আমি সুভাষ বলছি

শৈলেশ দে

আমি সুভাষ বলছি

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শ্রীশৈলেশ দে

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ :
রথযাত্রা, ১৩৭৭
দ্বিতীয় সংস্করণ :
শিবরাত্রি, ১৩৭৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

পনের টাকা মাত্র (সাধারণ বাঁধাই

ষোল টাকা মাত্র (রেক্সিন বাঁধাই

'Let us create history, let somebody else write it.'

—Netaji

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল।

'আমি সুভাষ বলছি' স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। ইতিহাস-ভিত্তিক একটি গৌরবোজ্জল অধ্যায় মাত্র। এ অধ্যায়ের প্রধান নায়ক আপসহীন বিপ্লবী নেতাজী সুভাষ। স্বভাবতই তাঁর কথা এ কাহিনীতে যতখানি স্থান পেয়েছে, অন্য সবার কথা ঠিক ততখানি আসেনি। পাঠক-পাঠিকাগণ এ ব্যাপারে কোন রকম ভুল বুঝবেন না আশা করি।

নেতাজীকে অনেকেই অনেক ভাবে দেখেছেন। অনেক ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যাঁরা রাজনীতিবিদ, তাঁরা দেখেছেন তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ঐতিহাসিকগণ বিশ্লেষণ করেছেন ইতিহাসের দিকে নজর রেখে।

আমি সাধারণ মানুষ। রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাই মতবাদ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সাধারণ ভাবেই আমি তাঁর কথা বলতে চেষ্টা করেছি আমার এই গ্রন্থের মাধ্যমে।

নেতাজী বলেছেন—"Let us create history, let somebody else write it." ভরসা বলতে আমার শুধু এইটুকুই। যদিও জানি যে, এই দুস্তর সাগর পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়, তবু ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জল অধ্যায়কে বার বার বিভিন্ন ভাবে স্মরণ করতে দোষ কি?

প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের পটভূমিকা অনেক বিরাট ও ব্যাপক। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তার পরিধি-বিস্তার। দায়িত্বও তদনুযায়ী বিশাল। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেও সেই দায়িত্ব বহনের প্রেরণা আমি পেয়েছি প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের কাছ থেকে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ঘোষের (মুকুল) কাছে। বইটি আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়ে এবং বহু মূল্যবান পরামর্শাদি দিয়ে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

তেমনি ভুলতে পারব না আজাদ হিন্দ সরকারের উপদেষ্টা ও নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীদেবনাথ দাসের সহযোগিতার কথা। এমন নেতাজী-প্রেমিক সত্যিই দুর্লভ। ব্যাঙ্কক সম্মেলন ও স্বামী সত্যানন্দ পুরীর অপ্রকাশিত ছবি দুটি পেয়েছি তাঁরই সৌজন্যে। বার্লিন-পর্বের কয়েকটি ছবিও তাঁরই দেওয়া।

মেজর আবিদ হাসান, বিপ্লবী মণীন্দ্র নায়েক এবং নেতাজী-ভবনে সংরক্ষিত অন্তর্ধান-পর্বে ব্যবহৃত সেই ঐতিহাসিক গাড়িটির ছবি তুলে দিয়েছে শ্রীমান সুবিনয়। পাঁচখানি ছবি পেয়েছি 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর' সৌজন্যে। ইয়োরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র দুটি এঁকে দিয়েছেন শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত। এঁদের সবার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া, এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে যাঁরা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন : সুলেখক শঙ্কু মহারাজ, দেবরঞ্জন গুহ, মনোরঞ্জন ঘোষ, পার্থসারথি বসু, অশোকা দত্ত, সুস্মিতা বসু, তপতী গুপ্তভায়া, অধ্যাপক ফণিভূষণ আচার্য এবং লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

কবিগুরুর রচনাবলী থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতী আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

'আমি সুভাষ বলছি' এই নামে সম্পূর্ণ রচনাটি একাদিক্রমে ছত্রিশটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন 'উল্টোরথ'-কর্তৃপক্ষ। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থ-রচনা কালে বহু দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার 'বালীগঞ্জ ইন্‌স্টিটিউট'। পাঠাগারের তরুণ বন্ধুদের অকৃপণ সহযোগিতার ফলে এ ব্যাপারে আমাকে কোনদিন এতটুকুও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা-পত্র পেয়েছি পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, ধন্যবাদ জানাই তরুণ প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর একটিই মাত্র দাবী—অন্তত চল্লিশ পাতার ছবি চাই। তাই দেওয়া হল। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আই.এন.এ.-র কোন ছবি এই খণ্ডে দেওয়া হয়নি। সে-সব থাকবে পরবর্তী খণ্ডে।

আর একটু সময় পেলে ভাল হত। কিন্তু উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের ক্রমবর্ধমান দাবীর জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করতে হল। হয়তো অসাবধানতাবশতঃ কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। থাকাটাই স্বাভাবিক। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেবার বাসনা রইল।

গ্রন্থখানি দ্রুত প্রকাশনার জন্য শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করছি।

বিনীত—

গ্রন্থকার

(রথযাত্রা) ২০শে আষাঢ়, ১৩৭৭ সাল

২১বি, ফার্ণ রোড,
কলিকাতা-১৯

পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। পুনঃ-মুদ্রণে আরো এমন কিছু তথ্য যোগ করা হল, যা প্রথম মুদ্রণে ছিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমি অসংখ্য চিঠি-পত্র পেয়েছি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিনীত—

গ্রন্থকার

(শিবরাত্রি) ৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৭ সাল

২১বি, ফার্ণ রোড,
কলিকাতা-১৯

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

আমি সুভাষ বলছি : প্রথম খণ্ড : (পঞ্চম সংস্করণ)

বিনয়-বাদল-দীনেশ (চতুর্থ সংস্করণ)

ক্ষমা নেই (৩য় সংস্করণ)

রক্ত দিয়ে গড়া (২য় সংস্করণ)

ফাঁসি মঞ্চ থেকে (২য় সংস্করণ)

শপথ নিলাম

রক্তের অক্ষরে

ও

অন্যান্য

॥ যে-সব বই ও পত্রিকা থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে ॥

ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়
সবার অলক্ষ্যে	"
বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনকিশোর গুহ
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	সুপ্রকাশ রায়
ভারতের বিপ্লব কাহিনী	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
সে যুগের আগ্নেয় পথ	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
শহীদ যুগল	নগেন্দ্রকুমার গুহরায়
ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ	লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
বাংলার বীর বন্দীরা	নিরঞ্জন সেন
হে অতীত কথা কও	সত্যানন্দ স্বামী
অবিস্মরণীয়	গঙ্গানারায়ণ চন্দ
মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র	শিশির দাশ
নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ	নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
রুশ-জার্মান সংগ্রাম	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী	"
ভারত ছাড়	নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ
মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে	কাশীকান্ত মৈত্র
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ	সঞ্জয়
যুদ্ধের ইয়োরোপ	বিক্রমাদিত্য
জার্মানীতে নেতাজী (সাপ্তাহিক বসুমতী)	অশোক সেন
পাক-ভারতের রূপ-রেখা "	প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী
কর্মবীর রাসবিহারী	বিজনবিহারী বসু
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু	শান্তিকুমার মিত্র
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র	নেপাল মজুমদার
মুক্তি সংগ্রাম	সুভাষচন্দ্র বসু
পথের দাবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পত্রগুচ্ছ	জওহরলাল সম্পাদিত
রবীন্দ্র রচনাবলী	বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

A basic history of Germany	Hubertus Prince Zu Loewenstein
German History 1933-45	H. Mau & H. Krausnick
Germany since 1848	Wolfgang Treue
The political legacy of the German resistance movement	Hans Rothfels
Hitler and the English	Fritz Hesse
Hitler	Wyndham Lewis
Hitler was my friend	Heinrich Hoffmann
Hitler marches in the Soviet	Bertram Otto
Story of the War	David Marley
The Ribbentrop memoirs	Alan Bullock
Das Dritte Reich	Heinz Huber & Artur Muller
Heinrich Himmler	Roger Manvell & Heinrich Fraenkel
Hermann Goering	"
The rise and fall of the Third Reich	William L. Shirer
Rommel	Desmond Young
Second World War	W. S. Churchill
Secret session speeches	"
Pacific Victory	Hugh Buggy
The Springing Tiger	Hugh Toye
German Odyssey	Otto Zarek
Subhas as I Knew him	Kitty Kurti
Netaji Subhas Chandra Bose	Tatsuo Hayashida
Netaji in Germany	Alexander Werth & Walter Harbich
Netaji in Germany	N. G. Ganpuley
Indian Politics	Reginald Coupland
This Europe	Girija Mukherjee
Rebel India	Bejan Mittra & Phani Chakraborty
India Wins Freedom	Abul Kalam Azad
Chalo Delhi	S. A. Das & K. B. Subbaiah

History of Freedom Movement in India	R. C. Mazumder
Advent of Independence	A. K. Mazumder
The History of the Indian National Congress	Pattabhi Sitaramyya
The Last Years of British Rule in India	Michael Edwards
Rash Behari Bose : His struggle for India's Independence	Biplabi Mahanayak Rash Behari Bose Smarak Samity
Two great Indian Revolutionaries	Uma Mukherjee
My Indian Years, 1910-1916	Lord Hardinge
India as I knew it	Michael O' Dwyer
India in Revolt	Tarini Sankar Chakraborty
My Memories of the I. N. A. and its Netaji	Maj. Gen. Shahnawaz Khan
India's struggle for Freedom	Maj. Gen. A. C. Chatterjee
Important speeches and writings of Subhas Bose	Jagat S. Bright
Indian Struggle	Subhas Chandra Bose
On to Delhi	

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতী : আনন্দবাজার : অমৃতবাজার : স্টেট্‌স্‌ম্যান : জাপান টাইমস্ : টোকিও নিচিনিচি : ইয়ং ইণ্ডিয়া (সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের মুখপত্র) : সঞ্জীবনী : দেশ : প্রবাসী : জয়শ্রী : বিপ্লবী নিকেতন (নেতাজী সংখ্যা) : রাষ্ট্রধর্ম (হিন্দি) : নেতাজী জন্মতিথি বুলেটিন : বার্ক পাবলিশিং (লণ্ডন) : ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট এবং সাপ্তাহিক বসুমতী

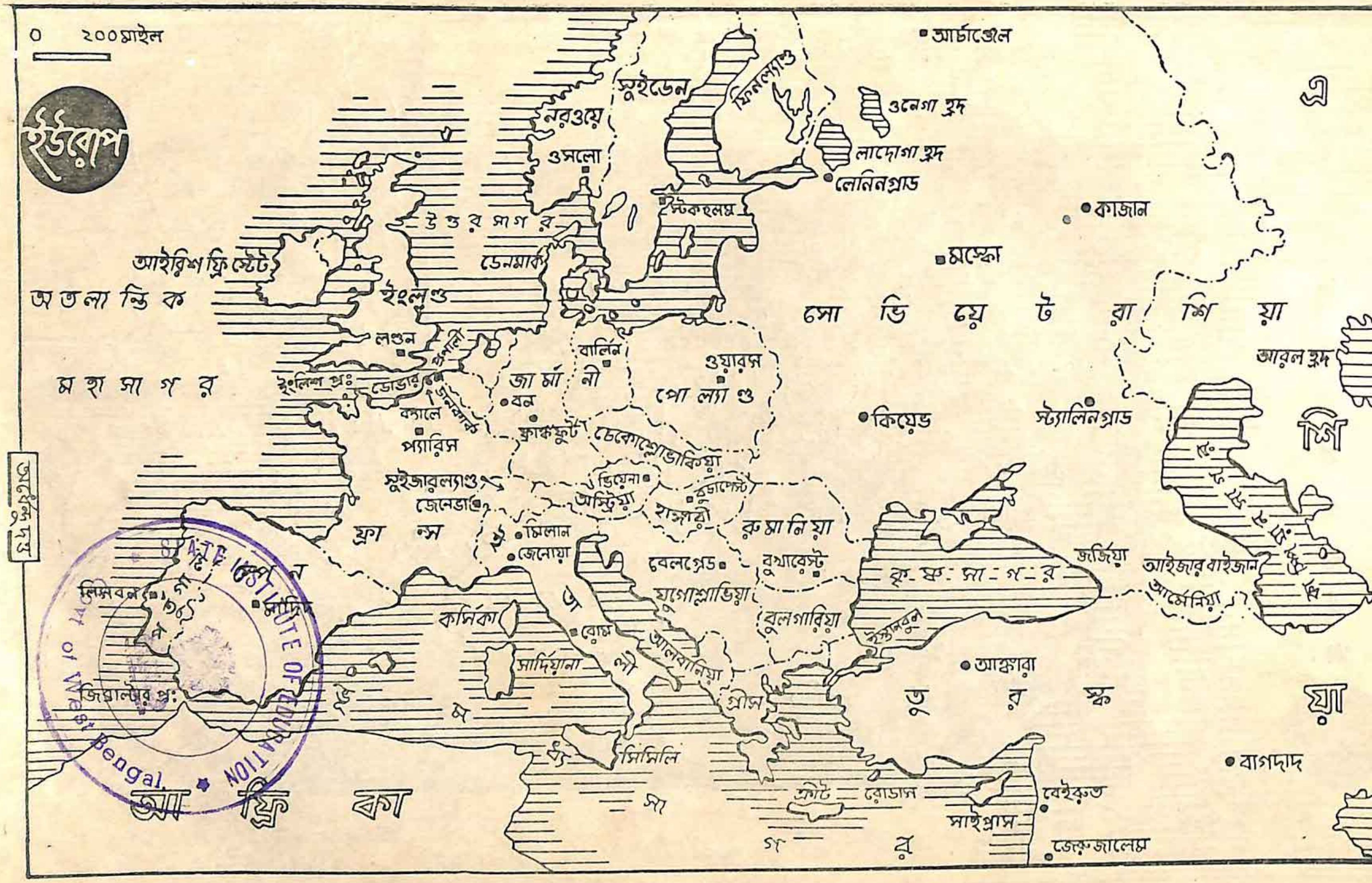
সুভাষচন্দ্র,

…তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভ ক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি।…আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।

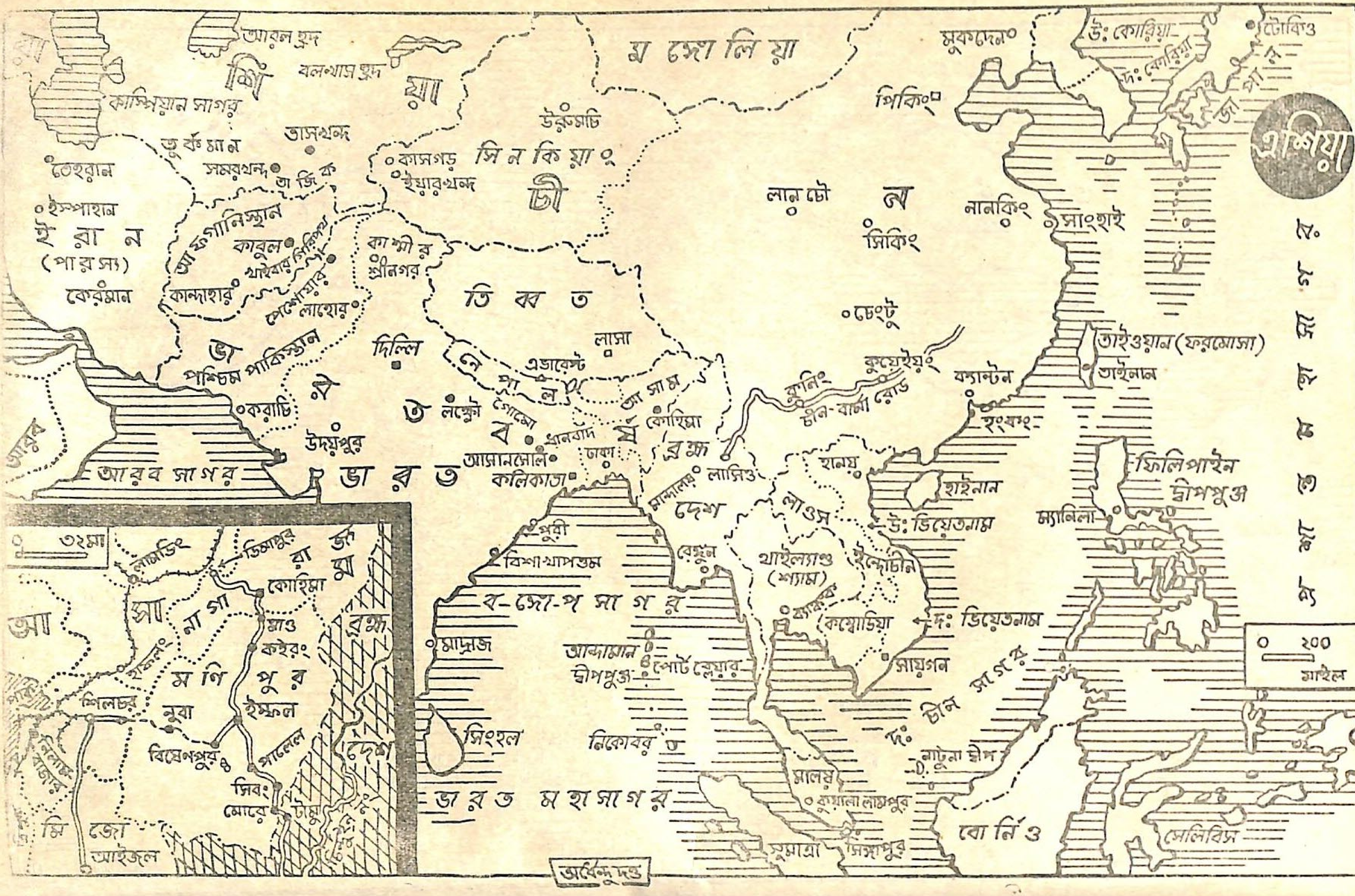
এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে।

দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।…

—রবীন্দ্রনাথ



ইউরোপ
0 ২০০মাইল
অর্ধেন্দু দত্ত
আর্চাঞ্জেল
সুইডেন
ফিনল্যাণ্ড
নরওয়ে
ওসলো
ওনেগা হ্রদ
লাদোগা হ্রদ
লেনিনগ্রাড
স্টকহলম
কাজান
মস্কো
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
আইরিশ ফ্রি স্টেট
ইংলণ্ড
অতলান্তিক মহাসাগর
লণ্ডন
ইংলিশ প্রঃ
ডোভার
ক্যালে
প্যারিস
জার্মানী
বার্লিন
বন
ওয়ারস
পোল্যাণ্ড
সোভিয়েট রাশিয়া
আরল হ্রদ
কিয়েভ
স্ট্যালিনগ্রাড
ফ্রাঙ্কফুর্ট
চেকোশ্লোভাকিয়া
সুইজারল্যাণ্ড
জেনেভা
ভিয়েনা
অস্ট্রিয়া
বুডাপেস্ট
হাঙ্গারী
রুমানিয়া
ফ্রান্স
মিলান
জেনোয়া
বেলগ্রেড
বুখারেস্ট
কৃষ্ণ সাগর
জর্জিয়া
আইজারবাইজান
আর্মেনিয়া
লিসবন
মাদ্রিদ
কর্সিকা
রোম
যুগোশ্লাভিয়া
বুলগারিয়া
ইস্তাম্বুল
সার্দিনিয়া
আলবানিয়া
আঙ্কারা
তুরস্ক
গ্রীস
জিব্রাল্টার প্রঃ
সিসিলি
বাগদাদ
ক্রীট
রোডাস
বেইরুত
সাইপ্রাস
জেরুজালেম
আফ্রিকা
এশিয়া


এশিয়া
প্রশান্ত মহাসাগর
মঙ্গোলিয়া
আরল হ্রদ
বলখাস হ্রদ
কাস্পিয়ান সাগর
তুর্কমান
তাসখন্দ
সমরখন্দ
তাজিক
তেহরান
ইস্পাহান
ইরান
(পারস্য)
কেরমান
আফগানিস্থান
কাবুল
কান্দাহার
পেশোয়ার
লাহোর
কাসগড়
ইয়ারখন্দ
সিনকিয়াং
উরুমচি
চীন
কাশ্মীর
শ্রীনগর
তিব্বত
লাসা
দিল্লি
পশ্চিম পাকিস্তান
করাচি
উদয়পুর
আরব সাগর
ভারত
লক্ষ্ণৌ
নেপাল
এভারেস্ট
আসাম
কোহিমা
ধানবাদ
আসানসোল
কলিকাতা
ঢাকা
ব্রহ্মদেশ
মান্দালয়
লাসিও
কুনমিং
কুয়েইয়ং
চীন-বার্মা রোড
লান্‌চৌ
সিকিং
চেংটু
পিকিং
মুকদেন
উঃ কোরিয়া
দঃ কোরিয়া
জাপান
টোকিও
নানকিং
সাংহাই
তাইওয়ান (ফরমোসা)
তাইনান
ক্যান্টন
হংকং
হানয়
হাইনান
উঃ ভিয়েতনাম
লাওস
থাইল্যাণ্ড
(শ্যাম)
ব্যাংকক
ইন্দোচীন
কম্বোডিয়া
দঃ ভিয়েতনাম
সায়গন
ফিলিপাইন
দ্বীপপুঞ্জ
ম্যানিলা
পুরী
বিশাখাপত্তম
বঙ্গোপসাগর
রেঙ্গুন
মাদ্রাজ
আন্দামান
দ্বীপপুঞ্জ
পোর্ট ব্লেয়ার
সিংহল
নিকোবর
ভারত মহাসাগর
দঃ চীন সাগর
নাটুনা দ্বীপ
মালয়
কুয়ালালামপুর
সিঙ্গাপুর
সুমাত্রা
বোর্নিও
সেলিবিস
০ ২০০
মাইল
৩২মা
লামডিং
ডিমাপুর
রাজ্য
কোহিমা
আসাম
নাগা
মাও
কইরং
মণিপুর
ইম্ফল
শিলচর
নুবা
বিষেনপুর
পালেল
সিবং
মোরে
টামু
ব্রহ্মদেশ
মিজো
আইজল
অর্দ্ধেন্দু দত্ত

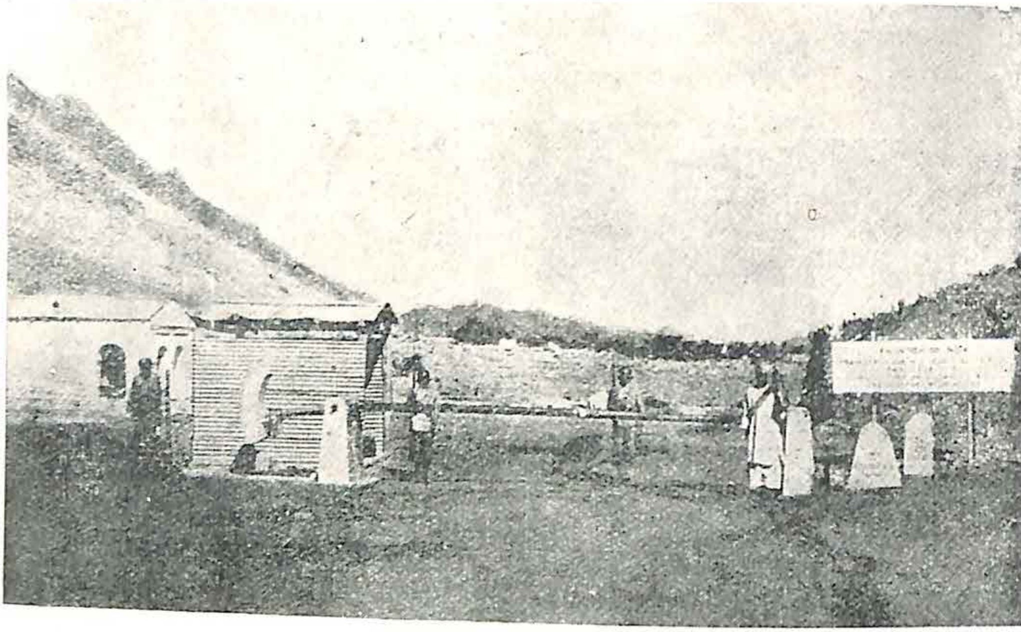
সেই গাড়ী



এই গাড়ীতেই নেতাজী অন্তর্ধান করেছিলেন এলগিন রোডের বাড়ী থেকে

(নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে)

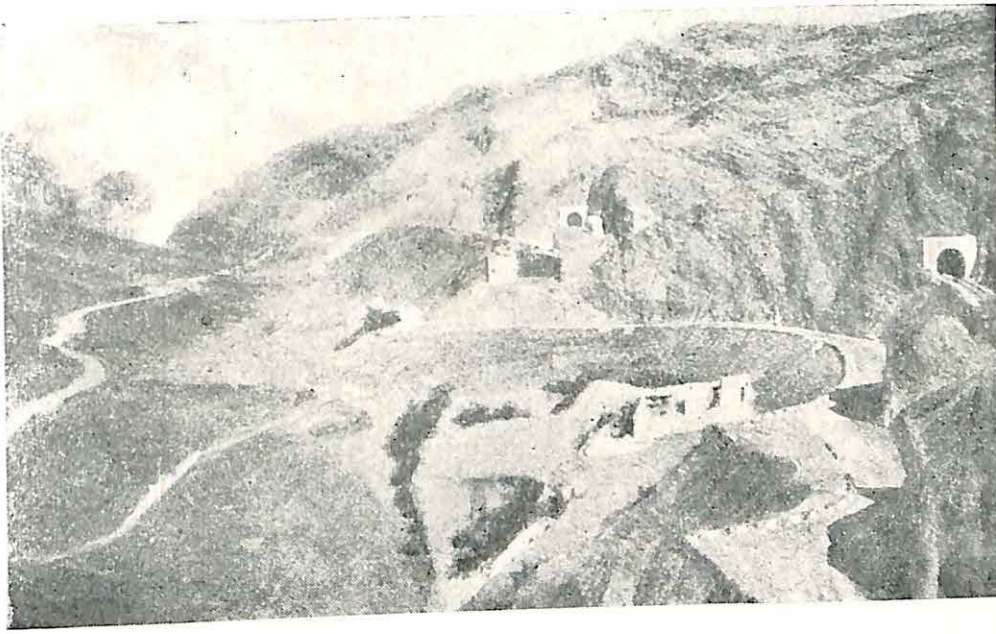
সেই পথ—



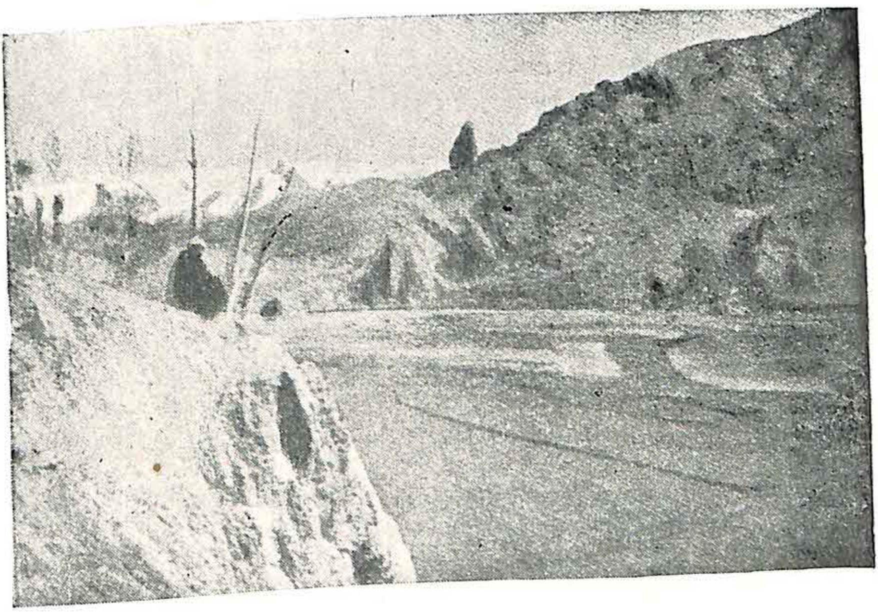
ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ সীমা [উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ]



জামরুদ দুর্গ



গিরিকন্দর পেরিয়ে [কাবুলের পথে]



হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে



সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজিট্টো
(নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে)



হিটলার



স্ট্যালিন



চার্চিল



রুজভেল্ট



মুসোলিনী



দ্যগল



চিয়াং কাইশেক



জেনারেল তোজো



গোয়েরিং



ডঃ গোয়েবল্‌স্



রিবেনট্রপ



ফিল্ড মার্শাল রোমেল



জুকভ



ওয়াভেল



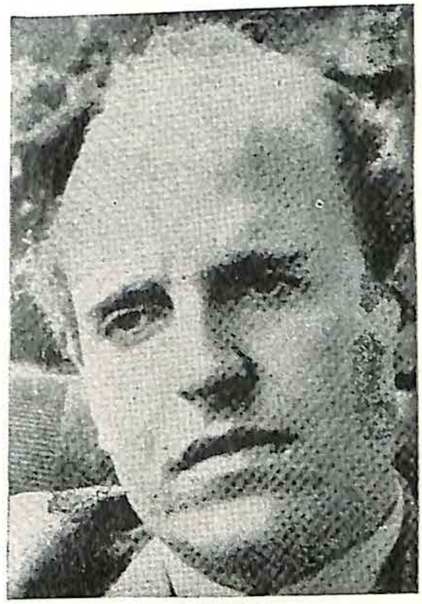
হিমলার



বোরম্যান



মলোটোভ



ভনট্রট



কাউণ্ট চিয়ানো



স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্

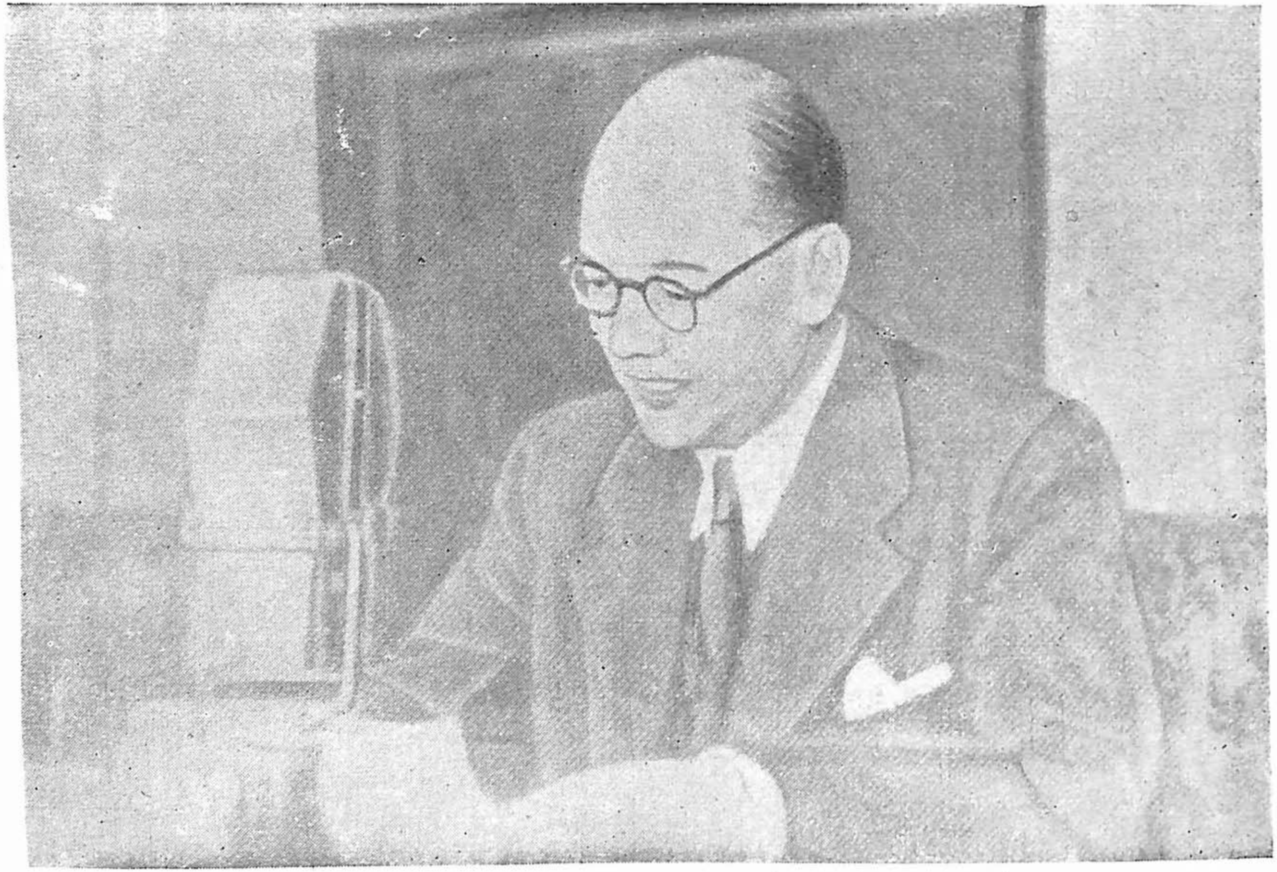


দুই প্রধান [নেতাজী ও হিটলার]



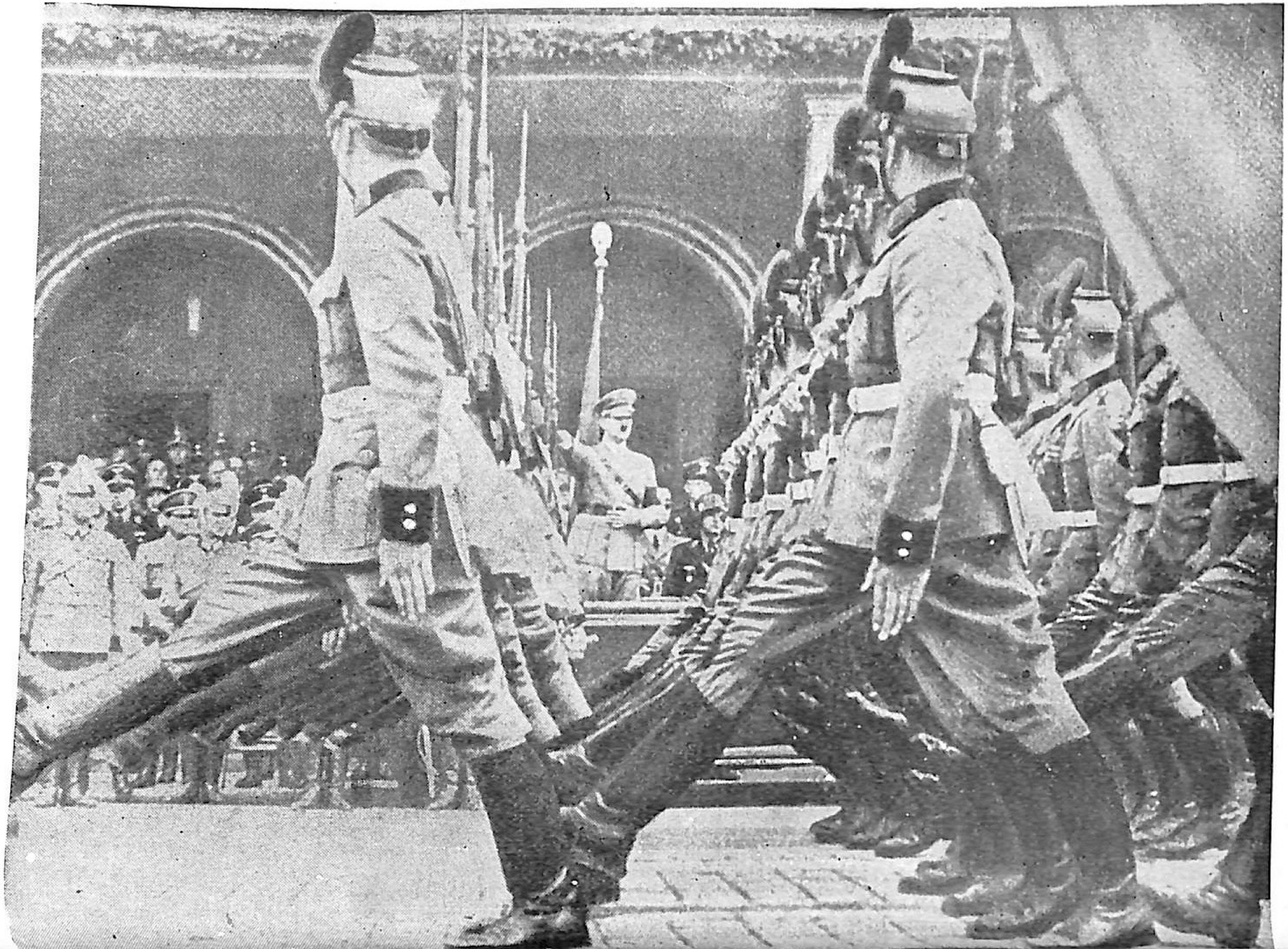
নেতাজী

(নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে)



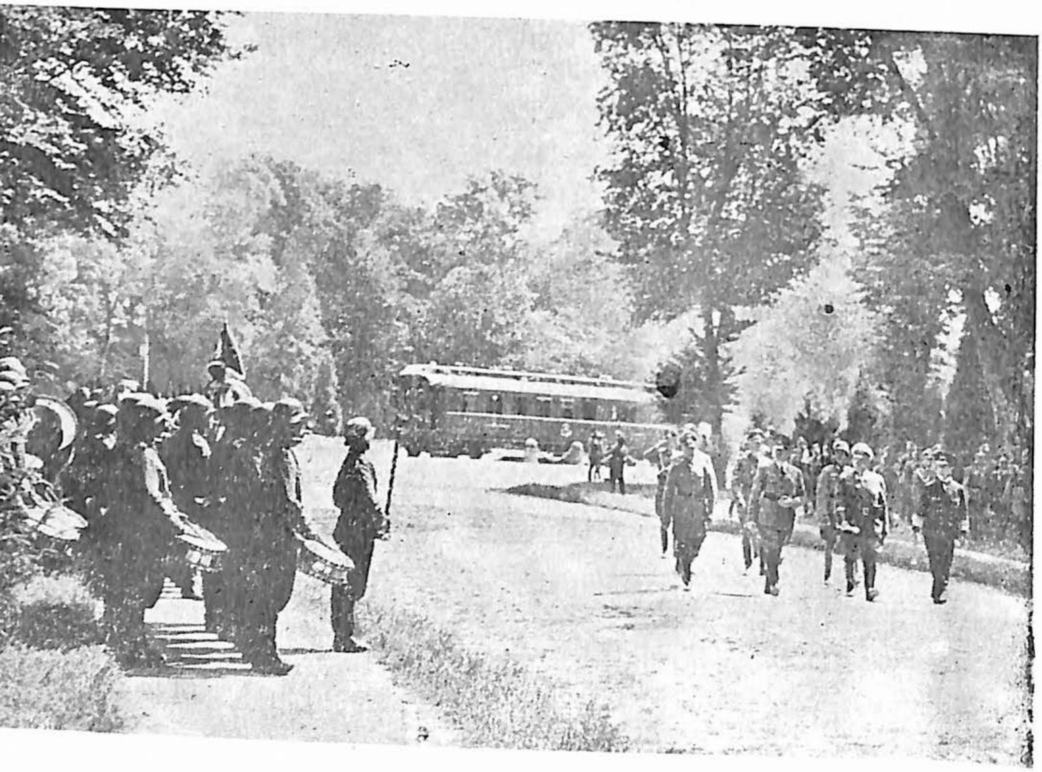
আমি সুভাষ বলছি
(নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে)

হিটলারকে অভিবাদনরত শক্তিমত্ত নাৎসী-বাহিনী





বিধ্বস্ত ডানকার্ক



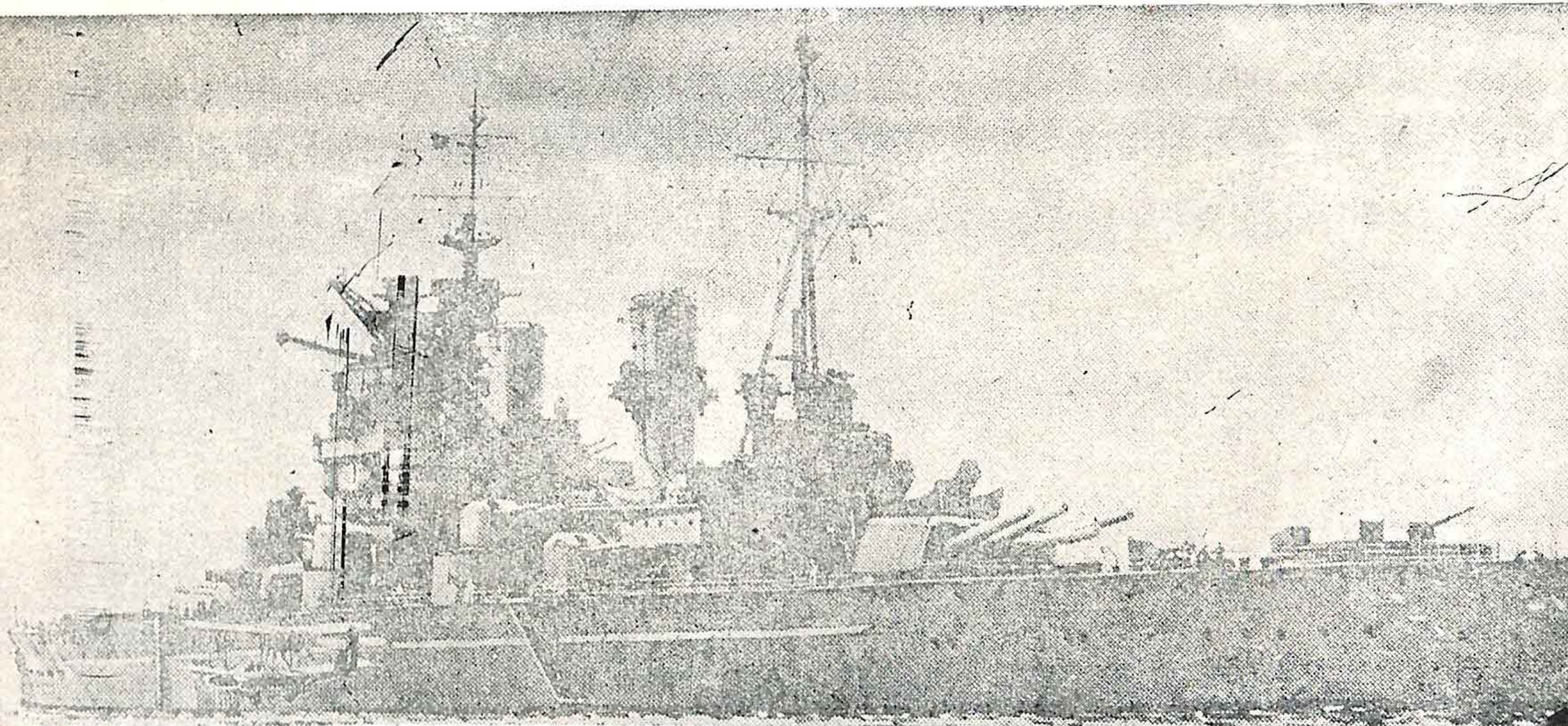
ফ্রান্সের ক্যাম্পেন অরণ্যে অবস্থিত সেই রেলগাড়ী
[সামনে হিটলার প্রমুখ নাৎসী নেতৃবৃন্দ]



মুসোলিনীকে অভিবাদনরত সেনা-বাহিনী



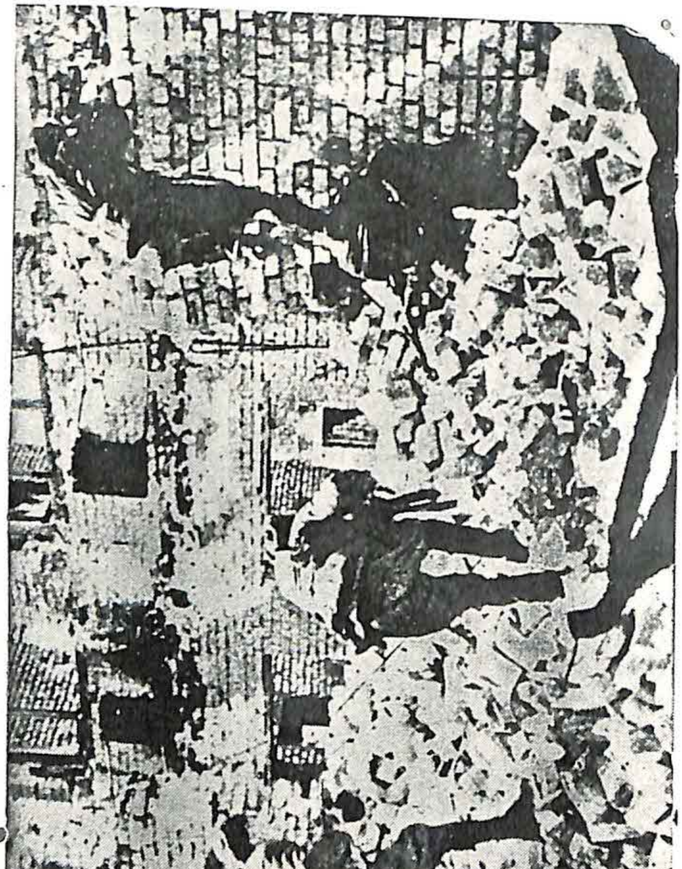
বিধ্বস্ত পার্ল হারবার



জাপানী বিমান-আক্রমণে নিমজ্জিত ব্রিটিশ ব্যাটলশিপ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্



আত্মসমর্পণের পূর্বদিনে সিঙ্গাপুর



স্ট্যালিনগ্রাড

বিভিন্ন রূপসজ্জায় বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী



চুচেন্দ্রনাথ



সতীশচন্দর



ফ্যাটবাবু



রাজা পি. এন. ঠাকুর



কর্তার সিং



বিষ্ণু গণেশ পিংলে



আমীরচাঁদ



অবোধবিহারী



বাবা গুরুদিৎ সিং



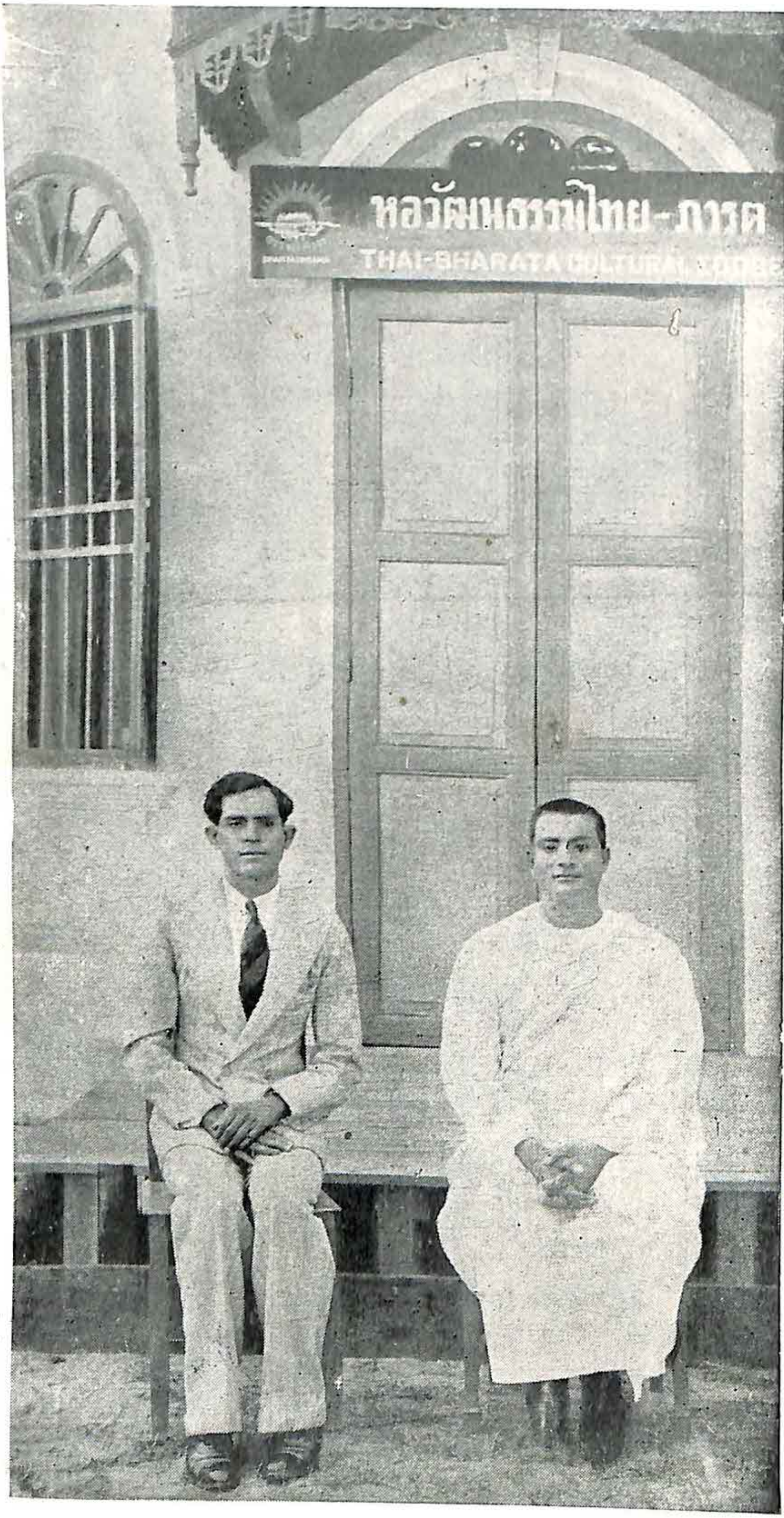
শচীন সান্যাল



রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ



মণীন্দ্র নায়েক



দেবনাথ দাস ও স্বামী সত্যানন্দ পুরী



ব্যাঙ্ক সম্মেলন



এন. রাঘবন



জন. এ. থিবি



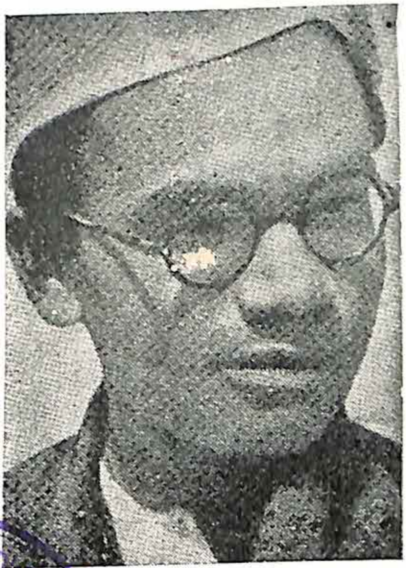
এন. কে. লক্ষ্মীমায়া



মোহন সিং



জয়প্রকাশ নারায়ণ



রামমনোহর লোহিয়া



অরুণা আসফ আলী



অচ্যুত পটবর্ধন



মানকুমার বসু



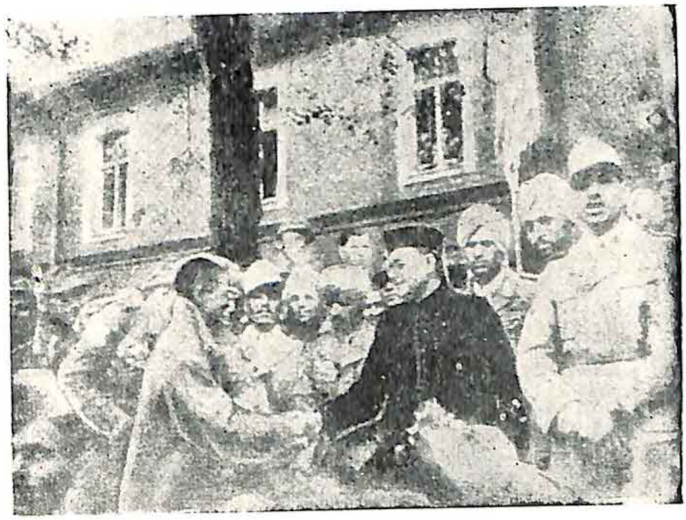
চিত্ত মুখার্জী



সত্যেন বর্ধন



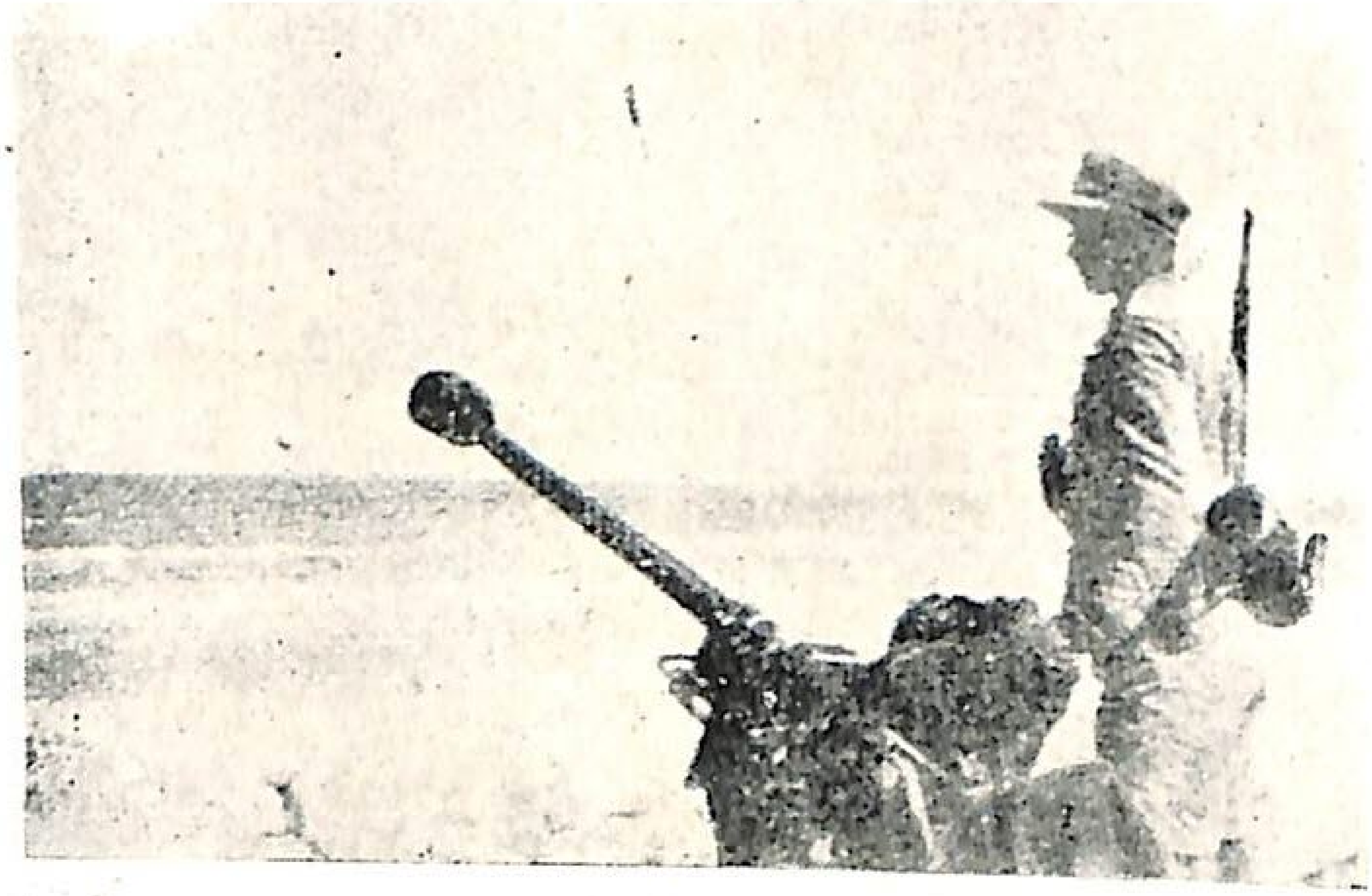
মাতঙ্গিনী হাজরা



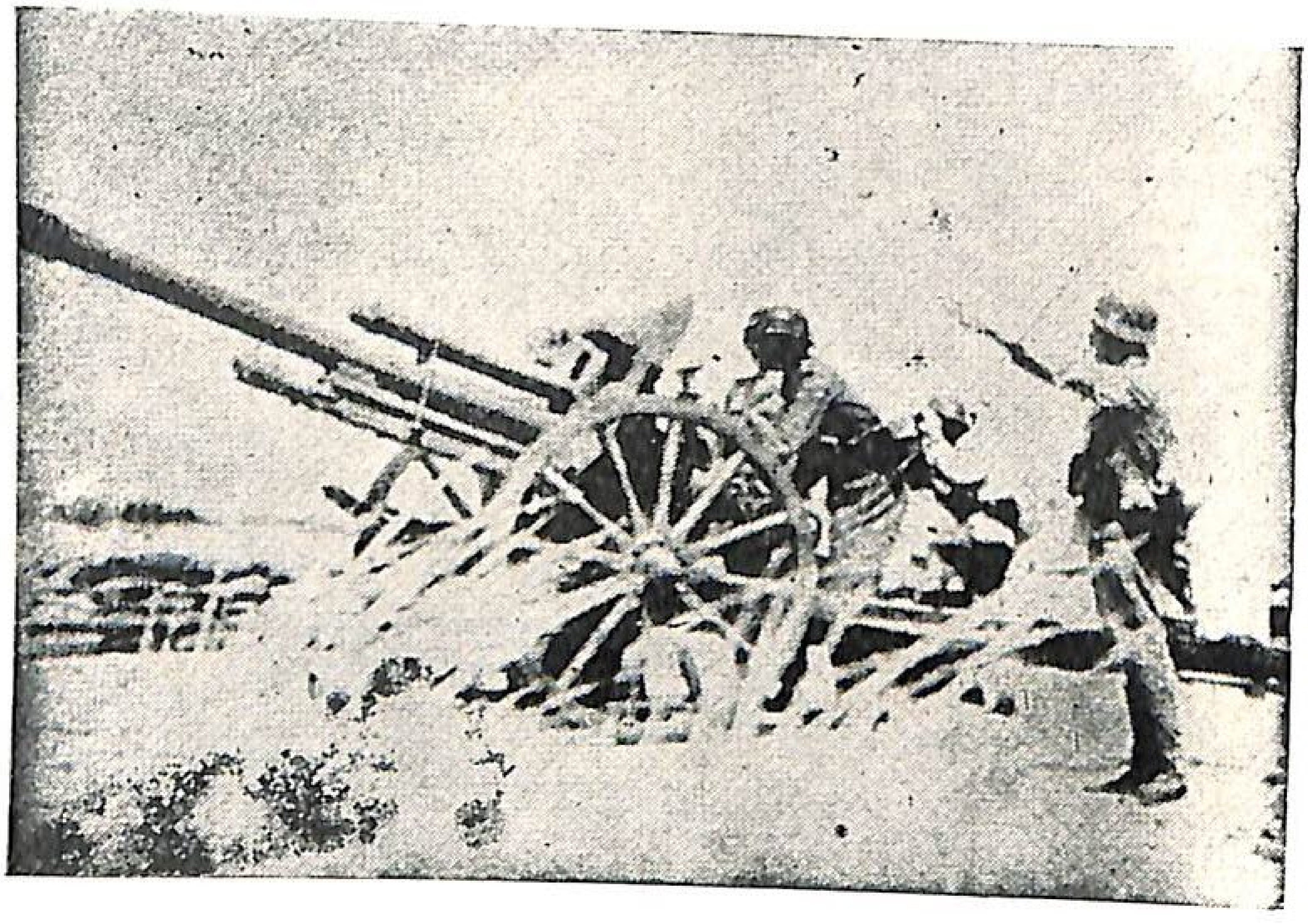
যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে নেতাজী
[জার্মানী]



সমুদ্র উপকূলে শিক্ষারত আজাদ হিন্দ ফৌজ
[জার্মানী]



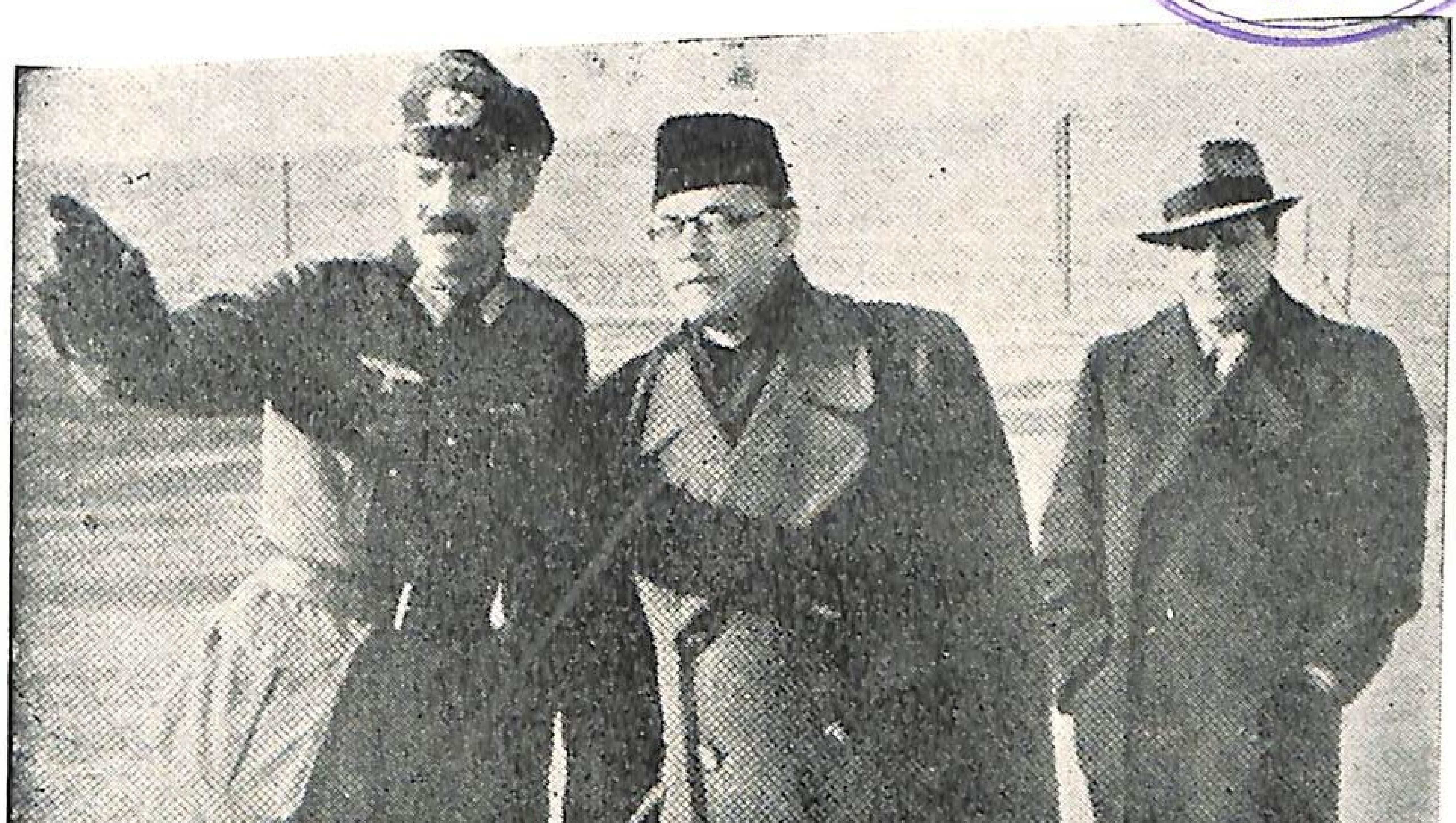
ডাচ্ উপকূলভাগে শিক্ষারত আজাদ হিন্দ ফৌজ
[জার্মানী]



শিক্ষারত আজাদ হিন্দ ফৌজ
[জার্মানী]



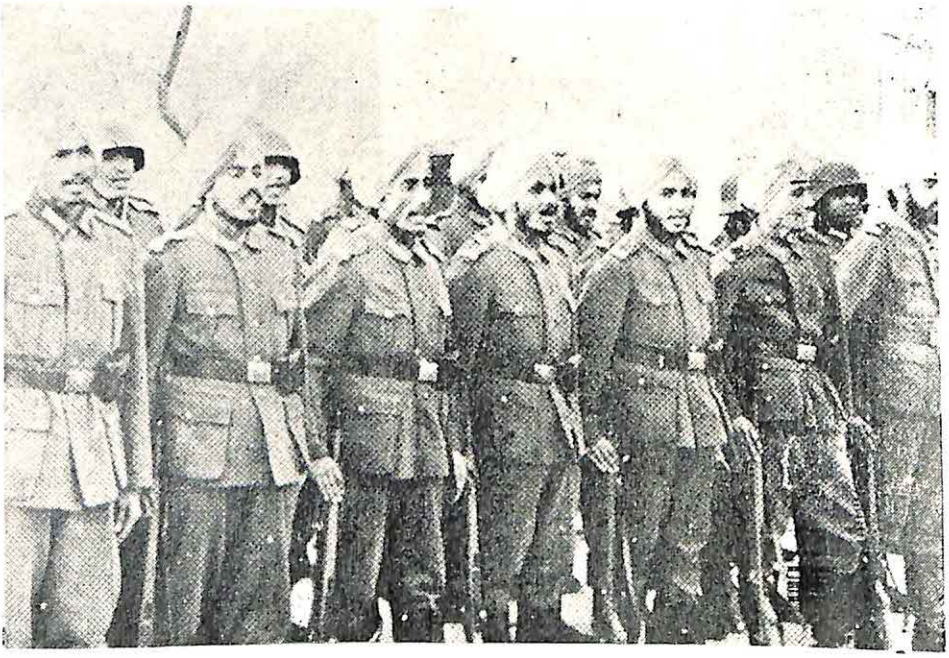
জার্মান ট্রেনার ও নেতাজী



জার্মান ট্রেনার ওয়াল্‌টার হারবিচ, নেতাজী ও অন্য একজন



সেনা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণরত নেতাজী
[বার্লিন]



জয় হিন্দ [জার্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ]



آزاد ہند

نمبر ۷

۱۷ جولائی

سنہ ۱۹۴۳

ہمارے کمانڈنگ صاحب کا مضمون

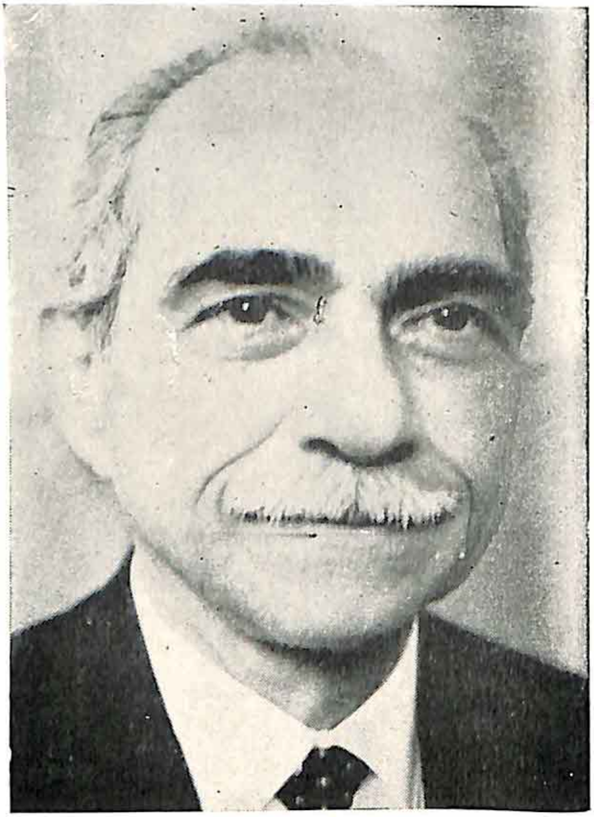
নিজস্ব পত্রিকা [জার্মানী]



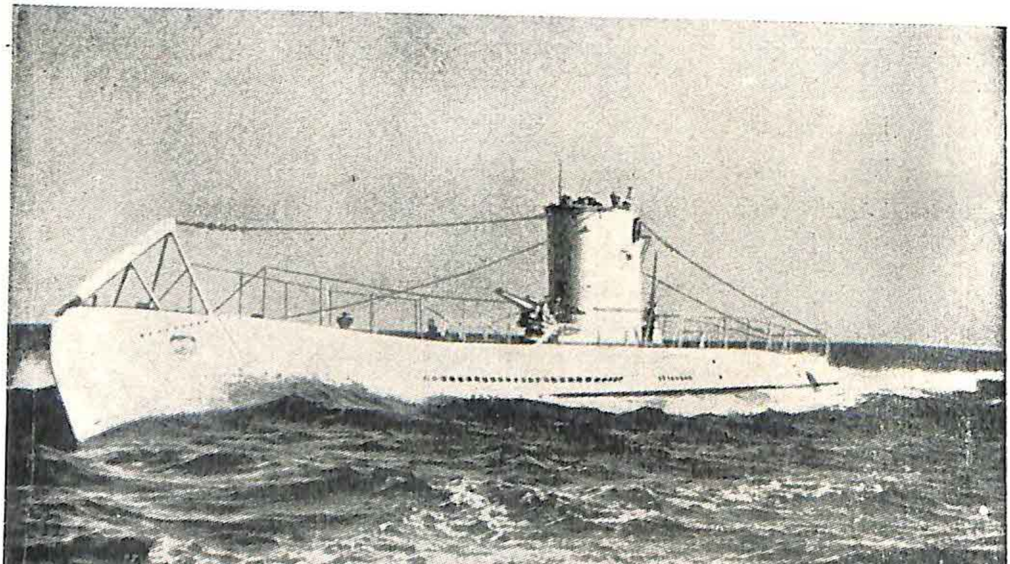
নিজস্ব ডাক-টিকেট [জার্মানী]



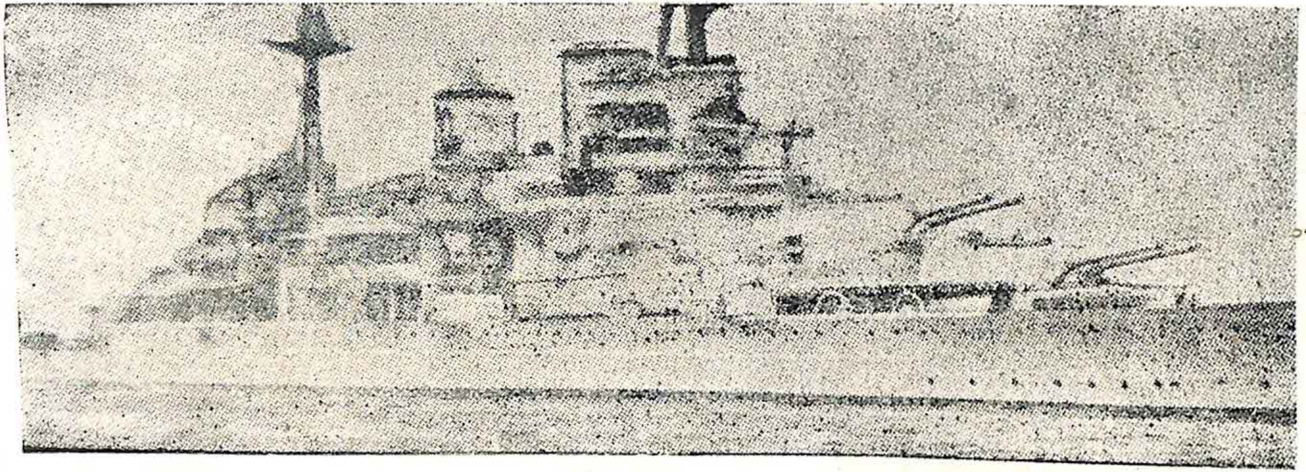
আমি সুভাষ
(নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে)



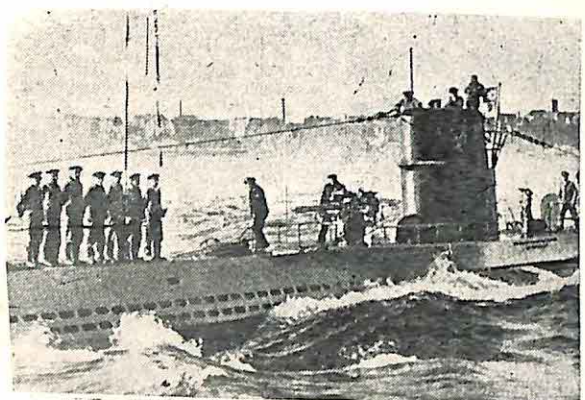
মেজর আবিদ হাসান



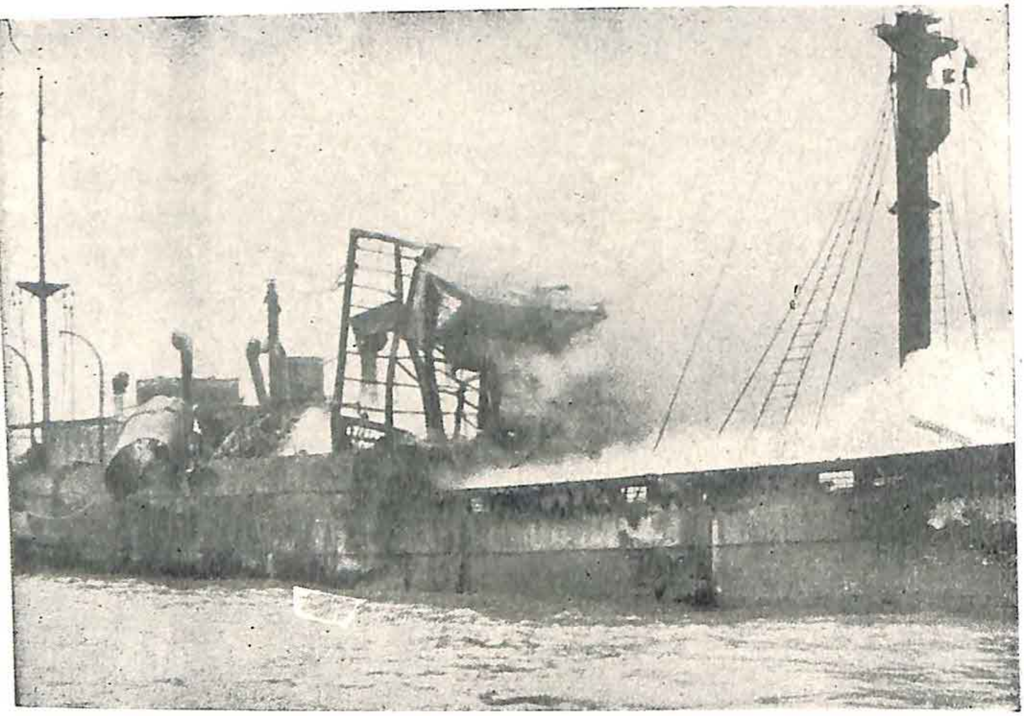
ভাসমান অবস্থায় জার্মান সাবমেরিন



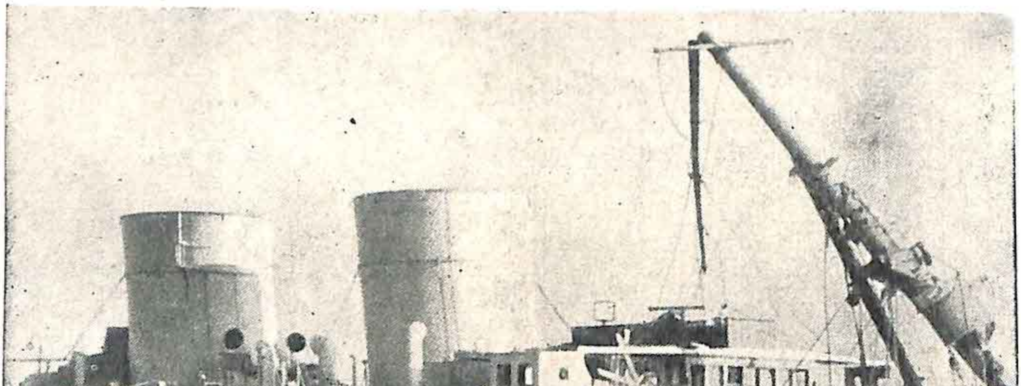
জাপানী বিমান-আক্রমণে
নিমজ্জিত ব্রিটিশ
রিপাল্‌স্‌ ব্যাটলশিপ



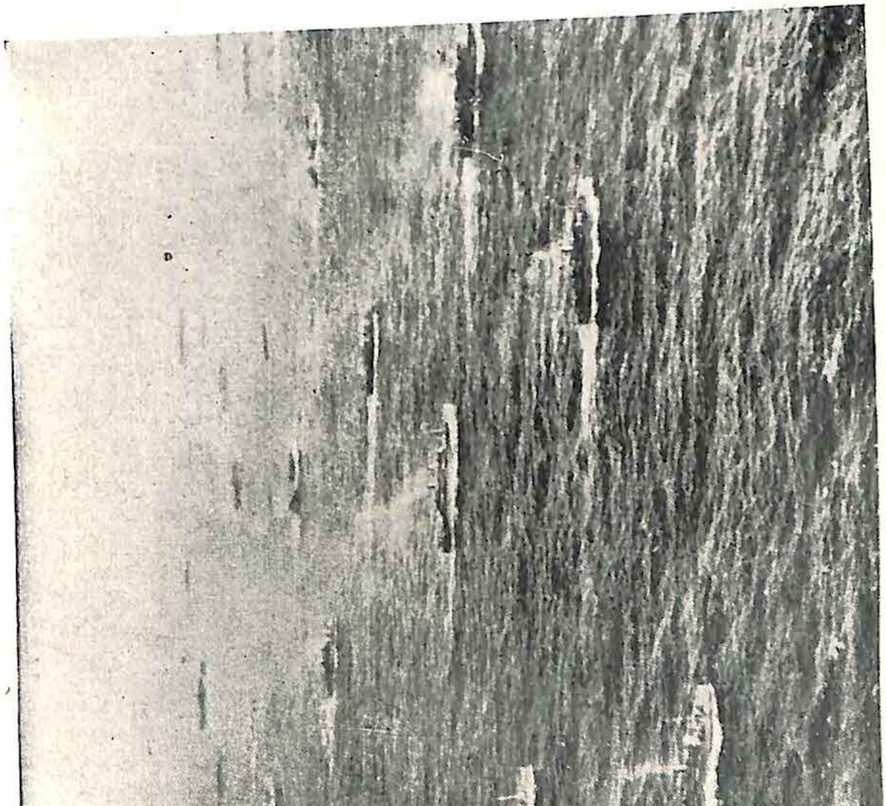
জার্মান সাবমেরিন



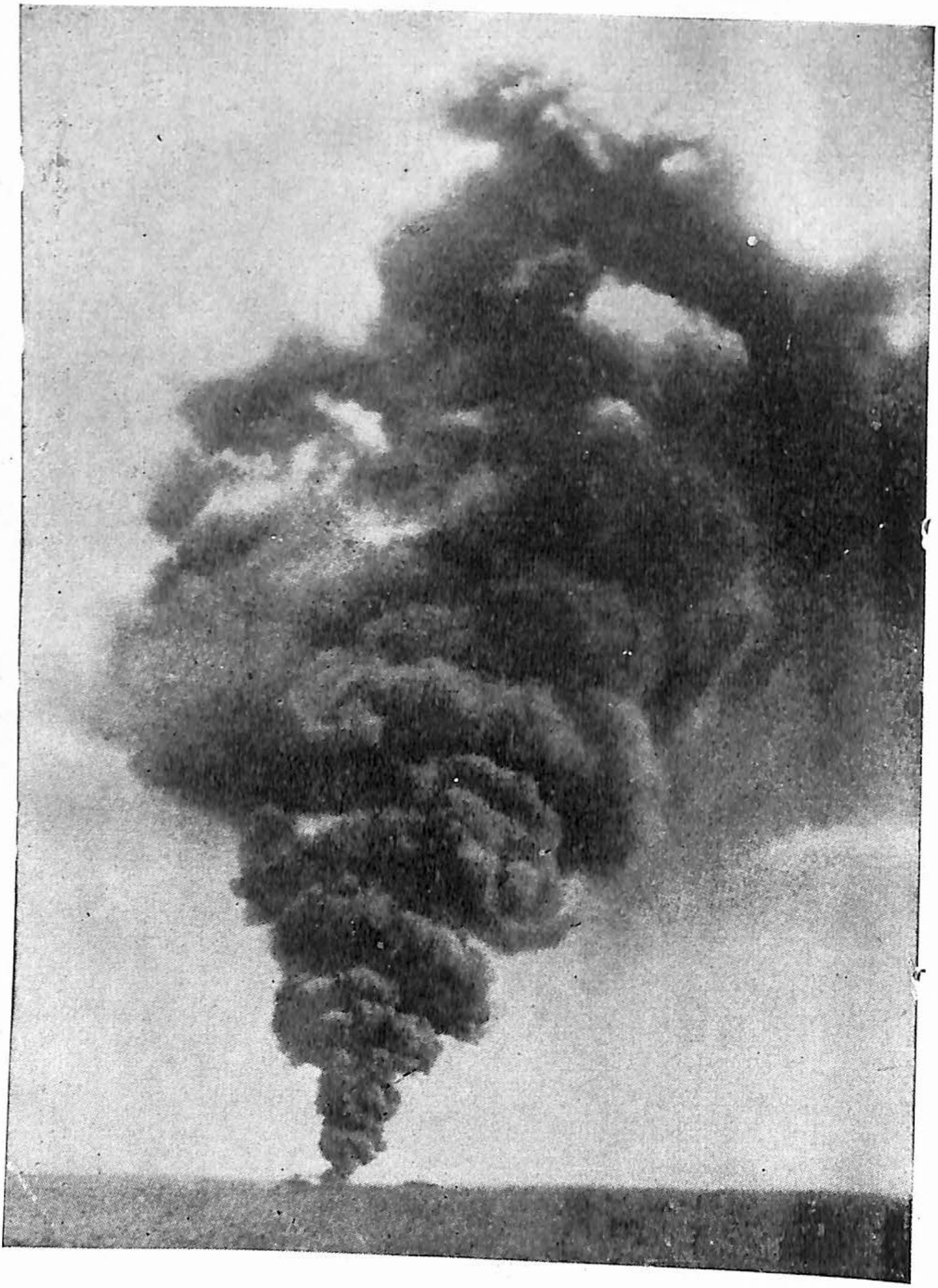
ইংলিশ চ্যানেলে টর্পেডো-বিধ্বস্ত ব্রিটিশ জাহাজ



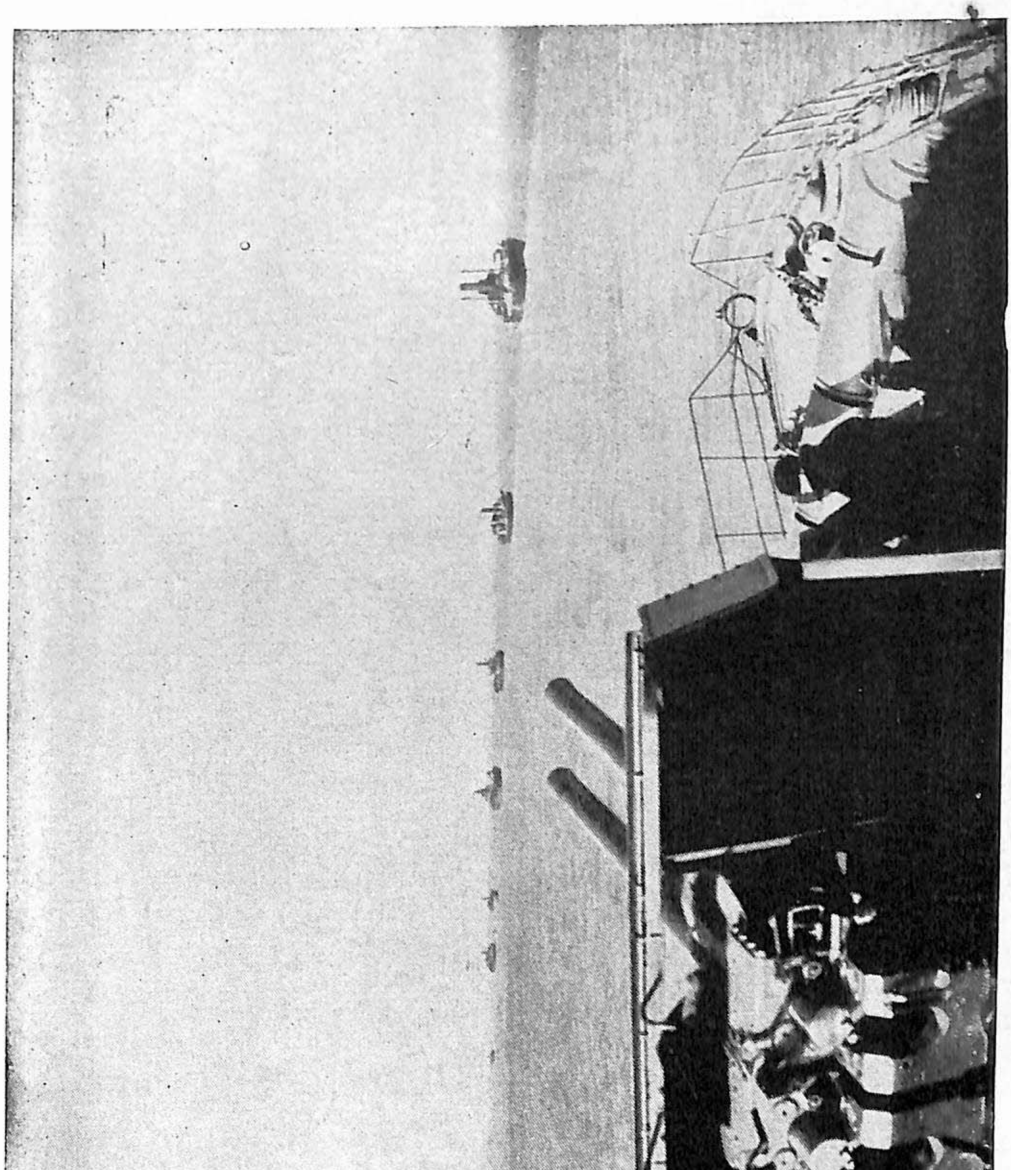
সলিল সমাধি



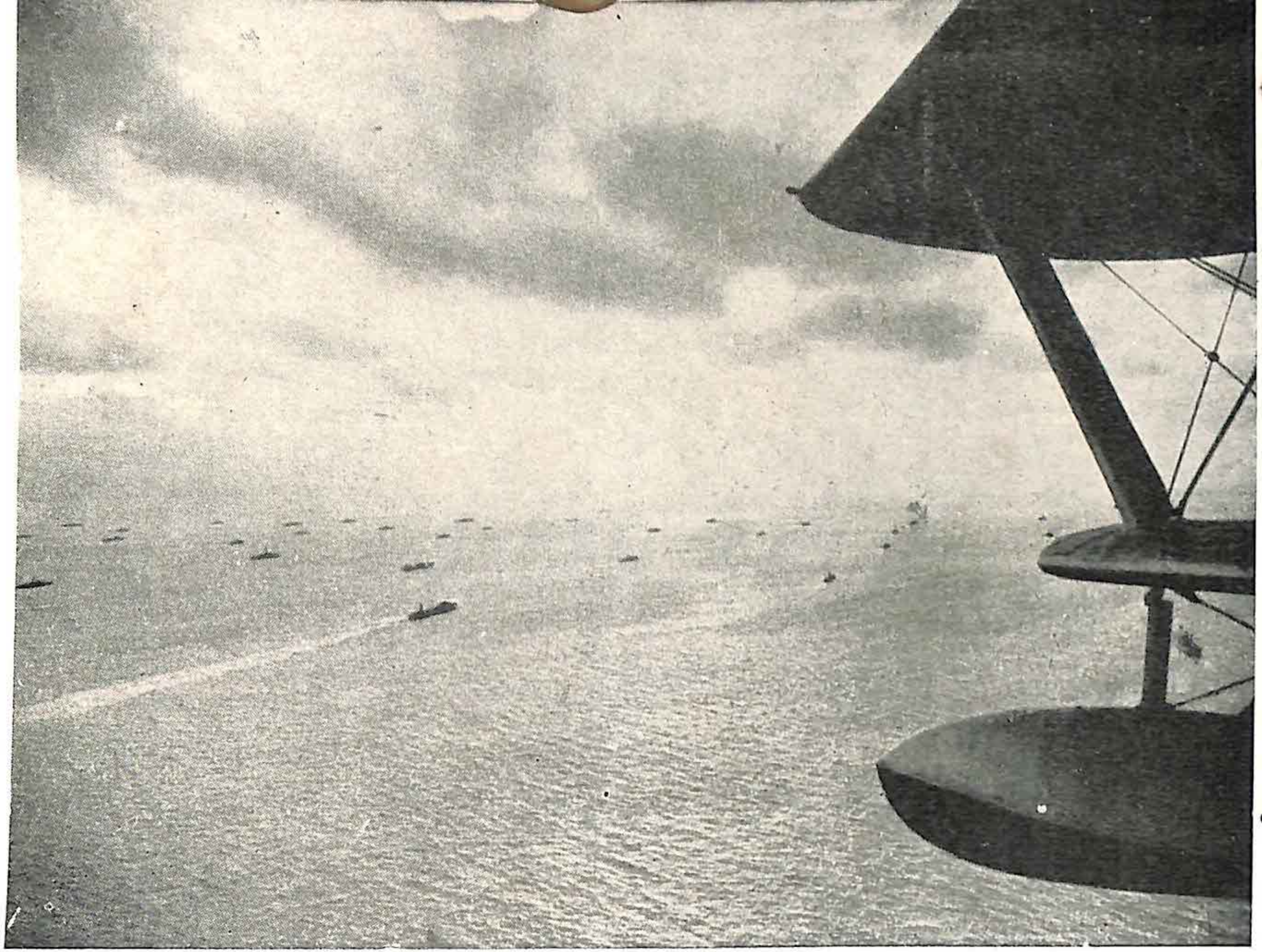
আইসেন হাওয়ারের নেতৃত্বে আফ্রিকা উপকূল অভিমুখে মিত্র বাহিনী



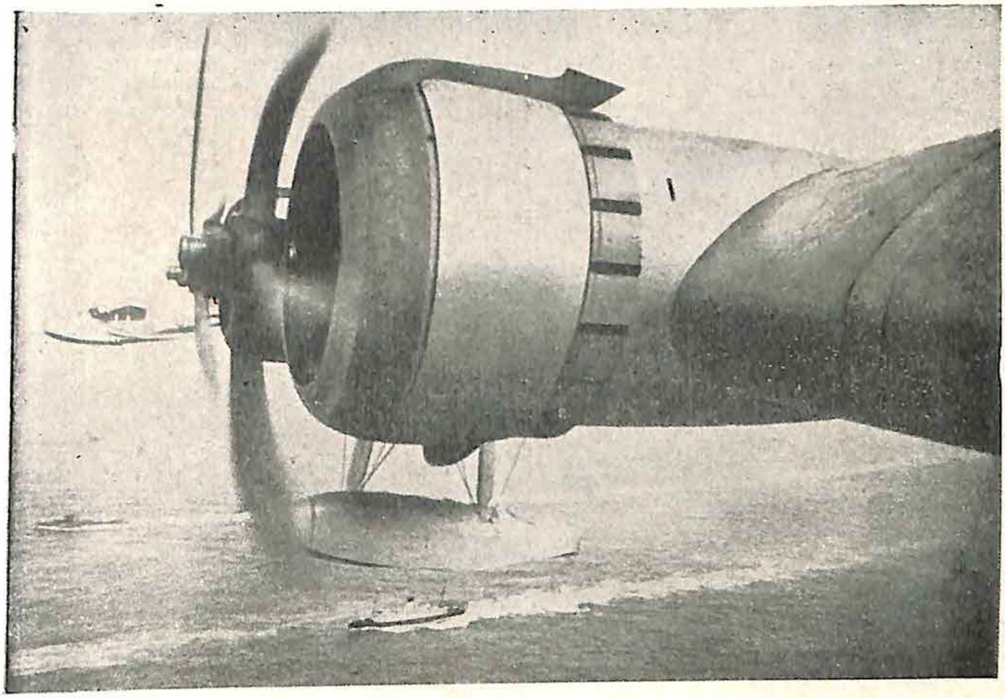
তলিয়ে যাবার আগে টর্পেডো-বিধ্বস্ত ব্রিটিশ জাহাজ



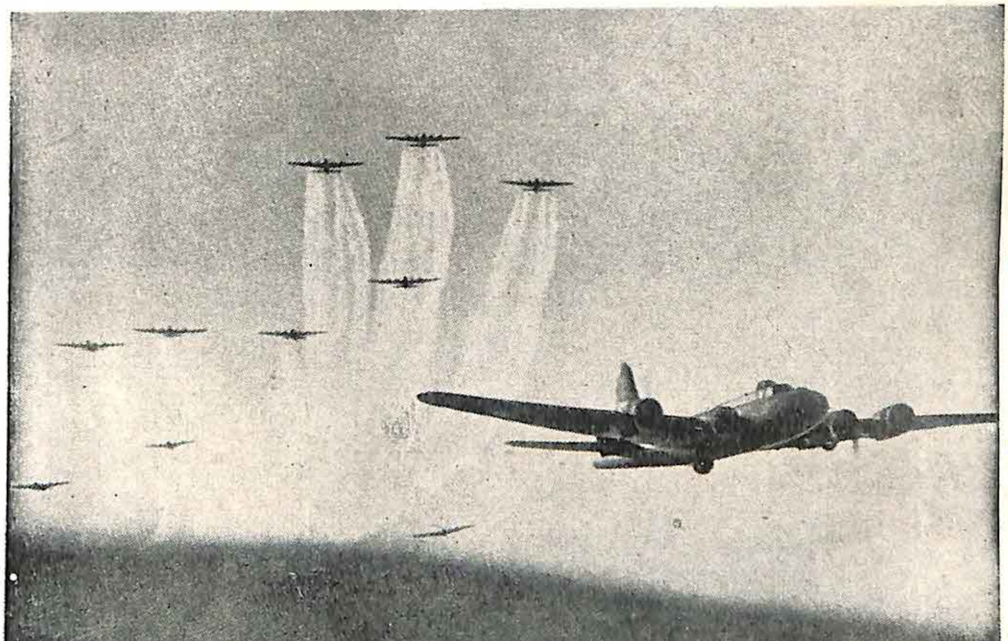
দল বেঁধে



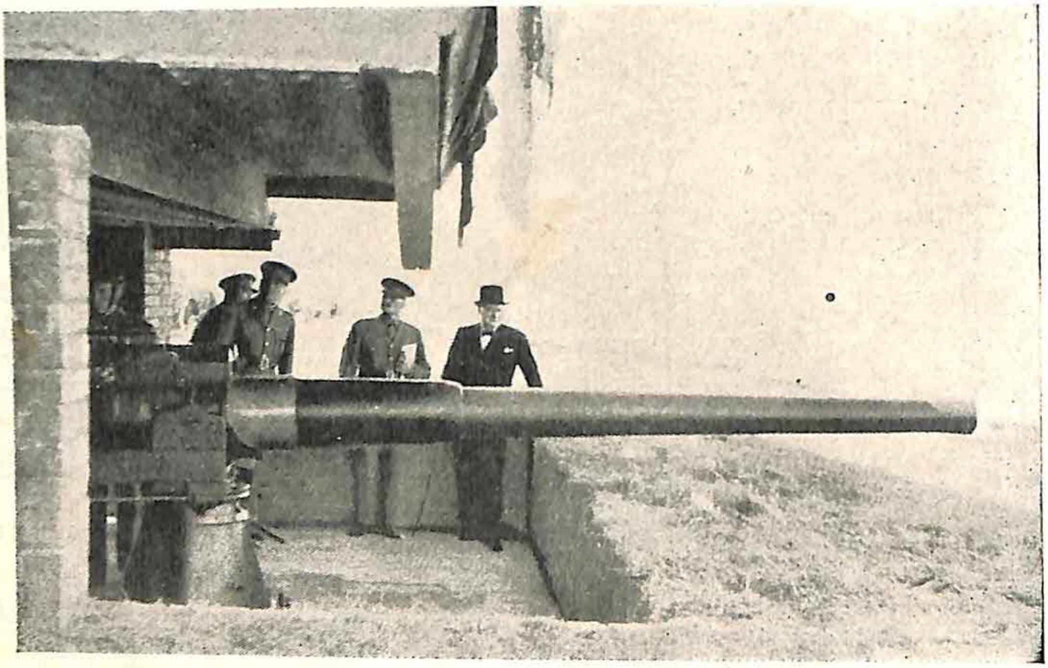
ব্রিটিশ কনভয়



নীচে কনভয়, ওপরে সদা-সতর্ক প্রহরী বিমান



শত্রু-রাজ্য অভিমুখে বিমান-বহর



উপকূলরক্ষী দূরপাল্লার কামান

[পেছনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল]



সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ

[ডানকার্ক থেকে]

ঘড়ির কাঁটাটা একটানা এগিয়ে চলেছে টিক্ টিক্ করে।

রাত চারটে বেজে পনেরো মিনিট। আর আধ ঘণ্টা বাকি। তারপরই শুরু হবে এক ঐতিহাসিক অভিযান, যার সাঙ্কেতিক নাম 'অপারেশন কেস্ হোয়াইট।'

হাজার হাজার ফাইটার এবং বোমারু বিমান প্রস্তুত। প্রস্তুত শক্তিশালী ট্যাঙ্ক-বহর। প্রস্তুত দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনী। প্রস্তুত ফিল্ড মার্শাল ভন ক্লুগে, ভন বোক, রাইখ্‌নেয়, রুনস্ট্যাণ্ড প্রমুখ সমর-কুশলী সেনাপতিবৃন্দ। এখন শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র!

চারটে বেজে চল্লিশ মিনিট। আরো পাঁচ মিনিট বাকি।

চারটে বেজে চুয়াল্লিশ মিনিট। চরম মুহূর্ত এগিয়ে এসেছে। আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বাকি। বিশ-পনেরো-দশ-পাঁচ-জিরো আওয়ার! গো অন! চার্জ!

নিমেষে দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পোল্যাণ্ডের ওপর। কণ্ঠে তাদের একই সুর—'ডয়েচ ল্যাণ্ড উইবার আলেস্'! জার্মানীর জয় হোক! জার্মানী দীর্ঘজীবী হোক!

শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। শুরু হল উত্থান, পতন আর ভাঙা-গড়ার ইতিহাস।

কেন এই যুদ্ধ?

কি এর কারণ?

কে এর জন্য দায়ী?

দায়ী কি শুধু হিটলার?

মোটেই না। হিটলার উপলক্ষ মাত্র, নইলে সেদিন হোক, বা দুদিন পরে হোক, যুদ্ধ অনিবার্যই ছিল।

এর মূলে রয়েছে ভার্সাই সন্ধি, যা একদিন অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল জার্মানীর ওপর। তারই অনিবার্য পরিণতি এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

চলো আমরা কিছুক্ষণের জন্য সেই পেছনের দিনগুলিতে ফিরে যাই, মল্লিকা।

•

১৯১৮ সাল। ১১ই নভেম্বর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ। এবার পরাজিত জার্মানীর বিচার করার পালা। তার জন্য বিজয়ী পক্ষের সবাই এসে সমবেত হয়েছেন ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ভার্সাই নগরীতে।

কিন্তু একি! শর্ত শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জার্মানী থেকে আগত বিশেষ প্রতিনিধি। এ শর্ত মেনে নেবার অর্থ যে জার্মানীর অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়! অসম্ভব! এ শর্ত কিছুতেই মেনে নেওয়া চলে না।

সন্ধিপত্রে সই না করেই জার্মানীতে ফিরে গেলেন সেই বিশেষ প্রতিনিধি। না, আমি পারব না। নিজের হাতে জার্মানীর এই মৃত্যুদণ্ডে সই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু সই তোমাদের করতেই হবে। না করে যাবে কোথায়! মনে রেখো, সাত দিন মাত্র সময়। তার মধ্যে সই কর তো ভালই, নইলে চরম পরিণতির জন্য তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

দুদিন যেতে না যেতেই এবার এসে হাজির হলেন হের হারম্যান মূলার। অর্ধমৃত জার্মানী তখন ধুঁকছে। সুতরাং বিজয়ী পক্ষের সব কিছু দাবী মেনে না নিয়ে উপায় কি!

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ক্যাম্পেন বনের একটা রেলগাড়ির কামরায় বসে। তারিখটা ছিল ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন।

তারপর যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে ক্যাম্পেন বনের সেই ঘটনাস্থলে স্থাপন করা হল একটি প্রস্তর-ফলক। তার গায়ে ফরাসী ভাষায় লেখা ছিল ঃ

'এখানে একটি স্বাধীন জাতির কাছে জার্মানীর গর্ব খর্ব হল। তারিখ—১১ই নভেম্বর, ১৯১৮ সাল।

শর্ত অনুযায়ী প্রথমেই দক্ষিণ সমুদ্র এবং আফ্রিকার উপনিবেশ-সমূহ হারাতে হল জার্মানীকে। তারপর নিজের অঙ্গচ্ছেদ করে পশ্চিম-আলসাস ও লোরেন ছেড়ে দিতে হল ফ্রান্সকে।

পুবে পোসেন এবং পশ্চিমে প্রুশিয়ার বেশির ভাগই পেল পোল্যাণ্ড। মেমেল গেল লিথুয়ানিয়ার হাতে।

ডানজিগ্‌কে পরিণত করা হল আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে। হারাতে হল সার অঞ্চলও। তার শাসনভার ন্যস্ত হল আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যদের হাতে।

আর ক্ষতিপূরণ! হ্যাঁ, কিস্তিতে কিস্তিতে মোট ৬৬০ কোটি পাউণ্ড তোমাদের দিতে তবে বিজয়ী দলগুলিকে। তবে বেশিদিন নয়। মাত্র ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। এই সত্তর বছর তোমরা এটা ঠিক মতো দিয়ে যেও। ব্যস, ঋণমুক্তি!

কিন্তু জামিন! জামিন কোথায় তোমাদের? তোমরা যে ক্ষতিপূরণের টাকাটা সময়মত দিতে পারবে, তার প্রমাণ কি?

সুতরাং জামিন হিসেবে রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলি পনেরো বছরের জন্য ছেড়ে দিতে হবে আমাদের সেনা বাহিনীর হাতে। আর তাদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে হবে তোমাদেরই।

আরো আছে। এখন থেকে মোট এক লক্ষ সৈন্য তোমরা রাখতে পারবে সারা দেশে। তাও পুলিশ বাহিনীর ভিত্তিতে।

সাবমেরিন তৈরি একদম বন্ধ। জাহাজ-টাহাজ দু-একটা তৈরি করতে চাও তো করতে পার, তবে দশ হাজার টনের ওপর কিছুতেই নয়।

আর রাইন নদীর পশ্চিম তীরে এবং হেলিগোল্যাণ্ডে দুর্গ তৈরি করা বা সৈন্য রাখা চলবে না।

মল্লিকা, যুদ্ধে সর্বস্ব হারিয়েও বোধহয় জার্মানী সেদিন ততখানি আঘাত পায়নি, যতটা পেয়েছিল এই অবমাননাকর ভার্সাই সন্ধি মেনে নিতে। কারণ, একথা তখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ভার্সাই সন্ধির আসল উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা নয়, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। জার্মান ঐতিহাসিকের ভাষায়ঃ

'The peace treaty of Versailles of June 28, 1919, was a heavy blow not only for the German people as a whole but particularly for all who were concerned about a lasting peace without hatred and a feeling of revenge. [Germany since 1848 : Wolfgang Treue : P.—71]

তবু মেনে নিতে হল। উপায় কি! সংসারে পরাজিত পক্ষের তুচ্ছ মান-অপমানের দাম আর কতটুকু!

তাছাড়া এ-ই তো নিয়ম। এই নিয়মই তো চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। যুদ্ধের যা কিছু দায়-দায়িত্ব, যা কিছু অপরাধ, সবই পরাজিত পক্ষের।

আর বিজয়ী পক্ষ! না, তারা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, সাধুপুরুষ মাত্র। তারাই তখন সব কিছুর বিচারক। সুতরাং তাদের কোন দোষ থাকতে পারে না।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ২৮শে জুন, ১৯১৯ সালে। কিন্তু টাকা! ক্ষতিপূরণের জন্য এই বিরাট অঙ্কের টাকা এখন কোথায় পাবে জার্মানী? জমার ঘর যে একেবারেই শূন্য!

বাধ্য হয়েই তখন প্রচুর কাগজের নোট বাজারে ছাড়তে হল জার্মানীকে। আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর যা হয় দেখা যাবে।

ফলে, যা হবার তাই হল। দেখতে দেখতে মার্কের দাম পড়ে যেতে লাগল ধাপে ধাপে।

১৯২২ সালে দেখা দিল ঘোর দুর্দিন। ক্ষতিপূরণ দেবার মতো কিছুই তখন আর অবশিষ্ট নেই জার্মানীর।

তবে রে,! গর্জে উঠল পাওনাদারের দল। টাকা দাও বলছি, নয় তো—

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকেন্দ্র রুর অঞ্চল দখল করে নিল ফরাসী বাহিনী। টাকা যখন দিতে পারছ না, তখন এটা আমাদের দখলেই থাক!

অবস্থা চরমে উঠল ১৯৩২ সালে। মার্কের আর তখন কোন দামই নেই খোলা বাজারে।

ফলে, দেশজোড়া প্রচণ্ড অর্থসঙ্কট। ট্রেজারী শূন্য। ব্যাঙ্ক শূন্য। শূন্য ছাড়া আর কিছুই তখন অবশিষ্ট নেই জার্মানীর জন-জীবনে।

সেই শূন্যতাকে আরো শতগুণ বাড়িয়ে তুলল ইহুদী বণিকগোষ্ঠী। জার্মানীতে নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের তখন অভাব। এই তো সুযোগ! এই সুযোগে যত পার চুষে নিঙড়ে ওদের একাকার করে দাও।

জার্মানীর তখন শেষ অবস্থা। চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। তিল তিল করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পায়ের নিচের মাটি। চারিদিকে অথৈ জল। কোথাও কূল নেই। এবার মৃত্যু অবধারিত।

'না, জার্মানী মরবে না।'

ঠিক তখনই ল্যাণ্ডস্‌বার্গ দুর্গ কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন একটি অসাধারণ মানুষ। কণ্ঠে তাঁর নতুন দিনের গান। নতুন প্রতিশ্রুতি।

জার্মানী মরবে না। আবার আমরা বাঁচব। নিজেদের শক্তি দিয়েই সব কিছু অর্জন করব। সোজা হয়ে দাঁড়াও। বলো— 'ডয়েচ ল্যাণ্ড উইবার আলেস্' !

বিস্ময় ভরে তাকিয়ে রইল গোটা জার্মানী। কে! কে! কে তাদের আজ নতুন করে বাঁচার আশ্বাস দিচ্ছে মৃতপ্রায় এই জার্মানীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে?

হিটলার! হিটলার! হিটলার! অ্যাডলফ্ হিটলার!

হিটলার! মনে মনে হাসলেন প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ। বীয়ার-সেলার অভ্যুত্থানের ব্যর্থ-নায়ক সেই বোহেমিয়ান কর্পোরালটা! জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আবার নাটক শুরু করেছে দেখছি লোকটা!

তবে ক্ষমতা আছে। গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে কি করে যে জন-মানসে প্রভাব বিস্তার করতে হয়, লোকটা তা ভাল করেই জানে।

আর সহকর্মীর দলও জুটেছে ঠিক তেমনিই। স্ট্রেসার, রোয়েহম, গোয়েবলস্, গোয়েরিং, ফ্রিক, হিমলার, হেস্, বোরম্যান, স্পীয়ার, রিবেনট্রপ—এক-একটি রত্ন যেন। মনে হয়, নাটক এবার জমবে ভাল।

১৯৩২ সালের নির্বাচনে হিটলারের জয়-জয়কার।

দেখা গেল ২৩০টা আসনই দখল করেছে তাঁর প্রবর্তিত নাৎসী দল। ফলে, ১৯৩৩ সালে তিনিই হলেন জার্মানীর চ্যান্সেলার।

মাত্র একবছর বাদেই দেহরক্ষা করলেন প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ। ফলে, হিটলারই তখন সর্বেসর্বা। এককথায় জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা।

শুরু হল গঠনমূলক কাজ। নাইট ক্লাব ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের কুৎসিত আড্ডাগুলি এখুনি ভেঙে চুরমার করে দাও। মেয়েরা 'go back to kitchen'। আমোদ-প্রমোদের সময় এখন নয়। আগে জার্মানীকে বাঁচতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার জন্য এখুনি কাজে লেগে যাও।

ছেলেরা সবাই কাজে লেগে যাও দলে দলে। কারো বেকার বসে থাকলে চলবে না। সবাইকে আমার চাই। সবাইকে আমার প্রয়োজন। রাস্তা তৈরি কর। কল-কারখানায় যোগ দাও।

জার্মানী তোমাদের দেশ। তাকে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব যে তোমাদেরই। উঠে দাঁড়াও! গেট আপ্!

ভার্সাই সন্ধি! ওসব আমি মানি নে। অনেক শোষণ করেছ তোমরা জার্মানীকে। এবার মানে মানে হাত গোটাও।

আর ঐ ইহুদী বেনিয়ার দল, জাতির চরম দুর্দিনে যেভাবে তোমরা গোটা জার্মানীকে চুষে নিঙড়ে একাকার করে দিয়েছ, তারপর আর একমুহূর্তও তোমাদের এখানে থাকা চলবে না। পত্রপাঠ বিদেয় হও!

রাষ্ট্রসঙ্ঘ! সে আবার কি! না, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ওরা যা খুশি করতে পারে, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না।

আমার সাফ কথা—অবস্থার সুযোগ নিয়ে জার্মানীর যেসব অঞ্চল তোমরা গ্রাস করেছ, তা কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

মাত্র এক লক্ষ সৈন্য! কে বললে! ওসব বস্তা-পচা কথা আমি শুনতে চাই নে। এখন থেকে জার্মানীতে সামরিক শিক্ষা-গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সবাই এসে ভর্তি হও দলে দলে। কেউ বাদ গেলে চলবে না।

দেখতে দেখতে চেহারা পাল্টে গেল জার্মানীর। এ যেন সেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানী নয়। আমূল পরিবর্তিত কোন নতুন দেশ। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এ জার্মানীর চেহারা আলাদা।

প্রতিটি নরনারীর মুখে তখন একটি মাত্র নাম। হিটলার! হিটলার! হিটলার! ফুয়েরার হিটলার! তিনি আমাদের বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। দিয়েছেন নতুন দিনের সন্ধান। তাঁর জয় হোক! জার্মানীর জয় হোক! ডয়েচ ল্যাণ্ড উইবার আলেস্! হেইল্ হিটলার!

চঞ্চল হয়ে উঠল ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি।

উঁহু, লোকটি সোজা নয়! বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ভার্সাই সন্ধিকে আর এক কানাকড়িও সে মূল্য দিতে রাজী নয়। বরং তাকে তাচ্ছিল্য করার একটা অনমনীয় জেদই যেন ফুটে উঠতে চাইছে তার প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কি করা যায় এখন? ইতিমধ্যেই বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছে লোকটা। এ অবস্থায় ওকে ঘাঁটাতে যাওয়াও যে বিপদ!

১৯৩৫ সালের ১১ই জানুয়ারি সার অঞ্চল জার্মানী আবার ফিরে পেল গণভোটের মাধ্যমে।

১৯৩৬ সালের ৭ই মার্চ পাওয়া গেল রাইনল্যাণ্ড। আর ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ—গোটা অস্ট্রিয়া।

খুবই ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল সন্দেহ নেই। এমন কি এ নিয়ে একটা গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি হওয়াও মোটেই বিচিত্র ছিল না। কিন্তু কিছুই হল না। কারণ, সোভিয়েত-ভীতি। কমিউনিষ্টদের বিশ্বাস নেই। কি ব্রিটিশ, কি ফ্রান্স, প্রতিটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে ওরা বিপদস্বরূপ। সুতরাং, ওদের ঠেকানোর জন্য হিটলারকে হাতে রাখা প্রয়োজন।

দুদিন যেতে না যেতেই আবার নতুন দাবী। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঐ সুদেতেন অঞ্চল আমার চাই। জার্মানরাই ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তড়ি-ঘড়ি করে ছাতা বগলে নিয়ে ছুটে এলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলীন। অতি শান্তিপ্রিয় লোক। জীবনে কোনদিনও তিনি বিমান-ভ্রমণ করেননি এর আগে। কারণ—ভয়। দারুণ ভয়। বিমানে উঠলেই নাকি তাঁর শান্তিভঙ্গ হবে।

এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম হল, মল্লিকা। গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আকাশ-পথে এসে হাজির

হলেন সর্বক্ষণের সঙ্গী ছাতাটি বগলে নিয়ে। উদ্দেশ্য, শান্তি-রক্ষা করা।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে দালাদিয়েরকেও আসতে হল সেই একই কারণে। একগুঁয়ে এই লোকটাকে নিয়েই হয়েছে যত জ্বালা! একবার গোঁ ধরলে আর রক্ষে নেই। দেখা যাক, বুঝিয়ে-সুজিয়ে একটু শান্ত করা যায় কিনা!

২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে কন্‌ফারেন্স বসল মিউনিকে। একদিকে চেম্বারলীন এবং দালাদিয়ের, অন্যদিকে হিটলার এবং বন্ধু মুসোলিনী। বলো, এবার কি চাই তোমার? কী পেলে তুমি খুশি হও?

চাই চেকোশ্লোভাকিয়ার ঐ সুদেতেন অঞ্চল।

বেশ, চেকোশ্লোভাকিয়াকে আমরা বলে দেব। নেহাত গাঁই-গুঁই করলে আচ্ছা করে ধমক দিয়ে রাজী করিয়ে দেব। তবে দেখো বাপু, আর যেন ঝামেলা করো না! আমরা শান্তিপ্রিয় লোক। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও। জার্মান ঐতিহাসিকের ভাষায়ঃ

'At the Munich conference (September 29th-30th) Hitler, Mussolini, Chamberlain and Daladier agreed that Germany should take over the Sudeten German areas by stages during the first days of October. Czechoslovakia was to be given a guarantee for her new frontiers. [German History, 1933-45 : H. Mau & H. Krausnick : P.—90]

শান্তিরক্ষার চমৎকার ব্যবস্থা করে দুজনেই আবার নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন মনের আনন্দে। যাক, আর ভাবনা নেই। এবার চিরস্থায়ী শান্তি।

কোথায় শান্তি! কোথায় কি!

দুদিন যেতে না যেতেই আবার অশান্তি। সেবার তোমরা

মেমেল কেড়ে নিয়েছিলে কেন আমাদের হাত থেকে? ওসব চলবে না। ঐ মেমেল আমার ফেরত চাই। আর চেকোশ্লোভাকিয়ার বাকি অংশটুকুও চাই। ও দুটোই আমার দরকার।

তাই মেনে নিতে হল সবাইকে। উপায় কি! সাধ করে কে আর নিজের ঘাড়ে অশান্তি ডেকে আনতে চায়!

সারা ইয়োরোপ তখন তটস্থ।

এবার কার পালা? এখানেই কি শেষ? না কি আরো কিছু চাই ওর?

না না, আর কিছু চাইনে। তবে ঐ ডানজিগ্! তোমরাই বলো, যে ওটা আমাদের ছিল কিনা! বলো, এখনো শতকরা সাতানব্বুই জনই ওখানে জার্মান কিনা! সুতরাং,—না না, যা ভেবেছ তা নয়। বিবাদ আমি কারো সঙ্গে করতে চাইনে। শুধু ডানজিগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মোটর চলাচলের একটা সুপার হাইওয়ে, আর একটা রেললাইন আমাদের পাততে দিতে হবে পোল্যাণ্ডের জমির ওপর দিয়ে। কারণ, ওখানে যাবার আমাদের কোন পথ নেই। ব্যস, এই করিডোরটুকু পেলেই আমি খুশি। আর কখনো আমি কিছু চাইব না তোমাদের কাছে। এই লাষ্ট। কথা দিলাম!

ডানজিগ্ সম্বন্ধে হিটলারের এই দাবীর সবটাই কি অসঙ্গত ছিল? না কি কিছুটা যুক্তিও ছিল তার পেছনে?

এ সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য না করে আমি শুধু ডানজিগের তখনকার সময়ের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি অন্য একজন বিদেশী ঐতিহাসিকের লেখনী থেকে:

'...Neither were the German claims to the free state of Danzig unfounded, a city of 4,50,000 souls which had been separated from Germany without a

plebiscite. 97 percent of the population were German, two percent Polish, one percent of other nationalities. [A basic History of Germany : Hubertus Prince zu Lowenstein : P.—161]

ওদিকে ততক্ষণে গলা ফাটিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন হিটলারের অন্তরঙ্গ সহচর, প্রচার-সচিব ডঃ গোয়েবলস্।

প্রচারের সাহায্যে কি করে যে জনমনে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন রীতিমত অভিজ্ঞ। পৃথিবী তার প্রমাণ পেয়েছে বার বার।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। রেডিও এবং বিভিন্ন প্রচার-পত্রের মাধ্যমে তিনিও এবার রব তুললেন ফুয়েরারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

ডানজিগ্! ডানজিগ্ ডানজিগ্! ডানজিগ্ আমাদের। ডানজিগ্ আমরা চাই-ই!

অসম্ভব! ডানজিগ্ আমাদের। কিছুতেই আমরা ডানজিগ্ ছাড়ব না। বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।

রাজী হল না পোল্যাণ্ড। হওয়া সম্ভবও নয়। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে সে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ। তেমন কিছু হলে চুক্তিমত তারা তাকে সাহায্য করতে বাধ্য। তাহলে ভয়টা কিসের?

বটে! চোখ পাকিয়ে তাকালেন হিটলার। ঠিক আছে, দেখা যাবে!

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে চুক্তির হিড়িক পড়ে গেল ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। ভয় নেই। তোমার বিপদে আমি আছি। কিন্তু দেখো ভাই, আমার বেলায় যেন মুখ ফিরিয়ে থেকো না!

কি ইংল্যাণ্ড, কি ফ্রান্স, সবার লক্ষ্য রাশিয়ার দিকে।

নীতিগত দিক থেকে যতই অমিল থাক না কেন, ইয়োরোপের এই শ্বেত-ভল্লুকের অসীম শক্তির কথা কে না জানে!

এখন সবচাইতে বড় প্রশ্ন—আত্মরক্ষা। সুতরাং তত্ত্বকথা আপাতত শিকেয় তুলে রেখে যে করে হোক, রাশিয়ার সঙ্গে একটা চুক্তি করা চাই।

শুরু হল আলোচনা-বৈঠক।

মাসের পর মাস কেটে গেল। খানাপিনাও কম হল না। কিন্তু কোথায় চুক্তি? কোথায় কি?

পদে পদে সংশয়। পদে পদে অবিশ্বাস। হাজার হোক ওরা কমিউনিষ্ট! ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছে ওরা অস্পৃশ্য। ওদের বিশ্বাস কি!

তাছাড়া অত ব্যস্ত হবারই বা কি আছে! দেখাই যাক না আরো কিছুদিন! তারপর যা হয় পরে ভেবে-চিন্তে করা যাবে।

দেখতে আর হল না, মল্লিকা। তার আগেই হঠাৎ একদিন সারা পৃথিবী চমকে উঠল অভাবনীয় একটা খবর শুনে।

হিটলার নাকি এর মধ্যেই তলে তলে দোস্তি করে ফেলেছেন রাশিয়ার সঙ্গে। মাসের পর মাস সময় লাগেনি। খানাপিনারও দরকার হয়নি। মাত্র একদিনেই নাকি সব শেষ।

'On August 23rd, Ribbentrop flew to Moscow and the same night signed a German-Soviet non-aggression pact with Molotov. When the news of the German-Soviet pact broke on August 23rd it was a shock to the whole world.' [German History, 1933-45 : P.—99-101]

সত্যিই এটা একটা বিরাট আঘাত, মল্লিকা। বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে। আমরা যেখানে মাসের পর মাস চেষ্টা

করেও কিছু করতে পারিনি, হিটলার কিনা সেখানে চোখের নিমেষেই এতবড় কাজটা গুছিয়ে নিলে! এককথায় একেবারে দশ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি! নাঃ, সংসারে আর কাউকেই বিশ্বাস নেই। হিটলার, স্ট্যালিন—কাউকেই না।

•

রুদ্ধশ্বাসে দিন গুনতে লাগল গোটা ইয়োরোপ। একমাত্র ভয় ছিল রাশিয়া। সেই রাশিয়া সম্বন্ধেও হিটলার এখন নিশ্চিন্ত। এ অবস্থায় তিনি কি এত সহজে রেহাই দেবেন পোল্যাণ্ডকে?

উত্তর পাওয়া গেল ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভোর-রাত্রে।

হঠাৎ লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত নাৎসী সৈন্য পোল্যাণ্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্বার বেগে। কার সাধ্য সেই বিরাট যান্ত্রিক বাহিনীর গতিরোধ করে!

দেখতে দেখতে অসংখ্য বোমারু বিমান ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাহায্য-পুষ্ট নাৎসী সৈন্যদল পূর্ব প্রুশিয়ার সাইলেসিয়া ও শ্লোভাকিয়ার দিক দিয়ে ঢুকে গেল পোল্যাণ্ডের অনেকখানি অভ্যন্তরে।

প্রতিবাদ জানাল ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড। অস্ত্র-সংবরণ কর সখা! পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ, সে-খবর তুমিও জান। এ অবস্থায় পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে আমাদেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে বৈকি!

সুতরাং শান্ত হও। এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কাল এগারোটার মধ্যে আমাদের জানালে 'বড়ই বাধিত হইব'।

কোথায় জবাব? কোথায় কি? তিনদিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণের চাপে ততক্ষণে পোল্যাণ্ড বাহিনী পিছু হটতে শুরু করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

বাধ্য হয়েই ওরা তারিখে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে আসরে নামতে হল সম্মানের খাতিরে।

আর হিটলার!

দীপ্তকণ্ঠে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন জাতির উদ্দেশ্যে। আজ থেকে আমিই জার্মান রাইখের প্রথম সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ না করা পর্যন্ত পবিত্র এই সৈনিকের বেশ আমি কোনদিনই ত্যাগ করব না।

'I am from now on just the first soldier of the German Reich. I have once more put on that coat that was most sacred and dear to me. I will not take it off again, until victory is secured, or I will not survive the outcome.'

ঐতিহাসিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই হল পটভূমিকা।

১৭ই সেপ্টেম্বর আর একবার বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হল অভাবনীয় একটি খবর শুনে।

শুধু নাৎসী বাহিনী নয়, রুশ-সীমান্তের দিক থেকে লালফৌজও নাকি অনেকদূর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে। পোল্যাণ্ডে অবস্থিত রুশ নাগরিকদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য নাকি তাদের এই অপ্রত্যাশিত অভিযান।

সবাই অবাক। অবাক হিটলারও সেদিন কম হননি। খুব দেখালে দাদা! এমন তো কথা ছিল না! ঠিক আছে, পরে এর মীমাংসা হবে।

রাজধানী ওয়ারশ আত্মসমর্পণ করল ২৭শে সেপ্টেম্বর। এবার ভাগাভাগির পালা।

শিল্পকেন্দ্র আর কয়লার খনিগুলি পড়ল জার্মানীর ভাগে। আর পোলিশ ইউক্রেনের গমের ভূমি ও তেলের খনি ইত্যাদি সব কিছুই গেল রাশিয়ার দখলে।

তখনো প্রতিটি পোল নরনারীর দৃষ্টি পশ্চিম ইয়োরোপের দিকে নিবদ্ধ। এই বুঝি তাদের সাহায্যের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ব্রিটিশ এবং ফরাসী বিমান এগিয়ে এল আকাশের বুকে ডানা মেলে! হয়তো ইতিমধ্যেই ওদের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে! চুক্তি অনুযায়ী ওরা যে তাদের সাহায্য করতে বাধ্য!

কোথায় সাহায্য, আর কোথায় কি? একমাত্র গালভরা প্রতিশ্রুতি ছাড়া তেমন কোন চেষ্টাই দেখা গেল না ব্রিটিশ বা ফ্রান্সের দিক থেকে।

অথচ সুযোগ ষোলআনাই ছিল। মাত্র তেইশ ডিভিশন জার্মান সৈন্য সেদিন রাখা হয়েছিল পশ্চিম-সীমান্তে। তাদের হটিয়ে মূল জার্মান ভূখণ্ডে প্রবেশ করা ফরাসী বাহিনীর পক্ষে সেদিন মোটেই কষ্টকর ছিল না। কিন্তু সে চেষ্টাই কোনদিন করেনি ফরাসী বাহিনী।

কারণ—ভয়। ভাবটা এই যে, একা একা আগ বাড়িয়ে মার খেতে যাই কেন? আগে ব্রিটিশ বাহিনী আসুক, তারপর লড়াই কাকে বলে দেখিয়ে দেব!

সত্যিই দেখিয়েছিল, মল্লিকা। গত বিশ্বযুদ্ধে এমন লড়াই বোধ হয় আর কেউ কোনদিনই দেখাতে পারেনি। সেকথা পরে আসছে।

পোল্যাণ্ডের পতন হল। কিন্তু তারপর? এবার কার পালা

উত্তর মিলল ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল।

কোনরকম প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ সেদিন দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেনমার্ক ও নরওয়ের ওপর।

ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনী নাকি নরওয়ের নার্ভিক বন্দরকে ঘাঁটি করে খাস জার্মানী আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। সুতরাং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নরওয়েকে নিজের দখলে রাখা দরকার।

ডেনমার্ক বশ্যতা স্বীকার করল সঙ্গে সঙ্গেই।

বাকি রইল নরওয়ে। কিন্তু দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি তার কোথায় ?

কেবলমাত্র মুখে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কি ফ্রান্স, কি ইংল্যাণ্ড, কেউ সেদিন এতটুকুও সহায়তা করেনি পোল্যাণ্ডকে।

তা বলে এবার কিন্তু আর ইংল্যাণ্ডের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হল না।

নরওয়ে থেকে ইংল্যাণ্ডের দূরত্ব কতটুকুই বা! এ অবস্থায় নরওয়ে হাত-ছাড়া হয়ে গেলে যে সত্যিই ভয়ের কথা!

অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য পরদিনই (১০ই এপ্রিল) বিরাট বিরাট সব যুদ্ধ-জাহাজ সহ এগিয়ে এল ইংল্যাণ্ড।

হিটলারকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, নৌ-শক্তিতে ইংল্যাণ্ড চিরদিনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

হায় ভগবান! হিটলারকে শিক্ষা দিতে এসে 'হাণ্টার' আর 'হাডি' যুদ্ধ-জাহাজ দুটিকে যে এমন করে খোয়াতে হবে, সেকথাটি সেদিন নৌ-বলে বলীয়ান ইংল্যাণ্ড একবারও কি ভাবতে পেরেছিল ?

হল কিন্তু তাই। বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে ফিরে যেতে হল হিটলারের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে।

১৫ই এপ্রিল তারিখে ব্রিটিশ বাহিনী অবতরণ করল নরওয়ের মাটিতে। জলযুদ্ধে হিটলারকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়নি। দেখা যাক, এবার স্থলযুদ্ধে কিছু করা যায় কিনা!

দেখা গেল দিন কয়েকের মধ্যেই। সেই একই অবস্থা। বেধড়ক মার খেয়ে আবার সেই ইংল্যাণ্ড।

বেগতিক দেখে রাজা হাকন সপরিবারে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। যুদ্ধও সেখানেই শেষ।

রাজা হাকন পলাতক। মন্ত্রিবর্গ পালিয়েছেন তাঁর পিছু পিছু। শাসন-ব্যবস্থা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। ফলে, সারা দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খলা।

এবার শাসন-ভার গ্রহণ করলেন নাৎসী সমর্থক মেজর কুইস্‌লিং। নরওয়ের ভিডকুন কুইস্‌লিং।

ব্রিটিশের ভাষায়—'বিশ্বাসঘাতক কুইস্‌লিং'। পরবর্তী কালে এমনি অনেককেই তারা আখ্যা দিয়েছিল এই কুইস্‌লিং বলে। বিশেষ করে তাদের, যারা সেদিন কোনরকম সহযোগিতা করতে রাজী হয়নি ব্রিটিশের সঙ্গে।

কুইস্‌লিং বিশ্বাসঘাতক। বিজয়ী পক্ষের অভিমত তা-ই। নরওয়েবাসীরা এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে একমত কিনা সে-তথ্য অবশ্য আমার জানা নেই।

হয়তো তাই। হয়তো বা অন্য কিছুও হতে পারে। তবে যুদ্ধ শেষে বিচারসভায় দণ্ডায়মান এই লোকটির মুখ থেকে কিন্তু একটি অদ্ভুত কথা শোনা গিয়েছিল, মল্লিকা। নিজের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনে দীপ্ত কণ্ঠে সেদিন তিনি জুরীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

'আমি যদি বিশ্বাসঘাতক হয়ে থাকি, তবে আমার জন্মভূমি নরওয়ের ঘরে ঘরে যেন যুগ যুগ ধরে এমনি বিশ্বাসঘাতকই জন্মায়।'

প্রথমে পোল্যাণ্ড। তারপর ডেনমার্ক এবং নরওয়ে।

এবার কার পালা ?

ফ্রান্স। ওদের ইংলিশ চ্যানেল-সংলগ্ন ক্যালে, বুলোন, শেরবুর্গ ইত্যাদি বন্দরগুলি রীতিমত বিপদজনক। খাস ইংল্যাণ্ড থেকে বন্দরগুলির দূরত্ব খুবই সামান্য। ওদিক থেকে যে বিপদ আসবে না, তা কে বলতে পারে!

না, ইংল্যাণ্ডকে সে সুযোগ দিলে চলবে না। আক্রমণই আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। সুতরাং, আগে থেকেই আক্রমণ চালিয়ে সে-পথ ওদের বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু ম্যাজিনো লাইন! জার্মানী ও বেলজিয়ামের সীমানা ঘিরে

ফ্রান্স যে এক শক্তিশালী দুর্গশ্রেণী ম্যাজিনো লাইন গড়ে তুলেছে, তা অতিক্রম করার উপায় কি? ও যে একেবারেই দুর্ভেদ্য!

ভাবনায় পড়ে গেলেন হিটলার। ফ্রান্স চাই-ই! কিন্তু ম্যাজিনো লাইন! ম্যাজিনো লাইনের কি হবে? দূরপাল্লার কামান, ভারী ট্যাঙ্ক, গোয়েরিং-এর বিমান-বহর, সবই যে ওখানে অচল! কি করা যায় এখন এ অবস্থায়!

একই চিন্তা তখন বড় বড় জেনারেলদের মাথায়। ফুয়েরারের হুকুম, ফ্রান্স তাঁর চাই-ই! কিন্তু ঐ ম্যাজিনো লাইনের কি হবে? ওটা অতিক্রম করার উপায় কি?

—উপায় আছে। সাহস করে একদিন বললেন অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত সেনাপতি ভন ম্যানস্টাইন, ফ্রান্স দখল করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

—বটে! কথাটা একদিন কানে গেল হিটলারের, ডাকো তো একবার ছোকরাটাকে। একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

সেই একই কথা ম্যানস্টাইন ব্যক্ত করলেন হিটলারের কাছে, এ তো খুব সোজা কাজ ফুয়েরার।

—সোজা কাজ! খেঁকিয়ে উঠলেন হিটলার, ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করাটা তোমার কাছে সোজা কাজ হল?

—ম্যাজিনো লাইন আমরা অতিক্রম করতে যাব কেন? আমরা তো ফ্রান্স আক্রমণ করতে যাচ্ছি নে। আক্রমণ করব বেলজিয়াম। ওখান থেকে আর্দেনেশ পর্বতমালা পেরিয়ে সোজা ফ্রান্স। অবশ্য ওখানেও ম্যাজিনো লাইন রয়েছে, তবে পর্বতসঙ্কুল জায়গা বলে লাইনটা ওখানে খুবই দুর্বল।

—বোগাস! এককথায় উড়িয়ে দিলেন হিটলার, ঐ উঁচু পর্বতসঙ্কুল এলাকায় ট্যাঙ্ক, প্যানৎসার বাহিনী—সব কিছু অচল।

—মোটেই না ফুয়েরার। আপনি একবার ফিল্ড-মার্শাল

গুডেরিয়ানকে ডেকে এনে প্ল্যানটা বুঝিয়ে বলুন। তারপর দেখুন যে, তিনি কি বলেন!

তলব পেয়ে ছুটে এলেন প্যানৎসার বাহিনীর আবিষ্কর্তা, ট্যাঙ্ক-বিশারদ ভন গুডেরিয়ান। আদেশ করুন ফুয়েরার। আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত।

প্রস্তুত নন সেনা বাহিনীর হাই-কম্যাণ্ড। অতি অবাস্তব প্ল্যান। এর কোন অর্থই হয় না। আমাদের ধারণা, এ-পথে আক্রমণ চালাতে গেলে এক বছরের আগে কিছুতেই আমরা ফ্রান্স দখল করতে পারব না।

—আমি পারব। গুডেরিয়ানের সংক্ষিপ্ত উত্তর, এক বছর নয়, খুব বেশি হলে ছমাস।

—ছমাস! বেশ, তাই হবে! গো অন! মার্চ···

১৯৪০ সাল। ১০ই মে।

শুরু হল জার্মানীর নূতন অভিযান। সেই শেষরাত্রে। লক্ষ্য—বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড আর লুক্সেমবার্গ।

যদিও আসল যুদ্ধ ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, তবু যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এগুলোও হাতে রাখা প্রয়োজন। বিপক্ষ দল যে একদিন ওখান দিয়েই পাল্টা আঘাত হানবে না, তা কে বলতে পারে!

প্রথমেই আত্মসমর্পণ করল লুক্সেমবার্গ। তারপর হল্যাণ্ড। আমাদের রেহাই দাও বাপু। আমরা কারো কোন ব্যাপারে নেই।

আত্মসমর্পণ করল না বেলজিয়াম। ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের চাইতে আমাদের ফোর্ট এবেন-এমাল কেল্লাও এমন কিছু কম যায় না। আসুক না জার্মানরা! মজাটা টের পাইয়ে দেব'খন!

হায় ভগবান! প্রথম দিনেই এবেন-এমাল কেল্লা বেদখল।

হাজার হাজার প্যারাসুটবাহী সৈন্য যে এমন বিনা নোটিশে হুট্ করে আকাশ থেকে নেমে আসবে, তা কে জানত !

ছুটে এল ব্রিটিশ বাহিনী। ছুটে এল ফরাসী বাহিনী। কিন্তু সব বৃথা। দুর্ধর্ষ ঝটিকা বাহিনীর প্রচণ্ড গতিবেগের কাছে সে বাধা আর কতক্ষণ? তাই বাধ্য হয়েই তারা পিছু হটতে লাগল ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ডানকার্ক বন্দরের দিকে।

মূল ফ্রান্স তখনো নিশ্চিন্ত। আসুক না জার্মান বাহিনী! আমাদের ম্যাজিনো লাইন থাকতে ভাবনা কি!

আট শ' কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ম্যাজিনো লাইন সত্যিই দুর্ভেদ্য। সীমানাও বহুদূর বিস্তৃত।

ফ্রান্স-সীমান্তের সুইজারল্যাণ্ড প্রান্ত থেকে শুরু করে মিউজ নদীর পুবে মন্টিভেডি পর্যন্ত বিস্তৃত এই দুর্গশ্রেণী বছরের পর বছর অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেও অসুবিধের কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, এর ভূগর্ভস্থ কক্ষে সঞ্চিত রাখা হয়েছে অপর্যাপ্ত খাদ্য ও প্রচুর অস্ত্র-সম্ভার। এ অবস্থায় মানুষ তো দূরের কথা, সামান্য মশা-মাছির পক্ষেও এই ম্যাজিনো লাইন ভেদ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু একি! কাণ্ড দেখে চোখে পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেল ফরাসী সমরনায়কগণ।

কোথায় ম্যাজিনো লাইন, কোথায় কি?

ও-পথে না এসে বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে একটা জার্মান বাহিনী মিউজ নদী পার হয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থান সেডানের দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে যে!

তবে কি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসই ওদের লক্ষ্য?

ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক, তেমনই অপ্রত্যাশিত।

এত আকস্মিক যে, নদীর সেতুগুলি পর্যন্ত ভেঙে দেবার মতো অবকাশ পেলেন না ফরাসী প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁ। ফলে, একেবারে খোলা মাঠ।

হঠাৎ বেলজিয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করলেন জার্মান বাহিনীর কাছে।

ফল হল আরো মারাত্মক। উপকূলস্থ বুলান ও ক্যালে বন্দর আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। বাকি আছে শুধু ডানকার্ক। নাৎসী বাহিনীর কাছ থেকে ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড গর্ট এবার সেই ডানকার্কের দিকেই পিছিয়ে যেতে লাগলেন তড়িৎগতিতে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সব কিছু গেলেও ডানকার্ক বন্দর এখনো হাতছাড়া হয়নি। কোনরকমে একবার ওখানে গিয়ে চ্যানেল পেরিয়ে ওপারে যেতে পারলে তবেই রক্ষা! নইলে একটি সৈন্যও বাঁচানো যাবে না দুরন্ত ঐ নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে।

কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব! তিন লক্ষ আটত্রিশ হাজার সৈন্যকে পার করার মতো জাহাজ কোথায়?

জাহাজ থাকলেই বা কি! ভিড়বে কোথায়? গোটা বন্দরটাই যে অকেজো হয়ে পড়েছে বোমার আঘাতে! না, কোন আশা নেই। সবাইকে আজ মৃত্যুবরণ করতে হবে জ্বলন্ত এই ডানকার্কের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে রাত্রি নেমে এল ডানকার্কের ওপর। অভিশপ্ত রাত্রি।

গোটা ডানকার্ক তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আকাশ-ছোঁয়া কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! রাশি রাশি কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া!

তখনো টেলিফোনের একটি ক্ষীণ যোগাযোগ অবশিষ্ট ছিল ডানকার্ক ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে। তারই সাহায্যে সেনাপতি লর্ড গর্ট নিজেদের এই শোচনীয় পরিস্থিতির কথা জানালেন মন্ত্রিসভার কাছে। তিন দিন থেকে ঘেরাও হয়ে আছি জার্মানদের দ্বারা। সামনে অথৈ সমুদ্র। এখন ভগবান ভরসা।

সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ড থেকে ক্যাপ্টেন টেন্যান্টকে পাঠানো হল ডানকার্কের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ছোট-বড় ১৩০খানি জাহাজ। যে করে হোক, ডানকার্ক পৌঁছে সেনা বাহিনীকে উদ্ধার করতে হবে। নইলে আমাদের সমূহ বিপদ।

সত্যিই বিপদ। এমন ভয়ঙ্কর বিপদে বোধহয় আর কোনদিনও পড়তে হয়নি ব্রিটিশ বাহিনীকে।

মাথার ওপর মার্শাল গোয়েরিং-এর মারাত্মক লুফৎওয়াফে (Luft-waffe) ও স্টুকা বিমান-বহর। একটানা বোমা-বর্ষণ চলছে তো চলছেই। নিচে তিন দিক থেকে গুডেরিয়ান, রোমেল ও রুনস্ট্যাণ্ডের প্যানৎসার বাহিনী ছুটে আসছে দৈত্যের মতো। বেষ্টনী ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ। আর রক্ষা নেই! মৃত্যু অনিবার্য!

আশঙ্কা অমূলক নয়, মল্লিকা। জয়ের আনন্দে সেকি উল্লাস তখন জার্মান বাহিনীর! এবার কোথায় যাবে ব্রিটিশ সিংহ? না, কাউকে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না ডানকার্ক থেকে। একটি প্রাণীকেও না। গোটা ইংলিশ চ্যানেলের জল আজ লালে লাল করে দিতে হবে ব্রিটিশের রক্তে। চলো সবাই এগিয়ে!

হল্ট! হল্ট! হল্ট! বেশি নয়, মাত্র দুদিন তোমরা একটু বিশ্রাম কর। তারপর আবার এগিয়ে যাও।

থমকে দাঁড়ালেন জার্মান সেনানায়কবৃন্দ। কার কণ্ঠ! কে তাঁদের থামতে আদেশ দিচ্ছে এমন করে!

না, কোথাও কোনরকম অস্পষ্টতা নেই। কোথাও এতটুকু কুয়াশার জাল নেই। আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং হিটলার। জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা হিটলার।

কিন্তু কেন? এই চরম মুহূর্ত হেলায় হারালে আর কোনদিনই যে ফিরে পাওয়া যাবে না! কিন্তু উপায় কি? আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং ফুয়েরার। এর পেছনে তাঁর কোন নতুন প্ল্যান আছে কিনা কে জানে!

কাণ্ড দেখে অবরুদ্ধ ব্রিটিশ বাহিনী অবাক। একি! জার্মান ট্যাঙ্কগুলি এতদূর পর্যন্ত এসে হঠাৎ এভাবে থেমে গেল কেন? স্টুকা বিমানগুলিই বা তাদের ওপর আর বোমা-বর্ষণ করছে না কেন? কি ব্যাপার!

ওদিকে ততক্ষণে ইংল্যাণ্ড থেকে আগত ক্যাপ্টেন টেন্যাণ্ট একটি জাহাজকে অতি কষ্টে তীরে আনতে সক্ষম হলেন বন্দরের পুবদিকের বাঁধের কাছে। সহজে নয়। কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পরে।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে খবর চলে গেল ইংল্যাণ্ডে। জাহাজ পাঠাও। আরো জাহাজ। বড় নয়, ছোট ছোট জাহাজ, যেগুলি সহজেই কিনারে আসতে পারবে। একটি ছুটি নয়, শত শত, হাজার হাজার জাহাজ চাই। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি জাহাজ, প্রতিটি স্টীমার, লঞ্চ, ট্রলার, মাছধরা জাহাজ, সব পাঠিয়ে দাও এখানে। অবিলম্বে।

দেখতে দেখতে শত শত জাহাজের মিছিল এগিয়ে এল ডোভার থেকে। অসামরিক ব্যক্তিরাও পিছিয়ে রইলেন না জাতির এই চরম ছুর্দিনে। তাঁরাও এগিয়ে এলেন তাঁদের ব্যক্তিগত লঞ্চ, বোট, জেলে বোট ইত্যাদি নিয়ে। সবার মুখে একই শপথ। এভাবে আমরা আমাদের ছেলেদের মরতে দেব না। তাদের আমরা রক্ষা করবই।

চ্যানেলের ওপারে ডোভার, এপারে ডানকার্ক। মাঝখানে শত শত জাহাজ। আসছে তো আসছেই। আবার ফিরে যাচ্ছে। আবার আসছে সারি বেঁধে। যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের।

সবার সমবেত চেষ্টায় অবশিষ্ট প্রতিটি সৈন্য ফিরে যেতে সক্ষম হল ইংল্যাণ্ডে। সঙ্গে ফরাসী সৈন্যও গেল প্রায় দেড়লক্ষ। সব শেষে ক্যাপ্টেন টেন্যাণ্ট। বিদায় ডানকার্ক, বিদায়! আজকের এই স্মৃতি ছুঃস্বপ্নের মতো আমার মনে থাকবে চিরকাল। অভিশপ্ত এই চব্বিশে মে-কে আমি কোনদিনই ভুলব না।

ইতালীর জোর ধাক্কা। এ অবস্থায় ফ্রান্সের প্রতিরোধ-শক্তি আর কতক্ষণ!

প্রথমেই প্যারিসকে ঘোষণা করা হল অরক্ষিত নগরী বলে। ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি-বিজড়িত সুন্দরী এই প্যারিস নগরী গড়ে উঠেছে বহু শতাব্দীর অধ্যবসায়ের ফলে। বোমা-বর্ষণ করে তোমরা এই মহৎ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিও না। নিতে হয়, এমনিই বরং নিয়ে নাও। তা বলে ধ্বংস কিছুতেই নয়। আমরা আত্মসমর্পণ করছি তোমাদের কাছে। যুদ্ধ আমরা চাই নে। সন্ধি চাই।

প্রস্তাব নিয়ে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন ভার্দুন-বিজয়ী বীর, নব্বুই বছরের বৃদ্ধ, মার্শাল পেঁতা। সেই পেঁতা, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন ভার্দুন রণাঙ্গনে। আজ তাঁর কণ্ঠে ভীরু আকুতি। আমরা সন্ধি চাই।

সন্ধি! বেশ, তাহলে সন্ধির শর্ত শোন। তোমাদের ট্যাঙ্ক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র অবিলম্বে আমাদের কাছে জমা দিতে হবে।

যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিতে হবে আমাদের কোন নৌ-বন্দরে। তাছাড়া উত্তর ও পশ্চিমের সমস্ত সমুদ্রোপকূল এখন আমাদের দখলেই থাকবে।

আর ইতালী যে-সমস্ত জায়গা দখল করেছে, সেখানে আপাতত তাদের সৈন্যই মোতায়েন থাকবে।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত স্থানে কোনরকম অস্ত্র-শস্ত্র রাখা চলবে না।

তুঁলো, এজাসিও, ওরান ও বিজার্তা—এই চারটি নৌ-ঘাঁটিতে কোনরকম সৈন্য রাখতে পারবে না।

আর আবিসিনিয়ার জিবুতি-আদ্দিসআবাবা রেললাইন এখন থেকে ইতালীর দখলে থাকবে।

বাকি অংশে তোমরা তোমাদের মনোমত সরকার গঠন করতে

পার, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সাবধান! শত্রুপক্ষের সুবিধে হতে পারে, এমন কোন কাজ করলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিরুপায়!

কিন্তু সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে কোথায়? না, অন্য কোথাও হলে চলবে না।

মনে কর সেই ভার্সাই সন্ধির কথা। সেদিন সবাই মিলে একতরফা তোমরা অপমান করেছিলে জার্মানীকে। অপমানের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করার মতো শক্তিটুকু পর্যন্ত সেদিন আমাদের অবশিষ্ট ছিল না।

কিন্তু আজ! আজ ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে।

তাই যেভাবে সেদিন জার্মানীকে সবার সামনে নতজানু হয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, ফ্রান্সকেও আজ ঠিক সেই ভাবেই মাথা নিচু করে সব শর্ত মেনে নিতে হবে। সুতরাং চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে সেই ক্যাম্পেনের বনে, সেই রেল-গাড়িতে, সেই একই কামরায়, সেই প্রস্তর-ফলকের সামনে—যেখানে তোমরা লিখে রেখেছ—'এখানে এক স্বাধীন জাতির কাছে জার্মানদের গর্ব খর্ব হল।'

আর তোমাদের উপস্থিতিতেই এবার সেখানে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী লিখিত হবে জার্মান ভাষায়। তোমাদের সবাইকে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে মাথা হেঁট করে। কি, রাজী?

তা-ই মেনে নিলেন মার্শাল পেঁতা। তাছাড়া উপায় কি! ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের দুই-তৃতীয়াংশ হাতছাড়া হয়ে গেছে সর্বনেশে যুদ্ধের মাশুল দিতে গিয়ে। শর্ত মেনে নিয়ে এখন যদি বাকিটুকু বাঁচানো যায় তো তবেই রক্ষা!

যথাসময়ে সেই ঐতিহাসিক রেলের কামরাটিকে আবার নিয়ে আসা হল ক্যাম্পেনের অরণ্যে। সেদিনের মতো এবারও এখানে

বসেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে ফরাসী প্রতিনিধিদের, অন্য কোথাও নয়।

১৯৪০ সাল। ২২শে জুন। অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সদলবলে হিটলার এসে উপস্থিত হলেন ক্যাম্পেনের বনে। সঙ্গে গোয়েরিং, ব্রাউশিচ, কাইটেল, রিবেনট্রপ, হেস্ প্রমুখ সহচরবৃন্দ।

বাইশ বছর আগেকার কথা। এই সুদীর্ঘ বাইশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও হিটলার ভুলতে পারেননি পাথরে খোদাই করা সেই অক্ষরগুলির কথা। প্রতিদিন ভেবেছেন, কি করে প্রতিশোধ নেবেন জার্মানীর সেই চরম অপমানের। আজ তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে দীর্ঘ বাইশ বছর বাদে।

সন্ধির শর্ত শুনতে শুনতে চোখে জল এসে গেল ফরাসী প্রতিনিধিদের। কিন্তু উপায় কি!

বাইশ বছর আগে ভার্সাই সন্ধির শর্ত শুনে জার্মান প্রতিনিধিদেরও চোখের জল ফেলতে হয়েছিল এমনি করে। তবু কেউ সেদিন তাদের এতটুকু করুণা করেনি। আজ তারাই বা ছাড়বে কেন?

অনুষ্ঠান-শেষে প্রস্তর-ফলক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সগর্বে সেই রেলের কামরা থেকে নিচে নেমে গেলেন জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা হের হিটলার। ভার্সাই সন্ধির অপমানের প্রতিশোধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে নিয়েছেন। জার্মান জাতিকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি ভালভাবেই পূরণ করেছেন। আজ তিনি সুখী, সার্থক ও বিজয়ী।

বাইরে মিলিটারী ব্যাণ্ড। দিক-বিদিক কাঁপিয়ে সেই ব্যাণ্ড তখন সুর তুলেছে, 'ডয়েচ ল্যাণ্ড উইবার আলেস্'! সকল দেশের সেরা জার্মানী। জার্মানী দীর্ঘজীবী হোক!

ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি, মল্লিকা! সেদিনও বিজয়ী ফ্রান্সের হয়ে ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ঐতিহাসিক ভার্দুন-বিজয়ী বীর এই মার্শাল পেঁতা। এবারও সেই পেঁতাকেই এগিয়ে আসতে

হল পরাজিত ফ্রান্সের প্রতিনিধি রূপে। ভাগ্যের পরিহাস বুঝি একেই বলে!

প্যারিসের পতন হল। সব কিছু দাবী মেনে নিয়ে ফ্রান্স মাথা নোয়াতে বাধ্য হল জার্মানীর কাছে।

এদিকে অনধিকৃত ফ্রান্সের একপ্রান্তে গিয়ে নতুন সরকার গঠন করলেন মার্শাল পেঁতা। নাম—ভিসি সরকার। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। তবু তো সন্ধি মেনে নিয়ে এটুকু রক্ষা করা গেছে জার্মানদের হাত থেকে! নইলে তো সবটাই যেত।

পরবর্তী কালে বিজয়ী শক্তির বিচার থেকে এই নব্বুই বছরের বৃদ্ধ পেঁতাও কিন্তু রেহাই পাননি, মল্লিকা। তাদের বিচারে তিনিও তখন 'কুইস্‌লিং'। তাই সাজা হয়েছিল প্রাণদণ্ড।

পরে বয়সের কথা বিবেচনা করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ফরাসী উপকূল থেকে সামান্য দূরে বিস্কে উপসাগরে অবস্থিত ছোট একটি দ্বীপের 'আইল দ্য ইউ' কারাগারে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

দেশ ও দেশবাসীকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে রেখে সেদিন যাঁরা প্রাণভয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন, মার্শাল পেঁতা তাঁদের দলে নন। বরং সেই হতভাগ্যদের মধ্যে থেকেই তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন দুর্ভাগ্যকে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে। বাঁচাতে চেয়েছিলেন অবশিষ্ট ফ্রান্সকে।

তবু তিনি কুইস্‌লিং! বিশ্বাসঘাতক! এটাই নিয়ম। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী পক্ষের বক্তব্যই চরম। তাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়েই সবাই ইতিহাস রচনা করে পরবর্তী কালে। পরাজিত পক্ষ সেখানে মৌন, মূক, ভাষাহীন। তাদের কোন ভাষা নেই সেখানে। সে অধিকারও তাদের নেই।

নইলে অন্য সবার মতো তিনিও যদি প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতেন সেটাই কি বীরত্ব বলে প্রমাণিত হত পৃথিবীর চোখে? না কি চরম বিপদের দিনে অরক্ষিত মাতৃভূমির সমস্ত দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেওয়াটাই আইনত অপরাধ?

না, এ প্রশ্নের উত্তর আজো লেখা হয়নি কোন যুদ্ধের ইতিহাসে।

কিছুদিন চুপচাপ। তারপরই হঠাৎ আবার একদিন হিটলার উঠে দাঁড়ালেন গা-ঝাড়া দিয়ে।

পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স সব আজ তাঁর করতলগত। কিন্তু কূটনীতির দিক থেকে পরাজয় ঘটেছে অন্য জায়গায়। ভেবেছিলেন, ডানকার্কের ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটিশ নিশ্চয় তাঁর কাছে মাথা নত করবে। সন্ধি ভিক্ষা করবে। কিন্তু ঐ বেরসিক ব্রিটিশ জাতটা কিনা তার ধার-কাছ দিয়েও গেল না! একবার তলিয়ে পর্যন্ত দেখল না যে, কেন আমি সেদিন ওদের লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে বাগে পেয়েও দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলাম? অসহ্য! অসহ্য! ডাকো এবার গোয়েরিংকে!

গোয়েরিং আহ্লাদে আটখানা। এই তো তিনি চান। এই তো তিনি চেয়েছিলেন এতদিন। ব্যস, আর ভাবনা নেই। এবার সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখুক যে, তাঁর পরিচালিত জার্মান বিমান-বহর অসাধ্য সাধন করতে পারে কিনা!

২৯শে জুলাই থেকে প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ শুরু হল খাস ইংল্যাণ্ডের ওপর।

একটি দুটি নয়, একসঙ্গে শত শত, হাজার হাজার বোমারু বিমান। তারপর শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস! মৃত্যু আর বিভীষিকা!

এমনি করে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। দিনে-রাত্রে সর্বক্ষণ।

সারা ইংল্যাণ্ড তখন জ্বলছে বোমার আগুনে। একটানা বোমা-বর্ষণ চলছে তো চলছেই। পার্লামেন্ট ভবন, ওয়েষ্ট মিনষ্টার এ্যাবে, এমন কি, বাকিংহাম প্যালেসের পর্যন্ত রেহাই নেই সেই বিধ্বংসী বোমার হাত থেকে। লক্ষ্য শুধু একটাই। ব্রিটিশকে চরম শিক্ষা দিতে হবে। ভেঙে-গুঁড়িয়ে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে মানচিত্র থেকে। ওদের ক্ষমা নেই।

বিপদের ওপর বিপদ।

২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বার্লিনে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হল জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে। অর্থাৎ, আর দুই বন্ধু নয়। এখন থেকে আমরা তিন বন্ধু।

সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সব সময়ে আমরা একসঙ্গে চলব পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। কথা দিলাম!

খবর শুনে আর একবার চমকে উঠল পৃথিবীর মানুষ। চোখে-মুখে তাদের সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কোথায় এর শেষ? শেষ হবে কি কোনদিন? কে জানে!

"...দেশবাসীর পক্ষ হইতে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপর যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমার হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই।"

—সুভাষচন্দ্র

১৯৪০ সাল শেষ হল। এল ১৯৪১ সাল।

ইংল্যাণ্ডের শোচনীয় বিপর্যয় লক্ষ্য করে ভারতবর্ষের প্রতিটি সাধারণ মানুষ সেদিন আনন্দে ভরপুর। ঠিক হয়েছে! খুব ভাল হয়েছে! আরো কেন ওরা মার খেল না হিটলারের হাতে? খেলে বেশ হত।

এ আনন্দ হিটলার বা জার্মানীর জয়ের জন্য নয় মল্লিকা, ব্রিটিশের পরাজয়ের জন্য। যে ব্রিটিশ আমাদের যুগ যুগ ধরে পদানত করে রেখেছে, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পশুর মতো হত্যা করেছে, তার এই শোচনীয় বিপর্যয় দেখে আমরা যে খুশি হব, সে তো বলাই বাহুল্য।

সেদিন ছিল ২৬শে জানুয়ারি।

ভারতের দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত। আজ স্বাধীনতা দিবস। আমরা স্বাধীনতা চাই।

হঠাৎ একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ।

সুভাষ নিখোঁজ। তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি। সে আশাও সুদূর পরাহত।

সবাই অবাক! সুভাষ নিখোঁজ! কি করে এটা সম্ভব হল?

সাদা পোশাকে মোট বাষট্টিজন গোয়েন্দা কর্মচারীকে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তাদের নজর এড়িয়ে কি করে তাঁর পক্ষে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্ভব হল? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

কিন্তু কেন? কি প্রয়োজন ছিল সুভাষের এমন করে বাইরে যাবার? কোন প্রয়োজন ছিল কি?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা।

গান্ধীজী এবং সুভাষ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি উল্লেখযোগ্য নাম।

ঠিক যেন বহুদূর বিস্তৃত একজোড়া রেললাইন। পাশাপাশি স্থান, কিন্তু মিল নেই কোথাও।

মিল শুধু এক জায়গায়। দুজনেরই একমাত্র লক্ষ্য—স্বাধীনতা। তাছাড়া আগাগোড়াই অমিল।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সাল। শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এবারও তাই হল। সেই অমিল। আগাগোড়াই অমিল।

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য—ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা। সুভাষের উদ্দেশ্য—বিরোধিতা করা। তাঁর সাফ কথা, কেন আমরা সহযোগিতা করব ব্রিটিশের সঙ্গে? কোন্ যুক্তিতে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও গান্ধীজী সহযোগিতা করেছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে। কি আমরা পেয়েছিলাম তার বিনিময়ে? একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু পেয়েছিলাম কি? আজ সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

তাছাড়া ভারত আজ আইনত যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু কেন? বড়লাট কি একবারও ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করেছিলেন যুদ্ধ ঘোষণার আগে? একবারও কি পরামর্শ করেছিলেন গান্ধীজী বা অন্য কোন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে? তাহলে তাদের ভাল-মন্দের জন্য আজ আমাদের এই অহেতুক মাথাব্যথা কেন?

বরং এই তো আমরা চাই। এই তো আমাদের সুযোগ। আহত ব্রিটিশ সিংহের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার এই তো আমাদের উপযুক্ত সময়। শত্রুকে তার দুর্বল মুহূর্তে আঘাত করাটাই তো যুদ্ধের নীতি। সুতরাং চাই সংগ্রাম। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম।

গান্ধীজী তাতে রাজী নন। তাই বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর

সঙ্গে দেখা করার পরেই তিনি এক বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা।

এ যুদ্ধে আমার সহানুভূতি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের দিকে। ইংল্যাণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট ভবন বা ওয়েষ্ট মিনষ্টার এ্যাবে ধ্বংস হবে, এ দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা এখন আমি মোটেই ভাবছি নে। ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স যদি স্বাধীনতা হারায়, তা হলে কি হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিয়ে?

'My own sympathies were with England and France from the purely humanitarian standpoint. I told him that I could not contemplate, without being stirred to the very depth, the destruction of London which had hitherto been regarded as impregnable. As I was picturing before him the House of Parliament and the Westminster Abbey and there possible destruction, I broke down. I have become disconsolate.

...I am not, therefore, just now thinking of India's deliverance. It will come but will it be worth, if England and France fail or if they come out victorious over Germany ruined and humbled?'

সুভাষ স্তম্ভিত। এ কার বিবৃতি! একি চোখের ভুল, না কি অসুস্থ চিত্তের মায়া-বিভ্রম?

না, কোনটাই নয়। সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। বিবৃতি দিয়েছেন গান্ধীজী।

কিন্তু এ কোন্ গান্ধীজী! আশ্চর্য, এই গান্ধীজীই একদিন দেশবন্ধুর গৃহে বাংলার বিপ্লবী নায়কদের ডেকে বলেছিলেন:

'Had India sword I would have asked her to

draw it. But as she had no sword—I ask her to adopt Non-violent, Non-co-operation···I am out to destroy this satanic Government.'

অর্থাৎ—ভারতবাসীর অস্ত্র নেই। থাকলে সবাইকে অস্ত্র-ধারণ করতেই আমি পরামর্শ দিতাম। নেই বলেই বলছি যে, তোমরা সবাই অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ কর। আমি এই শয়তান গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।

আশ্চর্য, এবার সেই গান্ধীজীর মুখ থেকেই আবার শোনা গেল বিপরীত কথা! দেখা গেল, শয়তান গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার জন্য তিনি মোটেই বদ্ধপরিকর নন। বরং ইয়োরোপে তাদের ধ্বংস হতে দেখে অজ্ঞাতেই কখন তাঁর মন সেই শয়তান গভর্ণমেণ্টের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

জওহরলালের মুখেও সেই একই কথা। ব্রিটিশ এখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। এ সময়ে সংগ্রাম শুরু করলে বিদেশীরা আমাদের কি বলবে?

কিন্তু বিদেশীদের মুখ চেয়ে এ সুযোগটাকে হেলায় হারালে দেশের মানুষ আমাদের কি বলবে? কি বলবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ?

কি লেখা হবে অনাগত দিনের ইতিহাসে?

না, জওহরলালের বিবৃতির মধ্যে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই।

সুভাষ তখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। কারণ, গান্ধীজী।

যদিও গান্ধীজীর ভোটে সুভাষ দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হননি, হয়েছিলেন জনসাধারণের ভোটেই। তবু গান্ধীজীই সব। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সেখানে সব কিছু। সুভাষের ভাষায়ঃ 'The entire intellect of the Congress has been mortgaged to one man.'

আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি গান্ধীবাদী নেতা শেঠ গোবিন্দ দাস স্বয়ং। ভাষণ দিতে গিয়ে বেশ সগর্বেই সেদিন তিনি বলেছিলেন ঃ

'ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিষ্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান।'...

[আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১১ই মার্চ ঃ ১৯৩৯ সাল]

সুভাষ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি। কিন্তু গান্ধীজীর তা মনঃপূত নয়। ফলে, যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হল। শেষ পর্যন্ত সুভাষকেই বিদায় নিতে হল কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে। তাতেও ষোলকলা পূর্ণ হল না। অবশেষে তাঁকে বহিষ্কার করা হল কংগ্রেস থেকে। অপরাধ—শৃঙ্খলাভঙ্গ করা।

কিন্তু ইতিহাস? ইতিহাস কি বলে, মল্লিকা? সুভাষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ইতিহাস কোনদিনও মেনে নিয়েছে কি? না কি গোটা ব্যাপারটাই তারা বর্ণনা করেছে গান্ধীজীর একটা কূটনৈতিক চাল হিসেবে?

এ প্রসঙ্গে বিদেশী লেখক মাইকেল এডোয়ার্ডস্ তাঁর বিখ্যাত 'The Last Years of British India' গ্রন্থে কি বলেছেন শোনা যাক ঃ

'Gandhi now turned the technique of Non-co-operation, not against the British, but against Congress's own president. Bose was forced to resign.'

[The Last Years of British India : P.—78]

অর্থাৎ—গান্ধীর এবারের অসহযোগ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের নিজের সভাপতির বিরুদ্ধেই। ফলে, বোস বাধ্য হলেন পদত্যাগ করতে।

ইংরেজ লেখকের কলম কিন্তু এখানেই থেমে যায়নি, মল্লিকা। তিনি আরো বলেছেন ঃ

'ভারতবর্ষ এবং বাইরের বহু লোকেরই বিশ্বাস ছিল, গান্ধী শুধু মাধুর্য এবং আলোর সংমিশ্রণেই তৈরি। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, নিজস্ব বিপুল মর্যাদা এবং কূটনীতির সাহায্যে অনায়াসেই তিনি সরিয়ে দিলেন তাঁর নেতৃত্বের একমাত্র সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বীকে।'

'Gandhi, whom so many both in India and abroad believed to be compounded only of sweetness and light, had, by the use of his over-whelming prestige and the sort of intrigue one would expect from Tammany Hall, succeeded in disposing of the only real opposition to his leadership.' [Ibid : P.—78]

১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়। উদ্দেশ্য—যুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা।

সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত, তবু তাঁকেও আহ্বান জানানো হল ওয়ার্কিং কমিটির সেই বৈঠকে। বিদ্রোহী ছেলেটা কি বলতে চায় শোনা যাক!

শোনা গেল সেই একই কথা। চুলোয় যাক ব্রিটিশ। তাদের ভাল-মন্দ নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? কি প্রতিশ্রুতি আমরা এতদিন দিয়েছিলাম দেশবাসীকে? 'যুদ্ধে কোনরকম সহযোগিতা করব না'—এ প্রতিশ্রুতিই কি দিইনি? মাত্র একবছর আগেও কি এ প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করিনি হরিপুরা কংগ্রেসে? তাহলে এখন এই উল্টো-পাল্টা কথা কেন সবার মুখে? না, কোন কথা নয়। কোন দর-কষাকষি নয়। চাই সংগ্রাম!

কেউ কান দিল না সুভাষের কথায়। একটি প্রাণীও না।

সেই পুরনো কথা। সেই পুরনো যুক্তি। দেশ প্রস্তুত নয়। সুতরাং সংগ্রাম চাই নে, চাই সহযোগিতা। চাই আপস-আলোচনা। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন বড়লাটকে একখানি চিঠি দেওয়া। দেখা যাক, সহযোগিতার কথা শুনে তাঁর কোন হৃদয় পরিবর্তন ঘটে কিনা!

একদিকে গোটা গান্ধীবাদী কংগ্রেস, অন্যদিকে সুভাষ একা। তবে কংগ্রেসের তখন আর তিনি কেউ নন। সেখান থেকে তিনি বহিষ্কৃত। বিতাড়িত। অপরাধ—শৃঙ্খলাভঙ্গ করা।

কিন্তু নীতিগত দিক থেকে বিচার করতে গেলে কার বক্তব্য সেদিন যুক্তিসঙ্গত ছিল? কার বক্তব্যের মধ্যে কংগ্রেসের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অধিকতর আস্থার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল? গান্ধীবাদী কংগ্রেসের, না কি শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী সুভাষের?

উত্তর দিয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার :

'But there was one leader, Subhas Bose, who stood up boldly in defence of the Congress policy.'

[History of Freedom Movement : Vol-III : P.—597]

আর সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্টা ছিল বাস্তব? সংগ্রাম, না আপস?

এমন কি, শত্রুপক্ষ ব্রিটিশও কিন্তু এ ব্যাপারে সুভাষের দূরদর্শিতাকে সমর্থন না করে পারেনি, মল্লিকা। পরবর্তী কালে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গিয়ে স্পষ্টই তারা স্বীকার করেছে যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে এতখানি স্বচ্ছ ধারণা সেদিন ভারতবর্ষে একমাত্র সুভাষ ছাড়া আর কোন কংগ্রেস নেতারই ছিল না।

'Bose himself welcomed the possibility of conflict because a blow to Britain in Europe would

undoubtedly, weaken her grasp on India. Other Congress leaders had no such clear-cut vision of the future.' [Last Years of British India : Michael Edwardes : P.—78]

তবে আর কেউ না হলেও ইংরেজ যে সেদিন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে খুবই খুশি হয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

হবারই কথা। কারণ, ভয় গান্ধীজীকে নয়, ঐ চরমপন্থী বিপ্লবীদের। এবার সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত।

এটা আমার কথা নয় মল্লিকা, ওদেরই স্বীকৃতি।

'The British felt they had little to fear from Gandhi himself, for they soon recognized him for what he was—an anti-western reformer.

As long as Gandhi was in control of Congress, they knew they had an ally. As long as civil disobedience remained non-violent, it did not greatly worry the Government.

Who was hurt by non-co-operation any way? Only the Indians. Gandhi's whole aim was to minimize violence ; the Government's was the same. They were still capable of suffering a few out breaks of small scale violence, but if once Gandhi ceased to dominate Congress, the machine he had built up might well be used by more dynamic and violent people. A full-scale rebellion could not be crushed.

So the Government obliged Gandhi by treating him with considerable respect jailing him occasionally

to keep up appearances while they took much more positive action against terrorists and those western-style revolutionaries whom they really feared,'

[Last Years of British India : Michael Edwardes : P.—57]

অর্থাৎ—'ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছিল যে, গান্ধীর কাছ থেকে তাদের ভয় পাবার তেমন কিছু নেই। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা-বিরোধী একজন সংস্কারক মাত্র।

যতক্ষণ গান্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার থাকছেন, ততক্ষণ তারা নিঃসন্দেহ ছিল যে, কংগ্রেসের মধ্যে তাদের একজন বন্ধু রয়েছেন। যতক্ষণ তাঁর অসহযোগ আন্দোলন অহিংস থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের তা নিয়ে বড় একটা মাথাব্যথা নেই। কারণ, এ আন্দোলনে ক্ষতি ভারতীয়দেরই।

গান্ধীর উদ্দেশ্য হিংসাত্মক সংগ্রাম দাবিয়ে রাখা। সরকারের উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক তাই। তাছাড়া ছোট-খাট দু-চারটে হিংসাত্মক ঘটনাকে দমন করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু গান্ধী যদি কংগ্রেস নেতৃত্বে না থাকেন, তাহলে এই সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান এমন লোকের হাতে যেতে পারে, যারা অনেক বেশি গতিশীল এবং সহিংস আন্দোলনের সমর্থক। তাদের চেষ্টায় কোন সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘটলে তাকে দমন করার সাধ্য সরকারের ছিল না।

তাই সরকার চাইতেন যে, গান্ধীই কংগ্রেসের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকুন। এই কারণেই তাঁরা গান্ধীর প্রতি সবসময়ে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন, এবং জনচিত্তে যাতে তাঁর সংগ্রামী মূর্তি ম্লান হয়ে না যায়, পাছে লোকে মনে করে তিনি ব্রিটিশের বন্ধু, সেইজন্যই মাঝে মাঝে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রেখে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করতেন।

অন্যদিকে যাদের তাঁরা সত্যিই ভয় করতেন—সেই সন্ত্রাসবাদী ও পশ্চিমী-ধাঁচে গড়া বিপ্লবীদের দমন করার বেলায় সরকার অনেক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন।'

সুভাষ শেষোক্ত দলে। অহিংসা তাঁর কাছে নীতি নয়, পলিসি—'Not creed but policy'। সর্বোপরি তাঁর ইংরেজ-বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এহেন ভয়ঙ্কর লোকটিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে দেখে ইংরেজ যে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

এ প্রসঙ্গে আমি ছোট্ট একটি ঘটনার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, মল্লিকা।

জনসাধারণ চেয়েছিল, সুভাষ দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু গান্ধীজী তা চাননি। প্রমাণ, তাঁর নিজের বিবৃতি ঃ

'আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গোড়া থেকেই আমি তাঁর পুনর্নির্বাচনের বিরোধী ছিলাম। তার কারণ আমি আজ বলতে চাই নে।'

স্পষ্ট স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতির মধ্যে কোথাও কোন কুয়াশার জাল নেই। সুভাষ দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি হন, গান্ধীজী গোড়া থেকেই তা চাননি। কেন চাননি, তিনি তা বলতে রাজী নন।

উত্তম কথা। কিন্তু কেন? রহস্যটা কোথায়?

একই লোকের একাধিকবার সভাপতি হওয়াটা কংগ্রেসের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে জওহরলাল সভাপতি হয়েছেন মোট তিনবার। এর আগেই দু বছর হয়েছেন পর-পর। কোনদিন এ নিয়ে কোনদিক থেকে আপত্তি ওঠেনি। আপত্তি উঠল শুধু সুভাষের বেলায়। এর কারণ কি?

জবাব পাবে ডঃ এ. কে. মজুমদার রচিত 'Advent of Independence' গ্রন্থের ৪০৯-এর পাতায়। একটি চিঠির মাধ্যমে রহস্যের দ্বার খুলেছেন প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা কে. এম. মুন্সী স্বয়ং। মূল বক্তব্য তাঁর মুখ থেকেই তুমি শোন ঃ

'The Government of India knew my relation

with Gandhiji and Sarder, and often saw to it that confidential information reached Gandhiji through me.

On one such occasion, I was shown certain secret service reports that Netaji had contacted the German Consul in Calcutta and had come to some arrangement with him, which would enable Germany to rely upon him in case there was a war.

I conveyed the information to Gandhiji, who naturally felt surprised.

[ভারত সরকার গান্ধীজী ও সর্দারের (প্যাটেল) সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানতেন এবং সেজন্য অনেক সময়ই তাঁরা এটা খেয়াল রাখতেন যে, সে রকম কোন গোপন সংবাদ আমার মারফৎই যেন গান্ধীজীর কাছে পৌঁছায়।

এ জাতীয় একটি ঘটনার সময় গোয়েন্দা বিভাগের কিছু গোপন রিপোর্ট আমাকে দেখানো হয়। তাতে এই ছিল যে,—নেতাজী কলকাতার জার্মান কন্‌সালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে এমন একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানীর পক্ষে তাঁর ওপর নির্ভর করা চলে।

আমি এ খবর গান্ধীজীকে জানাই এবং স্বাভাবিক কারণেই এ খবরে তিনি বিস্মিত হন।]

এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে। আর মুন্সীজী তা প্রকাশ করেছেন ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ, চব্বিশ বছর বাদে।

এবার আসল প্রশ্নে আসা যাক।

ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁদের গোপনীয় নথিপত্র মুন্সীজীকে দেখাতে গেলেন কেন ?

উপযুক্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকার সুভাষের বিরুদ্ধে কোনরকম

ব্যবস্থা অবলম্বন না করে চুপে চুপে মুন্সীজীকে দিয়ে গান্ধীজীর কাছে নালিশ জানাতে গেলেন কেন ?

আর গান্ধীজীই বা কংগ্রেসের ব্যাপারে অন্য সব কিছু তুচ্ছ করে ভারত সরকারের অভিমতের ওপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করতে গেলেন কেন ? এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়, বলো ?

সুভাষ আজন্ম-বিপ্লবী। ব্যর্থতায় ভেঙে পড়া তাঁর স্বভাব নয়। তাই কাল-বিলম্ব না করে একাই তিনি এবার দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘূর্ণীর মতো।

মুখে সেই একই ডাক। চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে। আর দেরি নয়। চাই সংগ্রাম!

ডাক শুনে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা এগিয়ে এল মাথা উঁচু করে। এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। কথা অনেক হয়েছে। এবার চাই সংগ্রাম!

ডাক এল পাঞ্জাব, নাগপুর, সীমান্ত-প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, বম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে। আর কথার কচকচি নয়। বড় বড় গাল-ভরা কথাও নয়। চাই আপসহীন সংগ্রাম!

১৭ই অক্টোবর জবাব পাওয়া গেল বড়লাটের কাছ থেকে। কোথায় প্রতিশ্রুতি, কোথায় কি! একমাত্র প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা-গুলির অধিকার সঙ্কুচিত করা, আর দেশরক্ষার অজুহাতে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থা করার কথা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না তাঁর ঘোষণায়।

মোট আটটি প্রদেশে তখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা চলছে। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে ওয়ার্কিং কমিটি এবার তাদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন মন্ত্রিসভা থেকে। সহযোগিতার ফল যে এমন হাতে হাতেই পাওয়া যাবে, তা কে জানত!

মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তারপর? পরবর্তী কর্মসূচী কি? তবে কি সংগ্রাম?

না, সে-সব কিছুই নয়। গান্ধীজী ও-পথে যেতে রাজী নন। বরং সংগ্রাম পরিহার করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

'I am not spoiling for a fight. I am trying to avoid it.'

তাছাড়া ব্রিটিশের প্রতি তিনি আস্থা হারাতে রাজী নন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর সহৃদয়তা সম্বন্ধেও তাঁর গভীর বিশ্বাস।

'I have not lost faith in Britain. I like the latest pronouncement of Lord Linlithgow. I believe in his sincerity.'

২০শে মার্চ, ১৯৪০ সাল। সুভাষের আপস-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রামগড়ে।

কি অভূতপূর্ব দৃশ্য সেদিন রামগড়ে! একদিকে মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের জাঁক-জমকপূর্ণ অধিবেশন। অন্যদিকে সুভাষের আপস-বিরোধী সম্মেলন।

একপক্ষের বক্তব্য—কোন আপস নয়। কোন দর-কষাকষি নয়। ভিক্ষায় কোনদিন স্বাধীনতা আসে না। আবেদন-নিবেদনেও নয়। সুতরাং চাই সংগ্রাম! আপসহীন সংগ্রাম!

অপরপক্ষের বক্তব্য—না, সংগ্রাম নয়, আপস। সহযোগিতা। সুতরাং মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও আমরা আমাদের আবেদন-নিবেদন যথারীতিই চালিয়ে যাব ব্রিটিশের দরবারে।

'The Working Committee will continue to explore all means of arriving at an honourable settlement, even though the British Government has banged the door in the face of the Congress.'

দেখে দেখে মরিয়া হয়ে উঠলেন সুভাষ। কংগ্রেস কোনমতেই সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে রাজী নয়। শুধু কংগ্রেস কেন, কেউ রাজী নয়।

একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও রায়পন্থী এবং কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি আগেই পিছিয়ে পড়েছে। এবার সরে দাঁড়িয়েছে কমিউনিষ্ট পার্টি। কংগ্রেস সঙ্গে না থাকলে কোনরকম সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে তারা রাজী নয়।

কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে? এমন অপূর্ব সুযোগটা কি হাতছাড়া হয়ে যাবে এমনি করে?

অসম্ভব! সুযোগ কারো মুখ চেয়ে চিরকাল অপেক্ষা করে না। সুতরাং যার খুশি সে সরে যাক, তার জন্য কোন দুঃখ নেই। তা বলে সুভাষকে পিছিয়ে গেলে চলবে না। কেউ যদি না আসে তো একাই তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মরণপণ সংগ্রামে। কে এল, কে পিছিয়ে গেল, তা নিয়ে এখন কালহরণ করার মতো অবকাশ কোথায়?

১৮ই জুন নাগপুরে অনুষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনে সুভাষ চরমপত্র দিলেন ব্রিটিশ সরকারকে:

'All power to the Indian people.'

স্বাধীনতার প্রশ্নে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই। সুতরাং ভুয়ো প্রতিশ্রুতি নয়। কোনরকম টালবাহানাও নয়। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—স্বাধীনতা। চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই সেই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে। সবাই প্রস্তুত হও। লগ্ন আসন্ন!

তারপরই সুভাষের মুখ থেকে শোনা গেল এক আগুনঝরা উক্তি।

ইয়োরোপে প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ওপর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে আসবে। তাই এই গভীর সঙ্কটে ব্রিটিশের জন্য চোখের জল না ফেলে ভারতবর্ষকে সর্বাগ্রে

নিজের কথা ভাবতে হবে। ভারতবাসীকে এখনই ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাতে হবে।

'With every blow that she receives in Europe the Imperialist might of Britain is bound to loosen its grip of India.

Let us therefore cease talking of saving Britain with the Empire's help or with India's help. India must in this grave crisis think of herself first···

It is for the Indian people to make an immediate demand for the transference of power to them through a Provisional National Government.'

সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। পর-পর দু বছরের কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ তখন আর কেউ নন কংগ্রেসের।

দোষ কার? সুভাষের? গান্ধীজীর? কংগ্রেসের?

না, দোষ কারোরই নয়, মল্লিকা। এটা অনিবার্য ছিল। কারণ, মহাকালের যাত্রা তখন শুরু হয়ে গেছে।

কানের কাছে সর্বক্ষণ বেজে চলেছে সেই একই ডাক। একই আকুলতা। মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! দেশের মুক্তি! মানুষের মুক্তি! নিজের মুক্তি!

কি শক্তি আছে সংসারের এই মিথ্যে মোহের যে, এরপরেও তাঁকে ধরে রাখবে?

এ প্রসঙ্গে ১৯২৭ সালে মান্দালয় জেল থেকে সুভাষের লেখা কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আত্যন্তিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া

পূর্ণতর জীবন লাভ করিব, এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।···আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনা-বহুল জীবনে যে-সকল ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিঘ্ন-বিপদের সেই কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি।

এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা শুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না।

আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সকল ব্যর্থ—শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম—সকলই ব্যর্থ, যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়'?'

এই হল সুভাষ। এই হল তাঁর আসল পরিচয়। জীবনভর যে স্বপ্ন তিনি দেখে এসেছেন, আজ সেই স্বাধীনতা অর্জনের চরম মুহূর্ত উপস্থিত। কি করে তিনি এ সময়ে স্থির থাকবেন মহাশঙ্খের ঐ আহ্বান শুনে? এ যে নিশির ডাক! এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে!

ভেতরে ভেতরে পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে কিছুদিন আগে থেকেই।

বাইরে যেতে হবে। হিটলারের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ এখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। আঘাত হানতে হবে ঘরে-বাইরে—দুদিক থেকেই।

ফরোয়ার্ড ব্লক, বি. ভি., অনুশীলন সমিতি, পূর্ণ দাসের দল, অনিল

রায় ও লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাহসে, শৌর্যে, বীর্যে ও আত্মত্যাগে সত্যিই তাঁদের তুলনা নেই। সত্যিকারের সৈনিকের যা কিছু থাকা প্রয়োজন, সবই তাঁদের আছে।

তবু তা-ই যথেষ্ট নয়।

'I knew their strength. They were real revolutionaries of high spirit. But their strength and sacrifice were not enough to achieve complete independence for our Motherland.

[On to Delhi : P.—71]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম চালাতে হলে আরো কিছু চাই। চাই আধুনিক অস্ত্র-সম্ভার। চাই সুদক্ষ সেনা বাহিনী। চাই আরো অনেক কিছু।

তাই চরম আঘাত হানতে হবে বাইরে থেকেই। ভারত এখন অগ্নিগর্ভ। বাইরে থেকে ঠিক মতো আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাবিপ্লবের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার বাইরে যাওয়া।

বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি. ও পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির যোগাযোগে সব কিছু ব্যবস্থা প্রস্তুত। প্রস্তুত অন্তরঙ্গ সুহৃদ সত্য বক্সী। প্রস্তুত পেশোয়ারের আকবর শা। প্রস্তুত দুরন্ত দুঃসাহসী গাইড কমরেড ভগৎরাম তলোয়ার। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষা মাত্র।

প্রথমেই যেতে হবে পেশোয়ার। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে কাবুল। কাবুল থেকে কোন বৈদেশিক দূতাবাসের সাহায্যে সোজা ইয়োরোপ।

প্রকাশ্য জনসভায় শেষবারের মতো সুভাষের কণ্ঠ শোনা গেল দেশপ্রিয় পার্কে ঃ

'বন্ধুগণ, আর হয়তো আমি থাকব না। এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কিছু বলার মতো সুযোগ আর হয়তো কোনদিনই আমি পাব না। তার আগেই হয়তো শত্রুপক্ষ আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেবে দীর্ঘকালের মতো। তাই শেষবারের মতো আজ আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যে, এ সুযোগ আপনারা হারাবেন না। সবাই এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলুন। জয় আমাদের হবেই।'

হঠাৎ সব কিছু পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল সাময়িকভাবে।

সুভাষের পরিচালনায় হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলনের দিন ধার্য হয়েছিল ৩রা জুলাই। কলকাতার বুক থেকে অন্ধকূপ-হত্যার ঐ মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা দূর কর। এই জাতীয় অবমাননা আমরা সইব না।

ঠিক তার আগের দিন। বেলা তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ ডেপুটি কমিশনার মিঃ জানভ্রিন এসে হাজির। তোমাকে ভারত-রক্ষা বিধির ১২৯ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হল। চলো এবার প্রেসিডেন্সি জেলে।

সুভাষ বন্দী। ওদিকে গান্ধীজীও চুপচাপ বসে নেই। তখনো তিনি শান্তি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলসভাবে।

ইতিমধ্যেই তিনি হিটলারকে একখানি চিঠি লিখেছেন নানাবিধ উপদেশ দিয়ে। এভাবে যুদ্ধ করাটা ঠিক নয়। করতেই যদি হয় তো অহিংস-পন্থায় যুদ্ধ কর।

একই ভাবে আর একখানি চিঠি লিখেছেন ইংল্যাণ্ডবাসীদের উদ্দেশ্যে। এভাবে হিংস্র-পন্থায় হিটলার ও মুসোলিনীকে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। তোমরা তাঁদের সমাদর করে নিজেদের দেশে ডেকে নাও। সবচাইতে সুরম্য প্রাসাদে থাকতে দাও। তারপর অহিংস প্রতিরোধ কর।

'...You will invite Herr Hitler and Signor Mussolini to take what they want of the countries you call your possessions. Let them take possession of your beautiful island with your many beautiful buildings. You will give all these, but neither your souls, nor your minds. If these gentlemen choose to occupy your homes, you will vacate them. If they do not give you free passage out, you will allow yourself, man, woman and child, to be slaughtered, but you will refuse to own allegience to them'.

২২শে জুলাই তারিখে গান্ধীজী সেই চিঠি তুলে দিলেন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর হাতে।

বড়লাট স্তম্ভিত। যাদের জন্য সর্বস্ব যেতে বসেছে, তাদের কি না ইংল্যাণ্ডে ডেকে নিয়ে আপ্যায়ন করার উপদেশ! এ বুঝি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরের কাহিনী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মুখ থেকেই শোন :

'When Gandhiji told Lord Linlithgow that the British people should give up arms and oppose Hitler with spiritual force, Lord Linlithgow was taken aback by what he regarded as an extraordinary suggestion.

It was normally his practice to ring the bell for an A. D. C. to come and take Gandhiji to his car. On this occasion he neither rang the bell, nor sent for the A. D. C.

The result was that Gandhiji walked away from

a silent and bewildered Viceroy and had to find his way out to his car all by himself'.

[India Wins Freedom : Abul Kalam Azad]

গান্ধীজী অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। অহিংসাই তাঁর জীবন-ধর্ম। অপরপক্ষে লিন্‌লিথগোর কাছে যুদ্ধটাই বাস্তব। সেক্ষেত্রে শিষ্টাচার ভুলে গিয়ে তিনি যদি গান্ধীজীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করে থাকেন, তাতে গান্ধীজীর কতটুকু আসে-যায়, বলো ?

বড়লাট মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু তারপর ?

১৯৪০ সালে সুভাষ যে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে কি কংগ্রেস, কি গান্ধীজী, কেউ কর্ণপাত করেননি। স্বভাবতই তরুণদল ক্ষুব্ধ, চঞ্চল।

এমন কথাও কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে, অধুনা কংগ্রেস নাকি একটা সংগ্রাম-বিমুখ অনুষ্ঠান-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আর কিছু না হোক, অন্তত তাদের শান্ত করার জন্যও কিছু একটা করা প্রয়োজন।

কারো কারো অভিমত,—অবিলম্বে গণ-আন্দোলন শুরু করা হোক। কিন্তু গান্ধীজী তাতে একেবারেই নারাজ। কোথাও নাকি আলো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল,—গণ-আন্দোলন নয়, একক সত্যাগ্রহ। অর্থাৎ—একটি মাত্র লোক ফুলের মালা গলায় দিয়ে, প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে, নানাবিধ ধ্বনি সহকারে আইন-অমান্য করে কারাজীবন বরণ করবেন।

তা বলে যে-কেউ যখন-তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আইন-অমান্য করবেন, তা হবে না। আগে নাম পাঠিয়ে গান্ধীজীর অনুমোদন নিতে হবে, তারপর অন্যকথা।

প্রথম সত্যাগ্রহী হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন গান্ধী-শিষ্য বিনোবা ভাবে। সেদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সবার অপরিচিত।

কিন্তু সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহ করার সুযোগ পেয়ে রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন সারা দেশে।

দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী জওহরলাল। তারপর কয়েক হাজার। কিন্তু অবস্থা যেমন ছিল, তেমনিই রয়ে গেল।

অঘটন ঘটল পাঞ্জাবে। গান্ধীজীর অনুমতি না নিয়েই সম্পূরণ সিং নামক ওখানকার একজন সত্যাগ্রহী হঠাৎ সেদিন আইন অমান্য করে বসলেন প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তারপরই একআনা মাত্র জরিমানা দিয়ে দিব্যি কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন হাসতে হাসতে।

সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল দেশের সর্বত্র। এই কি গান্ধীজীর আইন-অমান্যের সংজ্ঞা! এই করেই কি দেশের স্বাধীনতা আসবে কোনদিন! জন্মেও না।

বড় দুঃখেই কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে বলতে হল ঃ

'This brought such ridicule on the movement in the Punjab that I had to go there to set matters right.' [India Wins Freedom : Abul Kalam Azad]

মাত্র কয়েকদিন। তারপরই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল গান্ধীজীর নির্দেশে। একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেখানেই শেষ।

সুভাষ তখন কারাগারে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্সি জেলে।

ফল কিন্তু ভালই হয়েছে, মল্লিকা। সেখানেই তিনি পেয়ে গেলেন বি. ভি.-র হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য বক্সী, মণীন্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে।

ফলে, আবার মন্ত্রণা শুরু হল নতুন করে। কি করা যায় এখন! এতটা পথ এগিয়ে এসে সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে এমনি করে?

অসম্ভব! অভিমত প্রকাশ করলেন শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ। তুমি 'দেশনায়ক'। দেশ ও জাতির তোমার কাছে অনেক আশা। তবে এখানে থাকলে একমাত্র জেলখানায় পচে মরা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

আবার আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলেন সুভাষ। হ্যাঁ, আমি যাব। যাবই। যেতেই হবে আমাকে। এ সুযোগ কিছুতেই হারালে চলবে না।

'The cumulative effect of all these factors together with Sri Hem Ghosh's advice to Subhas in the Presidency jail (July 2, 1940) ultimately led Subhas Bose to take a firm decision to leave the country and to work from outside for the cause of Indian Independence.' [Two Great Indian Revolutionaries: Uma Mukherjee: P.—161]

কিন্তু ঐ আকাশ-ছোঁয়া উঁচু পাঁচিলটা!

থাক পাঁচিল। সুভাষ নিশ্চিন্ত। পরিকল্পনা মতো এগুতে পারলে ঐ পাঁচিলটাকে ফাঁকি দেওয়া তাঁর পক্ষে এতটুকুও কষ্টকর হবে না।

হলও তাই। ২৮শে অক্টোবর সুভাষ জেল থেকেই কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ঠিক তার একমাস পরে (২৯শে নভেম্বর) ঘুম থেকে উঠেই সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল অভাবনীয় একটি খবর শুনে।

মুক্তির দাবীতে সুভাষ অনশন শুরু করেছেন। আমৃত্যু অনশন। তার আগেই তিনি বাংলার গভর্ণর এবং মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে

দিয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা। 'হয় মুক্তি, নয়তো মৃত্যু',—এই আমার শেষ কথা।

সেই সঙ্গে আর একটি মর্মস্পর্শী আবেদন তিনি রাখলেন দেশের অগণিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে :

'Forget not that the greatest curse for a man is to remain a slave. Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law—you must give life if you want to get it. And remember that the highest virtue is to battle against inequity, no matter what the cost may be.'

[ভুলো না যে, দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলো না যে, অন্যায় এবং দুর্নীতির সঙ্গে আপস করার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পেতে হলে জীবনের বিনিময়ে তা পেতে হবে। আরো মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি মেনে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।]

মুক্তি দেওয়া হল ৫ই ডিসেম্বর। শর্তাধীনে মুক্তি।

ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন আরো একজনকে মুক্তি দেওয়া হল প্রায় একই সময়ে। তিনি হলেন বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক অন্তরঙ্গ সুহৃদ সত্য বক্সী। এবার ষোলকলা পূর্ণ হল।

শাসক সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত। পেলেই বা মুক্তি! চারপাশে সদা-সতর্ক পুলিশ প্রহরী। সাদা পোশাক পরিহিত গোয়েন্দাও এমন কিছু কম নেই। তাদের চোখ এড়িয়ে যাবে আর কোথায়?

তাছাড়া ক'দিনই বা! মহম্মদ আলী পার্কে মারাত্মক বক্তৃতা দেবার অপরাধে ২৭শে জানুয়ারি মামলার দিন রয়েছে। ওই দিনই

তো আবার গিয়ে ঢুকতে হবে লৌহকারার অন্তরালে। এবার আর কোনরকমেই রেহাই নেই।

শুরু হল সুভাষের নতুন জীবন। কারো সঙ্গে দেখা নয়। কোনরকম কথাবার্তাও নয়। শুধু রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাধন-ভজন আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাছাড়া আর সব কিছুই বুঝি মিথ্যে হয়ে গেছে সুভাষের এই নতুন জীবনে।

সেই বন্দী-জীবন। আগে ছিল জেলখানায়। এখন নিজের ঘরে।

দিন কেটে যায় একই ছন্দে। একই রঙ নিয়ে আসে ভোরের সূর্য, স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল। দিন আর রাত্রির মধ্যে সেখানে কোন তফাৎ নেই।

কিন্তু এ কোন্ সুভাষ?

মুখে একগাল দাড়ি। চোখের নিচে ক্লান্তির কালিমা রেখা। মনে হয়, এ যেন এতদিনকার চেনা সেই সুভাষ নন। আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা।

মাঝে মাঝে অতীতের জীর্ণ পাতা ভেসে আসে চিন্তার আবর্তে।

মনে পড়ে কত কথা। কত চেনা মুখ। কত টুকরো টুকরো ছবি। স্বাধীনতার বেদীমূলে কত নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের কাহিনী। অস্পষ্ট, কিন্তু অবিস্মরণীয়।

মনে পড়ে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ক্ষুদিরামের কথা।

'হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।'

ভারতবাসী সত্যিই দেখেছিল সেদিন। শুধু হাসি আর হাসি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাসি। এমন কি, ফাঁসির দড়ি গলায় পরার সময় পর্যন্ত হাসি। ক্ষুদিরামের মতো এমন অনাবিল হাসি কি কোন ভারতবাসী এর আগে হেসেছিল কোনদিন?

অবশ্য বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাসে ক্ষুদিরামই প্রথম শহীদ নন।

প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ১৯০৭ সালে দেওঘর সংলগ্ন রোহিণী পাহাড়ে উল্লাসকর দত্তের তৈরি বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন সবার অগোচরে।

দ্বিতীয় শহীদ ক্ষুদিরামের সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী। পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন মোকামাঘাট স্টেশনে।

ক্ষুদিরাম তৃতীয়। কিন্তু ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম।

১৯০৮ সাল। ৩০শে এপ্রিল। বৃহস্পতিবার। রাত তখন ঠিক আটটা।

অমাবস্যার রাত। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের বাইরে অন্ধকারে মিশে রয়েছেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। চোখে-মুখে তাঁদের অধীর প্রতীক্ষা।

কখন বেরিয়ে আসবে কুখ্যাত জেলা-জজ কিংসফোর্ড? আজ তার শেষ দিন।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া, বিশেষ করে বিপ্লবী বালক সুশীল সেনকে বেত্রদণ্ড দেবার প্রতিফল আজ তাকে পেতেই হবে।

ঐ যে তার ফিটন গাড়িটা বেরিয়ে আসছে ক্লাব ঘরের গেট দিয়ে! এবার? এবার কোথায় যাবে তুমি কিংসফোর্ড?

নিমেষে গোটা মজঃফরপুর শহরটা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে।

কি হল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

জানা গেল অনেক পরে। গাড়িটা কিংসফোর্ডের নয়, মিঃ কেনেডির। গাড়ির যাত্রী মিসেস কেনেডি এবং মিস কেনেডি দুজনেই নিহত। মিস কেনেডি মারা গেলেন সেই রাত্রেই। মিসেস কেনেডি আট ঘণ্টা পরে।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন পরদিন ভোরে চব্বিশ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনী রেলস্টেশনে। তার পরের দিন (২রা মে) প্রফুল্ল চাকী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন মোকামাঘাট স্টেশনে।

গ্রেপ্তারের পর ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে। সেকি ভীড় তখন রেলস্টেশনে! কোথায় সেই বীর বন্দী বালক? কোথায়?

আর ক্ষুদিরাম! সে কাহিনী লেখা রয়েছে তখনকার সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায়ঃ

'ক্ষুদিরাম দৃঢ়পদে সহাস্য বদনে গাড়িতে আরোহণ করিল। তাহার একদিকে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অপরদিকে আর একজন পুলিশ কর্মচারী উপবেশন করিলেন। ক্ষুদিরাম উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম্ বলিতে লাগিল—গাড়ি তাড়াতাড়ি স্টেশন হইতে চলিয়া গেল।

[সঞ্জীবনী : ৭ই মে : ১৯০৮ সাল]

একই কথা লেখা রয়েছে সরকারী মুখপত্র স্টেটস্‌ম্যান-এর পাতায়ঃ

'He came out of a first class compartment and walked all the way to phaeton, kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety…on taking his seat the boy lustily cried Bandemataram.'

[The Statesman : 2. 5. 1908]

৯ই জুন এডিশনাল সেসন-জজ মিঃ কর্ণডফ্-এর আদালতে শুরু হল বিচার।

ক্ষুদিরাম নির্বিকার। মুখে তাঁর সেই হাসি, যা তাঁর মুখে দেখা গিয়েছিল বরাবর।

কত টুকরো টুকরো ছবি। কত অবিস্মরণীয় ঘটনা। তার মধ্যেও সেই হাসি। যেন সব কিছুই তাঁর কাছে একটা হাসির ব্যাপার মাত্র।

"—তুমি গীতা পড়িয়াছ?

—হ্যাঁ, পড়িয়াছি।

—তোমার মনে কোনরূপ ভয় হয় কি?

ভয়ের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া উত্তর করিল,—কেন ভয় করিব?" [সঞ্জীবনী : ১৮ই জুন : ১৯০৮]

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে সাজা দেওয়া হল,—প্রাণদণ্ড।

আশ্চর্য, ক্ষুদিরামের সারা মুখে সেই স্বর্গীয় হাসি!

"মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার পর ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এবং তাহার নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবত এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আসামীর প্রতি যে চরম দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ফাঁসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?

ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল,—বুঝিয়াছি।"

[সঞ্জীবনী : ১৮ই জুন : ১৯০৮]

১১ই আগস্ট, ১৯০৮ সাল।

যথাসময়ে ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হল বধ্যমঞ্চে।

আশ্চর্য, তখনো ক্ষুদিরামের মুখে সেই হাসি, যে হাসির কোন তুলনা নেই সংসারে!

'হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।'

হ্যাঁ, একথা ক্ষুদিরামেরই সাজে। সত্যিই সেদিন তিনি দেখিয়েছিলেন পরাধীন ভারতবাসীকে। দেখিয়েছিলেন, দেশের মুক্তির জন্য কি করে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সোনার অক্ষরে তাই লেখা রয়েছে তখনকার সময়ের সংবাদপত্রের পাতায় ঃ

'মজঃফরপুর, ১১ই আগস্ট, অদ্য ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমন কি, যখন তাহার মাথার উপর টুপিটি টানিয়া দেওয়া হইল, তখনও সে হাসিতেছিল।'

[অমৃতবাজার ঃ ১২ই আগস্ট ঃ ১৯০৮]

ক্ষুদিরাম চলে গেলেন। কিন্তু এ মৃত্যু, মৃত্যু নয়। এ হল জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, এভাবেই তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। তাই মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচে রইলেন জাতির অন্তরে। বেঁচে রইলেন কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও ইতিহাসের পাতায়।

ক্ষুদিরাম ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করলেন ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট।

তারপরই পালা এল কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন বসুর।

মজঃফরপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ততদিনে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে।

অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস, নরেন গোঁসাই, সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ আরো অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে একে একে। শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক মানিকতলা বোমার মামলা।

বন্দীরা নির্বিকার। গানে-গল্পে, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে সর্বক্ষণই তাঁরা ভরপুর। যেন একটা বিরাট একান্নবর্তী সুখী পরিবার।

বিশ্বাসঘাতকতা করল নরেন গোঁসাই। সব কিছুই সে গোপনে ফাঁস করে দিল পুলিশের কাছে।

গর্জে উঠলেন কানাই আর সত্যেন। ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই! বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই! এর জবাব আমরা দেবই। এই জেলখানায় আবদ্ধ থেকেই প্রমাণ করে দেব যে, বাংলার বিপ্লবীরা অসাধ্য সাধন করতে পারে কিনা!

প্ল্যান মতো রিভলবার এসে গেল বাইরে থেকে। একটা নয়, দুটো।

কিন্তু কোথায় নরেন? সতর্কতা হিসেবে পুলিশ তাকে আগেই সরিয়ে নিয়েছে হাসপাতালের এক ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে। পাশে রেখেছে সদা-সতর্ক প্রহরী হিগিনস্ ও অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার। এ অবস্থায় তাকে কাছে পাবার উপায় কি?

হাঁপানী রোগের জন্য সত্যেন তখন সাধারণ হাসপাতালে। সেখান থেকেই তিনি টোপ ফেললেন পুলিশের কাছে। আমিও রাজসাক্ষী হব। তোমরা নরেনকে একবার নিয়ে এসো আমার কাছে। একটু পরামর্শ দরকার।

পুলিশ আহ্লাদে আটখানা। বাঃ! এই তো লক্ষ্মী ছেলে! এই তো চাই! ঠিক আছে, কাল ভোরেই আমরা নরেনকে নিয়ে আসছি তোমার কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে কানাইও এবার হাসপাতালে ভর্তি হলেন অসুস্থতার ভান করে। আসুক কাল নরেন। দেখা যাবে!

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ সাল।

যথাসময়ে নরেনকে নিয়ে আসা হল সত্যেনের কাছে। সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রহরী হিগিনস্ ও অন্য একজন ওয়ার্ডার।

সত্যেনের একহাত তাঁর জামার পকেটে। কথা বলতে বলতে একসময়ে সেই জামার পকেট থেকেই তাঁর রিভলবার গর্জে উঠল— দ্রাম!

একহাতে উরু চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গেই নরেন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল তীরের মতো। দ্বিতীয়বার গুলি করার মতো আর কোন অবকাশই পাওয়া গেল না।

ওদিকে গুলির শব্দ শুনেই কানাই নীচ থেকে দোতলায় ছুটে এলেন উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে। ঐ—ঐ যে নরেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাচ্ছে অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে! না, কিছুতেই আজ ওকে ছাড়া হবে না।

রক্তে যেন আগুন ধরে গেল কানাইয়ের। সঙ্গে সঙ্গেই উন্মত্ত আক্রোশে তিনি ছুটে গেলেন নরেনকে লক্ষ্য করে। তারপরই তাঁর হাতের রিভলবার গর্জে উঠল অব্যর্থ নিশানায়,—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

গুলিবিদ্ধ হয়ে স্নানাগার সংলগ্ন নর্দমায় দড়াম করে আছ্ড়ে পড়ল নরেন, তবু তার রেহাই নেই।

কানাই মরিয়া। বেপরোয়া। রিভলবারের সব ক'টা গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই যেন শান্তি নেই তাঁর। সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখুক যে, বাংলার বিপ্লবীরা জেলের অভ্যন্তরে থেকেও অসাধ্য সাধন করতে পারে কিনা!

আলিপুরের দায়রা-জজ মিঃ এফ. আর. রো-র আদালতে শুরু হল নতুন মামলা।

আসামী কানাই ও সত্যেন। অপরাধ—আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করা।

—রিভলবার কে দিয়েছে? প্রশ্ন করলেন বিচারক মিঃ রো।

—কে দিয়েছে! হাসলেন কানাই, দিয়েছে ক্ষুদিরামের আত্মা।

—সরকারী খরচে কোন উকিল রাখতে চাও কি?

—ধন্যবাদ! আবার হাসলেন কানাই, তার কোন প্রয়োজন হবে না।

সাজা হল প্রাণদণ্ড। হাইকোর্টও সে সাজা বহাল রাখলেন।

১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ সাল।

তখনো রাতের অন্ধকার ভাল করে মেলায়নি।

একে একে এসে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে,

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বম্পাস, জেল-সুপার এমারসন এবং ছোট-বড় আরো অনেকেই।

আজ কানাইয়ের শেষ দিন। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা কানাইকে আজ চির বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে।

কানাই তেমনি নির্বিকার। তেমনি সদাহাস্যময়। ফাঁসিমঞ্চে তোলার পরে প্রশ্ন করা হল,—কিছু বলার আছে তোমার?

—না, ধন্যবাদ! কানাইয়ের সারা মুখে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের প্রশান্ত হাসি।

কানাই চলে গেলেন। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু। তাই জেল গেটের বাইরে সেদিন দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। শুধু মানুষ আর মানুষ! অগণিত মানুষ! বীর কানাইকে তারা শুধু শেষবারের মতো একটু দেখতে চায়। দেখে ধন্য হতে চায়।

শবদেহ বাইরে আসতেই শুরু হল অবিরাম শঙ্খধ্বনি। শুরু হল মহিলাদের লাজ-বর্ষণ। বীর কানাই, তোমার মৃত্যু নেই। তুমিই আমাদের নির্ভয় হতে শিখিয়েছ।

আবার সেই একই দৃশ্য দেখা গেল ২১শে নভেম্বর, ভোর পাঁচটায়। এবার ফাঁসিমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সত্যেন।

তবে এবার আর আগেকার ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন না শাসক সম্প্রদায়। তাই উদ্বেলিত জনতার হাতে শবদেহ না দিয়ে নিজেরাই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে। ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠেছে! বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই!

প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন—সবাই চলে গেলেন একে একে।

বাকি রইলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বন্দীর দল।

সবাইকে আসামী তালিকাভুক্ত করে দিনের পর দিন মামলা এগিয়ে চলল এডিশনাল জজ মিঃ বীচক্রফট্-এর আদালতে।

রায় দেওয়া হল ১৯০৯ সালের ৬ই মে।

বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। আর উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল ও ইন্দুভূষণ রায়কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

পরেশ মৌলিক, নিরাপদ রায় ও শিশির ঘোষের দশ বছর কারাদণ্ড। অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরিকানে আর শিশির সেনের সাত বছর। কৃষ্ণজীবন সান্যালের এক বছর। বাকি সবাই মুক্ত।

অরবিন্দও মুক্তি পেলেন, তবে তখন আর তিনি শুধুমাত্র বিপ্লব-গুরু অরবিন্দ নন।

কারাজীবনের নির্জন অবকাশে বিপ্লব-গুরু অরবিন্দের খোলস ছেড়ে তখন বেরিয়ে এসেছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ—নাম তাঁর 'ঋষি অরবিন্দ'।

আদালতে অরবিন্দকে সমর্থন করতে গিয়ে সেকি দীপ্ত ভাষণ সেদিন দেশবন্ধুর!

'My appeal to you, therefore, is that a man like this who is being charged, charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar in this court, but stands before the bar of the High Court of history and my appeal to you in this : that long after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and lover of humanity'...

[তোমরা মনে করো না যে, আজ এই আদালতেই এ মামলার

শেষ। মানব ইতিহাসের বিরাট বিচারালয়েও এই মামলার শুনানী চলবে চিরকাল।

একদিন যখন তোমাদের সমস্ত বিচার-বিতর্ক নীরব হয়ে যাবে, যখন আজকের এই আন্দোলন ও উত্তেজনার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না এবং আজ যিনি আসামী হয়ে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন, তিনিও পৃথিবী থেকে চলে যাবেন। সেদিন সেই অনাগত যুগের মানুষ এই অরবিন্দকেই স্মরণ করবে দেশপ্রেমের কবি বলে। মানবতার উপাসক বলে সমগ্র পৃথিবী তাঁকেই দেবে সেদিন পুষ্পাঞ্জলি।

আজ যে বাণী প্রচারের জন্য তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন, সেদিন সেই বাণীর তরঙ্গ দেশ-দেশান্তরের মানুষের অন্তরে মহাভাবের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।]

ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা গুরু দেশবন্ধুর সেই স্মরণীয় উক্তি ব্যর্থ হয়নি। তাই বিপ্লব-গুরু অরবিন্দ আজ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কাছে 'ঋষি অরবিন্দ'।

আপীলে কিছুটা হেরফের হল। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে বারীন ঘোষ আর উল্লাসকরকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হেম দাস আর উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাই।

অন্যান্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের দেওয়া হল দশ বছর; আর বালকৃষ্ণ হরিকানে, ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুনীল সেন ও কৃষ্ণজীবন সান্যাল পেলেন মুক্তির আদেশ।

তা বলে ইতিহাস কিন্তু থেমে গেল না।

মিছিলের মতো সারি সারি সব ঘটনা। একটার পর একটা। অসংখ্য।

১৯০৯ সালের ১০ই এপ্রিল বোমার মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস প্রাণ দিলেন পুলিশের সুবার্বন আদালতে। আততায়ী চারু বসু ধরা পড়লেন ঘটনাস্থলেই।

কিন্তু একি ! আশ্চর্য ব্যাপার ! আসামীর ডানহাতটা একেবারেই পঙ্গু। পঙ্গু বলেই রিভলবারটাকে তিনি শক্ত করে বেঁধে নিয়েছেন ডানহাতের তালুতে। তারপর যা কিছু করেছেন, সবই বাঁ হাতে। বিশ্বাস করাও শক্ত !

আদালতে সেই একই প্রশ্ন করা হল আসামী চারু বসুকে, —সরকারী খরচে কোন উকিল রাখতে চাও কি ?

বিচারপতি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বম্পাসকে লক্ষ্য করে সেকি নির্ভীক উত্তর চারু বসুর! না, কিছুই আমি চাই নে। সেসন-টেসনেরও প্রয়োজন নেই। বিচার করে কালই আমাকে ফাঁসি দাও। এটা ভবিতব্য যে, আশুবাবু আমার গুলিতে নিহত হবেন এবং আমি ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দেব।

'No sessions, trial, but hang me to-morrow. It was all preordained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall be hanged,'

তাই করা হল। সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকরী হল দিন কয়েকের মধ্যেই।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, চারু সবাই চলে গেলেন একে একে। এবার এগিয়ে এলেন বীরেন দত্তগুপ্ত।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সাল।

স্থান—কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালত থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন বোমার মামলার প্রধান উদ্যোক্তা, গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা সামসুল আলম। আর মাত্র কয়েকটা ধাপ বাকি।

হঠাৎ কান ফাটানো আওয়াজ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! ব্যস, সামসুল আলম শেষ।

বিচারে আসামী বীরেন দত্তগুপ্তকে সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড।

সে আদেশ কার্যকরী হল ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখে। সংখ্যায় আর একজন বাড়ল।

১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গদর পার্টি, মহানায়ক রাসবিহারী বসু এবং বাংলার অবিসম্বাদী বিপ্লবী নায়ক যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হল অগ্নিযুগের দ্বিতীয় পর্ব।

চেষ্টার ক্রটি ছিল না। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু করা সম্ভব, সবই তাঁরা করেছিলেন দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে। বিদেশে অবস্থিত বিপ্লবিগণও তাঁদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছিলেন নিষ্ঠা ভরে। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে অস্থায়ী জাতীয় সরকারও গঠন করা হয়েছিল কাবুলের মাটিতে। তবু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত রাসবিহারী চলে গেলেন জাপানে। আর বাঘা যতীন ?

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জার্মানী-প্রেরিত অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ খালাস করতে গিয়ে প্রচণ্ড সম্মুখ-সমর শুরু হল উড়িষ্যার বুড়িবালামের তীরে।

একদিকে ডেনহাম, টেগার্ট, কিলবী সহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে বীর বিপ্লবী যতীন মুখার্জী এবং তাঁর চারজন একনিষ্ঠ সহকর্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত আর জ্যোতিষ পাল।

প্রচণ্ড সংগ্রামের পরে প্রাণ দিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। আহত বাঘা যতীন প্রাণ দিলেন পরদিন হাসপাতালে। নীরেন আর মনোরঞ্জন প্রাণ দিলেন ফাঁসিমঞ্চে।

একমাত্র ব্যতিক্রম জ্যোতিষ পাল। তাঁকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তবে বেশিদিন নয়। শেষ পর্যন্ত তিনিও একদিন প্রাণ দিলেন উন্মাদ হয়ে।

১৯১৮ সালের ১৫ই জুন পুলিশের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামে নলিনী বাগচী আর তারিণী মজুমদার প্রাণ দিলেন ঢাকার কলতা বাজারে। প্রাণ যায় যাক, তবু আত্মসমর্পণ কিছুতেই নয়।

মৃত্যুপথযাত্রী নলিনীর কাছে সেকি কাতর অনুরোধ পুলিশের! কে তুমি বলো? কি তোমার নাম? পরিচয় কি তোমার?

শুধু একটি মাত্র উত্তরই শোনা গেল নলিনীর মুখ থেকে,—Let me die peacefully. আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।

১৯২৪ সালের ১লা মার্চ ফাঁসিমঞ্চে নিজেকে উৎসর্গ করলেন গোপীনাথ সাহা। মারতে চেয়েছিলেন কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে। কিন্তু ভুল হয়ে গেল। ফলে, প্রাণ দিতে হল আর্নেস্ট ডে-কে।

মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ গোপীনাথ!

বুঝি বারেকের জন্য তন্ময়তা ভেঙে জেগে উঠলেন সুভাষ। আজো তাঁর মনে আছে সেদিনের কথা। তিনি নিজেই সেদিন জেল গেটে হাজির হয়েছিলেন শহীদের শবদেহ বহন করবেন বলে। ওরা তা দেয়নি।

ফাঁসির পরেই জনৈক শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট বেরিয়ে এসে গোপীনাথের নির্ভীকতার কথা উল্লেখ করে তাঁকে বলেছিলেন:

'He played like fawn
And at the dawn
Was slain on the lawn.'

১৯২৬ সালের ৯ই আগস্ট আবার ফাঁসির রজ্জু ভিজে উঠল শহীদদের তাজা রক্তে। এবার প্রাণ দিলেন প্রমোদ চৌধুরী আর অনন্তহরি মিত্র।

আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে যেভাবে ওঁরা আই. বি. বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে শেষ করে দিয়েছিলেন, সত্যিই তার তুলনা নেই। রিভলবার ছিল না। ছিল একটা শাবল মাত্র। ঐ শাবলের এক ঘায়েই রায়বাহাদুর ঠাণ্ডা।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল শুরু হল তৃতীয় পর্ব। প্রথম সূত্রপাত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। তারপর এখানে-ওখানে সর্বত্র। শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস! রক্তের অক্ষরে লেখা অবিস্মরণীয় ইতিহাস!

এ দাসত্ব চিরদিন থাকবে না। একদিন না একদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। সেদিন দেশবাসী ওঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করবে না? মাথা নোয়াবে না ওঁদের নাম স্মরণ করে? না কি অকৃতজ্ঞ বলে জাতির ইতিহাসে এমনি করেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরকাল?

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। ভাবনার গতিও পাল্‌টায়।

মনে পড়ে গুরু দেশবন্ধুর কথা। মনে পড়ে তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তি। ১৯২৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হলে সেই পুরুষসিংহ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন:

'If love of country is crime, I am a criminal. If Mr. Subhas Chandra Bose is a criminal, I am a criminal, not only the Chief Executive Officer of the Corporation, but the Mayor of this Corporation is equally guilty.'

দেশবন্ধু!

সত্যিই তাই। দেশকে কে না ভালবাসে? কে না তার মঙ্গল চায়? কিন্তু দেশের জন্য এমনভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করে 'দেশবন্ধু' হতে পেরেছেন ক'জন?

নিঝুম নিশুতি রাত্রি। চারিদিক মৌন, অকম্পিত। বুঝি গোটা অঞ্চলটাই ঘুমিয়ে পড়েছে নিটোল ঘুমের অতলান্তে।

ঘুম নেই শুধু সুভাষের চোখে। আসে রাশি রাশি ভাবনা। অস্থির, চঞ্চল সব ভাবনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবারও কি তাই হবে? এমন সুবর্ণ সুযোগটাকে কি এমনি করে হেলায় হারাতে হবে? অসম্ভব!

কিন্তু কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে? কে দেবে তাকে পথের নির্দেশ?

ভাবতে ভাবতে অজ্ঞাতেই বুঝি এক সাগ্নিক সন্ন্যাসীর ছবি ভেসে

ওঠে সুভাষের চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে। ভেসে আসে তাঁর সেই অমৃতময় বাণী ঃ

'পরে কি হবে—সর্বদা একথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কার্যই হতে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস, তা এখনই করে ফেল ; পরে কি হবে না হবে সেকথা ভাববার দরকার কি ? এতটুকু তো জীবন—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে পারে ? ফলাফল দাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) যাহা হয় করবেন, সে-কথায় তোর কাজ কি ? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা।

—যারা ভীরু, কাপুরুষ তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়, মহাবীর কি কিছুতে দৃকপাত করে রে ?'

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে নিমেষে মনের মণিকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে সুভাষের। তাই হোক স্বামীজী, তাই হোক ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ! আশীর্বাদ কর, আমি যেন এই গুরু-দায়িত্ব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাসিমুখে বইতে পারি। তুমি আমাকে শক্তি দাও। আশীর্বাদ কর !

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪১ সাল।

সারা ভারত সেদিন উত্তাল। আজ স্বাধীনতা দিবস। আমরা স্বাধীনতা চাই !

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে গেল। জানা গেল—সুভাষ নিখোঁজ। সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি। কাউকে কিছু বলেও যাননি। কখন, কিভাবে গৃহত্যাগ করেছেন তাও জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা আগাগোড়াই রহস্যাবৃত।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। স্বাধীনতাই যাঁর জীবন-স্বপ্ন, তিনি কিনা অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই স্বাধীনতা দিবসেরই পুণ্যলগ্নে ! কিন্তু কেন ? কোথায় গেলেন সুভাষ ? কি ব্যাপার ?

আশ্চর্য! সব যেমন ছিল, তেমনিই আছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সবই চলছে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। শুধু সুভাষই নেই। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

খবর শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। মাত্র কিছুদিন আগে যাকে তিনি পরম স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে 'দেশনায়ক' পদে বরণ করেছিলেন, সেই সুভাষ কিনা আজ নিখোঁজ! এ দুঃখ তিনি রাখবেন কোথায়?

কাল-বিলম্ব না করে কবি এবার তার পাঠালেন মেজদা শরৎ বসুর কাছে:

'Deeply concerned over Subhas's disappearance. Convey to mother my sympathy. Kindly keep me informed of news.'

কি বলবেন মেজদা শরৎবাবু? বলার আছেই বা কি?

বিরাট বসু-পরিবারের মধ্যে এই একটি মাত্র লোক, যিনি প্রথম থেকেই জড়িত ছিলেন সুভাষের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সঙ্গে।

কিন্তু সেকথা বলার সাধ্য তাঁর কোথায়? সুবি যে তাঁর বড় আদরের! বড় গর্বের! তাই সব কিছু জেনেও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁকে বলতে হল অন্য কথা:

'Mother and we profoundly touched by message. No news of Subhas yet despite utmost efforts last few days. Hope he will have your blessings wherever he may be.'

'সুভাষ যেখানেই থাক না কেন, আশাকরি তোমার আশীর্বাদ সবসময়েই তার ওপর থাকবে।'

শরৎবাবু-প্রেরিত তারের এই শেষ লাইনটি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ নয় কি, মল্লিকা! ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি-কবিকে এই লাইনটির মধ্য দিয়ে তিনি কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন কিনা, কে জানে!

তার পাঠালেন গান্ধীজী :

'Startling news about Subhas. Please wire truth. Anxious. Hope all well—Bapu'.

উত্তর দিলেন শরৎবাবু :

'We as much in dark as public about Subhas's whereabouts and intention and even the exact time of leaving. No news inspite of best efforts for last three days. Circumstances indicate renunciation.'

তার পাঠালেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ :

'Great anxiety about Subhas Babu. Please wire latest information.'

শরৎবাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তর : 'No news.'

শুরু হল নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা। সাধু-সঙ্গের আশায় গৃহত্যাগ করা সুভাষের পক্ষে নতুন কিছু নয়। এবারও তেমন কিছু হয়নি তো!

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। সমর্থন জানালেন ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট সর্দার শার্দুল সিং কবিশের। নিশ্চয় সাধু-সঙ্গের আশায় সুভাষ গৃহত্যাগ করেছেন। এমনি একটা আভাসই তিনি আমাকে দিয়েছিলেন মাত্র কিছুদিন আগে।

ভবী ভোলবার নয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে আহত সিংহের অন্তিম আর্তনাদ।

হ্যালো ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস, হ্যালো সুর্মাভ্যালি লাইট হর্স রাইফেলস,—সরকার বাহাদুরের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বোস পালিয়েছে। প্রতিটি ঘাঁটির ওপর কড়া নজর রাখো। কোনরকমেই যেন সে বর্ডার পেরিয়ে যেতে না পারে।

হ্যালো রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং এয়ারপোর্ট, প্রতিটি

যাত্রীকে ভাল করে পরীক্ষা কর। প্রতিটি পাসপোর্ট নতুন করে পরীক্ষা কর।

কোনরকম সন্দেহ হলেই আটক করবে।

প্রতিটি বিদেশী জাহাজ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কর। প্রতিটি নৌকোর ওপর নজর রাখো। যে করে হোক সুভাষ বোসকে ধরা চাই-ই!

মল্লিকা, লক্ষ্য কর যে, যা কিছু তৎপরতা সবই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে।

কারণ, সময়োপযোগী একটি গুজব।

দমদম বিমান-বন্দর থেকে নাকি গতকাল একজন রহস্যময় যাত্রীকে একটি জাপানী বিমানে আরোহণ করতে দেখা গেছে। লোকটি আর কেউ নন, স্বয়ং সুভাষ।

অত্যন্ত চাতুর্য সহকারে সেদিন এই গুজবটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল লোকের মুখে মুখে। উদ্দেশ্য—পুলিশের দৃষ্টিকে ভারতের পূর্ব-সীমান্তের দিকে নিবদ্ধ রাখা।

গুজবটি খুবই কার্যকরী হয়েছিল সন্দেহ নেই। সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ শাসকরা সেদিন ভাবতেই পারেনি যে, তাদের ঘুম কেড়ে নেওয়া পয়লা নম্বরের শত্রু সুভাষ বোসের আসল লক্ষ্য আদপেই পূর্ব-সীমান্তে নয়, পশ্চিম-সীমান্তে।

এদিকে সবার অলক্ষ্যে তখন রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনে চলেছেন অন্তর্ধান পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক বি. ভি.-র সত্যরঞ্জন বক্সী। প্রতিটি দমবন্ধ মুহূর্ত যেন একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাকে কাছে টেনে আনছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে!

প্রকৃতপক্ষে সুভাষ অন্তর্ধান করেছেন ১৭ই জানুয়ারি রাত একটা বেজে পনেরো মিনিটে। কিন্তু খবরটা প্রচার করা হয়েছে আজ

কাদের সান্নিধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন একটু একটু করে ? কোন্ পরিবেশে ?

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় কি বলেছেন, শোন ঃ

'সুভাষ একটি হঠাৎ সৃষ্টি নন।······সুভাষচন্দ্রের প্রাণগুরু স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কর্মগুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর বিপ্লবগুরু শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন দুর্জয় বিপ্লবীদল। তাঁকে দেশনায়কের আসনে বরণ করেছেন আর কেহ নন—সুদূর-দ্রষ্টা ঋষি-কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।···তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবন এর ধারাস্নানেই লালিত। তিনি মহনীয় এই ঐতিহ্যের সন্তান।'

এই হল সুভাষ। মহান ঐতিহ্যের সন্তান সেই সুভাষকে ধরে রাখা কি সেদিন সম্ভব ছিল কারো পক্ষে ?

মায়ের স্নেহাঞ্চলই কি সেদিন তাঁকে পেরেছিল বেঁধে রাখতে ?

বিপ্লবীর ধর্মই যে এগিয়ে যাওয়া ! কি পেল, কি হারাল, ওসব তুচ্ছ হিসেব-নিকেশ করার মতো অবকাশ তাঁর কোথায় ? ওসব ভাল ছেলেদের জন্য, সুভাষের জন্য নয়।

সুভাষ অসম্ভবের নায়ক।

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। জীবনে এমন বহু অসম্ভবকেই তিনি সম্ভব করে তুলেছিলেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। পেশোয়ার থেকে যাত্রা শুরু করে, দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অনায়াসেই একদিন তিনি পৌঁছে গেলেন কাবুল শহরে।*

তারপর প্রায় দেড়মাসাধিক কাল ওখানকার রেডিও-ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদের আশ্রয়ে।

---

* অন্তর্ধান পর্বের বিস্তৃত বিবরণ প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে।

স্বপ্ন সার্থক হল ১৮ই মার্চ। ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানীর সহযোগিতায় সেদিন তিনি পাড়ি দিতে সক্ষম হলেন যুদ্ধরত ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে।

সুভাষের লেখা মূল্যবান প্রবন্ধ, ইস্তাহার ও চিঠি সহ পরদিনই পথের সঙ্গী ভগৎরাম রওনা দিলেন হিন্দুস্থানের দিকে।

প্রথমেই গেলেন লাহোর। ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট সর্দার শার্দুল সিং কবিশের এখন ওখানেই রয়েছেন। বোসবাবুর লেখা জরুরী চিঠিটি তাঁকে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

২৮শে মার্চ লাহোর থেকে কলকাতা। এবার প্রবন্ধ দুটি তুলে দিতে হবে মেজদা শরৎবাবুর হাতে।

ভগৎরামের মুখ থেকে খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে আনন্দে আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন শরৎবাবু।

অর্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ-রাজের সমস্ত শক্তিকে পর্যুদস্ত করে সুবি তার আপন লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছে। এবার শুরু হবে তার আসল সংগ্রাম। দিন আগত ঐ!

সুভাষের লেখা সেই প্রবন্ধ নিশ্চয়ই তুমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পড়ে থাকবে, মল্লিকা। আমি তার সংক্ষিপ্তসার এখানে তুলে দিচ্ছি:

'...ইয়োরোপে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী ব্রিটিশের সঙ্গে নিঃশর্ত সহযোগিতার জন্য একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিলেন। এগারো বছর ধরে কংগ্রেস যা বলে এসেছিল, তা বেমালুম ভুলে যাওয়া হল।

গান্ধীজীর কাজে জাতির নেতৃত্বদানে তাঁর অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। গান্ধী-আন্দোলন ক্রমশই গতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং সংরক্ষণশীল হয়ে উঠেছে।

মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার পর থেকেই গান্ধীবাদীরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও ক্ষমতার একাধিপত্য রক্ষার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে যা চলছে, তাকে পাওয়ার পলিটিক্স ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এর মূল কেন্দ্র হল, ওয়ার্ধা।

ওদের একমাত্র লক্ষ্য হল, কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বিরোধী মনোভাবকে দমন করা, যাতে চিরকালের জন্য ওরা কর্তৃত্ব করতে পারে।...'

শরৎবাবুর নির্দেশে এবার ভগৎরাম দেখা করলেন অন্তর্ধান পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক বি. ভি.-র দায়িত্বশীল নেতা শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সীর সঙ্গে। তারপর সব কথাই তাঁকে খুলে বললেন একে একে।

বোসবাবুর নির্দেশ,—অবিলম্বে একজন বিশ্বস্ত কর্মীকে কাবুল যেতে হবে। তার কাজ হবে—আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে ইতালিয়ান এ্যামব্যাসির সহায়তায় ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপ পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং নেওয়া।

২১শে এপ্রিল ভগৎরাম আবার পেশোয়ার থেকে পায়ে হেঁটে কাবুলের দিকে পাড়ি দিলেন বি. ভি.-র বিশ্বস্ত কর্মী শান্তিময় গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে। ধ্বংসাত্মক কার্যের ট্রেনিং ছাড়াও ইতালিয়ান এ্যামব্যাসির মাধ্যমে বোসবাবুর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে শান্তিবাবুর সহায়তা খুবই প্রয়োজন।

আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন উপজাতীয় সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে শেষ পর্যন্ত কি করে যে তাঁরা একদিন কাবুলের মাটিতে পা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আজ আর তোমাকে নতুন করে বলার কিছু নেই, মল্লিকা। কারণ, তার বিস্তৃত বিবরণ তোমাকে আমি আগেই শুনিয়েছি প্রথম পর্বে।

কাবুল পৌঁছেই ভগৎরাম দেখা করলেন উত্তমচাঁদের সঙ্গে। সেই উত্তমচাঁদ, যিনি সব রকম বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও দেড়-মাসাধিক কাল সুভাষকে আগলে রেখেছিলেন নিজের আশ্রয়ে।

অনেক কথাই জানালেন উত্তমচাঁদ। খবর শুভ। ২৮শে মার্চ তারিখে বোসবাবু নিরাপদে বার্লিন পৌঁছে গেছেন। ওখান থেকে

যে-সব পত্র-পত্রিকা এসেছে, তা থেকেই খবরটা জানা গেছে। সঙ্গে ছবিও ছাপিয়েছে। তাছাড়া বন্ধু হাজি সাহেবের বাড়ির ঠিকানায় তাঁর চিঠিও এসেছে বার্লিন থেকে।

দেখা করলেন ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানীর সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে সে খবর চলে গেল বার্লিনে অবস্থিত সুভাষের কাছে। আমি কাবুলের ইতালিয়ান এ্যামব্যাসি থেকে অ্যালবার্ট কোরানী বলছি। কলকাতা থেকে লোক এসে গেছে। পরবর্তী নির্দেশ চাই!

নির্দেশ এল মে মাসের ২০ তারিখে।

অনেক নির্দেশ। বক্তব্যও অনেক। সেই সুদীর্ঘ বক্তব্য থেকে সংক্ষেপে কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

'...অক্ষশক্তির সঙ্গে এখনো পর্যন্ত আমার কোন রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়নি। অবশ্য বোঝাপড়া না করেই তারা আমাকে সব রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তা মেনে নিতে রাজী নই।

সর্বাগ্রে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের প্রকাশ্য ঘোষণা চাই। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান ভারতের জনগণই ঠিক করবে, —এ স্বীকৃতি আমি পক্ষকালের মধ্যেই পাব বলে আশা করি।

কাবুল থেকে পেশোয়ার এবং পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষার জন্য অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

আর কলকাতার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা প্রয়োজনবোধে কাবুল আসবেন, তাঁদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা দরকার।

কলকাতার বন্ধুদের প্রতি আমার নির্দেশ, তাঁরা যেন গুর্খা সৈন্যদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানোর জন্য কিছু-সংখ্যক বিশ্বস্ত লোককে নেপালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

আর কিছু-সংখ্যক তরুণকে অবিলম্বে সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। তাদের কাজ হবে সৈন্যদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং সামরিক বাহিনীর গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

ব্রহ্মদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যও ওখানে কিছু-সংখ্যক লোক পাঠানো প্রয়োজন।…'

কলকাতার বন্ধুরা কি সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন যথাযথভাবে?

করেছিলেন বৈকি! শুধু ব্রহ্মদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে নয়, সেই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে, পায়ে হেঁটে ব্রহ্ম রণাঙ্গনে গিয়ে স্বয়ং সুভাষের সামনেই সশরীরে হাজির হতে সক্ষম হয়েছিলেন, মল্লিকা। সুভাষ তখন আর শুধুমাত্র সুভাষ নন, বিশ্বের বিস্ময় এক ও অদ্বিতীয় নেতাজী। সে কাহিনী তোমাকে শোনাব পরবর্তী কোন এক সময়।

এদিকে তখন ব্যস্ততার সীমা নেই অন্তর্ধান পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক বি. ভি.-র সত্য বক্সীর।

ব্যস্ততার কারণ সুভাষ-প্রেরিত সেই ইস্তাহার, যার ওপরে লেখা রয়েছে 'A message to my countrymen.' নিচে কোন ঠিকানা নেই। শুধু লেখা রয়েছে—'From somewhere in Europe.'

সুভাষের নির্দেশে তার হাজার হাজার কপি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে-ওখানে সর্বত্র। সংবাদপত্র, বিভিন্ন দূতাবাস, যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী অফিস, কিছুই বাদ যায়নি। এমন কি, শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছেও তা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যথাযথ-ভাবে।

এ ব্যাপারে অমলেন্দু ঘোষ (মুকুল), নির্মল রায়, কমলা দাশগুপ্তা প্রমুখ দলীয় সদস্যদের ভূমিকা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। কোন ত্রুটিই তাঁরা রাখেননি এ ব্যাপারে।

সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, মেজর সত্য গুপ্ত, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন, সুপতি রায় প্রমুখ দলের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রায় সবাই তখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

ভরসা বলতে শুধু যতীশ গুহ, বিনয় সেনগুপ্ত, কামাখ্যা রায়, কমেট্ দাশগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন, যাঁরা তখনো জেলের বাইরে

রয়েছেন। আর রয়েছেন গুটি-কয়েক তরুণ কর্মী। পুলিশের নজর এড়িয়ে কি নিখুঁত ভাবেই না তাঁরা প্রতিটি কাজ করে চলেছেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাও শক্ত।

এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র তৈরি করা।

এ কাজের জন্য চাই একজন অতি বিশ্বস্ত সুদক্ষ টেক্‌নিসিয়ান। এমন লোক চাই, যিনি ডাক পড়লেই যেন সব কিছু ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়তে পারেন বাড়ি থেকে।

কোথায় পাওয়া যাবে এমন লোক, যার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলে?

দলীয় সদস্য সত্যব্রত মজুমদার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।

যাদবপুর কলেজের ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসের ছাত্র। ফাইনাল ইয়ার। সামনেই পরীক্ষা। তবু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন হলে পরীক্ষা বন্ধ রেখেও এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে তিনি রাজী।

এমনি আরো নানা কাজে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে রয়েছেন ধীরেন সাহা রায়, সুবোধ চক্রবর্তী, রাতুল রায়চৌধুরী, জগদীন্দ্র সেন, নীরেন রায় প্রমুখ বি. ভি.-র আরো কয়েকজন দায়িত্বশীল তরুণ কর্মী।

তবে আর কতদিন যে বাইরে থাকা সম্ভব হবে, বলা শক্ত। কারণ, পুলিশী তৎপরতা।

হিংস্র হায়েনার মতো পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। যে করে হোক, অন্তর্ধান পর্বের রহস্য ভেদ করতে তারা বদ্ধপরিকর। হাজার চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত কোন সূত্র তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। পারবে বলেও মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। একটু অসতর্ক হলে কখন কি ঘটে যাবে, কে বলতে পারে!

শুধু পুলিশ নয়, জনসাধারণও তখন সেই তিমিরে। সেই একই প্রশ্ন তাদের মনে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে সর্বক্ষণ।

সুভাষ কোথায়? সব কিছু ফেলে কোথায় তিনি চলে গেলেন এমন করে?

২৬শে জানুয়ারি জানাজানি হলেও প্রকৃতপক্ষে সুভাষ নাকি ১৭ই জানুয়ারিই রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করেছেন এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। তারপর মাসের পর মাস কেটে গেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

তবে কি সত্যিই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে চিরদিনের মতো চলে গেছেন হিমালয়ের কোন গহন কন্দরে? না কি জাপানে গিয়েছেন সেদিনের সেই রহস্যময় বিমানে?

সরকার পক্ষও নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। উপায় কি? এত সতর্কতা সত্ত্বেও লোকটা তাদের সমস্ত মান-সম্ভ্রম পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে নাগালের বাইরে চলে গেছে। এতবড় লজ্জার কথাটা সরকার বাহাদুর নিজের মুখে ব্যক্ত করবেন কি করে?

এতবড় পরাজয়টা কি এত সহজে ভোলা যায়? না কি ভোলা সম্ভব?

তাই সুভাষকে না পেয়ে এবার যত আক্রোশ গিয়ে পড়ল এলগিন রোডের বাড়িটার ওপর। সুভাষ বোস থাক, আর নাই থাক, বাড়িটা তো আছে! ওটার ওপর দিয়েই গায়ের জ্বালা কিছুটা মেটানো যাক। তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকা থেকেই তার কিছুটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি:

'ভারত-রক্ষা বিধানে অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মামলা বিচারাধীন থাকা কালে নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী

পরোয়ানা ও হুলিয়া জারি করা হয় এবং তাঁহার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেওয়া হয়।

এই আদেশ জারির পর ছয় মাস অতীত হওয়ায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আদালতে হাজির না হওয়ায় উত্তর বিভাগ পুলিশ কোর্টের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর ওয়ালি উল ইসলাম এই মর্মে আদেশ জারি করিয়াছেন যে, ৩৮।২ নং এলগিন রোডস্থ বাড়িতে আসামীর যে এক-চতুর্থাংশ স্বত্ব রহিয়াছে, তাহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৮ (৭) ধারা মতে সরকারের আয়ত্তাধীনে আসিল।

মহাজাতি সদন সম্পর্কে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এই সম্পত্তি সম্বন্ধে বিবেচনা ১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।' [সাপ্তাহিক দেশ : ২৭শে ডিসেম্বর : ১৯৪১ সাল]

'বিচার হইয়া গেল।' কিন্তু আসামী কোথায়? না, সে সম্বন্ধে কোন জবাব নেই।

কিন্তু জনসাধারণ সেকথা শুনবে কেন? তারা যে জবাব চায়! জানতে চায় যে, সুভাষ কোথায়?

১০ই নভেম্বর তারিখে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে সর্বপ্রথম প্রশ্ন তুললেন যুবরাজ দত্ত: সুভাষ কোথায়? আমরা মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে সুস্পষ্ট জবাব চাই।

জবাব দিলেন স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারি মিঃ কনর্যান স্মিথ: তিনি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে রোম অথবা বার্লিনে রয়েছেন।

প্রমাণ! প্রমাণ আছে কিছু তোমাদের কাছে?

হ্যাঁ, আছে।

দেখানো হল কতগুলি ইস্তাহার। সেই ইস্তাহার, যা সেদিন সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সুভাষের নির্দেশে।

হ্যাঁ, তাই। ঠিক দুদিন বাদেই সমর্থন জানাল এ্যাসোসিয়েটেড

প্রেস। খবর সত্যি। এ খবর আমরা শুনেছি বার্লিন, রোম এবং টোকিও রেডিও থেকে। রোম এবং টোকিও থেকে বলা হয়েছিল হিন্দুস্থানী ভাষায়।

স্রেফ বাজে কথা। প্রতিবাদ জানালেন বিলেতের 'নিউ স্টেটস্-ম্যান এণ্ড নেশন' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কিংসলী মার্টিন। আমি এসব বিশ্বাস করি নে।

মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন ভারত-সচিব মিঃ এমেরী। বোস কোথায় আছেন আমি জানি নে।

একই দিনে বার্লিন রেডিও থেকে বলা হল অন্য কথা। হ্যাঁ, বোস এখানেই রয়েছেন। সম্প্রতি একটা বোঝাপড়া হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমরা এখন পরস্পরের বন্ধু।

এতটুকুও আশ্বস্ত হতে পারল না জনসাধারণ। এ তো যুদ্ধের খবর! যুদ্ধের খবর মানেই তো মিথ্যের বেসাতি! এ কবির লড়াইকে যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

কিন্তু এটাই সত্যি। জোর গলায় জানাল বিলেতের এম্পায়ার নিউজ এজেন্সী, সুভাষ বোস বার্লিনে রয়েছেন। জার্মানরা তাঁকে আফগানিস্থান ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে রোমে নিয়ে যায়। সেখানকার বেতার-যন্ত্র যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বলে পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বার্লিনে। রোম রেডিও থেকে স্পষ্ট আমরা একথা শুনেছি।

তাই বুঝি! প্রশ্ন তুলল বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহ, রোমের বেতার-যন্ত্র যথেষ্ট শক্তিশালী না হলে তোমরা সেকথা স্পষ্ট শুনলে কি করে?

এবার রঙ্গমঞ্চে হাজির হলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্। স্বনাম-খ্যাত পুরুষ। বিশেষ করে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এত ভাল ভাল কথা বলতে সত্যিই সেদিন তাঁর কোন জুড়ি ছিল না সারা ইংল্যাণ্ডে। তবে কাজে নয়, কথায়। তাই ঠাট্টা করে অনেকেই তাঁকে বলতেন,—'বিলিতি জওহরলাল।'

ক্রীপস্-এর বক্তব্য ঃ সুভাষ বোস বার্লিনেই রয়েছেন। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ।

ততক্ষণে বিলেতের সবগুলি পত্র-পত্রিকা একসঙ্গে রব তুলেছে— কুইস্লিং! কুইস্লিং! কুইস্লিং! সুভাষ বোস ভারতের পয়লা নম্বর কুইস্লিং!

তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করলেন সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঃ 'কে বলে সুভাষ কুইস্লিং? গ্যারিবল্ডি, সান ইয়াত-সেন, ডি ভ্যালেরা প্রমুখ স্বাধীনতার বীর যোদ্ধারা সবাই তাঁদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়েছিলেন বলে জানি। তাঁরা কি কুইস্লিং? সম্প্রতি ফ্রান্সের দ্য গল তোমাদের দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলে শুনেছি। তাঁর উদ্দেশ্য নাকি মুক্তিফৌজ গঠন করে ফ্রান্সকে মুক্ত করা। কই, তাঁকে তো তোমরা কুইস্লিং বলছ না? বরং তোমরা সবাই দেখছি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ! তাহলে সুভাষের বেলায় তার ব্যতিক্রম কেন? স্বার্থে আঘাত লেগেছে বলেই কি?'

ঠিক তাই মল্লিকা। এটাই সংসারের নিয়ম। যতক্ষণ তোমার দ্বারা আমার স্বার্থসিদ্ধি হবে, ততক্ষণ আমার কাছে তুমি খুবই ভাল লোক। একটু এদিক-ওদিক হলেই মুশ্‌কিল। তখন আমার একমাত্র কাজ হবে, নানাবিধ প্রচারের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তোমার চরিত্র হনন করে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

যেমন করা হয়েছিল বাংলার মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের বেলায়। 'Give the dog a bad name to hang him.' এ তো আমাদের নিজের চোখেই দেখা।

সুতরাং সুভাষের সেদিনের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে বিপন্ন ইংরেজ যে তাঁকে কুইস্লিং আখ্যা দেবে, তাতে আর বিচিত্র কি! বরং তাই তো স্বাভাবিক। 'সুভাষ ইংরেজের পয়লা নম্বর শত্রু'—এই তো তাঁর সবচাইতে বড় গৌরব।

সুভাষ কুইস্‌লিং। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সঙ্গে কোন-রকম সহযোগিতা করতে তিনি প্রস্তুত নন।

কিন্তু কি হয়েছিল জন এমেরীর বেলায় ?

জন এমেরীকে চিনতে তোমার খুব কষ্ট হবে না, মল্লিকা।

দোর্দণ্ড-প্রতাপ মিঃ এমেরী তখন আমাদের ভারত-সচিব। পদমর্যাদার দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পরেই তাঁর স্থান। জন এমেরী তাঁরই ছেলে। যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন বার্লিন রেডিও থেকে।

তাঁকেও কি বিশ্ব-সমক্ষে এভাবে হেয় করা হয়েছিল কুইস্‌লিং বলে ?

না, হয়নি। যুদ্ধ শেষে অনেকের মতো তাঁরও বিচার হয়েছিল। সাজাও হয়েছিল। কিন্তু কুইস্‌লিং! না, ইংরেজ অত বোকা নয়। 'Divide and Rule' কোথায়, কিভাবে প্রযোজ্য, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ তা ভাল করেই জানে।

জনসাধারণ আরও বিভ্রান্ত। এসব একঘেয়ে, অসংলগ্ন, পরস্পর-বিরোধী অপপ্রচারে আর তারা কান দিতে রাজী নয়।

তাদের একমাত্র প্রশ্ন—সুভাষ কোথায় ? তিনি বেঁচে আছেন কি নেই ?

বেঁচে থাকলে এ সময়ে তিনি নীরব কেন ?

স্বাধীনতাই যাঁর একমাত্র স্বপ্ন, এ সময়ে তাঁর চুপ করে থাকার কথা নয়। তাহলে কেন তাঁর এই নিরুত্তাপ শীতলতা ? কি ব্যাপার ? কোথায় এই রহস্যের উৎস ?

কোথায় এই রহস্যের উৎস ?

একই প্রশ্ন তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে বার্লিন প্রবাসী ভারতীয়দের মনে।

রহস্যের কারণ ছোট্ট একটি চিঠি। চিঠি দিয়ে কে যেন একজন অচেনা ভদ্রলোক চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের সবাইকে। নাম তাঁর—'সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা।'

কে এই সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা? কি পরিচয় তাঁর? সবার ঠিকানাই বা তিনি পেলেন কি করে?

পথে-ঘাটে দেখা হলে সেই একই কথা। কে ইনি? আপনি কিছু শুনেছেন কি? কি ব্যাপার?

আমারও জিজ্ঞাস্য তাই। কে এই অচেনা ভদ্রলোক? নাম শুনে ইতালিয়ান বলে মনে হয়। কিন্তু এভাবে ওঁর সবাইকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ কি?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অসংখ্য প্রশ্ন।

চিঠি এসেছে ৬নং সোফিয়েন ট্রস-এ অবস্থিত প্রাক্তন ব্রিটিশ রাজদূত ভবন থেকে। এর মানে কি? ব্যাপারটা আগাগোড়াই কেমন যেন রহস্যময়!

যথাসময়ে সবাই গিয়ে হাজির হলেন নির্দিষ্ট স্থানে। চোখে-মুখে তাঁদের অধীর কৌতূহল।

বিশিষ্ট জার্মানদের মধ্যেও এসেছেন কেউ কেউ। তাঁরাও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত।

কিন্তু সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা কোথায়? কোথায় সেই রহস্যময় পুরুষ?

সহসা কি দেখে বিস্ময়ে ছিটকে পড়লেন প্রবাসী ভারতীয়গণ।

কে? কে? কে এই সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা?

কে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের চোখের সামনে?

এ কি দিবাস্বপ্ন, না কি অসুস্থ চিত্তের মায়া-বিভ্রম?

আবার তাকালেন পরিপূর্ণভাবে।

না, ভুল নয়। এত কাছে থেকে নিজের লোককে চিনতে কেউ ভুল করে না।

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দীপ্ত ভঙ্গী, কোথাও এতটুকু অমিল নেই। কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। কোথাও কুয়াশার জাল নেই।

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একক প্রতিনিধি সুভাষ ছাড়া উনি আর কেউ নন।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল?

যুদ্ধের আগুনে গোটা ইয়োরোপ এখন জ্বলছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে সমস্ত ব্রিটিশ শক্তিকে পরাভূত করে কি করে তাঁর পক্ষে এ সময়ে বার্লিনে আসা সম্ভব হল? এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

সত্যিই বিশ্বাস করা শক্ত, মল্লিকা। কারণ, কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। সুভাষকেও তার জন্য কম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি দিনের পর দিন।

কাবুল থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮ই মার্চ, ১৯৪১ সালে। সঙ্গে ইতালিয়ান পাশপোর্ট। নাম—'সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা।'

কিন্তু কেন? এত নাম থাকতে হঠাৎ সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা নামটা পছন্দ করা হল কেন?

এটা কি কোন কল্পিত নাম? না কি এই নামে সত্যিই সেদিন কেউ ছিলেন ইতালিয়ান দূতাবাসে?

হ্যাঁ, ছিলেন। বলেছেন জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের তখনকার সময়ের দায়িত্বশীল কর্মী ডঃ আলেকজান্দার ওয়র্থ। সেদিন সত্যিই এই নামে একটি কুটনৈতিক পর্যায়ের ওয়্যারলেশ অপারেটারের পদ খালি ছিল ইতালিয়ান দূতাবাসে। তারপর যা হবার তাই হল। শেষপর্যন্ত সেই কুটনৈতিক পর্যায়ের ওয়্যারলেশ অপারেটার সাজতে হল সুভাষকেই।

'At the Italian Legation in Kabul there happened to be a vacant position for an official wireless

operator with diplomatic status. This position including a diplomatic passport in the name of Orlando Mazzota was taken over by Netaji.'

[Netaji in Germany : Alexander Werth : P.—12]

ফল কিন্তু ভালই হয়েছিল, মল্লিকা। সাধারণ যাত্রীর পক্ষে ভিন্ন রাষ্ট্রে যেতে হলে সেক্ষেত্রে তল্লাশীর প্রশ্ন আসবেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বেলায় সাতখুন মাপ। সুতরাং সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত।

হিন্দুকুশের উঁচু-নিচু গিরিপথ, তাশকুরগানের গিরিমালা, আফগান-প্রান্তরের অসংখ্য হিমশীতল মৃত নগরী, পুণ্যতীর্থ মার্জার-ই শরীফ, ভয়াবহ জঙ্গলে ঘেরা বিষাদময় অক্সাস ও পাটাকেসরের জঘন্য পারঘাট অতিক্রম করে অবশেষে সমরখন্দ।

২০শে মার্চ টারমিজ। টারমিজ থেকে ট্রেনে মস্কো। সঙ্গে সেই ডাঃ ওয়েলগার, যিনি সুভাষের সহযাত্রী হয়ে একই সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন কাবুল থেকে।

রাশিয়া। বিপ্লবের পীঠস্থান রাশিয়া।

প্রথম থেকেই সুভাষের লক্ষ্য ছিল এই রাশিয়া।

যুদ্ধের আগে এমন বহুবারই তাঁকে বলতে শোনা গেছে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে একমাত্র রাশিয়ার কাছ থেকেই তা আশা করা সম্ভব। কারণ, সারা পৃথিবীতে রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যাদের শোষিত ও নির্যাতিতের প্রতি সহানুভূতি আছে।

কার্যত কিন্তু তা আর সম্ভব হল না, মল্লিকা। কারণ, ইয়োরোপের তখনকার সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

একদিকে রাশিয়া তখন জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ, অন্যদিকে ব্রিটিশও পিছিয়ে নেই।

মস্কোর ব্রিটিশ রাজদূত 'বিলিতি জওহরলাল' স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ইতিমধ্যেই তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন ভেতরে ভেতরে। জার্মানীকে তোমরা বিশ্বাস করো না। একদিন তোমরাই যে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবে না, তা কে বলতে পারে! সুতরাং খুব সাবধান! কথাটা ভেবে দেখো একবার!

একদিকে জার্মানী, অন্যদিকে ব্রিটিশ। এ অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেই বা রাশিয়ার পক্ষে ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বোসকে সহায়তা করার মতো সাধ্য কোথায়? জেনে-শুনে এতবড় ঝুঁকি তাঁরা নেবেনই বা কেন?

তবে সরকারীভাবে কিছু না করলেও সুভাষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কিন্তু ছিল খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ। তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তাঁদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। প্রত্যক্ষভাবে এর চাইতে বেশি কিছু করা সত্যিই সেদিন সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে।

কিন্তু পরোক্ষভাবে? পরোক্ষভাবে সেদিন যেটুকু তাঁরা করেছিলেন, তার মূল্য কিন্তু মোটেই কম নয়, মল্লিকা।

তাঁদের সহযোগিতা না পেলে সুভাষের পক্ষে বার্লিন যাওয়া সম্ভব হল কি করে? সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টার পরিচয় তো তাঁদের অজানা ছিল না!

মস্কোর জার্মান দূতাবাসের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা সেদিন সুভাষের ব্যাপারে রাশিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে বার্লিনে কি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, শোন:

'In Moscow no official cognizance had been taken of his presence, but the Russians had done everything they could to make his stay there a pleasant one. Revolution in India fitted their plans excellently. [An extract from Nachrichtendieust i. e. the German Military Intelligence Service for East in the charge

of Paul Leverkuehn : Netaji in Germany : N. G. Ganpuley : P.—181]

মস্কো থাকতেই সুভাষ দেখা করলেন ওখানকার জার্মান রাষ্ট্রদূত Count Vou Derschulenburg-এর সঙ্গে।

এগিয়ে যাওয়াই বিপ্লবের ধর্ম। চলার পথে রাশিয়াকে পাওয়া গেল না, তা বলে পিছিয়ে গেলে তো আর চলবে না! দেখা যাক, এবার বার্লিনে গিয়ে কিছু হয় কিনা!

মস্কো থেকে আকাশপথে বার্লিন অভিমুখে।

বার্লিন সুভাষের কাছে নতুন কিছু নয়। হিটলার, গোয়েরিং প্রমুখ নাৎসী প্রধানগণও তাঁর অপরিচিত নন। এ পরিচয় ঘটেছিল নাৎসী শাসনের প্রথম দিকে। সুভাষ তখন ইয়োরোপে নির্বাসিত।

কিন্তু কেন? সুভাষ কি নাৎসী সমর্থক?

না, কোনদিনই না।

তাহলে সুভাষ কেন সেদিন পরিচয় করেছিলেন হিটলার, গোয়েরিং প্রমুখ নাৎসী নায়কদের সঙ্গে?

কারণ, সুভাষের দূরদর্শিতা। সুভাষ জানতেন যে, আজ হোক বা কাল হোক, যুদ্ধ অনিবার্য। ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা হবে একটা চমৎকার সুযোগ। সে সুযোগটাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। সর্বস্ব পণ করে সেদিন আঘাত করতে হবে পররাজ্যগ্রাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। এ ব্যাপারে ব্রিটিশের শত্রুপক্ষই হবে আমাদের সবচাইতে বড় মিত্র। আর যাই হোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভুলের পুনরাবৃত্তি কিছুতেই আর সেদিন ঘটতে দেওয়া হবে না।

এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের তফাৎ, মল্লিকা।

গান্ধীজীর বক্তব্য, হিংসা বা দ্বেষ নয়, শুধু ভালবাসা দিয়েই ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তন করে আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।

ঠিক তাঁর বিপরীত হলেন সুভাষ। তাঁর বক্তব্য, সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার, মনসা পুজোয় কোনদিনও সাপ মরে না।

গান্ধীজীর লক্ষ্য, আপস-আলোচনার মাধ্যমে সাবধানে পা ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া।

সুভাষের মতে, এটা কোন যুক্তিই নয়। ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। দর-কষাকষির মাধ্যমেও নয়। স্বাধীনতার মধ্যে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই। চরম মূল্য দিয়েই তা অর্জন করতে হয়। সুতরাং চাই সংগ্রাম। অহেতুক কালহরণ না করে এখনই আমাদের সংগ্রামের পথে পা বাড়ানো উচিত।

গান্ধীজীর প্রথম ও শেষ কথা, অহিংসা। স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সে স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে একমাত্র অহিংসার মাধ্যমে। অন্যথায় সে স্বাধীনতা তাঁর কাছে অর্থহীন।

সুভাষের প্রধান লক্ষ্য, স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি সব কিছুই করতে প্রস্তুত। মোদ্দা কথা, ছলে-বলে-কৌশলে, যেভাবেই হোক না কেন, স্বাধীনতা চাই-ই!

সুভাষের এই মনোভাব কারোরই অজানা ছিল না। গান্ধীজীও জানতেন। জানতেন হিটলার, গোয়েরিং প্রমুখ নাৎসী নেতৃবৃন্দও। সেদিনই তিনি হিটলার, গোয়েরিং প্রমুখ সবাইকে প্রশ্ন করেছিলেন খোলাখুলিভাবে। কবে তোমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে, বলো?

স্পষ্ট জবাব মেলেনি। যা মিলেছিল তা সবই অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা। অর্থাৎ—আমরা ওসব এখন ভাবছি নে।

আমরা ভেবেছি। সাফ জবাব দিয়েছিলেন সুভাষ। ব্রিটেন আমাদের চিরশত্রু। তোমরা কিছু কর বা না কর, আমরা লড়াই করবই!

'Britain is our traditional enemy. We will fight her, whether you support or not.'

'সুভাষ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তাঁর কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার

প্রশ্নটাই ছিল সবচাইতে বড়। কোন্ পন্থায়, কোন্ নীতি অবলম্বন করে সে স্বাধীনতা আসবে, তা নিয়ে কোনরকম গোঁড়ামি তাঁর ছিল না।'

বলেছেন ইহুদী লেখক Otto Zarek. ১৯৩৫ সালের কথা। সুভাষ তখন ভিয়েনাতে। তখনই পরিচয় গড়ে উঠেছিল দুজনের মধ্যে। অটো জারেকের ভাষায়ঃ

'ইয়োরোপ সম্বন্ধে সুভাষের যে জ্ঞান ছিল, কোন সত্যিকারের ইয়োরোপীয়ানের পক্ষেও তার চাইতে বেশি কিছু জানা সম্ভব ছিল না।

দোষ ছিল এক জায়গায়। ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন তিনি। '...his implacable hatred of the British,'—মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতাম এই নিয়ে। শুনে হাসতেন শুধু।

হঠাৎ একদিন তিনি কাউকে কিছু না বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভিয়েনা থেকে। খুবই অবাক হয়েছিলাম সেদিন। অনেক ভেবেছি, কিন্তু কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি।

ফিরে এলেন প্রায় সপ্তাহ দুই বাদে। তেমনি হাস্যোজ্জ্বল। তেমনিই আনন্দময়।'

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন সুভাষ? কার কাছে?

অটো জারেকের মুখ থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন, মল্লিকাঃ

'দেখা হতেই সেদিন তিনি বললেনঃ

কোথায় ছিলাম—জানো? বার্লিন। হিটলারের সঙ্গে দেখা করে এলাম।

খবরের মতো খবর বটে। ভেবেছিলাম, ভারতের যুব-সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে জার্মানী এবং নাৎসীদের সম্বন্ধে তিনি খুব খারাপ কিছু বলবেন, কিন্তু আমারই ভুল হয়েছিল। জার্মান রাইখের সব কিছুই যেন তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছিল। হিটলার যে জার্মানীর পুনরুত্থানের জন্য কিভাবে কাজ করে চলেছেন, তাই ছিল তাঁর কাছে সবচাইতে বড় বিস্ময়।

সব শুনে আমি আর প্রশ্ন না করে পারলাম না—'আপনি কোন্ জাতীয় পুনরুত্থানের কথা বলছেন'?

যুদ্ধ! ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ!

এই একটি মাত্র ইচ্ছা ছাড়া তাঁর যেন আর দ্বিতীয় কোন ইচ্ছা ছিল না। আর আশ্চর্য, ইনি এমনই একজন মানুষ যে, যা চাইতেন তাই যেন পেয়ে যেতেন।

বস্তুত এই একটি মাত্র ব্যাপারই তাঁকে নাৎসীদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন করে তুলেছিল। কারণ, দুজনেরই লক্ষ্য ছিল এক—ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ। হয়তো এই কারণেই জার্মানদের ইহুদী নির্যাতন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য তিনি করেননি।

আমি তাই প্রশ্ন করলাম—'আপনি তো আপনার জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আপনি কি করে এমন একটি জাতির সঙ্গে একমত হতে পারেন, যারা অন্য জাতিকে নির্যাতন করে চলেছে'?

আমাদের দীর্ঘ আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে এই প্রথম তিনি যেন আমার প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। অবশেষে বললেন ঃ

Any how, Hitler is our natural ally. And he knows it. I put before him detailed plans for an agreement between Germany and the Indian Free State which is to come into force when we gain our freedom. He is studying the project. We shall get his support when we revolt.' [German Odyssey : Otto Zarek.]

[যাই হোক হিটলার হচ্ছেন আমাদের স্বাভাবিক বন্ধু, এবং তিনিও তা জানেন। জার্মানী এবং ভবিষ্যত স্বাধীন ভারতের মধ্যে কিভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করা যায়, সে সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত

পরিকল্পনা আমি তাঁর কাছে উপস্থিত করেছি। সব কিছু তিনি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখছেন। আমরা যখন বিদ্রোহ করব, তখন তাঁর সমর্থন আমরা ঠিকই পাব।]

শুধু অটো জারেক নন, বিস্ময় সেদিন Mrs. Kitty Kurti-রও কম ছিল না।

নির্বাসিত জীবনে সেদিন যাঁরা সুভাষকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন, মিসেস কিট্টি কুর্তী তাঁদেরই একজন।

অটো জারেকের প্রশ্নের জবাব না দিলেও মিসেস কিট্টি কুর্তীকে কিন্তু সুভাষ তাঁর বক্তব্য খুলেই বলেছিলেন, মল্লিকা।

সেদিন সুভাষ মিসেস কিট্টি কুর্তীর বাড়িতে আমন্ত্রিত। সুভাষ ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন মিসেস কিট্টি কুর্তী:

'সূর্যালোকে আজকের আবহাওয়া বেশ মৃদু ছিল। মিঃ বোস কি প্রাতঃভ্রমণের সময় পেয়েছিলেন আজ?

না, মিসেস কুর্তী। আজ আমার মিঃ গোয়েরিং-এর সঙ্গে দেখা করার সময় নির্দিষ্ট ছিল। তাঁর অফিস থেকেই আমি সোজা এখানে চলে এসেছি।

খবর শুনে আমি ও আমার স্বামী বিস্মিত। নাৎসী জার্মানীর ঐ পাগলা ষাঁড়টার সঙ্গে মিঃ বোসের কি প্রয়োজন! কোথাও যে এতটুকু মিল নেই দুজনের চরিত্রে!...আমার নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি, কিন্তু তাই বলে নাৎসীদের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগের কথা আমি ভাবতেই পারি নে। ওরা ছোঁয়াচে মহামারী রোগের মতোই ঘৃণ্য জীব। আমি প্রশ্ন করলাম: আপনার দেশ উদ্ধারের জন্য আপনি কি পৃথিবীতে শয়তানের প্রতিনিধির সঙ্গেও হাত মেলাতে পারেন? তিনি উত্তর দিলেন:

It is dreadful, but it must be done. It is our only way out. India must gain her independence, cost what it may.

'Have you an idea, Mrs. Kurti, of the despair, the misery, the humiliation of India? Can you imagine her suffering and indignation? British imperialism there can be just as intolerable as your Nazism here, I assure you. But it is perhaps, difficult for you to understand it all.' [Subha's as I knew him : Kitty Kurti : P.—11]

[এটা ভীতিজনক ঠিকই, তবু একাজ আমাদের করতেই হবে। এটাই আমাদের একমাত্র পথ। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, স্বাধীনতা আমাদের পেতেই হবে। ভারতের নৈরাশ্য, দুঃখ ও লাঞ্ছনা সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণা আছে কি মিসেস কুর্তী? আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, ভারতবাসী কি যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছে? অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে কি বিক্ষুব্ধ অবস্থা তাদের?

সব অবস্থা হয়তো আপনাদের পক্ষে ঠিক বোঝা সম্ভব নয়। তবে বিশ্বাস করুন, নাৎসীবাদ আপনাদের কাছে যতখানি অসহ্য হয়ে উঠেছে, ভারতবাসীর কাছেও ঠিক ততখানিই অসহ্য হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।]

হ্যাঁ, এই হল সুভাষ। কোথাও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। কোনরকম কুয়াশার আবরণও নেই। তার এককথা,—যেভাবে হোক, যে কোন পন্থায় হোক, আগে নিজের দেশের স্বাধীনতা, তারপর পরের ভাবনা। দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে পৃথিবীর জন্য চোখের জল ফেলে বিশ্ব-মানব সাজতে তিনি প্রস্তুত নন।

এ হল ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সালের ঘটনা। তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি।

তারপর ছ'বছর কেটে গেছে। দীর্ঘ ছ'বছর বাদে আবার সুভাষ এসে পা দিলেন সেই বার্লিনের মাটিতে।

তবু সেদিনের সেই বার্লিন, আর আজকের বার্লিন এক নয়। ক্ষমতাদীপ্ত বার্লিন আজ পৃথিবীর বিস্ময়।

রাশিয়ায় কিছু হল না। দেখা যাক, এবার এখানে থেকে কিছু করা যায় কিনা ?

৯ই এপ্রিল সুভাষ সহযোগিতার শর্ত জানিয়ে সর্বপ্রথম একটি গোপন স্মারকলিপি পাঠিয়ে দিলেন জার্মান সরকারের কাছে।

সেই দীর্ঘ স্মারকলিপি থেকে কিছু কিছু অংশ আমি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'…ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শুধুমাত্র ভারতের মুক্তির পথেই নয়, পৃথিবীর মানব সমাজের অগ্রগতির পক্ষে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক।… ভারতের প্রতিটি মানুষ আজ কামনা করে যে, এ যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরদিনের মতো ধ্বংস হোক। কারণ, ব্রিটিশ ধ্বংস হলেই ভারত তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে।

ভারতবাসী ব্রিটিশকে তাদের শত্রু বলে মনে করে। সুতরাং তাদের পরাজয়ের ব্যাপারে স্বভাবতই তারা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে।…সেই সহযোগিতা পেতে হলে অক্ষশক্তি জয়ী হলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, সর্বাগ্রে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

ইয়োরোপে একটি স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করতে হবে।… প্রতিটি মিত্ররাষ্ট্রে স্বাধীন ভারত সরকারের কূটনৈতিক দূতাবাস স্থাপন করতে হবে।…বিদ্রোহে সহায়তার জন্য ভারতকে আফগানিস্থানের পথে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাতে হবে।'…

এবার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদটি লক্ষ্য কর, মল্লিকা ঃ

'…ব্রিটিশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি দূর করতে হলে বর্তমানে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যে বন্ধুত্বপূর্ণ স্থিতাবস্থা রয়েছে, তা রক্ষা করতে হবে।' [মুক্তি সংগ্রাম ঃ সুভাষচন্দ্র বসু]

পটসডাম প্লাটজ-এর হোটেল এসপ্লানেডে বসে শুরু হল অন্তহীন প্রতীক্ষা। স্মারকলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কি জবাব আসে দেখা যাক!

কোথায় জবাব, কোথায় কি? কোন সাড়া-শব্দ নেই পররাষ্ট্র দপ্তরের। এমনি করে দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তবু এতটুকু আশার আলো দেখা গেল না কোনদিক থেকে।

কেন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই অকারণ নিঃশব্দতা? এর কোন কারণ ছিল কি?

হ্যাঁ, ছিল। জার্মানী তখন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। তার সময় কোথায়?

'...at that time the leading lights of German politics must have been so busy that they had no time to consider in detail the case of a man, even of Bose's political status, who had appeared suddenly on the scene, with his uncommon demands.'

[Netaji in Germany : N. G. Ganpuley : P.—31]

তাছাড়া পদে পদে ভয়। পদে পদে সংশয়। সুভাষ বোস যে ব্রিটিশের গুপ্তচর নন, তা কে বলতে পারে! সুতরাং আগে থেকেই সব কিছু ভাল করে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু না, তাই বা কি করে সম্ভব? কলকাতার জার্মান কনসালের মুখ থেকে যে শোনা গিয়েছিল ঠিক তার বিপরীত কথা! কাবুলের জার্মান কনসালের বক্তব্যও তাই। সুতরাং সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

'German Foreign Office was very well-informed about Bose through its pre-war Consul General in

Calcutta and also from its representative in Kabul. The Foreign Office had all the information about his great past and knew from their reports that, as an active fighter against British imperialism Bose could be trusted with any help that the Government thought fit to extend to him.' [Ibid : P.—29]

সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। সুভাষ বসুর অতীত জীবনই তার সবচাইতে বড় সাক্ষী। সেদিক থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই।

ভয়ের কারণ রয়েছে অন্যত্র। লোকটা যেমন জেদী, তেমনি স্পষ্টবক্তা। এ হেন লোককে কোনরকম প্রতিশ্রুতি দিতে হলে সব কিছু ভাল করে দেখা প্রয়োজন।

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। সুভাষকে জার্মানরা ভাল করেই চিনেছিল। চিনেছিল বছর কয়েক আগেই। সুভাষ তখন ভিয়েনাতে।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রত্নখনি।

অথচ সেই ভারতবর্ষ আজ কিনা স্বাধীনতা চায়! কি অন্যায় কথা! ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয়ে গেলে আর রইল কি!

তাই পৃথিবীর চোখে ভারতবাসীকে হেয় করার জন্য সুসভ্য ব্রিটিশ সরকারের কতরকম অপচেষ্টা!

উদ্দেশ্য মহৎ। বিশ্ববাসী তাকিয়ে দেখুক যে, ভারতবাসীর আসল পরিচয় কি! তারপর তারাই বলুক যে, এহেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার কোন মানে হয় কিনা!

ছবির পর ছবি। 'ইণ্ডিয়া স্পীকস', 'বেঙ্গলী' এমনি কত সব ছায়াছবি।

উদ্দেশ্য সেই একই। অর্থাৎ, ভারতবাসীরা যে মানুষ হিসেবে কত নিম্নস্তরের, তা দেখে নাও। তারপর তোমরাই বিচার কর।

সবশেষে এল 'Everybody loves music.'

এ ছবিতে যা দেখানো হল তা আরো কুৎসিত। একটি দৃশ্যে দেখা গেল, স্বয়ং গান্ধীজী নেংটি পরে বল-ড্যান্স করছেন একটি ইংরেজ মহিলার কণ্ঠলগ্ন হয়ে।

গান্ধীবাদী নেতা বলে পরিচিত কংগ্রেসের অনেকেই সেদিন ইয়োরোপে ছিলেন। কিন্তু এ ধরণের কুৎসিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ-ধ্বনিও শোনা গেল না কারো মুখ থেকে।

একমাত্র প্রতিবাদ করলেন সুভাষ। খবর শুনে সেই মুহূর্তেই তিনি Archbishop Cardinal Intizar-এর কাছে ছুটে গিয়ে গর্জে উঠলেন রুষ্ট বাঘের মতো।

এক্ষুণি এ ছবি বন্ধ করবেন কিনা আমি জানতে চাই!

ছবি বন্ধ হল। শুধু ভিয়েনাতে নয়, বন্ধ হল গোটা জার্মানী থেকেই।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৪ সালে।

সুভাষ তখন মিউনিকে। ওখানকার নাৎসী পার্টি সিদ্ধান্ত নিল, সুভাষকে তারা পৌর-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে।

গোল বাধল ঠিক তার আগের দিন। হঠাৎ সেদিন হিটলার এক বেতার-বক্তৃতা দিয়ে বসলেন ব্রিটিশের ভারত-শাসনের সুখ্যাতি করে।

ব্যস, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান বাতিল। 'Hitler is at liberty to lick British boots (হিটলার ব্রিটিশের জুতো চাটতে পারে), তার দেওয়া কোনরকম সংবর্ধনা গ্রহণ করতে আমি রাজী নই।'

জবাব শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা ইয়োরোপ। জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা মহামহিম হিটলার সম্বন্ধে এমন উক্তি করার মতো দুঃসাহস যে পৃথিবীতে কারো থাকতে পারে, সেকথা বুঝি তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আশ্চর্য, দুঃসাহসী এই মানুষটিকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে সেদিন কিন্তু আর এতটুকুও দেরি করেননি অ্যাডলফ্ হিটলার।

পরদিনই তিনি ভুল স্বীকার করে তাঁর বেতার-বক্তৃতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বাধ্য ছেলের মতো।

সেই স্পষ্টবক্তা সুভাষ বোস। তাঁকে কি কোনদিন ভুলতে পারে জার্মানী? না কি ভোলা সম্ভব? সুতরাং এহেন মানুষকে কোনরকম কথা দিতে হলে একটু ভেবে-চিন্তে দিতে হবে বৈকি!

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। তাসের ঘরের মতো একটার পর একটা শহর ভেঙে পড়ছে জার্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণের কাছে।

গোয়েরিং-এর বোমার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ইংল্যাণ্ড তখনো কোনরকমে টিকে আছে টিম টিম করে।

তবে সবচাইতে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে লণ্ডনের। দেখে আর তাকে চেনার উপায় নেই। অধিকাংশ ঘর-বাড়িই ধুলোয় মিশে গেছে হিটলারী বোমার ঘায়ে। এমন কি, বাকিংহাম প্যালেসও রেহাই পায়নি।

পরিস্থিতি আরো ঘোরাল করে তুলেছে জার্মানীর খুদে পকেট ব্যাটলশিপগুলি। তাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণের ফলে ইতিমধ্যে ব্রিটিশের কত জাহাজ যে সাগরের তলায় তলিয়ে গেছে, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই।

একদিকে ইংল্যাণ্ডের বিরাট রাজকীয় নৌ-বহর, অন্যদিকে জার্মানীর তিনটি মাত্র পকেট ব্যাটলশিপ। গ্রাফ স্পি, ডয়েস্‌ল্যাণ্ড আর অ্যাডমিরাল শিয়ার।

ছোট্ট জাহাজ। খুবই ছোট্ট। কিন্তু কি প্রচণ্ড তার শক্তি! একবার কামানের পাল্লার মধ্যে পেলে আর রক্ষা নেই। যত বড় ভারি ব্যাটলশিপ, ডেস্ট্রয়ার বা ক্রুজারই হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্রাম! তারপরই দে ছুট! এমন তীব্র গতিসম্পন্ন যে, কার সাধ্য তখন তাদের নাগাল পায়!

আর নাগাল পেলেই বা কি! ভোল পাল্টাতে কতক্ষণ! একটু আগে ছিল একটা চিমনি, পরমুহূর্তেই হয়তো দেখা গেল চিমনির সংখ্যা মোট তিনটে। গায়ের রঙও আলাদা। আর হরেক রকম নাম-ধাম বা নিশানের তো কোন প্রশ্নই নেই।

এই করে কতবার যে তারা ব্রিটিশের বিরাট কনভয়ের নাকের ডগার ওপর দিয়ে দিব্যি ভালমানুষটি সেজে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, তার বোধহয় কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যেন কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ আর কি!

সেই সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে মারাত্মক ইউবোট-গুলি। নৌ-শক্তিতে ব্রিটিশ নাকি অপরাজেয়। দেখা যাক, তাদের এই বড়াই আর কতদিন থাকে!

এ ব্যাপারে খোলাখুলি ভাবেই হিটলার তাঁর চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডকে।

মনে রেখো, আমাদের ইউবোটগুলি ঘুমিয়ে নেই। আর বিমান-বহর এবং সেনা বাহিনীও চুপচাপ বসে নেই। যেভাবেই হোক না কেন, চূড়ান্ত বোঝাপড়া করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর।

'Our U-boat-war will begin at sea, and they will notice that we have not been sleeping. And the Air Force will play its part and the entire armed forces will force the decision by hook or by crook.'

ইতিমধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায়। ফ্রান্স আক্রান্ত হয়েছিল ১০ই মে, ১৯৪০ সালে। সেদিনই পদ-ত্যাগ করেছেন সেই ছাতা-বিলাসী প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলীন। শান্তিপ্রিয় লোক তিনি। এসব অশান্তি সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

পরিবর্তে এসেছেন উইনস্টন চার্চিল। ঝানু রক্ষণশীল। ব্রিটিশকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

এহেন চার্চিলও কিন্তু পারেননি নিজেদের এই বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির কথা অস্বীকার করতে। নিজের মুখেই সেকথা তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল পার্লিয়ামেণ্টের এক গোপন অধিবেশনে। হ্যাঁ, খুবই ক্ষতি হয়েছিল আমাদের। এক বছরে মোট ৪৬,০০,০০০ টনের জাহাজ আমরা হারিয়েছি।

'Our losses and those of our Allies by sinking in the last few months have been heavy. In the last 12 months they amount to 46,00,000 tons.

The enemy continually varies his form of attack in order to meet our counter measures.'

[Secret Session speeches : Churchill : P.—43]

১০ই মে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন হিটলারের ডেপুটি রুডলফ্ হেস্।

হঠাৎ তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে ছোট্ট একটি বিমান নিয়ে অবতরণ করলেন স্কটল্যাণ্ডের ঈগলহ্যাম বিমান ঘাঁটিতে। তারপরই পুলিশের হাতে।

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল গোটা ইংল্যাণ্ডে। বলে কি! এই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে রুডলফ্ হেস্ এখানে এলেন কি করে! কি ব্যাপার!

রুডলফ্ হেস্ নির্বিকার। আমি তোমাদের ডিউক অফ হ্যামিল্টনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি আমার পুরনো বন্ধু। বার্লিন অলিম্পিকের সময়েই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। তাঁকে একবার আসতে বলো আমার কাছে। বলো যে, জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছি।

ছুটে এলেন ডিউক অফ হ্যামিল্টন। কি ব্যাপার! কি বলতে চান তাঁকে রুডলফ্ হেস্?

আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

সন্ধি! নিজের কানকেই বুঝি বিশ্বাস করতে পারলেন না ডিউক অফ হ্যামিল্টন।

হ্যাঁ, সন্ধি। মোট তিনটি শর্ত। এক—আমাদের সমস্ত পুরনো উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে। দুই—তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পার, আমরা তোমাদের ভাল-মন্দ কোন ব্যাপারে থাকব না। তোমরাও ইয়োরোপের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে যেতে পারবে না। তিন—সন্ধির শর্ত আলোচিত হবে অন্য কারো সঙ্গে, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে নয়। ঐ গোঁয়ার গোবিন্দ লোকটাকে আমরা একদম সহ্য করতে পারি নে।

ডিউক অফ হ্যামিল্টন স্তম্ভিত। বলে কি! লোকটা কি সত্যিই সুস্থ, না কি মস্তিষ্কবিকৃত!

না, ঠিকই বলেছি আমি। অবশ্য আমার এখানে আসার খবর ফুয়েরার কিছুই জানেন না। তবে তার জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। তাঁকে বলে-কয়ে রাজী করানোর ভার আমার। এখন তোমরা রাজী আছ কিনা বলো?

রাজী হল না ইংল্যাণ্ড। হবার কথাও নয়। কারণ, এ শর্ত মেনে নেওয়া পরাজয়েরই নামান্তর মাত্র।

ওদিকে খবর শুনে হিটলার চটে লাল। এতবড় স্পর্ধা রুডলফ্ হেস্-এর! কার হুকুমে সে ইংল্যাণ্ডে গেছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে? কি অপমান! নাঃ! এর একটা বিহিত করতেই হবে। ঠিক আছে, ফিরে আসুক ও জার্মানীতে! এলেই ওকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

ফিরে আসা কিন্তু আর সম্ভব হয়নি, মল্লিকা। সেই থেকেই তিনি কারাগারে। তারপর ত্রিশ বছর কেটে গেছে। এখনো তাঁর কারাজীবন শেষ হয়নি। কোনদিন শেষ হবে কিনা কে জানে!

কিন্তু একটা প্রশ্ন, মল্লিকা। সত্যিই কি সেদিন তিনি স্বেচ্ছায় ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন? না কি যা কিছু করেছিলেন সবই হিটলারের

নির্দেশে ? নইলে ব্রিটিশের প্রতি হিটলারের প্রচ্ছন্ন মমত্ব বোধের কথা তো এখন আর কারোরই অজানা নয়! ডানকার্কের সেই ঘটনাই তো তার সবচাইতে বড় প্রমাণ।

'The Operation Dunkirk gives very clear evidence of Hitler's sympathies for Britain.

Between 29th May and 14th June 300.000 British troops were allowed to be embarked from Dunkirk because Hitler refused to allow the victorious German forces to mop up the routed Britains.'

[Netaji in Germany : N. G. Ganpuley : P.—50]

নইলে কিসের অভাব ছিল সেদিন জার্মানীর! কি তার ছিল না! হিটলারের যদি ব্রিটিশকে ধ্বংস করার এতটুকু ইচ্ছা থাকত, তাহলে একটি প্রাণীর পক্ষেও সেদিন ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া সম্ভব হত কি ?

'At that time Germany had a very strong Air Force, a well equipped submarine fleet and the German army was victoriously following the demoralised enemy at its heels.

If Hitler had wished it, not a single British soul would have ever reached England.

That was also the occasion when Germany could have invaded England ; but Hitler's decision was to the contrary.'

[Ibid : P.—30]

তাহলে কোথায় এই রহস্যের উৎস ? কি এর কারণ ? কেন সেদিন তিনি লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন ডানকার্ক থেকে ?

কারণ, প্রচ্ছন্ন স্বজাতি-প্রীতি। হিটলারের মতে,—জার্মানরাই হল পৃথিবীর সেরা আর্য জাতি। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশও

সেই একই রক্তের অধিকারী। সেই মহাশক্তিমান ব্রিটিশ নতজানু হয়ে তাঁর কাছে সন্ধি প্রার্থনা করুক, ইয়োরোপে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিক, মনের অতলে এমনি একটা গোপন ইচ্ছা তাঁর বরাবরই ছিল। তা বলে তাদের ধ্বংসের বিনিময়ে তিনি তা পেতে রাজী ছিলেন না কোনদিনও।

'The superiority of Nordic races was a mania with him, on account of that he was in favour of conserving this dominant Nordic power.'

[Ibid : P.—30]

গোল বাধাল ইতালীর ভাগ্য-নিয়ন্তা মুসোলিনী।

তুই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। হিটলার আর মুসোলিনী। যদিও শিক্ষা এবং চিন্তাধারার দিক থেকে মুসোলিনী ছিলেন অনেক বেশি উন্নত, তবু লক্ষ্য ছিল তুজনেরই এক। সেখানে তুজনের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই।

তবু হিটলার আর মুসোলিনী এক নন। মুসোলিনীর সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। ছিল না বলেই চলার পথে তাঁকে হোঁচট খেতে হয়েছে বার বার।

যেমন হোঁচট খেতে হয়েছে গ্রীসের বেলায়।

শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর।

হঠাৎ সেদিন মুসোলিনী বন্ধু হিটলারের অনুকরণ করে বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিলেন,—গ্রীস আমার চাই-ই! হিটলার যদি অসাধ্য সাধন করতে পারে তো আমিই বা পারব না কেন? দেখাই যাক না!

দেখা গেল দিন কয়েকের মধ্যেই। সেকি বেধড়ক পাল্‌টা-মার গ্রীক বাহিনীর! মার খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত তাঁর সেনা বাহিনীকে ঢুকে পড়তে হল অধিকৃত আলবেনিয়ার অভ্যন্তরে।

শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল সেই বন্ধু হিটলারের। এবারের মতো আমার মান বাঁচাও সখা! আর কক্ষণো এমন কাজ করব না।

মনে মনে হাসলেন হিটলার। শিক্ষা হল তো! এবার বুঝতে পেরেছ তো যে, তুমি আর আমি এক নই! যাক, ব্যবস্থা করছি। তবে একটু বুঝে-সুঝে চলতে চেষ্টা কর এবার থেকে।

এল জার্মান বাহিনী। ফলে, গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া দুই-ই গেল। যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধের অবসান হল ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ সালে। গ্রীক বাহিনী তাদের মূলভূমি ছেড়ে আশ্রয় নিল ক্রীট দ্বীপে।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্স্ থেকে দেড়শো মাইল দূরে এজেন সাগরের মোহনায় ক্রীট ছোট্ট একটি দ্বীপ। গ্রীস ছাড়া অন্যান্য মিত্র-রাষ্ট্রের সৈন্যরাও সেখানে ঘাঁটি আগলে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কারণ, দ্বীপ হিসেবে ক্রীট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীট হারানো মানে ভূমধ্য সাগরে নিজেদের আধিপত্য বেদখল হওয়া। সুতরাং যেভাবে হোক, ক্রীট রক্ষা করতে তারা বদ্ধপরিকর।

অবশ্য আশঙ্কার কোন কারণ নেই। ক্রীটের চারপাশেই সমুদ্র। এ অবস্থায় কোন কিছু করতে হলে উপযুক্ত নৌ-বহর থাকা দরকার। জার্মানীর তা নেই। সুতরাং তাদের দিক থেকে এ ধরণের ঝুঁকি নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু একি! সবগুলি বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন একসঙ্গে বেজে উঠল কেন এমন করে? কি ব্যাপার?

বিমান! বিমান! বিমান! একটি দুটি নয়, হাজার হাজার জার্মান বিমান। ক্রীটের আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে অসংখ্য বিমানের আবির্ভাবে।

ক্রীট দখল করতে গিয়ে হিটলার যে চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, যুদ্ধের ইতিহাসে সত্যিই তা অভূতপূর্ব, মল্লিকা।

তারিখটা ছিল ১৯শে মে। আকাশের পানে তাকিয়ে দ্বীপ-রক্ষী ব্রিটিশ ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের সৈন্যগণ সেদিন অবাক। বিমান থেকে

হাজার হাজার প্যারাসুট-সৈন্য ক্রীটের ওপর নেমে আসছে পাখির ঝাঁকের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল নিচের বিমান-ধ্বংসী কামানগুলি। আসুক না প্যারাসুট বাহিনী! কাউকে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। একটি প্রাণীকেও না।

কিন্তু একি! কোথায় শত্রুসৈন্য! এ যে সম আকারের রাশি রাশি রবারের পুতুল মাত্র! এভাবে রসিকতা করার কারণ কি!

কারণ যখন বোঝা গেল, তখন সব শেষ। সবার দৃষ্টি এদিকে আবদ্ধ রেখে ততক্ষণে দ্বীপের অপর প্রান্তে জার্মান বাহিনী নেমে পড়েছে দলে দলে। তারপর আর তাদের পায় কে! ফলে, ক্রীটও গেল।

আফ্রিকাতেও সেই একই অবস্থা। বন্ধুর মান রাখতে গিয়ে সেখানেও শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হল অগতির গতি সেই হিটলারকে।

শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের ৪ঠা আগস্ট।

হঠাৎ সেদিন ইতালিয়ান সেনাপতি গ্রাৎসিয়ানি আফ্রিকায় ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ঢুকে পড়লেন বিরাট এক সৈন্য বাহিনীকে নিয়ে। অধিকার করলেন সোল্লুম। ক'দিন যেতে না যেতেই ব্রিটিশ জেনারেল ওয়াভেলের কাছ থেকে বিরাট এক থাপ্পড় খেয়ে বিলকুল ঠাণ্ডা। তারপরই শোনা গেল সেই কাতর প্রার্থনা। আমাকে বাঁচাও সখা! আর কোনদিন তোমার অবাধ্য হব না!

হিটলারের নির্দেশে এবার এগিয়ে এলেন রোমেল। জার্মানীর সর্বকনিষ্ঠ সেনাপতি দুর্ধর্ষ রোমেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল মরুভূমির বুকে। লিবিয়া, বেনগাজী, ভার্না, তব্রুক পেরিয়ে দেখতে দেখতে রোমেল গিয়ে হাজির হলেন এল আলামিনে। সামনেই মিশরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া। হাত বাড়ালেই তার নাগাল পাওয়া যায়।

দৌড়! দৌড়! দৌড়!

তাড়া খেয়ে সেকি প্রাণপণ দৌড় তখন ব্রিটিশ বাহিনীর! যথা-সর্বস্ব যায় তো যাক, তবু ঐ 'ডেজার্ট-ফক্স' রোমেলের মুখোমুখি কিছুতেই নয়।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। ফলে, হাজার হাজার সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করতে হল রোমেলের হাতে। বেশির ভাগই ভারতীয় সৈন্য। যথাসময়ে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল ইতালীর বন্দী-নিবাসে। কিছু-সংখ্যক জার্মানীতে।

কাণ্ড দেখে হৈ-চৈ পড়ে গেল ইংল্যাণ্ডে। আবার সেই ডানকার্কের পুনরাবৃত্তি! কোথায় এর শেষ কে জানে! তবে ভেঙে পড়লে চলবে না। যে করে হোক, রোমেলকে রুখতেই হবে। নইলে মিশর বা ভারত, কিছুই রক্ষা করা যাবে না ওর হাত থেকে।

রোমেলের এই অবিশ্বাস্য অগ্রগতি দেখে বিস্ময় সেদিন হিটলারেরও কম ছিল না, মল্লিকা। কোথায় বেনগাজী আর কোথায় এল আলামিন! বিশ্বাস করাই যেন শক্ত!

অবশ্য সেভেন্থ প্যানৎসার বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে গত বছরই তিনি ফ্রান্সে বিদ্যুৎগতিতে অভিযান চালিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এবারের সাফল্য আগেকার সব কিছুকেই বুঝি ম্লান করে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসে একদিন হিটলারের শিবিরে ডাক পড়ল রোমেলের। বলো, কি চাই?

চাই সামান্য কিছু সমর-সম্ভার। চাই তিনশো বিমান। ব্যস, এটুকু পেলেই ওদের আমি পিষে মারতে পারব।

সমর্থন জানালেন কেমারসিং ও অ্যাডমিরাল রেডার। রোমেলকে এ পর্যন্ত যে সমর-সম্ভার দেওয়া হয়েছে তা খুবই নগণ্য। অথচ তাই দিয়ে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন আফ্রিকার ঐ মরুভূমির প্রান্তরে। তাঁকে আরো কিছু দেওয়া উচিত।

এল আলামিন থেকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর কত দূর? জানতে চাইলেন হিটলার।

পঁয়ষট্টি মাইল।

বেশ, আরো সমর-সম্ভার তুমি পাবে।

বুকভরা আশা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোমেল আবার ফিরে এলেন উত্তর আফ্রিকার মরু-প্রান্তরে। ফুয়েরার যখন কথা দিয়েছেন, তখন আর ভাবনা কি! দু-চার দিনের মধ্যেই হয়তো সব এসে যাবে। তারপর মিশর ছিনিয়ে নেওয়া তো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র!

রোমেলের এই অভাবনীয় সাফল্য দেখে আরো একটি মানুষের সেদিন বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, মল্লিকা। তিনি হলেন ব্রিটিশ জেনারেল মণ্টোগোমারি। শত্রু হলেও রোমেলের সমর-কৌশলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। সব সময়ে তিনি রোমেলের একটি ছবি টাঙিয়ে রাখতেন নিজের শিবিরে। বলতেন,—'অনেক কিছু শেখার আছে ওঁর কাছে। যুদ্ধ শেষ হোক। তখন সব কিছুই আমি ওঁর কাছ থেকে শিখে নেব একে একে।'

আফ্রিকার পরে মধ্যপ্রাচ্য।

রোমেলের ভয়ে ব্রিটিশ তখন তটস্থ। যেভাবে লোকটা মরুভূমির বুকে ঝড় তুলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে, তাতে মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। যে করে হোক, সে-পথ তার বন্ধ করতেই হবে। ভারতবর্ষ গেলে আর রইল কি!

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসেই ব্রিটিশ বাহিনী বসরাতে গিয়ে হাজির। না, তোমরা যা ভেবেছ, তা নয়। আমরা তোমাদের দেশ দখল করতে আসিনি। এসেছি তোমাদের উপকার করতে। নইলে জার্মানদের হাত থেকে কিছুতেই তোমরা রেহাই পাবে না।

বাধা দিলেন প্রধানমন্ত্রী রসিদ আলী। না, তোমাদের উপকার করতে হবে না। তোমরা বিদেয় হও!

বটে! দাঁড়াও মজাটা দেখাচ্ছি তোমাদের!

জার্মানদের সঙ্গে না পারলেও দুর্বল ইরাককে মজা দেখাতে মোটেই দেরি হল না। বাধ্য হয়েই তখন রসিদ আলীকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হল ইরানে।

ইরাকের পর ইরান। সেখানেও সেই একই অবস্থা। অর্থাৎ, আমাদের উদ্দেশ্য দেশ দখল করা নয়, তোমাদের উপকার করা।

তারপর সিরিয়া। সিরিয়া আক্রান্ত হল ১৯৪১ সালের ১লা জুন। ব্রিটিশের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে যুদ্ধ-বিরতি ঘটল ১৫ই জুলাই।

এবার টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হল তুরস্ককে নিয়ে। কি জার্মানী, কি ব্রিটিশ সবাই এ ব্যাপারে সমান তৎপর। তোমরা আমাদের দলে যোগ দাও। যুদ্ধের পরে আমরা তোমাদের রাজা করে দেব।

নিশ্চয়! নিশ্চয়! একশোবার! অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে পাশ কাটিয়ে চলতে লাগল তুরস্ক। ভাবটা এই যে, আমরা তো তোমাদের দলেই রয়েছি। সময় হোক, তারপর নিজেরাই সেটা দেখতে পাবে!

অবশ্য মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল একেবারে শেষের দিকে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত তারা ব্রিটিশের হয়েই যুদ্ধ-ঘোষণা করেছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে। তবে যুদ্ধ আর তাদের করতে হয়নি। তার আগেই যুদ্ধ শেষ।

মে মাসের মাঝামাঝি।

সুভাষ তখনো বার্লিনে। চোখে সেই অন্তহীন প্রতীক্ষা। কবে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পাকা কথা পাওয়া যাবে! কবে তাঁর এই প্রতীক্ষার শেষ হবে! সময় যে বয়ে যায়!

ডাক এল কাবুল থেকে। আমি ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানী বলছি। কলকাতা থেকে লোক এসেছে। তারা আপনার নির্দেশ চায়।

২০শে মে তারিখে কলকাতা থেকে আগত ভগৎরাম ও শান্তিময় গাঙ্গুলীর উদ্দেশ্যে সুভাষ তাঁর নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন কাবুলের ইতালিয়ান দূতাবাসের মাধ্যমে। তার বিস্তৃত বিবরণ আগেই তোমাকে জানিয়েছি।

জুন মাসে গেলেন রোমে। কতদিন আর এভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায়! দেখা যাক, ওখানে গিয়ে কিছু হয় কিনা!

দেখা করলেন বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী মুসোলিনীর জামাতা কাউন্ট চিয়ানোর সঙ্গে। বক্তব্য সেই একই। আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্যথায় সহযোগিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুই অজানা ছিল না কাউন্ট চিয়ানোর। সুভাষ সম্বন্ধে সব কথাই তিনি জানতে পেরেছিলেন কাবুলের রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানী প্রেরিত এক গোপন রিপোর্ট থেকে।

২রা এপ্রিল তারিখে প্রেরিত এক রিপোর্টে স্পষ্টই তিনি লিখেছিলেন ঃ

'বসুর মতে, ইয়োরোপে একটি স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট হবে; এবং ইতালী, জার্মানী ও জাপানকে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করতে হবে। এ প্রতিশ্রুতি পেলে স্বাধীন ভারতের নিজস্ব বেতার-কেন্দ্র থেকে তিনি তাঁর অভিযান শুরু করতে প্রস্তুত। এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, এখন তা আমাদের ঋণ-স্বরূপ দিতে হবে। ভারত স্বাধীন হলেই তিনি তা পরিশোধ করে দেবেন।

বসুকে আমরা জানি। ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বসুই একমাত্র বাস্তববাদী, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গতবছর জুন মাসে যখন ইংল্যাণ্ডের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল, তখন বসুর পরিকল্পনা মতো কোন সংগঠন থাকলে অনায়াসেই ভারতের মুক্তি সম্ভব হত।

গতবছর আমরা সুযোগ হারিয়েছি। সে সুযোগ এবারও আসতে পারে। তার সদ্ব্যবহারের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।'

আলাপ করে এতটুকুও খুশি হতে পারলেন না সুভাষ। বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী হলেও বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্বন্ধে লোকটা খুব একটা ওয়াকিবহাল নয়। মনে মনে খানিকটা জার্মান-বিরোধীও বটে। এমন লোকের কাছ থেকে কতটুকুই বা আশা করা যায়!

ভাবনার পর ভাবনা। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের কোন খবর নেই। ইতালীর অবস্থাও তথৈবচ। কি করা যায় এখন এ পরিস্থিতিতে!

ঠিক এমনি সময়ে একদিন পরিচয় হল জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের প্রাচ্য সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ Adam Von Trott Zu Solz-এর সঙ্গে। পরিচয় হল রোমেই।

সুভাষের পরিকল্পনার কথা শুনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ভন ট্রট। হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। যে করে হোক, এ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে ট্রটের এই আগ্রহ বহু দিনের। এর মূলে ছিলেন একজন ভারতীয় মুসলীম তরুণ।

মুসলীম তরুণটি কে জানো, মল্লিকা! হুমায়ুন কবীর। উভয়েই সেদিন একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ট্রটের অনুরোধে আবার সুভাষ ফিরে গেলেন বার্লিনে। দেখা করলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ ও প্রচার-সচিব গোয়েবল্‌সের সঙ্গে। যে করে হোক, ওঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, মল্লিকা। কারণ, হিটলারের সেই প্রছন্ন ব্রিটিশ-প্রীতি।

'It was therefore not very easy to change this pro-British attitude of Hitler into a friendly gesture towards India which was in direct opposition to England. [Ibid : P.—34]

তবু দমে গেলেন না সুভাষ। নানাভাবে তিনি বোঝাতে লাগলেন সবাইকে। নানা যুক্তি দিয়ে। সেই সঙ্গে শোনালেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পেছনে জার্মান সহযোগিতার কথা। এস. এস. ম্যাভারিক ও হেনরি এস্ জাহাজ যোগে অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণের ইতিহাস। বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী।

নতুন করে শোনালেন ভার্সাই সন্ধির সেই চরম অবমাননার ইতিহাস। মাত্র একুশ বছর আগেকার ঘটনা। এরি মধ্যেই কি তোমরা ভুলে গেলে সেই জাতীয় অবমাননার কথা! তার জবাব দেবে না! প্রতিশোধ নেবে না!

কে সেদিন তোমাদের ভার্সাই সন্ধি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল নতজানু হয়ে? ঐ ব্রিটিশ। বাগে পেয়েও সেই ব্রিটিশকে তোমরা খাতির করে ছেড়ে দিয়েছ। তা বলে ব্রিটিশ কিন্তু তোমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সেদিন তাদের হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষা করবে, বলো! করবে কি কেউ! ব্রিটিশই কি তোমাদের এতটুকু খাতির করবে সেদিন?

এবার কাজ হল। সবাই আগ্রহ ভরে শুনলেন সুভাষের পরি-কল্পনার কথা। কথাও দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

যদিও জার্মানী তখন প্রতিটি রণাঙ্গনে মরণ-পণ সংগ্রামে লিপ্ত, তবু মহামান্য 'মাসসোত্তা'কে সহায়তা করার ব্যাপারে তাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।

এ তো গেল আমাদের কথা। এবার জার্মানরা এ সম্বন্ধে কি বলে শোনা যাক ঃ

'Very soon we felt the strength of his will power, the honesty of his intentions and the inexorability of his personal dedication to India's Cause,···

We could not help being influenced by his ideas and wishes'

অর্থাৎ—খুব শীগগিরই আমরা তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, উদ্দেশ্যের সততা ও ভারতের জন্য তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করার অনমনীয় বাসনার বিষয় উপলব্ধি করলাম এবং তাঁর ধারণা ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজেরাও প্রভাবিত হলাম।

তবে সব কিছুর মূলে ছিলেন সেই ভন ট্রট।

নেতাজীর সৌভাগ্য যে, সে সময়ে ভন ট্রট ঐ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ট্রট এবং তাঁর বন্ধুদের অকুণ্ঠ সমর্থন না পেলে সে সময়ে তাঁর পক্ষে বার্লিনে থাকা বোধহয় সম্ভবপর হত না।

'It was great luck for Netaji and his cause that Adam Von Trott Zu Solz happened to be the head of the office in charge of all matters concerning Netaji's activities in Germany···without Trott, his circle of friends and his devoted working team, Netaji probably would not have remained in Berlin'.

বলেছেন ডঃ আলেকজান্দার ওয়র্থ।

কে এই আলেকজান্দার ওয়র্থ? সেকথা তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোন ঃ

'Trott was designated head of the 'Special India Division' and I, his deputy assistant.' হ্যাঁ, আমিই সেদিন ট্রটের সহকারী ছিলাম।

এবার শুরু হল শর্তাবলী নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা।

সুভাষের দাবী : লক্ষ্য আমাদের উভয়েরই এক। সে লক্ষ্য হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা। তবু আমাদের প্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে তোমাদের কোনরকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তোমাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে আমরা কোনদিনই যাব না। সে-সব তোমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। আমরা তার মধ্যে নেই। আমাদের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ। সুতরাং বোঝাপড়া যা কিছু করবার তাদের সঙ্গেই আমরা করব, অন্য কারো সঙ্গে নয়।

ট্রেণিং-এর জন্য মিলিটারী এবং টেকনিক্যাল অফিসার দিতে হবে আপাতত তোমাদেরই। আর প্রয়োজনীয় অর্থ সব কিছুই নেওয়া হবে ঋণ হিসেবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে সব তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে কড়ায়-গণ্ডায়। সে দায়িত্ব আমার। বলো, রাজী?

রাজী হল জার্মানী। হ্যাঁ, তোমার সব শর্তই আমরা মেনে নিলাম। ডঃ ওয়র্থ-এর ভাষায় :

'Netaji's stiff demands that no German political authority should interfere with his work, that the financial assistance granted to him should be considered as a loan given to Free India which after the war would be paid back and his request for personnel and technical assistance from the German Foreign Office and the OKW (Supreme Military Command) met with the German Foreign Minister's favourable understanding.

...Indians did not want to be involved in Germany's quarrel with other countries or with her own internal quarrels.

The Germans, i. e. the German Foreign Office, accepted this point of view and never wanted Bose to support them in their war with other countries.

Neither Bose nor Azad Hind Radio ever defended, by speech or in broadcasts, the policy of the National Socialist Party in Continental Europe or elsewhere.

The work done by the Indians under Bose in Germany was based on the firm understanding that without being ideologically involved in the National Socialist doctrine, the Indians in Germany could advance the cause of Indian independence.'

[Netaji in Germany : Alexander Werth : P.—17-19]

নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ, মল্লিকা। ভাবছ, কেন জার্মানীর এই নিঃশর্ত সহযোগিতা ?

কি এর কারণ! ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাদের কেন এত মাথাব্যথা! এর পেছনে কি স্বার্থের কোন প্রশ্ন ছিল না ?

ছিল বৈকি! নিশ্চয়ই ছিল। ব্রিটিশ শুধু সুভাষেরই শত্রু নয়, তাদেরও শত্রু। উভয় পক্ষেরই একমাত্র লক্ষ্য হল ব্রিটিশকে ধ্বংস করা। এ অবস্থায় সুভাষকে সাহায্য করার অর্থই যে চিরশত্রু ব্রিটিশকে ধ্বংস করতে সহায়তা করা।

সবচাইতে বড় লাভ—সুভাষ। সুভাষের সঙ্গে সহযোগিতার অর্থই হল ভারতের সত্যিকারের সংগ্রামী যুবশক্তির সমর্থন লাভ করা। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি। এ সময়ে তার সমর্থন পাওয়া কম লাভের কথা নয়!

দেখতে দেখতে একদিন সুভাষের আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ (Free India Centre) জন্ম নিল বার্লিনের মাটিতে।

কিন্তু কর্মী! কর্মী কোথায়? যুদ্ধের ডামাডোলে ভারতীয়দের মধ্যে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এ সময়ে কর্মী সংগ্রহ করা সোজা কথা নয়।

শুরু হল ইয়োরোপ-পরিক্রমা।

যে করে হোক, সবাইকে খুঁজে বের করতে হবে। ঠিকানা সংগ্রহ করে সবাইকে একদিন চা-পানের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে আনতে হবে।

সুভাষ নন, আমন্ত্রণ জানাবেন সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা। কারণ, সরকারীভাবে সুভাষ এখনো সুভাষ বলে স্বীকৃত নন। আইনত তিনি এখন সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা। জার্মানদের ভাষায়—'মহামান্য মাসসোত্তা।'

পরিকল্পনা ব্যর্থ হল না। ডাক শুনে এগিয়ে এলেন নাম্বিয়ার, শর্মা, সুলতান, হবিবুর রহমান, প্রমোদ সেনগুপ্ত, আবিদ হাসান, এম. ভি. রাও, কান্তরাম, ডঃ মল্লিক প্রমুখ স্বাধীনতাকামী ভারতীয় তরুণবৃন্দ। আর এলেন সুখ্যাত সাংবাদিক গিরিজা মুখার্জী।

নাম্বিয়ার দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে প্যারিসের বাসিন্দা। ইয়োরোপের রাজনীতির সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে.

হবিবুর রহমান জার্মান প্রচার-বিভাগের একজন বিশিষ্ট কর্মী। সুতরাং তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর গিরিজা মুখার্জী!

পরাধীনতার গ্লানি যে মানুষের জীবনকে পদে পদে কতখানি দুঃসহ করে তুলতে পারে, তার প্রকৃত প্রমাণ এই গিরিজা মুখার্জী।

স্বদেশে তিনি ছিলেন ইংরেজের কারাগারে বন্দী। কারণ, তিনি স্বাধীনতাকামী যুবক। সুতরাং ইংরেজের বিচারে তিনি শত্রু।

বিদেশেও তাই। যেহেতু তিনি ব্রিটিশ-প্রজা, সেহেতু আইনত তিনি জার্মানীর শত্রু। সুতরাং আবার সেই কারাগার।

বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল ফ্রান্সের ফ্রেজনের বন্দিশালায়। তারপর ঐতিহাসিক সাঁড়েনীর কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পে।

এককালে ফরাসী পঞ্চদশ লুই এই ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন তাঁর সৈন্যদের বসবাসের জন্য। পরে সেই ক্যাম্পই হয়ে দাঁড়ায় বিখ্যাত সাঁড়েনী কারাগার, যার নাম শুনলে পর্যন্ত সাধারণ কয়েদীর দল ভয়ে আধমরা হয়ে যেত।

আরো দুজন বাঙালী সেদিন বন্দী ছিলেন সাঁড়েনীর কারাগারে। কুসুম পাল এবং চৌধুরী। চৌধুরী ছিলেন সুভাষের সতীর্থ। কটকের রাভেনশ কলেজের সহপাঠী।

আর কুসুম পাল!

কুসুম পালকে আজ আর তুমি চিনতে পারবে না, মল্লিকা। চেনার কথাও নয়। তবে সেদিন কিন্তু ভারতের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কাছে কুসুম পাল মোটেই অপরিচিত ছিলেন না।

ইতিমধ্যে কত যুগ কেটে গেছে। তবু মনে হয় যেন সেদিনের কথা। কান পাতলে এখনো বুঝি শোনা যাবে কুসুম পালের সেই শ্রীহট্ট জেলার বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী:

'আজাদ হিন্দ রেডিও, বার্লিন, বাংলায় খবর বলছি।'...

আজাদ হিন্দ রেডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনিই বাংলায় খবর শোনাতেন তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে।

একঘেয়ে বন্দী-জীবন। দিন আর রাত্রির মধ্যে সেখানে কোন তফাত নেই। কবে যুদ্ধ শেষ হবে?

কবে সমাপ্তি ঘটবে এই বন্দী-জীবনের?

কোনদিনও ঘটবে কি ? ভয়াবহ এই সাঁডেনী কারাগার থেকে মুক্তি পাবার আশা যে দুরাশা মাত্র !

সহসা এক অপূর্ব প্রত্যূষ এসে দেখা দিল ভারতীয় বন্দীদের জীবনে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জরুরী নির্দেশ,—অবিলম্বে সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। কারণ,—অজ্ঞাত। অন্তত ক্যাম্পের বড়কর্তা কর্নেল স্মিথ-এর তা জানা নেই।

মুক্তি পেয়ে সবাই বেরিয়ে এলেন বাইরে। সবার চোখে ঘোর ঘোর দৃষ্টি। সবার মনে সেই একই প্রশ্ন। কি ব্যাপার! কেবল-মাত্র ভারতীয় বন্দীদের প্রতি হঠাৎ এই উদারতা প্রদর্শনের কারণ কি ?

কারণটা নিশ্চয়ই তুমি অনুমান করতে পেরেছ, মল্লিকা। কারণ,—সুভাষ।

সুভাষের দাবী,—অবিলম্বে সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। এইসব স্বাধীনতাকামী তরুণদের সাহায্যেই আমাকে ১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে দেখা সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ বাহিনী।

নতুন দপ্তর খোলা হল বার্লিনের তিয়ারগার্ত এলাকায়।

কর্মী-সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ জন। বেশির ভাগই ইয়োরোপ প্রবাসী মেধাবী ছাত্র। মনে মনে কত আশা। কত রঙীন কল্পনা। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যত। তারপর একটানা ভাবনা-মুক্ত নিশ্চিন্ত জীবন।

কিন্তু সব বৃথা। এ যে নিশির ডাক! এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে! তাই সুভাষের ডাক শুনে সবাই ছুটে এসেছেন সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে। আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা। পড়াশোনা পরে হলেও চলবে, কিন্তু

এ সুযোগ একবার হারালে আর কোনদিনই যে ফিরে পাওয়া যাবে না!

সুভাষের থাকার ব্যবস্থা হল ৬নং সোফেন ট্রসে অবস্থিত প্রাক্তন ব্রিটিশ রাজদূত ভবনে। স্পেনিশ দূতাবাসের ঠিক পাশেই।

'The crow is the most cunning and cruel among the birds, the fox among the animals and the British imperialist is among the human beings'.

সুভাষের কথা। শুধু একবার নয়, সুভাষের মুখ থেকে এ-কথা শোনা গিয়েছিল অসংখ্যবার। এমন কি, পরবর্তী কালে ব্রহ্ম রণাঙ্গন থেকে বেতার-ভাষণ দিতে গিয়েও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন এই একই কথা ঃ

'পাখিদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে খ্যাঁকশিয়াল আর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই হল সবচাইতে ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর।'

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। প্রমাণ,—যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়।

ব্রিটিশের তখন একমাত্র লক্ষ্য—রাশিয়া। যদিও কমিউনিস্ট রাশিয়া সম্বন্ধে তাদের ঘৃণা আর বিদ্বেষের অন্ত ছিল না, তবু গরজ বড় বালাই! সুতরাং রাশিয়াকে চাই।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! রাশিয়া যে জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ!

তা হোকগে, তবু রাশিয়াকে চাই। যে করে হোক, ওদের মধ্যে ফাটল ধরাতে হবে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মন ভিজিয়ে দলে আনতে হবে। চলার পথে রাশিয়াকে না পেলে আর রক্ষা নেই।

মস্কোর ব্রিটিশ রাজদূত সেই বিলিতি জওহরলালের অবশ্য চেষ্টার এতটুকুও ত্রুটি নেই। স্ট্যালিন এবং মলোটভের কানে সমানে তিনি বিষ ঢেলে চলেছেন নিরলস ভাবে। জার্মানীকে বিশ্বাস করো না।

ওদের বিশ্বাস করলে পরে তোমাদের পস্তাতে হবে। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখো একবার!

স্ট্যালিন কম কথার মানুষ। ক্রীপস্-এর এই সৎ-পরামর্শ শুনে মনে তাঁর কোনরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল কিনা ঠিক যেন বোঝা গেল না।

তবু হাল ছাড়লেন না স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্। বরং নতুন উৎসাহে এবার তিনি শুরু করলেন তাঁর ব্রিটিশ-সুলভ কূটনীতির আসল খেলা। দেখা যাক, নতুন এই ব্যবস্থায় কোন পক্ষ টোপ গেলে কিনা!

দেখা গেল অচিরেই। রাশিয়ার প্রতিটি হোটেল, রেস্তরাঁয় সামরিক বিভাগের প্রণয়ীদের লক্ষ্য করে তাদের বিলাস-সঙ্গিনী যুবতী কন্যাদের তখন সেকি অশ্রু বিসর্জন! ডার্লিং, এই বোধহয় আমাদের শেষ দেখা!

তার মানে! সবাই অবাক।

কেন, জার্মানরা শীগগিরই রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে যে! একেবারে পাকা খবর। আশ্চর্য, তোমরা এখনো দিব্বি ঘুমোচ্ছ!

গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে একই খেলা তখন শুরু হয়েছে জার্মানীর অভ্যন্তরে। সেই একই দৃশ্য। একই অভিনয়। শুধু বক্তব্যটা বিপরীত। আর আশা নেই। এই শেষ দেখা। কমিউনিস্টরা এল বলে! এরি মধ্যেই ওদের সৈন্য-চলাচল শুরু হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। একেবারে পাকা খবর!

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'।

কি রাশিয়া, কি জার্মানী সর্বত্র একই কথা। সর্বত্র একই আলোচনা। আক্রমণ শুরু হল বলে! আর দেরি নেই!

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব ক্রীপস্-এর। আর কিছু না হলেও এর ফলে উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি একটা তীব্র

অবিশ্বাস ও সন্দেহের মনোভাব সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন, তাতে আর কোন ভুল নেই।

সব কিছুর অবসান ঘটল ২২শে জুন, ভোররাত্রে।

অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হঠাৎ সেদিন হিটলার পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম রণক্ষেত্র, —দু-হাজার মাইল বিস্তৃত রুশ-সীমান্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্বার গতিতে।

রাষ্ট্রদূত ক্রীপস্-এর উস্কানিতে রাশিয়া নাকি তলে তলে ব্রিটিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে খাস জার্মানী আক্রমণের সিদ্ধান্ত করেছে। সুতরাং আগে থাকতেই সে-পথ বন্ধ করা দরকার।

খবর শুনে উল্লাসে ফেটে পড়লেন যুদ্ধবাজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল। হিটলার শত্রু। রাশিয়াও তাই। এবার ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরুক, তারপর ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় দেখা যাবে!

সেদিনই রাত্রে এক বেতার-বক্তৃতায় চার্চিল ঘোষণা করলেন ইংল্যাণ্ডের বর্তমান নীতির কথা।

এখন থেকে রাশিয়া আমাদের বন্ধু। আমরা সর্বতোভাবে তাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত। এসো, হাতে হাত মেলাও!

চিঠির পর চিঠি। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম। বলো, কি কি সাহায্য চাই তোমাদের?

কোন উত্তরই দিলেন না স্ট্যালিন। ব্রিটিশের ওসব বড় বড় বুলি তাঁর ঢের শোনা আছে। সুতরাং সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

চার্চিলও নাছোড়বান্দা। যে করে হোক, রাশিয়ার উপকার করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর নিজের ভাষায়: 'হিটলারকে পরাজিত করার জন্য দরকার হলে আমি নরকের সঙ্গেও হাত মেলাতে প্রস্তুত।'

অনেক সাধ্য-সাধনার পরে অবশেষে উত্তর দিলেন স্ট্যালিন। আমি কাজের মানুষ। কাজটাই আগে বুঝি, কথা নয়। সত্যিই যদি

আমাদের বন্ধুত্ব তোমাদের কাম্য হয়ে থাকে, তবে কাজেই তার প্রমাণ দাও।

বেশ, তাই হবে! বলো, কি প্রমাণ পেলে তোমরা খুশি হও?

'সেকেণ্ড ফ্রণ্ট'।

সেকেণ্ড ফ্রণ্ট! চার্চিল স্তম্ভিত। বলে কি এই বেরসিক লোকটা!

হ্যাঁ, সেকেণ্ড ফ্রণ্ট। আমরা এদিক থেকে হিটলারকে সামলাচ্ছি। তোমরা ফ্রান্সের উপকূল-ভাগে একটা সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খুলে দিয়ে আক্রমণ চালাও। ব্যস, এইটুকু পেলেই আমরা খুশি।

বটেই তো! বটেই তো! সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, তবে এত ব্যস্ত কেন? এই তো সেদিন ডনকার্ক থেকে 'glorious retreat' করে এলাম। এরপর একটু সামলে নেবার জন্য সময় দেবে তো! তাই বলছি যে, আপাতত কিছুদিন তোমরা একাই মহড়া নাও। তারপর সময় হোক, তখন দেখবে যে লড়াই কাকে বলে!

নীতি এবং আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ অমিল হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া এবার ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলাল প্রয়োজনের তাগিদে। ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা পরে করলেও চলবে। আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা।

ওদিকে বাল্টিক সাগর থেকে শুরু করে কৃষ্ণসাগর, এই দু-হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে হাজার হাজার বোমারু বিমান, হাজার হাজার ট্যাঙ্ক ও লক্ষ লক্ষ মোটরারূঢ় দুর্ধর্ষ জার্মান প্যানৎসার বাহিনী ততক্ষণে পঙ্গপালের মতো ঢুকে পড়েছে রাশিয়ার অভ্যন্তরে। রাশিয়ার শীত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তার আগেই লড়াই শেষ করে ফেলতে হবে।

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়েছেন বিখ্যাত জার্মান সমরবিদ ফিল্ড-মার্শাল ভন লীব। সহকারী হিসেবে সঙ্গে রয়েছেন জেনারেল কুয়েলার, জেনারেল বুস ও ট্যাঙ্ক-বিশারদ জেনারেল হোয়েপনার। লক্ষ্য তাঁদের—লেনিনগ্রাদ।

মধ্য রণাঙ্গনে ফিল্ড-মার্শাল ভন বোক্। আর রয়েছেন ফিল্ড-মার্শাল ভন ক্লেগে, জেনারেল ষ্ট্রাউস, জেনারেল ভন ভিকস্, জেনারেল টড্ (ট্যাঙ্ক), ও মার্শাল কেসেলরিং (বিমান) প্রমুখ স্বনামখ্যাত সহকারিবৃন্দ। লক্ষ্য—রাজধানী মস্কো।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে ফিল্ড-মার্শাল ভন রুনস্টেড। সহকারী হিসেবে সঙ্গে রয়েছেন ফিল্ড-মার্শাল ভন রাইকেনাউ, জেনারেল স্টুয়েলপ্-ন্যাজেল, জেনারেল ভন সোপার্ট, জেনারেল ভন ক্লাইস্ট (ট্যাঙ্ক) ও জেনারেল লোয়ের (বিমান) প্রমুখ সমরবিদগণ। লক্ষ্য—রাশিয়ার শস্য-ভাণ্ডার গোটা উক্রাইন অঞ্চল।

রাশিয়ার পক্ষে লেনিনগ্রাদ-সহ সমগ্র উত্তরাঞ্চল রক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন মার্শাল ভরোশিলভ। মধ্য রণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কো আর দক্ষিণ রণাঙ্গনে মার্শাল বুদেনী।

'Remember, you are always within an inch of invasion.'

রাষ্ট্রগুরু লেনিনের এই সতর্ক-বাণী রাশিয়া কোনদিনই ভোলেনি।

চারপাশে তাদের একাধিক ধনতান্ত্রিক দেশ। সুযোগ পেলেই যে তারা তাদের পিষে মারতে চেষ্টা করবে, সেকথা তারা ভাল করেই জানে।

তবু অতর্কিত আক্রমণ, তার ওপর দুর্বল স্থানে আঘাত, তাই প্রথম ধাক্কাতেই জার্মান বাহিনী বিদ্যুৎবেগে প্রায় চার শ' মাইল ঢুকে পড়তে সক্ষম হল রাশিয়ার অভ্যন্তরে।

৩রা জুলাই তারিখে স্ট্যালিন নিজেই সেকথা স্বীকার করলেন তাঁর এক বেতার-ভাষণে। লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, হোয়াইট রাশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল এবং উক্রাইনের একাংশ শত্রুপক্ষের দখলে। লেনিনগ্রাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

মধ্য রণাঙ্গনেও মার্শাল টিমোশেঙ্কোকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড হারাতে হল জার্মানদের কাছে। প্রথমেই হারাতে হল মিনস্ক। তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেল-কেন্দ্র স্মলেনস্ক।

স্মলেনস্ক হারানো মানেই রাজধানী মস্কোর দরজা খুলে যাওয়া। তাই লাল ফৌজ এখানে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করল জার্মান বাহিনীকে। তবু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত স্মলেনস্কও একদিন বেদখল হয়ে গেল দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর হাতে।

এবার স্মলেনস্ক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির একটা বিবরণ শোন, মল্লিকা। এটা বিপক্ষের দেওয়া কোন হিসেব নয়, উভয় পক্ষের সরকারী ইস্তাহারে ক্ষয়-ক্ষতির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল, তা-ই এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

রাশিয়ার ক্ষতি—হতাহত ও নিখোঁজ সৈন্য মোট ৬ লক্ষ ; ৫ হাজার ট্যাঙ্ক ; ৭ হাজার কামান আর মোট ৪ হাজার বিমান।

আর জার্মানদের মতে তাদের নিজেদের নিহত সৈন্যের সংখ্যা হল মোট ৪,০২,৮৬৫ জন।

ভাবতে পার মল্লিকা ! সংখ্যাটা চিন্তা করতে পার একবার !

এদিকে বিপদে পড়ে গেলেন মার্শাল বুদেনী। হঠাৎ তিনি বেষ্টিত হয়ে পড়লেন জার্মান সেনাপতি ভন রুনস্টেডের সেনা বাহিনীর হাতে।

তবে বেশিক্ষণ নয়। অদ্ভুত কৌশলে এক সময়ে তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে সক্ষম হলেন নীপার নদীর ওপারে।

এবার এক মহা সমস্যা দেখা দিল বুদেনীর চোখের সামনে।

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নীপার নদীর বাঁধ শুধু পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ নয়, সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ত-বিভাগীয় এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার এক বিস্ময়কর নিদর্শনও বটে।

উক্রাইন অঞ্চলের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে এই বাঁধ। কি করা যায় এখন এই বাঁধ নিয়ে ?

জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য অবিলম্বে এই বাঁধ ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। অথচ তার ফলে রাশিয়ার যে ক্ষতি হবে, তা সত্যিই অপূরণীয়। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে ?

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত ২৮শে আগস্ট ভোররাত্রে বুদেনী সেই বাঁধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র উড়িয়ে দিলেন শক্তিশালী ডিনামাইটের সাহায্যে।

অভূতপূর্ব জল-প্লাবনের ফলে জনসাধারণকে হয়তো অশেষ দুঃখ-দুর্গতির সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু উপায় কি !

আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা। এমন জিনিস কোনমতেই শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া চলে না, যার দ্বারা সে এতটুকুও উপকৃত হতে পারে।

এত করেও কিন্তু জার্মান বাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব হল না, মল্লিকা।

একে একে হারাতে হল ওডেসা, কিয়েভ, খারকোভ, পেরেকোপ, ক্রিমিয়া, রস্টোভ, কার্চ ইত্যাদি সব কিছুই।

কিয়েভ রাশিয়ার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র উক্রাইনের রাজধানী। খারকোভ রাশিয়ার শ্রম-শিল্পের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী এবং রেলওয়ে ও রাস্তার যোগাযোগের ব্যাপারে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। রাশিয়ার পক্ষে এ ক্ষতি নিঃসন্দেহে মারাত্মক।

শুধু তাই নয়। লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়ার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী একটা জার্মান বাহিনী ততদিনে পৌঁছে গেছে লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে। হিটলারের নির্দেশ—লেনিনগ্রাদ আমার চাই !

স্বাধীনতার যে কি মূল্য, রাশিয়া তা ভাল করেই জানে। তাই অনেক কিছু হারিয়েও এবার তারা রুখে দাঁড়াল রুষ্ট বাঘের মতো। অসম্ভব ! পবিত্রভূমি লেনিনগ্রাদ আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

শুধু রাষ্ট্রগুরু লেনিনের নামানুসারে বলে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও লেনিনগ্রাদের গুরুত্ব অসাধারণ।

লেনিনগ্রাদ একাধারে নৌ-দুর্গ ও স্থল-দুর্গের সমন্বয়ে শক্তিমান। তাছাড়া বস্ত্র-শিল্প, জাহাজ, বিমান, গোলা-গুলি ও বিভিন্ন অস্ত্র-সম্ভার নির্মাণের কেন্দ্র হিসেবেও রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প-নগরী বলে পরিচিত। সুতরাং লেনিনগ্রাদকে কোনরকমেই হাতছাড়া করা চলে না।

ফিল্ড-মার্শাল ভন লীব, জেনারেল ব্রাউসিস্ত, জেনারেল রুনস্টাড, জেনারেল ভন গুডেরিয়ান প্রমুখ বিখ্যাত সমরবিদগণ বোঝাতে চেষ্টা করলেন হিটলারকে।

লেনিনগ্রাদের চাইতে মস্কোর গুরুত্ব অনেক বেশি। সুতরাং এখানে অহেতুক কালক্ষয় না করে মস্কোর দিকেই এখন আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

কে কার কথা শোনে! ভদ্রলোকের এককথার মতো হিটলারেরও সেই এক গোঁ—লেনিনগ্রাদ আমার চাই-ই!

ফুয়েরারের মান রাখতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ভন লীবের দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে আঘাত হানল লেনিনগ্রাদের ওপর। ফুয়েরারের আদেশ। লেনিনগ্রাদ চাই-ই!

অসম্ভব! রুখে দাঁড়াল মরণজয়ী লাল ফৌজ।

সেই সঙ্গে নগরীর ত্রিশ লক্ষ স্বাধীনতা-প্রিয় নরনারী। লেনিনগ্রাদ আমরা ছাড়ব না। প্রাণ যায় যাক, তবু এই পবিত্র-ভূমিকে যে কোন মূল্য দিয়ে আমরা রক্ষা করবই।

৮ই সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বেষ্টিত হল জার্মানদের দ্বারা।

বেষ্টনী আরো দৃঢ় হল বন্ধু-রাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে। ফলে. একমাত্র ক্রোনস্টাডের নৌ-দুর্গ ও নৌ-ঘাঁটি ছাড়া লেনিনগ্রাদের আর কোন যোগাযোগই রইল না মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে।

সুরক্ষিত শক্তিশালী দুর্গ আক্রমণে জার্মানদের পটুতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বেলজিয়ামের দুর্গমালা, ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন, রাশিয়ার স্ট্যালিন লাইন সব কিছুই তাদের হাতে ধূলিসাৎ হয়েছে একে একে।

তাছাড়া ইতিপূর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে যেভাবে বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা বিপক্ষকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে, যুদ্ধের ইতিহাসে তা সত্যিই অভিনব।

যেমন—পোল্যাণ্ড। পোল্যাণ্ড জয় করতে তাদের লেগেছিল মাত্র আঠারো দিন। ডানকার্ক—বারো দিন। বলকান রাজ্যসমূহ—দশ দিন। ফ্রান্স—ছাব্বিশ দিন।

বাদ সাধল লেনিনগ্রাদ।

আশ্চর্য, চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মার্শাল ভরোশিলভের ঐতিহাসিক লাল ফৌজ এতটুকুও মাথা নোয়াল না জার্মানদের কাছে। তাদের একমাত্র পণ—লেনিনগ্রাদ আমরা দেব না। যে করে হোক, পিতৃভূমি লেনিনগ্রাদকে আমরা রক্ষা করবই।

লেনিনগ্রাদের আশা ছেড়ে দিয়ে এবার শুরু হল মস্কো অভিযান।

শীতের আর বিশেষ বাকি নেই। সেপ্টেম্বর শেষ। অক্টোবরও যায় যায়। এর পরই ভয়ঙ্কর শীত নেমে আসবে রাশিয়ার প্রান্তরে। সেই সঙ্গে মারাত্মক তুষারপাত। তার আগেই যে করে হোক, লড়াই শেষ করে ফেলতে হবে।

তাছাড়া লাল ফৌজের একটা বিরাট অংশ তখন ব্যস্ত রয়েছে লেনিনগ্রাদ রক্ষার জন্য। কোনরকমেই তাদের বেষ্টনী ভেদ করে বাইরে আসার উপায় নেই। মস্কো দখল করার এই তো অপূর্ব সুযোগ! সুতরাং চলো এবার মস্কো!

সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড-মার্শাল ভন বোক মস্কো অভিমুখে ঝড়ের মতো ছুটে আসতে লাগলেন বিরাট যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে। সঙ্গে রইলেন ট্যাঙ্ক-বিশারদ জেনারেল গুডেরিয়ান ও বিমান-বিশারদ হের কেসেলরিং। ফুয়েরারের নির্দেশ। মস্কো চাই-ই!

প্রথমেই দখল করলেন লেনিনগ্রাদ-মস্কোগামী রেলপথে অবস্থিত ক্যালিনিন।

তারপর একে একে ভলোকলামস্কো, ভিয়াজমা, বরোডিনো হয়ে মোজাইস্ক।

আর মাত্র সত্তর মাইল বাকি। তারপরই মস্কো।

শুধু একদিক থেকে নয়, বৃত্তাকারে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ।

ক্যালিনিন থেকে আর একটা বাহু ক্লিনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ এগুতে লাগল মস্কো-ভল্গা খালের দিকে। মস্কোকে যাঁতি-কলে পিষে মারতে হবে বিভিন্ন দিক থেকে। কোনমতেই যেন সে রেহাই না পায়।

২০শে অক্টোবর তারিখে মস্কোর বিপদ-বার্তা ঘোষিত হল রেডিও-যোগে। পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। সরকারী দপ্তর মস্কো থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কুইবিশভে।

সামরিক বিভাগেও অদল-বদল করা হয়েছে কিছু কিছু। মার্শাল ভরোশিলভের জায়গায় এখন উত্তর রণাঙ্গন, অর্থাৎ মস্কো-লেনিনগ্রাদ অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জেনারেল জুকভ।

মধ্য রণাঙ্গনে—মার্শাল টিমোশেঙ্কো।

মার্শাল ভরোশিলভ ও মার্শাল বুদেনীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মস্কো থেকে অনেকটা পেছনে। আরো সৈন্য চাই। অনেক সৈন্য। অবিলম্বে তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সে দায়িত্ব এ দুজনের ওপর।

দেখতে দেখতে মস্কোর পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল জেনারেল ভন ক্লুগ-এর দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনী।

ট্যাঙ্ক, বিমান ও দূরপাল্লার কামানের সাহায্যে তারপর শুধু আঘাত আর আঘাত! একটানা আঘাত। দিনে-রাত্রে। অবিশ্রান্ত ভাবে। যে করে হোক, মস্কো চাই-ই! ফুয়েরারের আদেশ!

জেনারেল জুকভের নেতৃত্বে লাল ফৌজও তখন উন্মত্ত, মরিয়া। প্রাণ যায় যাক, তবু মস্কো আমরা শত্রু-কবলিত হতে দেব না। কিছুতেই না।

এমনি করে পুরো নভেম্বর মাস। তবু লাল ফৌজকে এতটুকুও টলানো গেল না তাদের সঙ্কল্প থেকে। ফলে, আর এক ইঞ্চিও এগুনো সম্ভব হল না জার্মান বাহিনীর পক্ষে।

ততদিনে সেই ভয়াবহ শীত নেমে এসেছে রাশিয়ার প্রান্তরে। সেই সঙ্গে তীব্র তুষারপাত।

শুধু বরফ আর বরফ! ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান সব কিছুই বরফে বরফে একেবারে একাকার।

প্রকৃতির এই নির্মম আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে মস্কোর আশা ত্যাগ করে অবিলম্বে পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় নেই।

না, কারও পিছিয়ে আসা চলবে না। আদেশ জারি করলেন মহামান্য হিটলার, সবাইকে ওখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। শীত আর ক'দিন! ও তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে! শীত গিয়ে বসন্তকাল আসুক, তখন দেখা যাবে!

ইয়োরোপ প্রবাসী প্রতিটি ভারতীয়ের দৃষ্টি তখন বার্লিনের দিকে। সুভাষ ডাক পাঠিয়েছেন। স্বাধীনতার ডাক। সুতরাং আর দেরি নয়। চলো সবাই বার্লিন!

পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসৎ নেই। এ হল বাঁচার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে।

প্যারিস থেকে ছুটে এলেন বিনু ব্যানার্জী আর প্রমোদ সেন। প্রথমে দ্বিধা। নীতিগত দিক থেকে নাৎসীদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। তাদের সঙ্গে হাত মেলানো কি করে সম্ভব?

পরে সব দ্বিধাই স্রোতের মতো ভেসে গেল সুভাষের বক্তব্য শুনে।

পৃথিবীর কোন্ দেশ সাহায্য গ্রহণ করেনি অন্য কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র থেকে? আয়ারল্যাণ্ড তার মুক্তি-যুদ্ধে সাহায্য নেয়নি আমেরিকার কাছ থেকে?

রাশিয়া নেয়নি?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্রিটিশ এতদিন জাপানকে সাহায্য করেনি তলে তলে ?

তাহলে আমরাই বা নেব না কেন ?

নিশ্চয় নেব। নেব কূটনীতি হিসেবে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব আপন লক্ষ্যের দিকে। সে লক্ষ্য হল,—আমাদের স্বাধীনতা। সোজা কথায় এটা হল কূটনীতির খেলা। এ খেলায় প্রতিনিয়ত আমাদের সজাগ থাকতে হবে। বুদ্ধির লড়াইয়ে জয়ী হতে হবে।

এলেন বম্বের অধিবাসী এন. জি. গণপুলে।

অহিংস নীতিতে আস্থাবান খাঁটি কংগ্রেস কর্মী। ডাক শুনে তিনিও এসে হাত মেলালেন সুভাষের সঙ্গে।

সব পথই স্বাধীনতার পথ। কোন্ পন্থায়, কোন্ রীতিতে স্বাধীনতা আসবে সেটা বড় কথা নয়। অহিংস পন্থায় না এলেও স্বাধীনতা স্বাধীনতাই। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই।

নিজস্ব বেতার-কেন্দ্র 'আজাদ হিন্দ রেডিও'র কাজ শুরু হল অক্টোবর মাস থেকে।

সুভাষের সারা মনে সেদিন কূলপ্লাবি আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি। বুঝি এমনি একটা লগ্নের অপেক্ষায়ই তিনি উন্মুখ হয়ে ছিলেন সারা জীবন।

'The first day of broadcasting to India was an eventful day both for Netaji and India. It was the day for which Netaji was feverishly waiting. Although by temperament a very patient man, he looked that day unusually enthusiastic and even a little excited.' [N. G. Ganpuley : P.—51]

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে সেদিনই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানুষ শুনতে পেল সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ঃ

'আজাদ হিন্দ রেডিও—বার্লিন, আমি সুভাষ বলছি···'

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ!

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। এতদিনকার সব সংশয়ের অবসান। সব প্রশ্নের পরিসমাপ্তি।

না, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠ। সেই মনোহর ভঙ্গী। কোথাও এতটুকু অমিল নেই। সুভাষই।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? পৃথিবীব্যাপী এখন মহাযুদ্ধ চলছে। এ সময়ে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কি করে বার্লিন যাওয়া সম্ভব হল সুভাষের পক্ষে? এ যে কল্পনাতীত ব্যাপার!

২রা নভেম্বর আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন বসল বার্লিনে।

ভারতের মূল ভূমি থেকে ছ' হাজার মাইল দূরে সেই প্রথম উড্ডীন হল ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

প্রথমেই কবিগুরুর 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি গৃহীত হল জাতীয়-সঙ্গীত রূপে।

তারপর একে একে গৃহীত হল তিনটি উল্লেখযোগ্য কথা—যা আজও অমর অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। অক্ষয় হয়ে আছে প্রতিটি ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে।

প্রথম কথাটি হল—'জয় হিন্দ'। নমস্কার নয়। নমস্তেও নয়। জয় হিন্দ।

মল্লিকা, এর আগে কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছিল কি এমনি একটি সর্বজন-গ্রহণযোগ্য জাতীয় অভিবাদনের কথা? মাথায় এসেছিল কারো?

'জাতির জনক' বলে গান্ধীজী আজ সর্বত্র পূজিত। সুভাষের দেওয়া এই 'জাতির জনক' সম্বোধনটিরই কি তুলনা আছে কোথাও?

অদৃশ্য অঙ্গুলী-হেলনে ইতিহাস আজ তার বুক থেকে সুভাষের নাম মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁর দেওয়া ঐ বিশেষণ দুটি?

না, তাতে কোন আপত্তি নেই। কারণ, অনেক চেষ্টা করেও এর বিকল্প কোন প্রতিশব্দ আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় কথাটি হল—'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ'। আর তৃতীয় কথাটি!

নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী!

সুভাষ নয়। নেতা নয়। নেতাজী। তোমার—আমার—সবার নেতাজী। প্রতিটি ভারতবাসীর নেতাজী। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ—মহাক্ষত্রিয় নেতাজী।

প্রথমে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ। তারপর আজাদ হিন্দ রেডিও। এবার চাই ভারতের নিজস্ব সেনা বাহিনী—'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। Indian Legion.

আফ্রিকা রণাঙ্গনে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে ফিল্ড-মার্শাল রোমেলের হাতে। তাদের বেশির ভাগই রাখা হয়েছে ইতালীতে। মাত্র হাজার দশেকের মতো আনা হয়েছে জার্মানীর আনাবুর্গ ক্যাম্পের বন্দী-নিবাসে।

ঐ সব বন্দীদের সাহায্যে একটা ভারতীয় বাহিনী গড়া যায় না? গড়া যায় না ভারতের নিজস্ব সেনা বাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'?

কিন্তু কি করে সম্ভব! রেডিও অসামরিক দপ্তরের ব্যাপার। কিন্তু ফৌজ গঠন সম্পূর্ণ সামরিক বিভাগের ইচ্ছাধীন। জার্মানী তাতে রাজী হবে কেন? তাদের দেশে সম্পূর্ণ আলাদা একটি স্বাধীন বাহিনী গড়তে দেবার প্রশ্নই যে ওঠে না!

কিন্তু দাবী তুলেছেন স্বয়ং সুভাষ বোস। লোকটা যে একেবারে নাছোড়বান্দা! একবার মাথায় কিছু ঢুকলেই আর রক্ষা নেই। তার শেষ পর্যন্ত দেখে সে নেবেই। এমন লোককে এড়ানোও যে মুশ্‌কিল!

'Once an idea caught his fancy, he was not the man to leave it on account of ordinary difficulties.'

[Ganpuley : P.—53]

যোগাযোগ করা হল সামরিক বিভাগের সঙ্গে। প্রথমে বৈদেশিক দপ্তরের মাধ্যমে। তারপর সোজাসুজি নিজেই।…'he tried to

establish contacts with the military authorities in Berlin, first through the Special India Division of the German Foreign Office and afterwards directly.'

[Dr. Werth : P.—38]

অনেক আলাপ-আলোচনার পরে অবশেষে রাজী হল জার্মানী। বেশ, তাই হোক। গড়ে উঠুক তোমাদের নিজস্ব সেনা বাহিনী।

এবার শর্তাবলী। সুভাষের দাবী ঃ এ বাহিনী হবে আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। কোন অবস্থাতেই তোমাদের কোন বাহিনীর সঙ্গে তাদের মেশানো চলবে না।

আমাদের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া আমাদের সেনা বাহিনীকে অন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো চলবে না। তবে হ্যাঁ, কোথাও আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে তারা আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বৈকি !

বেতন, ছুটি, খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তোমাদের মতো আমাদের সেনা বাহিনীকেও সমান সুবিধা দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরকম তারতম্য করা চলবে না।

এবারও সুভাষের প্রতিটি দাবী গৃহীত হল যথাযথভাবে। শুধু মুখে নয়, কাজেও। এবং সে দায়িত্ব জার্মানী বহন করেছিল শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত।

'After many discussions and deliberations with the German Army Head Quarters on this subject, it was ultimately decided that Netaji should be given every help to choose his men out of the POW (Prisoner of War) camps and the German Wehrmacht should give him all the help necessary on the lines suggested.

...All the arrangements agreed to were meticu-

lously carried out, from the day they were approved till the very end of the war'. [Ganpuley : P—39]

প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যেরও ব্যবস্থা হল আলোচনার মাধ্যমে।

সুভাষের ব্যক্তিগত ভাতা বরাদ্দ হল মাসিক ৮০০ পাউণ্ড। আর আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের জন্য ১,২০০ পাউণ্ড। ১৯৪৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩,২০০ পাউণ্ড। অবশ্য সেনা বাহিনীর খরচ আলাদা।

তবে সবই ঋণ হিসেবে। সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব ভারতের নয়, সুভাষের একার।

তাই মেনে নিলেন জার্মান সরকার। সুভাষের সততার প্রতি সে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা তাঁদের বরাবরই ছিল।

'It was a gentleman's agreement made in good faith. It was a personal debt of honour to Bose and the Indian Nation was not made responsible for its re-imbursement.' [Ibid : P.—38]

এবার সৈন্য সংগ্রহের কাজ।

প্রথমে সহকর্মী এন. জি. স্বামী ও আবিদ হাসানকে বন্দিশালায় পাঠানো হল সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য। তারপর নিজেই। শুধু সহকর্মীদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। এ কাজ সবার। সুতরাং সবাইকেই যেতে হবে সেখানে।

কাজটা কিন্তু খুব সহজে হল না, মল্লিকা।

প্রথমেই বাধা এল বন্দীদের দিক থেকে। না, ও সবের মধ্যে আমরা নেই। ইংরেজের নিমক খেয়েছি, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমরা রাজী নই।

কেন এই দ্বিধা ? কি এর কারণ ?

কারণ আর কিছু নয় মল্লিকা ; আসলে এর পেছনে রয়েছে ইংরেজ শাসকদের সেই চিরাচরিত কূটনীতি, যে নীতির সাহায্যে তারা ভারতকে পদানত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল যুগ যুগ ধরে।

অর্থাৎ, সৈন্য বাহিনী গড়া হবে কেবলমাত্র অশিক্ষিত লোকদের নিয়ে, শিক্ষিতদের নিয়ে নয়।

শিক্ষিত লোকদের বিশ্বাস নেই। কখন যে ওরা রাইফেল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে, তা বলা শক্ত।

অশিক্ষিতদের বেলায় তেমন কোন ভয়ের কারণ নেই। পেট ভরে খাওয়া, মাস গেলে নগদ মাইনে, আর শেষ-জীবনে পেনসন— ব্যস, এটুকু পেলেই ওরা খুশি। তার বাইরে কোন কিছু নিয়ে ওরা বড় একটা মাথা ঘামায় না। সুতরাং কামানের খোরাক হিসেবে ওরাই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে ডঃ গিরিজা মুখার্জী তাঁর 'Netaji the great resistance leader' নিবন্ধে কি বলেছেন, শোন ঃ

'The recruitment policy of the British was designed to make the simple Indian peasants when brought into the army, completely immune from any national feeling, and, inspite of the fact that they had their family roots in our Indian village, yet the British succeeded in indoctrinating them in such a manner as to make them completely indifferent to the upheavals which were going on around them'.

সুভাষ কিন্তু এতটুকুও নিরাশ হলেন না সৈন্যদের এই বিরূপ মনোভাব দেখে। বরং আরো বেশি করে ওদের সঙ্গে মিশতে লাগলেন নতুন উদ্যমে।

দোষ ওদের নয়। ওরা অশিক্ষিত, গরীব। নিজের দেশকে ওরা চেনে না। স্বাধীনতা যে কি বস্তু, তাও ওরা জানে না। জানতেও দেওয়া হয়নি কোনদিন।

এবার ওদের সেই নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। শোনাতে হবে দেশের কথা। স্বাধীনতার কথা। জন্মগত অধিকারের কথা।

প্রথমেই তিনি দল থেকে ব্রিটিশ এন. সি. ও.-দের সরিয়ে দিলেন অন্যত্র। দোষ সৈন্যদের নয়, ওদের। ওরাই সৈন্যদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে আড়াল থেকে। সুতরাং হটাও ওদের।

এবার কাজ হল। প্রথমে একটি ছুটি, তারপর দলে দলে সবাই এগিয়ে এল সুভাষের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান শুনে। নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী! আমাদের নেতাজী! বলো, আমাদের কি করতে হবে? তুমি আদেশ করো!

এ প্রসঙ্গে ডঃ গিরিজা মুখার্জীর 'দিস ইয়োরোপ' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'I saw how the whole audience was coming under his spell and how they were listening···when he had finished they had acquired new life, new animation, new excitement···'

তিনি আরো বলেছেন:

'দিনের পর দিন সুভাষকে আমি দেখেছি ভারতীয় বন্দীদের সঙ্গে কথা বলতে। শুনেছি তাঁর তেজোদীপ্ত কণ্ঠের আহ্বান।

একদিনের কথা আজও আমার মনে পড়ে। সেদিন ড্রেসডেনের রৌদ্র-ক্লান্ত পথে দাঁড়িয়ে সুভাষ ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। শ্রোতাদের বেশির ভাগই ছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ।

সুভাষের সেই কণ্ঠস্বর, সেই অনুভূতি মেশানো কথা, সেই সুখ-দুঃখের কাহিনী আজও আমার কানে বাজে মিষ্টি সঙ্গীতের মতো। তাঁর সেদিনের বক্তৃতা আমার দেহের শিরা-উপশিরায় সত্যই উত্তেজনার ঢেউ তুলেছিল। মনে হয়েছিল, আমি যেন সত্যই স্বাধীন ভারতের নাগরিক।

কতক্ষণ সুভাষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন জানি নে। বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক হবে। বক্তৃতা শেষে দেখা গেল, শ্রোতার দল স্তব্ধ। যেন

তারা তাদের হারানো নেতাকে খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে মুক্তির পথ। শুনতে পেয়েছে স্বাধীনতার বাণী।

তারপর একে একে তারা এগিয়ে এসে সুভাষকে বলল ঃ

আজ থেকে তুমিই আমাদের নেতা। আমাদের নেতাজী। আমাদের পথ-প্রদর্শক। আমরা সবাই তোমার আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের কর্মী। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য।'

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কেউ এ জিনিস পারেননি। কি গান্ধীজী, কি জওহরলাল, কেউ সক্ষম হননি সেনা বাহিনীর রাজানুরক্তিতে এতটুকু ফাটল ধরাতে।

একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র লোক, যিনি সেই রাজ-ভক্ত সেনা বাহিনীকে কাছে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে।

ডঃ মুখার্জীর ভাষায় ঃ

'...inspite of the nation-wide struggle for independence which we carried out from 1920 up to 1939, our Indian soldiers seemed completely unaffected. Neither Mahatma Gandhi nor Jawaharlal Nehru was able to pierce through this indoctrination which the British had so carefully fostered in them.

...no one amongst our national leaders, except Subhas Bose, had been able to win over the loyalty and respect of the Indian soldiers and convert them to the national cause. It was Subhas Bose's great contribution that he succeeded where the other national leaders had failed.'

আজাদ হিন্দ রেডিও ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেশে-বিদেশে।

কাজের নেশায় প্রতিটি কর্মী উন্মত্ত যেন। শুধু কাজ আর কাজ! নিরবচ্ছিন্ন কাজ। কাজ ছাড়া আর সব কিছুই বুঝি চাপা পড়ে গেছে মনের অতল গভীরে।

নিত্য-নতুন ফিচার। নিত্য-নতুন দেশের উত্থান-পতনের কাহিনী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে নিত্য-নতুন প্রচার।

এই প্রচারের সাহায্যেই নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। জানাতে হবে প্রতিটি রণাঙ্গনে ইংরেজের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার কথা। সময় এসে গেছে। সংগ্রাম আসন্ন। তোমরা প্রস্তুত হও!

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সাল।

আবার সেদিন সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইথার-তরঙ্গে। 'আমি সুভাষ বলছি...'

দেখতে দেখতে সেই স্বর ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। আমি সুভাষ বলছি! আমি সুভাষ বলছি! আমি সুভাষ বলছি!

'এতকাল আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য বিষয় শোনানোর কোন সুযোগ ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক, আমি জানি, আপনারা তা বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ করে চলে যাব, কে কি বলে না-বলে, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না।

নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আজ ব্রিটিশ যদি রাশিয়া এবং আমেরিকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায়, তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য কোন জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া অন্যায়ও নয়, অপরাধও হতে পারে না।

আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকুন।

যে সুযোগ আসছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। জাতি এবং ধর্ম নির্বিশেষে অবিলম্বে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হোন। চাই ঐক্য ও একাগ্রতা। জয় হিন্দ!'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

সুভাষের কথা শেষ হতে না-হতেই হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর খবর ভেসে এল বেতার-তরঙ্গে।

জাপান ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পার্ল হারবার বিধ্বস্ত।

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক, তেমনিই অপ্রত্যাশিত। কেউ ভাবতে পারেনি এমন কথা। চার্চিল বা রুজভেল্ট, কেউ না। প্রধান সেনানায়ক জেনারেল ওয়াভেলও না।

তার কারণও ছিল। চীন-যুদ্ধে জাপানের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত। তার ওপর আবার নতুন একটা যুদ্ধের ঝুঁকি নেবার মতো শক্তি তার কোথায়? বিশেষ করে ইংরেজ বা আমেরিকার বিরুদ্ধে?

অন্যদিকে রাশিয়া এখন ইংরেজের বন্ধু। তেমন কিছু ঘটলে রাশিয়াও চুপ করে বসে থাকবে না।

রাশিয়ার ব্লাডিভোস্টক বন্দর থেকে জাপানের রাজধানী টোকিওর দূরত্ব মাত্র ৭০০ মাইল। আধুনিক যুগের বোমারু বিমানের পক্ষে এ দূরত্ব কিছুই নয়। সে অবস্থায় জাপান তার নিজের ঘর সামলাবে কি করে?

অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবীর নৌ-জগতের বিস্ময় সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য নৌ-ঘাঁটি।

তারও অদূরে রয়েছে হংকং নৌ-ঘাঁটি। এ দুটি নৌ-ঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ নৌ-বহর যে দুদিনেই জাপানী নৌ-বহরকে অচল করে দেবে, তা বলাই বাহুল্য।

তার ওপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, বর্মা ও ভারতের সামরিক সহযোগিতা। এদের সমবেত শক্তির তুলনায় একফোঁটা জাপানের শক্তি আর কতটুকু ?

আরো প্রশ্ন আছে। আমেরিকা, রাশিয়া বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেমন কাঁচামালে আত্ম-নির্ভর, জাপান তা নয়। এ অবস্থায় জাপানের পক্ষে ব্যাপক যান্ত্রিক যুদ্ধ চালানো অসম্ভব।

তাছাড়া জাপানের চারপাশেই সমুদ্র। একমাত্র ভরসা তার নৌ-পথ। সারা পৃথিবীব্যাপী তার যা কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য সবই এই নৌ-বহরের সাহায্যে। যুদ্ধ শুরু হলে তখন তাকে যে সমস্ত পথই হারাতে হবে, সন্দেহ নেই। সেই অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া তার পক্ষে সামলানো সম্ভব হবে কি ?

অবশ্য এক বছর আগে (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) বার্লিনে অনুষ্ঠিত এক ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির ফলে জার্মানী, ইতালী ও জাপান এখন পরস্পর মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ।

কিন্তু জাপানের তাতে কতটুকু লাভ !

তারা রয়েছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে। সেখান থেকে তাদের পক্ষে জাপানকে সাহায্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং যুদ্ধ চালাতে হবে জাপানকে একাই। এ অবস্থায় জাপান এতবড় একটা ঝুঁকি নেবার সাহস পাবে কি করে ?

অবশ্য অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। কারণ—চীন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কাছে চীন তখন একটা লুঠের মাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

চীনের আমদানী দ্রব্যের অর্ধেকটাই তখন আসে ব্রিটেন থেকে।

এমন কি, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, কারবারী মূলধন ও আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা সব কিছুই তখন তাদের দখলে।

মাত্র পাঁচ ভাগ রপ্তানী করে জাপান। আমেরিকা আরো কম। ষোলভাগের এক ভাগ মাত্র।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এল রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি সবাই।

তোমরা একা একা দইয়ের সরটুকু খাবে, এ কি অন্যায় কথা! আমাদেরও বখরা চাই!

বটেই তো! বটেই তো! ফতোয়া জারি করল আমেরিকা, একজনের ভাগেই বরাবর রুইমাছের মুড়োটা পড়বে, তা ঠিক নয়। তার চাইতে এখন থেকে চীনে 'ওপেন্-ডোর' বা খোলা দরজা নীতি চালু হোক। অর্থাৎ এস, আমরা সবাই মিলে এই বেওয়ারিশ মালটাকে চুষে নিঙড়ে একাকার করে দিই!

ফলে, চীনের সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও শহরগুলি লীজ নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ, কেউ যেন ভুল বুঝো না আমাদের। চীনের মূল ভূখণ্ড দখল করার বাসনা আমাদের কারুরই নেই। আমরা তার বন্দর ও শহরগুলি লীজ নিচ্ছি মাত্র।

বিপদের যেন সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেল জাপান।

উদ্দেশ্য তোমাদের খুবই মহৎ তা বুঝতে পারছি; কিন্তু এভাবে তোমরা আমাদের নাকের ডগার ওপর ঘাঁটি গেড়ে বসবে, ঐটি চলবে না। ঠিক আছে, দেখা যাবে!

আমদানী-বাণিজ্য নিয়ে শুরু হল তীব্র প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতায় প্রথমেই মার খেল ব্রিটেন। হু-হু করে তার বাজার পড়ে গেল এশিয়া ভূখণ্ডের প্রতিটি অংশে।

লাভ হল আমেরিকার। তারা শতকরা ৬ ভাগ থেকে একলাফে উঠে গেল ১৫ ভাগে। ফলে, এবার আসল বিরোধ দেখা দিল আমেরিকার সঙ্গেই।

বিরোধ আরো ঘনীভূত হল ১৯২৪ সালে আমেরিকার একটি সিদ্ধান্তের ফলে।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে অসংখ্য জাপানী শ্রমিক ও মজুরের বাস।

আমেরিকাই এককালে তাদের জাপান থেকে নিয়ে এসেছিল নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে। কারণ, শ্রমিক হিসেবে জাপানীরা যেমন কর্মপটু, তেমনিই কষ্ট-সহিষ্ণু। মজুরীও আমেরিকান মজুরদের তুলনায় অনেক কম।

১৯২৪ সালে আমেরিকার সেই সিদ্ধান্তে বলা হল অন্য কথা।

না, আর নয়। এখন থেকে কার্যত তোমাদের আমেরিকা আসা নিষিদ্ধ।

আর এখানে তোমাদের জমি-জমার মালিকানা-স্বত্বও এখন থেকে আর রইল না। সে অধিকার আজ থেকে একমাত্র আমেরিকান-দেরই। সোজা কথায়—পথ দেখ!

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা জাপান।

১লা জুলাই জাতীয় অবমাননা দিবস পালিত হল সমগ্র জাপানে। সেই সঙ্গে প্রতিটি নরনারীর মুখে শোনা গেল একই শপথ। এ অপমানের প্রতিশোধ আমরা নেব। এমন শিক্ষা দেব, যা জন্মেও কোনদিন আমেরিকা ভুলতে পারবে না।

জাপান যে কোনদিনই সে শপথ ভুলে যায়নি, তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল ঠিক দশ বছর বাদে—১৯৩৪ সালে।

হঠাৎ সেদিন তারা রব তুলল, 'হ্যাণ্ডস্ অফ্ চায়না'! চীন থেকে হাত গোটাও! সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে এসে তোমরা এখানে মাতব্বরী করবে, তা হবে না। এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য। আভি নিকালো!

১৯৩৭ সালে শুরু হল চীন-জাপান যুদ্ধ।

জাপানের অভিযোগ—রাষ্ট্র-নায়ক চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্তে

চীন নাকি ক্রমশ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির একটা শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হতে চলেছে। না, কোন বিদেশী শক্তিকে তারা ঘরের সামনে এভাবে ঘাঁটি করতে দিতে রাজী নয়।

মজা দেখাল ব্রিটিশ। সুযোগ বুঝে একদিকে তারা চীনকে সাহায্য করতে লাগল নব নির্মিত বর্মা রোড দিয়ে। অন্যদিকে জাপানও বাদ গেল না। তাদেরও তারা যথারীতি অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করতে লাগল ব্যবসার নাম করে। কারণ—আমেরিকা। আমেরিকা যেভাবে এশিয়া ভূখণ্ডে মাথা গলাতে শুরু করেছে, তা রীতিমত উদ্বেগজনক। এ অবস্থায় আমেরিকাকে রুখতে হলে জাপানকে শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন।

তবে চীন অবশ্য বেশিদিন আর সে সুযোগ পেল না। কারণ, সেই ব্রিটিশ। কিছুদিন পরে ব্রিটিশই আবার একদিন বর্মা রোড বন্ধ করে দিল জাপানী হুঙ্কারের কাছে নতি স্বীকার করে।

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। এল ১৯৩৯ সাল। শুরু হল যুদ্ধ।

মনে মনে প্রমাদ গণল ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা।

বলতে গেলে গোটা ইয়োরোপ তখন হিটলারের পদানত। এদিকে জাপানেরও মতি-গতি ভাল নয়।

সবচাইতে বড় কথা, জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে সে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ। এ অবস্থায় কখন যে সে কি করে বসবে, ঠিক কি!

কূটনীতিতে ব্রিটিশের স্থান চিরদিনই সর্বোচ্চে। তার একমাত্র লক্ষ্য তখন—আমেরিকা। রাশিয়াকে আগেই বাগানো গেছে। এখন বাকি রয়েছে আমেরিকা। সুতরাং এমন একটি মোক্ষম চাল চালতে হবে, যার ফলে আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। আমেরিকার যে অনেক টাকা!

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে আমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাষ্ট্রকে আমেরিকা কত টাকা ধার দিয়েছিল,

তার একটি ছোট্ট তালিকা তোমার কাছে তুলে ধরছি। এই তালিকা থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার স্থান কোথায়!

ইংল্যাণ্ড	১৩৩৫,৯০০০০০০	টাকা
ফ্রান্স	১২০৭,৫০০০০০০	”
ইতালী	৬০৬,৬০০০০০০	”
বেলজিয়াম	১২২৪,৫৪০০০০০	”
রাশিয়া	৮৮,১৯৯৮৮৯৯	”
পোল্যাণ্ড	৬২,৩৩৩৮৫৭৮	”
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫১,৯২১৩০৬৯	”
রুমানিয়া	১৯,৫৪৮১৬৮০	”
যুগোশ্লোভিয়া	১৮,৬৭৫০০০০	”
গ্রীস	৯,৭২৯৬০০০	”
অষ্ট্রিয়া	৭,৩৮৪৪৬৫৫	”
হাঙ্গেরী	৫৭৯৪৬৮০	”
মোট,	৪৬৩২,৯১,১৭,৫৬১	টাকা

এহেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দলে পাবার জন্য কূটনীতি-বিশারদ ব্রিটিশ যে সেদিন চালাচালির ব্যাপারে একটু বেশি রকমই তৎপর হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

চাল দেওয়া হল ১৯৪১ সালের ২৫শে জুলাই।

হঠাৎ সেদিন এক আদেশ জারি করে জাপানীদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি আটক করা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র। অবাধ্য জাপানীদের কিঞ্চিৎ বাধ্য করার জন্য এ ছাড়া নাকি আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিরও উচিত এই একই পন্থা অবলম্বন করা।

চাল ব্যর্থ হল না। পরদিনই তাদের সেই পন্থা অবলম্বন করলেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট। ঠিকই বলেছে ব্রিটিশ। বড্ড বাড় বেড়েছে ঐ ক্ষুদে জাপানীদের। এবার বোঝ মজা!

জাপানও বসে রইল না। সঙ্গে সঙ্গে তারাও আটক করল ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যাবতীয় সম্পত্তি।

আশ্চর্য, তারপরেই একেবারে গুড বয়! না, আমরা কারো সঙ্গে বিবাদ চাই নে। এস, আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটা আপসে মিটিয়ে নেওয়া যাক!

আলোচনা শুরু হল আমেরিকার ওয়াশিংটনে। একদিকে টোকিও থেকে প্রেরিত বিশেষ দূত মিঃ কুরুসো ও রাজদূত অ্যাডমিরাল নোমুরু, অন্যদিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল ও পারিষদবর্গ।

মাসের পর মাস পেরিয়ে গেল, তবু আলোচনা আর শেষ হল না।

হবার কথাও নয়। কারণ, বাইরে আপস-আলোচনার ভান করলেও ভেতরে ভেতরে জাপান তখন এগিয়ে চলেছে চরম পরিণতির দিকে।

জবাব দিতে হবে। এমন জবাব দিতে হবে, যা ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা কোনদিনই যেন ভুলে না যায়।

জবাব দিল ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। রবিবার, সকাল ঠিক আটটায়। ওদিকে তখনো ওয়াশিংটনেসে ই আপস-আলোচনা চলছে একইভাবে।

সৌন্দর্যের লীলাভূমি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার।

যেমন ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি সিঙ্গাপুর, তেমনি আমেরিকার পার্ল হারবার। দুটোই সমান উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরের মোট ছিয়াশিখানা জাহাজ সেদিন নোঙর করা ছিল পার্ল হারবারে।

তার মধ্যে বড় ব্যাটলশিপই ছিল আটখানা। নেভাদা, ওয়েস্ট

ভার্জিনিয়া, আরিজোনা, ওকলাহোমা, ক্যালিফোর্নিয়া, মেরীল্যাণ্ড, টেনেসি ও পেনসিলভানিয়া।

সাতখানা ক্রুজার, আটাশখানা ডেস্ট্রয়ার। সাবমেরিন পাঁচটি। তাছাড়া মাইন পাতা জাহাজ ও অন্যান্য শ্রেণীর জাহাজ ছিল অসংখ্য।

৬ই ডিসেম্বর। রাত তখন অনেক, তবু আনন্দ-স্রোতের এতটুকু বিরাম নেই।

বেশির ভাগ নাবিক ও অফিসারই তখন তীরে নেমে গিয়েছে জাহাজ ছেড়ে। কেউ সিনেমায়, কেউ পানশালায়, কেউ নাইট-ক্লাবে। কেউ কেউ অধিকতর আনন্দের খোঁজে।

ব্ল্যাক-আউটের কোন বালাই নেই। যুদ্ধ চলছে ইয়োরোপে। এখানে সে-সব কোন প্রশ্ন নেই। সুতরাং সবাই নিশ্চিন্ত। যেমন খুশি খাও-দাও ফূর্তি কর, কারো কিছু বলার নেই।

রাত শেষ হয়ে আসছে। শুধু একটি মাত্র ডেস্ট্রয়ার 'ওয়ার্ড' তখন পাহাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছিল পার্ল হারবারের অদূরে। এবার তারও ঘাঁটিতে ফেরার পালা।

প্রথমে খবর দিল একটি মাইন সুইপার। সে নাকি কিছুক্ষণ আগে একটি অজ্ঞাত-পরিচয় সাবমেরিন দেখতে পেয়েছে।

খানিকটা খোঁজাখুঁজি হল এখানে-ওখানে, কিন্তু কোথায় সাবমেরিন!

না, কোথাও কিছু নেই। নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে মাইন সুইপার।

কিছুক্ষণ বাদে সেই একই খবর দিল 'আণ্টোয়ার্প'। সে-ও নাকি একটা সাবমেরিন দেখতে পেয়েছে খানিকক্ষণ আগে। আর সাবমেরিন আটকাবার জন্য জলের নিচে বিছানো লোহার জালটাও নাকি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। কি ব্যাপার!

সকাল সাতটা। এবার দেখতে পেল পাহারাদার জাহাজ 'ওয়ার্ড' নিজেই। হ্যাঁ, সাবমেরিন। ঐ যে জলের ওপরে তার পেরিস্কোপটা দেখা যাচ্ছে! রেডি! ডেপ্‌থ্‌চার্জ!

সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো আওয়াজ—দ্রাম্! পেরিস্কোপটা আর দেখা গেল না। সাবমেরিনটা ঘায়েল হল কিনা তাও ঠিক বোঝা গেল না।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ।

হঠাৎ কি দেখে বিমান-বন্দরের রাডার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মীটি চমকে উঠলেন দারুণ ভাবে। রাডারের পর্দায় কিসের যেন কতগুলো রূপালী ফুট্‌কি ফুটে উঠেছে অস্পষ্ট ভাবে। কি ওগুলো?

হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো ইনফরমেশন সেণ্টার! আমি রাডার স্টেশন থেকে কথা বলছি। কিসের যেন কতগুলো অস্পষ্ট ফুট্‌কি দেখা যাচ্ছে রাডারের পর্দায়। এখনো প্রায় পৌনে ছশো মাইল দূরে রয়েছে। মনে হয় একঝাঁক বিমান।

তোমার মাথা! ব্রেকফাস্ট করতে করতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলেন ইনফরমেশন সেণ্টারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ। রাত্রির নেশাটা এখনো কাটেনি বুঝি

বিশ্বাস করুন, আমি নেশার ঝোঁকে বলছি নে! সত্যিই একঝাঁক বিমান ক্রমেই এদিকে এগিয়ে আসছে!

আসতে দাও।

প্লীজ, আমার কথা বিশ্বাস করুন! সত্যিই একঝাঁক বিমান এগিয়ে আসছে! একটি ছুটি নয়, অসংখ্য। এদিকেই আসছে।

আসুক না! নিশ্চয় আমাদেরই বিমান। কোন বিমানবাহী জাহাজ থেকে আকাশে উঠে ট্রায়াল দিচ্ছে হয়তো।

দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। মাই গড! এ যে জাপানী প্লেন দেখছি!

হোয়াট! জাপানী প্লেন

খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-ফুর্তির ব্যাপারে আমেরিকান সৈন্যদের দক্ষতা বরাবরই অপরিসীম।

এবারও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। ফলে, ব্রেকফাস্ট

শেষ করে কোমরে বেল্ট বাঁধতে না বাঁধতেই শুরু হল প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণ।

প্রথমেই বোমা পড়ল ২৯,০০০ টনের বিরাট ব্যাটলশিপ 'নেভাদা'র ওপর।

নেভাদা তখন জাতীয়-সঙ্গীত বাজিয়ে পতাকা তুলছিল তার মাস্তুলের শীর্ষে। কিন্তু কার্যত তা আর হল না। তার আগেই বিরাটকায় যুদ্ধ-জাহাজটা হঠাৎ কেঁপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে।

তারপর শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস! একবার নয়, দফায় দফায়, ঝাঁকে ঝাঁকে। একটানা পৌনে দু ঘণ্টা ধরে। শুধু মৃত্যু আর বিভীষিকা!

শুরু হয়েছিল সকাল আটটায়। কাজ শেষ করে বিমান-বহর ফিরে গেল ঠিক ন'টা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

কোথায় তখন আমেরিকার বহু-আলোচিত শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার! বিরাট একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া তখন আর কিছুই বলা যায় না তাকে।

ক্ষয়-ক্ষতির অঙ্কটাও বিরাট। মোট আটখানা ব্যাটলশিপ ছিল, তা আগেই বলেছি। তার মধ্যে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া (৩২,০০০ টন), ক্যালিফোর্নিয়া (৩২,০০০ টন), আরিজোনা (৩২,০০০ টন), ওকলাহোমা (২৯,০০০ টন) আর নেভাদা (২৯,০০০ টন)—এই পাঁচখানা ব্যাটলশিপই সেদিন তলিয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে।

বাকি তিনটিও এমন মারাত্মকভাবে জখম হল যে, সামরিক দিক থেকে তাদের আর কোন মূল্যই রইল না।

ডেস্ট্রয়ার হারাতে হল মোট তিনটি। ক্রুজারও তাই। ক্ষতিগ্রস্ত আরো দুটি। মাইন পাতা জাহাজ গেল দুটি। ভাসমান ড্রাই ডক একটি।

নৌ-বিভাগীয় ২৩২টি বিমানের মধ্যে ধ্বংস হল ৮০টি। অকেজো

আরো ৭০টি। সৈন্য-বিভাগীয় ২৭৩টি বিমানের মধ্যে ধ্বংস হল মোট ৯৭টি।

হতাহতের সংখ্যাও রীতিমত ভয়াবহ। কেবল মাত্র নৌ-বিভাগের নিহত সৈন্যসংখ্যাই হল মোট ২,১১৭ জন। নিখোঁজ ৯৬০ আর আহত ৮৭৬ জন। সেনা বিভাগের নিহত ২২৬ জন আর আহত ৩৯৬ জন।

জাপানীদের ক্ষয়-ক্ষতি খুবই নগণ্য। মোট ৩৬৩টি বিমান অংশ-গ্রহণ করেছিল পার্ল হারবারের সেই অভিযানে। তার মধ্যে হারাতে হয়েছে মাত্র ২৯টি বিমান।

ওদিকে খাস আমেরিকায় বসে দুপক্ষের মধ্যে আপস-আলোচনা তখনও সেই একই ভাবে চলছে। সেই সঙ্গে খানা-পিনা ও যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন। আর বিবাদ নয়। এখন থেকে অহিংসাই হবে আমাদের দুটি রাষ্ট্রের একমাত্র মূলধন।

হঠাৎ পৃথিবীর সবগুলি বেতার-কেন্দ্র আর্তনাদ করে উঠল সমস্বরে।

ওয়ার! ওয়ার! ওবাহু বম্বড্ বাই জাপানীজ প্লেন! জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে! পার্ল হারবার বিধ্বস্ত!

পরদিনই আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপান, তথা ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে। জার্মানীও পালটা-যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকার বিরুদ্ধে। ফলে, শুধু ইয়োরোপ নয়, দেখতে দেখতে এশিয়া ভূখণ্ডেও এবার যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল বিস্তৃতভাবে।

খবর শুনে আনন্দে নেচে উঠলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল। জাল পাতা সার্থক হয়েছে। শিকার নিজে থেকেই এসে সে জালে ধরা দিয়েছে। এবার আর পায় কে!

কি মারটাই না এতদিন খেতে হয়েছিল হিটলারের হাতে!

ভাগ্যিস রাশিয়া ছিল! নইলে কবে বোধহয় মরে ভূত হয়ে যেতে হত!

এবার এসেছে আমেরিকা। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি এখন আড়ালে গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়া চলবে। তারপর দেখা যাবে ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়। গড্ সেভ দি কিং! আর ভয় নেই।

'Timing is the first act of war.'

রণ-নীতির এই মতবাদের নির্ভুল নিদর্শন ইতিপূর্বে দেখিয়েছিল জার্মানী। এবার দেখাল জাপান।

ব্রিটিশ নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। কি নৌ-বহর, কি বিমান-বহর সব কিছু এখন তার নিযুক্ত রয়েছে দেশরক্ষার কাজে।

আমেরিকার অবস্থাও তাই। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ না দিলেও তার নৌ-বহরের বেশির ভাগ অংশই এখন ব্যস্ত রয়েছে ব্রিটিশকে নানাবিধ যুদ্ধ-সরঞ্জাম এবং খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের কাজে। সুতরাং এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ!

পরিকল্পনা মতো প্রথমেই তারা আঘাত হানল প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবারের ওপর। সেই সঙ্গে আক্রান্ত হল হংকং, গুয়াম, ওয়েক ও ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা। একই তারিখে তারা অধিকার করে নিল চীনের অন্যতম বৃহত্তম নগরী সাংহাই।

তারপর শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়! এমন কি, জার্মানীর দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনীও বুঝি হার মেনে গেল তাদের সেই বিস্ময়কর অগ্রগতির কাছে।

পার্ল হারবার আক্রান্ত হল ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে।

পরদিন শুধু আমেরিকা নয়, কানাডা, ওলন্দাজ উপনিবেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডও যুদ্ধ ঘোষণা করল ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে। শুরু হল বিশ্বযুদ্ধ।

ওদিকে জাপানীরা ততক্ষণে ফরাসী ইন্দোচীন থেকে ঢুকে পড়েছে

থাইল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে। আর একদল মালয়ের সিঙ্গোরা ও পাটানী বন্দরে।

৯ই তারিখে অধিকার করা হল গিলবার্ট দ্বীপ।

আর ১০ই! সেই চরম পরাজয়ের কাহিনী ব্রিটিশ বোধহয় জীবনেও কোনদিন ভুলতে পারবে না, মল্লিকা।

ব্রিটিশ নৌ-বহরের সবচাইতে শক্তিশালী ব্যাটলশিপ 'প্রিন্স অফ ওয়েল্স' এবং 'রিপাল্স্' তখন সিঙ্গাপুরে।

মাত্র সপ্তাহখানেক আগে (২রা ডিসেম্বর) জাহাজ দুটি সিঙ্গাপুরে এসে নোঙর ফেলেছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে। জাপানীদের মতি-গতি ভাল নয়। সুতরাং প্রস্তুত থাকাই ভাল।

প্রিন্স অফ ওয়েল্স মাত্র দু বছর আগে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ৩৫ হাজার টনের বিরাট ব্যাটলশিপ। গতিবেগও তার বিস্ময়কর। ৩০ নটেরও বেশি।

অস্ত্র-সজ্জাও বিরাট। চৌদ্দ ইঞ্চি ব্যাসের বিরাটাকার কামানের সংখ্যাই রয়েছে মোট দশটি। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন আকারের আরো ষোলটি কামান। এক কথায়—দুর্ভেদ্য একটি ভাসমান দুর্গ।

সত্যিই দুর্ভেদ্য। শুধু অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও। বিশেষ করে আত্মরক্ষার ব্যাপারে। ষোল ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের বর্ম দিয়ে তার পুরো খোলটাকে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, হাজার গুলি-গোলা নিক্ষিপ্ত হলেও তাতে ক্ষয়-ক্ষতির কোন প্রশ্ন নেই।

৩২ হাজার টনের অতিকায় ব্যাটলশিপ রিপাল্স্ও কম যায় না। সেখানেও পনেরো ইঞ্চি ব্যাসের কামান রয়েছে মোট ছ'টি। আর চার ইঞ্চি ব্যাসের রয়েছে সব মিলিয়ে বারোটি।

অ্যাডমিরাল স্যার টম ফিলিপস্ তখন প্রাচ্য সমুদ্রের ব্রিটিশ নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি।

জাপানীদের মালয় অভিযানের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাহাজ দুটিকে আদেশ দিলেন নোঙর তুলতে। বড্ড বাড় বেড়েছে ঐ ক্ষুদে জাপানীগুলোর! দেখা যাক কত শক্তি ওরা ধরে! চলো এবার মালয় উপকূলের দিকে! কুইক!

প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ ভেঙে ক্রমশ প্রিন্স অফ ওয়েল্স ও রিপাল্স্ এগিয়ে চলল মালয়ের দিকে। জাপানীদের শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা দিতে হবে যে, জন্মেও যেন ওরা সেকথা ভুলে না যায়।

দিনটা ছিল মঙ্গলবার। সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে টিপ্ টিপ্ করে। আকাশে যেমন মেঘ, তেমনি কুয়াশা। শত্রুর সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে হলে এই আবহাওয়া খুবই কার্যকরী।

মেঘ কেটে গেল বিকেলের দিকে। তারপর দেখতে দেখতেই একসময়ে মহাসাগরের বুক লাল হয়ে গেল সূর্যাস্তের রঙে। দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশির বুকে শুধু রঙ আর রঙ!

ঠিক তখনই প্রশান্ত মহাসাগরের জল ফুঁড়ে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াল একটা সাবমেরিনের পেরিস্কোপ।

তবে বেশিক্ষণ নয়। মুহূর্ত বাদেই আবার একসময়ে সেই পেরিস্কোপটা তলিয়ে গেল সাগরের জলে। কি প্রিন্স অফ ওয়েল্স, কি রিপাল্স্, কারোরই তা নজরে এল না।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ। প্রিন্স অফ ওয়েল্স ও রিপাল্স্ তখন সেই একই ভাবে এগিয়ে চলেছে মালয় উপকূলের দিকে।

সহসা একসময়ে জাহাজের সবগুলি বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন একসঙ্গে বেজে উঠল আর্তস্বরে,—উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ...

সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল জাহাজ দুটির সর্বত্র।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! জাহাজের রাডার-যন্ত্রে একটা সাদা

ফুট্‌কি ধরা পড়েছে। জাপানী প্লেন! একটা জাপানী প্লেন এগিয়ে আসছে এদিকে!

জাপানী প্লেন! তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন অ্যাডমিরাল স্যার টম ফিলিপস্, তাও কিনা মাত্র একটা! তা, আসুক না! একটা কেন, একসঙ্গে হাজারটা প্লেন এলেও প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স-এর ওরা কিছুই করতে পারবে না। তাছাড়া বিমান-ধ্বংসী কামানগুলি তৈরিই আছে। কি করে ঐ নিপ্পনগুলোকে জবাব দিতে হয়, তারা তা ভাল করেই জানে।

বিমানটা কিন্তু একবারও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এল না, মল্লিকা। পাল্লার বাইরে থেকে বার কয়েক চক্কর খেয়ে আবার একসময়ে সে ফিরে গেল নিজের গন্তব্য পথে।

নিশ্চিন্ত মনে জাহাজ দুটি আবার সেই একই ভাবে এগিয়ে চলল মহাসমুদ্রের ঢেউ ভেঙে।

মাত্র কিছুক্ষণ। তারপরই একসময়ে রিপাল্‌স্ থেকে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম টেন্যান্ট-এর গলা ভেসে এল লাউড-স্পীকারে,—আমার মনে হয় কেউ যেন আড়াল থেকে আমাদের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে।

একথা মনে হবার কারণ? প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স থেকে প্রশ্ন করলেন স্যার টম ফিলিপস্, তুমি কি দেখতে পেয়েছ কিছু?

না, পাইনি। তবে সন্দেহ হচ্ছে।

ঠিক বলেছ তুমি। আমারও ধারণা তাই। ঠিক আছে, জাহাজের মুখ ঘোরাও। কাজ নেই মালয়ে গিয়ে। তার চাইতে আবার ফিরে চলো সেই সিঙ্গাপুরে। আর জাহাজের সবগুলো কামান রেডি রাখো।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স ও রিপাল্‌স্ আবার ফিরে চলল সিঙ্গাপুরের দিকে। চুলোয় যাক মালয়। এখন কোনরকমে একবার সিঙ্গাপুরে যেতে পারলে তবেই নিশ্চিন্ত।

প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। দুঃস্বপ্নে ভরা ভয়ঙ্কর রাত্রি।

কারো চোখে ঘুম নেই। সবাই জেগে রয়েছে একটা চাপা উদ্বেগ বুকে নিয়ে।

মনে হয়, কিসের যেন একটা নীরব ধ্বংস আর নিষ্ক্রিয় প্রাণহীনতা মুখ বুজে অপেক্ষা করছে মহাসাগরের প্রতিটি অংশে। কিছুতেই যেন তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

মাঝে মাঝে কানে আসে দূরাগত কোন বিমানের শব্দ—বোঁ-বোঁ-বোঁ-ও-ও-ও! তারপরই সব চুপ। একটানা ঢেউ ভাঙার শব্দ ছাড়া আর কিছুই তখন শোনা যায় না আশে-পাশে।

এমনি করে লুকোচুরি খেলতে খেলতে একসময়ে অন্ধকার তরল হয়ে এল একটু একটু করে। পুব আকাশে দেখা দিল নতুন দিনের নতুন সূর্য। ঠিক সূর্য-লাঞ্ছিত জাপানী জাতীয় পতাকার মতোই।

প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স ও রিপাল্‌স্ তখন এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ চীনসাগরের ওপর দিয়ে।

হঠাৎ আবার সেই সাইরেনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ!

জাহাজের রাডারের পর্দায় আবার সেই রূপালী ফুট্‌কি। তবে এবার আর একটি নয়, মোট ষাটখানা।

প্রথমে পর্যবেক্ষণকারী বিমান। ঠিক তার পেছনেই জাপানের সবচাইতে শক্তিশালী 'মিৎসুবিসি ৯৬' ডাইভ বম্বার।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! লাউড-স্পীকারে সতর্কবাণী শোনা গেল প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স থেকে, সবাই প্রস্তুত হও! সবগুলো বিমান-ধ্বংসী কামান রেডি কর! এসে পড়েছে! আরো কাছে! চার্জ!

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! না, সুবিধে হল না। প্রায় সতেরো হাজার ফিট উঁচুতে রয়েছে বিমানগুলি। এতদূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা সহজ কথা নয়।

বুম্-ম্-ম্-ম্! সহসা প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স কেঁপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। কি হল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া

আর ধোঁয়া। সব কিছুই বুঝি ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

বোঝা গেল ধোঁয়া সরে যাবার পরে। না, তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। হবার কথাও নয়। দু পাশে তার ষোল ইঞ্চি ইস্পাতের বর্ম। সুতরাং সামান্য একটা বোমা তো তার কাছে কিছুই নয়।

স্‌স্‌স্‌স্‌···শব্দ শুনে সহসা কি দেখে চমকে উঠল জাহাজের প্রতিটি প্রাণী।

সমুদ্রের জল কেটে কি ওটা ছুটে আসছে বিদ্যুৎগতিতে!

সর্বনাশ! এ যে টর্পেডো! একটা দুটো নয়। ডাইনে-বাঁয়ে, এখানে-ওখানে, অসংখ্য টর্পেডো। শীগগির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাও এঁকে-বেঁকে! কুইক!

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? কারণ, টর্পেডো চার্জ করার ব্যবস্থা থাকে একমাত্র সাবমেরিনেই। অথচ সেই টর্পেডো ওরা কিনা ক্রমাগত নিক্ষেপ করে চলেছে বিমান থেকে! এ যে বিশ্বাস করা শক্ত! দেখালে বটে ক্ষুদে জাপানীগুলো!

যেতে যেতে হঠাৎ একসময়ে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স সিগন্যাল দিল রিপাল্‌স্‌কে। খবর কি! কোনরকম জখম হওনি তো টর্পেডোর ঘায়ে?

না, এখনো হইনি। তেমনি ভাবেই সিগন্যালে জবাব দিল রিপাল্‌স্‌, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এ পর্যন্ত উনিশটা এড়াতে পেরেছি। তবে শেষ পর্যন্ত পারব কিনা জানি নে। তোমার খবর ভাল তো?

হ্যাঁ, ভাল।

ড্রাম! বলতে না বলতেই সহসা একটা টর্পেডো তীব্রবেগে ছুটে গিয়ে আঘাত করল প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স-এর শক্ত ইস্পাতের বর্মটার গায়ে। কিন্তু সব বৃথা। ভেতরের খোল তার অক্ষতই রয়ে গেল আগেকার মতো।

এমনি করে পুরো তিন ঘণ্টা, তবু কিছুতেই কিছু হল না। অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

জাপানীরা তখন মরিয়া। ইতিমধ্যে তাদের মোট ছ'খানা বিমান হারাতে হয়েছে বিমান-ধ্বংসী গোলার ঘায়ে, তবু তারা ভ্রূক্ষেপহীন।

ব্রিটিশ নৌ-বহরের সবচাইতে শক্তিশালী ব্যাটলশিপ প্রিন্স অফ ওয়েল্স ও রিপাল্স্‌কে আজ বাগে পাওয়া গেছে। যে করে হোক, খতম ওদের করতেই হবে। এ সুযোগ কিছুতেই হারালে চলবে না।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব!

বর্ম দিয়ে ঘেরা ঐ প্রিন্স অফ ওয়েল্স যে অপরাজেয়! বোমা, টর্পেডো সব কিছুই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ওর দুর্ভেদ্য বর্মের গায়ে লেগে! এ অবস্থায় ওকে ঘায়েল করার উপায় কি?

একটা উপায় আছে। ওর ঐ বিরাট চিমনিটার মধ্য দিয়ে বোমা বা টর্পেডো গলিয়ে দিতে পারলে সেগুলো হয়তো সরাসরি এঞ্জিন-ঘরে নেমে গিয়ে বিরাট বিস্ফোরণের সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু এত উঁচু থেকে এমন নির্ভুল নিশানায় বোমা বা টর্পেডো গলিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে কি! দেখা যাক!

হঠাৎ একঝাঁক 'মিৎসুবিসি ৯৬' বিমান ছোঁ মেরে নিচে নেমে এল প্রিন্স অফ ওয়েল্স-এর ঠিক মাথার ওপর। তারপরই শুরু হল আসল লড়াই।

বোমারুর লক্ষ্য, জাহাজের বিরাটাকার চিমনি দুটি। বিমান-ধ্বংসী কামানগুলি তাদের সে সুযোগ দিতে রাজী নয়। কারণ, গোটা জাহাজের মধ্যে একমাত্র দুর্বল জায়গা হল ঐ চিমনি দুটিই। ওখান দিয়ে বোমা বা টর্পেডো ভেতরে গলিয়ে দিতে পারলে আর রক্ষা নেই।

জাপানীরা জাত-যোদ্ধা। কথায় কথায় হারিকিরি করতে তাদের জুড়ি নেই। মৃত্যু যেন তাদের কাছে একটা খেলা মাত্র।

কথাটা যে কতবড় সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল মুহূর্ত বাদেই।

কোনরকমেই লক্ষ্যভেদ করতে না পেরে হঠাৎ একসময়ে পর পর কয়েকটা জাপানী বিমান গোঁত্তা খেয়ে সশব্দে গিয়ে আছড়ে পড়ল জাহাজের বিরাট চিমনিগুলির ওপর। এবার! এবার কোথায় যাবে তোমরা! আমরা মরব ক্ষতি নেই, তা বলে তোমাদেরও ছেড়ে দেব না।

এবার কাজ হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অতিকায় প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স জাহাজটা দুলে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। তারপর শুধু বিস্ফোরণ আর বিস্ফোরণ! একটার পর একটা। অসংখ্য!

রিপাল্‌স্‌-এর অবস্থা আরো শোচনীয়। আঘাতে আঘাতে তখন তার শেষ অবস্থা। বেশ বোঝা গেল যে, তার অন্তিমকাল আসন্ন।

হেল্প! হেল্প! হেল্প! বেতার-তরঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত।

প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স একপাশে কাত হয়ে পড়েছে। হু-হু করে জল ঢুকছে জাহাজের খোলে। ডুবে যেতে আর বেশি দেরি নেই। রিপাল্‌স্‌-এর অবস্থাও তাই। প্লীজ হেল্প!

রিপাল্‌স্‌-এর ডেকের চারপাশে তখন মৃতদেহের স্তূপ। জাহাজ হেলে পড়েছে একপাশে। তারই মধ্যে একফাঁকে জাহাজের ক্যাপ্টেন টেন্যান্টের শেষ নির্দেশ শোনা গেল মাইক্রোফোনে,—'All hands on deck. Prepare to abandon ship. God be with you!'

নির্দেশ মতো সবাই এসে জাহাজের ডেকে দাঁড়াল সারি দিয়ে। তারপরই ভগবানের নাম স্মরণ করে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু ডেক থেকে তৈল-সিক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক এক করে।

প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সও আর বেশিক্ষণ নয়। মাত্র মিনিট দশেক। তারপরই পৃথিবীর বিস্ময় বিরাটাকার সেই যুদ্ধ-জাহাজটা ভুস্‌ করে

কোথায় তলিয়ে গেল অসংখ্য লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে—আর তাকে দেখা গেল না।

জাহাজ দুটিতে লোক-লস্করের সংখ্যা ছিল মোট ২,৯২৫ জন। তার মধ্যে উদ্ধারকারী জাহাজের হাতে রক্ষা পেল মোট ২,৩০০ জন। বাদ বাকি সবাই হারিয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জলে।

ব্রিটিশ নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল স্যার টম ফিলিপস্ এবং প্রিন্স অফ ওয়েল্স-এর ক্যাপ্টেন জে. সি. লীচও রক্ষা পেলেন না। কোথায় যে তাঁদের দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

বেঁচে গেলেন রিপাল্স্-এর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন উইলিয়াম টেন্যাণ্ট। শেষ পর্যন্ত তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন উদ্ধারকারী একটা ডেস্ট্রয়ারের সাহায্যে।

প্রিন্স অফ ওয়েল্স এবং রিপাল্স্ ডুবে গেল। ফল হল সুদূর-প্রসারী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভাষায়ঃ

'...Their loss alters the whole balance of naval power in Malayan waters in favour of Japan.'

অর্থাৎ, জাহাজ দুটি হারানোর ফলে নৌ-শক্তির ভারসাম্যের একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল এবং তার সবটুকুই গেল জাপানের অনুকূলে।

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। একদিকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার বিধ্বস্ত। অন্যদিকে ব্রিটিশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটলশিপ প্রিন্স অফ ওয়েল্স ও রিপাল্স্ নিমজ্জিত। সমুদ্রপথ খোলা পেয়ে জাপান যে এই সুযোগে বন্যার মতো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর বিচিত্র কি!

হলও তাই। প্রিন্স অফ ওয়েল্স ও রিপাল্স্ নিমজ্জিত হল ১০ই ডিসেম্বর। ১১ই তারিখে গুয়াম দ্বীপ চলে গেল জাপানীদের দখলে। কোনদিক থেকেই তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হল না তেমনভাবে।

কারণ, রণনীতির সেই নিভুল মতবাদ—'Timing is the first act of war !'

ঠিক সময় বুঝে এমন এক মুহূর্তে জাপান আঘাত হেনেছে যে, তাল সামলানো কঠিন। এ অবস্থায় বাধা দিতে চাইলেই বা ইঙ্গ-আমেরিকার পক্ষে সে সাধ্য তখন কোথায় !

১৪ই তারিখে জাপানী সৈন্য অবতরণ করল ফিলিপাইনের দক্ষিণ অঞ্চল লুজন এবং দক্ষিণ বর্মার সীমান্ত-বরাবর ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে। অন্যদিকে হংকং-এর ওপরও তখন আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে ব্যাপকভাবে।

১৫ই তারিখে হংকং অবরুদ্ধ হল চারিদিক থেকে। শুধু জলপথে নয়, স্থলপথেও।

হংকং ও চীনের তীরভূমি প্রায় পাশাপাশি। ব্যবধান বলতে মাঝখানে সংকীর্ণ একটি জলপথ মাত্র। তারই উত্তর প্রান্তে কৌলুন।

প্রথমেই জাপানীরা কৌলুন অধিকার করে নিল চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে এগিয়ে এসে। পরবর্তী লক্ষ্য—হংকং।

অন্যদিকে পদানত হতে হল বোর্ণিও দ্বীপের সারাওয়াকে। উদ্দেশ্য—মার্কিন এবং ব্রিটিশ নৌ-বহরকে একসঙ্গে মিলতে না দেওয়া।

হংকং-এর পরিস্থিতি তখন সত্যিই গুরুতর।

কৌলুনের পাহাড়ের ওপর কামান বসিয়ে জাপানীরা তখন অবিশ্রান্ত ভাবে গোলা-বর্ষণ করে চলেছে হংকং-এর ওপর। সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে তাদের নৌ-বহরের কামানগুলি। সেই সঙ্গে বিমান থেকে একটানা বোমা-বর্ষণ।

অন্যদিকে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে উত্তর মালয় ও বর্মার দক্ষিণে অবস্থিত সেই ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে।

দক্ষিণ বর্মা বা উত্তর মালয়, কোনটাই বড় যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। কারণ, এ জায়গাগুলো যেমন জঙ্গল-পাহাড়ে আচ্ছন্ন, তেমনি রাস্তা-ঘাটও অত্যন্ত কম ও সংকীর্ণ।

কিন্তু জঙ্গল-যুদ্ধে অভিজ্ঞ জাপ-যোদ্ধাদের কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। তাই সব কিছু প্রাকৃতিক বাধাকে উপেক্ষা করে ক্রমশই তারা এগিয়ে চলেছে মালয় ও বর্মার অভ্যন্তরে। প্রতিটি জায়গায় ব্রিটিশ বাহিনীকে মান বাঁচাতে হয়েছে 'সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ' করে।

সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ! কথাটার সেদিন খুবই প্রচলন হয়েছিল, মল্লিকা। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে।

এর মূলে ছিল রেডিও থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ। রোজ সেই একই কথা। 'অমুক জায়গা থেকে আমাদের সেনা বাহিনী শত্রুর প্রভূত ক্ষতি করে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছে।'

তবে কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে নয়, মল্লিকা। গত যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী প্রায় প্রতিটি রণাঙ্গন থেকে যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছিল, ইতিহাসে তার খুব একটা নজীর আছে বলে আমার জানা নেই।

২১শে ডিসেম্বর জাপানীরা অবতরণ করল ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপে। ২২শে ওয়েক দ্বীপে।

তারপরই একদিন তাদের বিমান-বহর হানা দিল খাস রেঙ্গুনের ওপর। তারিখটা ছিল ২৩শে ডিসেম্বর।

হঠাৎ সেদিন শহরের সবগুলো বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন আর্তনাদ করে উঠল বিকট স্বরে—উঁ-উঁ-উঁ-উঁ··· !

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সাজ-সাজ রব। বিমান! বিমান! বিমান! জাপানী বিমান আসছে! ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে। সবাই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নাও। কেউ বাইরে থেকো না। হুঁশিয়ার!

তখনো পর্যন্ত বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণা রেঙ্গুন-বাসীদের ছিল না। তাই মজা দেখার জন্য বহু লোক বাইরে বেরিয়ে এল সতর্কবাণী উপেক্ষা করে।

ফল হল মারাত্মক। অন্তত হাজার কয়েক লোককে সেদিন প্রাণ হারাতে হল বোমা ও মেশিনগানের গুলিতে।

ওদিকে সাত দিন আত্মরক্ষার পর হংকং আত্মসমর্পণ করল ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে।

না করে উপায়ও ছিল না।

প্রথম প্রশ্ন পানীয় জল। হংকং-এর পানীয় জল সরবরাহ নির্ভর করে পাহাড়ের ওপর স্থাপিত জলাধারগুলির ওপর। সব কিছুই তখন জাপানীদের দখলে। খাদ্য-ভাণ্ডারও তাই। বাধ্য হয়েই তখন হংকং-এর গভর্ণর স্যার মার্ক ইয়ং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন জাপানীদের কাছে।

শুধু হংকং নয়। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত পেনাং-এর নৌ-ঘাঁটিও একদিন চলে গেল জাপানীদের দখলে।

তবে পেনাং-এর চাইতেও হংকং-এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটির দ্বার-রক্ষী হিসেবে হংকং ছিল অপরিহার্য। হংকং চলে যাওয়ায় জাপানীরা যে এবার খাস সিঙ্গাপুরের দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

তবে কার্যত তা কতখানি সম্ভব হবে বলা শক্ত। কারণ, সিঙ্গাপুর সত্যিই দুর্ভেদ্য নৌ-ঘাঁটি। বিশেষ করে উপকূলভাগ তার অত্যন্ত সুরক্ষিত। এ অবস্থায় জাপান এত বড় ঝুঁকি নিতে রাজী হবে কি?

হংকং জয় করা হল ২৫শে ডিসেম্বর। তারপর শুধু জয় আর জয়! একটানা জয়।

২রা জানুয়ারি জয় করা হল ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা। ১১ই মালয়ের প্রধান নগর কুয়ালালামপুর। ১৮ই টেভয়।

২২শে তারিখে জাপ ও মার্কিন নৌ-বহরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল ম্যাকাসার প্রণালীতে। ওলন্দাজ সাবমেরিন ও বিমান-বহরও সেই যুদ্ধে যোগ দিল মার্কিনদের সঙ্গে।

যুদ্ধ চলল একটানা চার দিন ধরে। মোট চারটি সৈন্যবাহী জাহাজ এ যুদ্ধে হারাতে হল জাপানকে। মার্কিনদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অজ্ঞাত।

২৩শে জানুয়ারি নিউগিনির রাবাউল চলে গেল জাপানীদের দখলে।

২৪শে তারিখে নতুন অভিযান শুরু হল দক্ষিণ বোর্ণিও এবং সেলিবিস দ্বীপের কেণ্ডারীতে।

৩০শে তারিখে পতন হল ওলন্দাজ নৌ-ঘাঁটি আম্বয়নার।

একই অবস্থা চলছে তখন মালয়ে। দুর্গম পাহাড়, জঙ্গল, জলাভূমি, নদী ইত্যাদি সব কিছু প্রাকৃতিক বাধা অগ্রাহ্য করে সর্বত্র জাপানীরা এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে।

সর্বত্র ব্রিটিশ বাহিনীর সেই একই অবস্থা। অর্থাৎ, সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। একমাত্র পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া বুঝি সেদিন আর কোন কাজই ছিল না ব্রিটিশ বাহিনীর।

তার কারণও অবশ্য ছিল। প্রধান কারণ—শক্তির অসমতা। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির তুলনায় সেদিন জাপানীদের শক্তি ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে, বিমান-শক্তিতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ছিল খুবই দুর্বল।

অন্যদিকে জাপান ছিল এ ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী।

বিমান-শক্তিতে জাপান যে এতদূর এগিয়ে গেছে, সেকথা কি ব্রিটিশ, কি আমেরিকা কেউ ভাবতেই পারেনি কোনদিন।

দ্বিতীয় কারণ—জাপানীদের চাতুর্য। জঙ্গল-যুদ্ধে জাপানীরা এত বেশি পটু যে, ভাবতেও অবাক লাগে।

কখনো রবার বাগানের কুলী সেজে, কখনো মাছ-ধরা জেলের বেশে, আবার কখনো বা সাধারণ গ্রাম্য লোকের সাজে এমন চাতুর্য সহকারে তারা এগিয়ে আসত যে, বোঝাই যেত না।

বর্মা রণাঙ্গনেও সেই একই ব্যাপার।

দক্ষিণ বর্মার ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট এবং টেভয় আগেই চলে গিয়েছিল জাপানীদের হাতে। তাছাড়া রেঙ্গুন এবং মৌলমিনে বোমা-বর্ষণ তো চলছেই।

৩১শে তারিখের মধ্যেই পেনাং, কেডা, সেলাংগড়, সিঙ্গোরা, কুরান্টান ইত্যাদি সব কিছু চলে গেল জাপানীদের দখলে। চলে গেল গোটা মালয়।

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, মালয়—এই পাঁচ-মিশালী সৈন্যদলই ছিল সেদিন ব্রিটিশের সবচাইতে বড় ভরসা। তাড়া খেয়ে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে যেতে লাগল সিঙ্গাপুরের দিকে। সিঙ্গাপুর দুর্ভেদ্য নৌ-দুর্গ। ওখানে একবার যেতে পারলে আর ভাবনা নেই।

এপারে মালয়ের জহোর রাজ্য, ওপারে নৌ-ঘাঁটি ও নৌ-দুর্গের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি লৌহনগরী সিঙ্গাপুর।

মাঝখানে সংকীর্ণ জহোর প্রণালীর ওপর দিয়ে বাঁধানো সেতুপথ। এই সেতুপথটুকু অতিক্রম করতে পারলেই খাস সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এমন চমৎকার যে, আত্মরক্ষা করা খুবই সহজ।

তাছাড়া ভাসমান ডক, শুকনো ডক, বিমান অবতরণ ক্ষেত্র, তীর-রক্ষী কামানশ্রেণী, গুপ্ত মেশিনগান ঘাঁটি, পেট্রোল ও কয়লা মজুদ করার স্থান—কোন কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

নৌ-ঘাঁটি নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল ১৯২৩ সালে। শেষ হয়েছে মাত্র দুবছর আগে—১৯৩৯ সালে। খরচ পড়েছে মোট এক কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড।

উপকূলভাগে বসানো হয়েছে পনেরো ও আঠারো ইঞ্চি ব্যাসের দূরপাল্লার কামানশ্রেণী, যা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

তেলের ট্যাঙ্কসমূহ রক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে মাটির নিচে। অস্ত্রাগার এবং খাদ্য মজুদ ভাণ্ডারও তাই। সুতরাং দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হলেও অসুবিধার কোন প্রশ্ন নেই।

কোথায় গেল এত আয়োজন, আর কোথায় রইল কি!

আশ্চর্য, এবারও ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাভব মানতে হল জাপানী-দের স্বভাবসিদ্ধ চাতুরীর কাছে।

সিঙ্গাপুর মূলত নৌ-ঘাঁটি। তার আত্মরক্ষা বা আক্রমণের যা কিছু ব্যবস্থা, সবই গড়ে উঠেছে সমুদ্রের দিকে।

উপকূল-রক্ষী কামানশ্রেণী, গুপ্ত মেশিনগান ঘাঁটিসমূহ সবই বসানো হয়েছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে। কারণ, কেউ যদি কোনদিন সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে তো জলপথেই করবে, স্থলপথে নয়।

জাপান তা জানে। জানে বলেই সমুদ্রপথে তারা আসেনি, এসেছে মালয়ের মধ্য দিয়ে, স্থলপথে। এ ব্যাপারে বরাবরের মতো এবারও তারা এমন চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে যে, হঠাৎ তাল সামলানোও মুশ্‌কিল।

অথচ উপায় নেই। যে করে হোক, জাপানকে রুখতেই হবে।

হংকং আগেই গেছে। এখন একমাত্র ভরসা সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর চলে গেলে প্রশান্ত মহাসাগরে ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌ বহর অচল হয়ে পড়বে।

না, জাপানকে সে সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হবে না। যেভাবে হোক, যে কোন মূল্যে হোক সিঙ্গাপুরকে রক্ষা করতেই হবে।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪২ সাল। রাত তখন অনেক। ভোর হতে আর খুব একটা বেশি দেরি নেই।

তখনো মালয় থেকে আগত ছত্রভঙ্গ সৈন্য বাহিনী জহোর প্রণালীর সেতুপথ দিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে সিঙ্গাপুরের দিকে।

দেহ অবশ। পা চলতে চাইছে না। তবু তাদের পথ চলার বিরাম নেই। ঐ যে দূরে দুর্ভেদ্য দুর্গ সিঙ্গাপুর দেখা যাচ্ছে! ওখানে যেতে পারলে তবেই রক্ষা। নইলে আর কোন আশাই নেই।

সহসা গোটা দ্বীপ অঞ্চলটা থরথর করে কেঁপে উঠল পর পর দুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে। সঙ্গে সঙ্গে জহোর প্রণালীর ওপর অবস্থিত সেই সেতুপথটা কোথায় উড়ে গেল চোখের নিমেষে।

জাপানীরা এসে পড়েছে।

মাত্র গতকালও তাদের অবস্থিতি ছিল এখান থেকে আঠারো মাইল দূরে। কিন্তু আজ সেই দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে গেছে। ইতি-মধ্যেই তারা এসে পড়েছে জহোর প্রণালীর সেতুর ওপারে। সুতরাং শক্তিশালী ডিনামাইট দিয়ে সেতু উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

তবু কোন সুবিধে হল না।

এপারে জহোর রাজ্য, ওপারে সিঙ্গাপুর। মাঝখানে একটা সংকীর্ণ প্রণালী মাত্র। সেতুপথ থাক বা না থাক, পাল্লার মধ্যে যখন পাওয়া গেছে, তখন কামান ও মর্টারের সাহায্যে একটানা গোলা-বর্ষণ করে দ্বীপটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে কতক্ষণ!

কাজেও তাই করা হল। শুরু হল একটানা গোলা-বর্ষণ। দিনে রাত্রে। সর্বক্ষণ। সেই সঙ্গে ছোঁ-মারা বোমারু বিমান। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে তারা বোমা-বর্ষণ করতে লাগল লক্ষ্যবস্তুর ওপর।

অপর দিকে ব্রিটিশ বাহিনীর বিমানের সংখ্যা তখন প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে।

অনেক আবেদন জানানো হয়েছে হেড কোয়ার্টার্সে। অবিলম্বে বিমান চাই। এক্ষুণি!

কিন্তু কোথায় বিমান! ভাণ্ডার যে একেবারেই শূন্য!

আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল ৯ই ফেব্রুয়ারি রাত এগারোটায়।

সিঙ্গাপুরের সবগুলি সার্চলাইট তখন জহোর প্রণালীর ওপর নিবদ্ধ।

ওপারে জাপানীরা রয়েছে। তীব্র সন্ধানী আলো ফেলে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা দরকার। কখন কি করে বসবে কে জানে!

সহসা ওপার থেকে প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণ শুরু হল সার্চলাইটগুলি লক্ষ্য করে। যে করে হোক, এগুলোকে ভাঙতেই হবে।

অব্যর্থ নিশানায় সঙ্গে সঙ্গে সার্চলাইটগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল একটি একটি করে। বাকি শুধু আর একটি। ওটা ভাঙতে পারলেই, ব্যস!

শেষ পর্যন্ত ওটাও একসময় ভেঙে পড়ল ঝন্‌ঝন্‌ করে।

কিন্তু তার আগেই সিঙ্গাপুরের পৃষ্ঠদেশ-রক্ষাকারী সৈন্য বাহিনী কি দেখে চমকে উঠল দারুণ ভাবে।

নৌকো! নৌকো! নৌকো!

জহোর প্রণালীর ওপর দিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি রবারের নৌকো তীব্রবেগে ছুটে আসছে সিঙ্গাপুরের দিকে।

প্রতিটিতে রয়েছে ত্রিশজন করে জাপানী সৈন্য। আর রয়েছে মাঝারী আকারের ট্যাঙ্ক।

সামাল সামাল রব উঠল সর্বত্র। জাপানীরা এসে পড়েছে! হুঁশিয়ার! তৈরি হও!

কিন্তু সব বৃথা। প্রচণ্ড গোলা ও বোমা-বর্ষণের আড়ালে ততক্ষণে জাপ-যোদ্ধারা দলে দলে নেমে পড়েছে সিঙ্গাপুরের মাটিতে। তারপরই শুরু হল তাদের হিংস্র, উন্মত্ত, বেপরোয়া আক্রমণ। কার সাধ্য তখন তাদের গতিরোধ করে!

একটানা যুদ্ধের ফলে মালয় থেকে আগত ভারতীয় সৈন্যগণ তখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিপর্যস্ত। কেউ কেউ আবার অসুস্থ। বলতে গেলে একটি দিনের জন্যও তারা বিশ্রাম পায়নি গত দুমাসের মধ্যে।

তবু বরাবরের মতো এবারও তাদেরই সর্বাগ্রে ঠেলে দেওয়া হল অনিবার্য মৃত্যুর মুখে।

যাও, এগিয়ে যাও। তোমরা ভাড়াটে সৈনিক। তোমাদের জীবনের দাম আর কতটুকু!

মনে মনে বেশ একটু আহত হল ভারতীয় সৈনিকগণ। কিন্তু উপায় কি!

বেগতিক দেখে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই তখন কেটে পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার দিকে। সর্বাগ্রে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল। অবশ্য তাড়াহুড়া করতে গিয়ে একটা পাঁজরা ভেঙেছে, তা যাকগে। প্রাণ তো বেঁচেছে!

বাকি যারা রয়েছে, তাদের রক্ষা করতে গিয়ে কামানের খোরাক হওয়া ছাড়া আর কি-ই বা তখন করণীয় আছে ভারতীয় সৈন্যদের!

কিন্তু অন্যান্য সেনা বাহিনী তখন কোথায়! কোথায় অস্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদল?

তারা তখন জায়গা ছেড়ে শহরে গিয়ে তাদের দেশোয়ালী ভাইদের নিয়ে নারী-ধর্ষণ এবং লুটতরাজে মত্ত।

'Australian Comrades were abandoning their positions and running away to take part in the indiscriminate looting and raping that their countrymen had started in the town.'

[I. N. A. & its Netaji : Maj-Gen. Shahnawaz Khan : P.—10]

সুতরাং দায়-দায়িত্ব তখন ভারতীয় সৈন্যদেরই। ভাবটা এই যে, পার তো জাপানীদের হঠাও, নয়তো মরো গে!

প্রথমেই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি বিখ্যাত ভাসমান ডকটি ডুবিয়ে দেওয়া হল সাগরের জলে।

এক ইংল্যাণ্ড ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর কোথাও এতবড় ডক ছিল না। কিন্তু উপায় কি!

শত্রুপক্ষ সিঙ্গাপুরে ঢুকে পড়েছে। এমন কিছুই অবশিষ্ট রাখা চলবে না, যার দ্বারা তারা এতটুকুও উপকৃত হতে পারে।

ব্রিটিশ বাহিনী তখন আশ্রয় নিয়েছে পরিখার আড়ালে।

জাপানীরা একসঙ্গে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেছে চারিদিক থেকে। নিচে কামান থেকে একটানা গোলা-বর্ষণ, ওপরে বিমান থেকে বোমা-বৃষ্টি, তাছাড়া ছদিক থেকে ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি—এ অবস্থায় পরিখার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

কিছুতেই কিছু হল না। সৈন্য হিসেবে জাপানীরা আরো অনেক বেশি চতুর। অনেক কৌশলী। তাই এবার তারা একটানা গোলা-বর্ষণ শুরু করল মর্টার থেকে।

পরিখা ভাঙতে মর্টারের জুড়ি নেই। এবার! এবার কোথায় যাবে তোমরা!

বিপদের ওপর বিপদ। এবার বিপদ এল ভিন্ন দিক থেকে।

ইতিমধ্যেই জাপানীরা জহোর প্রণালীর সেই সেতুপথ মেরামত করে নিয়ে দলে দলে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছে সিঙ্গাপুরের অভ্যন্তরে। ফলে, পিছু হটতে হটতে ক্রমশ দশ লক্ষ সামরিক ও অসামরিক লোক গিয়ে জড় হল মাত্র সাড়ে তিন মাইল জায়গার মধ্যে। অথচ এদিকে জল, খাদ্য, পেট্রোল, গোলা-বারুদ সব কিছুরই অভাব। সব কিছুই বাড়ন্ত।

সবচাইতে বড় প্রশ্ন—পানীয় জল।

পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এমন মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, আর চব্বিশ ঘণ্টাও টিকে থাকা যাবে কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় জাপানীদের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো অসম্ভব।

সত্যিই অসম্ভব।

প্রমাণ পাওয়া গেল মাত্র সাত দিন বাদে—১৫ই তারিখে।

কোথায় রইল সেদিন ব্রিটিশের দুর্ভেদ্য নৌ-ঘাঁটি সিঙ্গাপুর, আর কোথায় গেল তার বীর সেনাপতি ব্রিটিশ জেনারেল পার্সিভ্যাল !

এত সাধের সিঙ্গাপুরকে সেদিন নিজের হাতেই তাকে জাপানীদের হাতে তুলে দিতে হল ফোর্ড কোম্পানীর মোটর কারখানায় বসে।

সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিনাশর্তে তুলে দেওয়া হল হাজার হাজার হতভাগ্য ভারতীয় সৈনিকদের অনিশ্চিত ভাগ্যকে।

এবার তোমরা পথ দেখো। এতদিন তোমাদের মনিব ছিলাম আমরা। এবার থেকে তোমাদের নতুন মনিব হল জাপানীরা। ওরা যা বলে, তাই শোন। গুড বাই !

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ সাল। সকাল আটটা।

বিরাট ট্যাঙ্ক বাহিনী সামনে রেখে বিজয়গর্বে সিঙ্গাপুরে প্রবেশ করলেন জাপানী সেনাপতি লেঃ জেনারেল ইয়ামাসিটা। সূর্য-লাঞ্ছিত জাপানী পতাকায় গোটা শহরটাই বুঝি তখন ঢাকা পড়ে গেছে।

সেই সঙ্গে মিলিটারী ব্যাণ্ডে একটানা বেজে চলেছে জাপানের দেশ-বন্দনার সুর :

'Kimi ga yo wa
Chiyo ni yachiyo ni
Sazare ishi no
Iwao to nari te
Koke no musu made'.

অর্থাৎ—হে মহান সম্রাট, তোমার রাজত্ব দশ হাজার বৎসর ব্যাপী স্থায়ী হোক ! তুমি দীর্ঘজীবী হও !

এবার মোট কত সৈন্য সেদিন সিঙ্গাপুরে বন্দী হয়েছিল, শোন :

ব্রিটিশ········ ১৫,০০০ হাজার
অস্ট্রেলিয়ান·····১৩,০০০ „
ভারতীয়····· ৪৫,০০০ „

তাছাড়া ৮,০০০ হাজার আহত সৈন্য। যুদ্ধ-সম্ভারও খোয়াতে হল বিস্তর। তার মধ্যে ছিল :

বড় কামান………	৩০০
মেশিনগান………	২,০০০
রাইফেল………	৫০,০০০
ট্যাঙ্ক… ………	২০০
মোটর লরী……	১০,০০০
মোটর সাইকেল…	২০০

সেই সঙ্গে দশ হাজার টনের জাহাজ একটি। পাঁচ হাজার টনের ট্যাঙ্কার তিনটি। ছোট ছোট জাহাজ অসংখ্য এবং সেই অনুপাতে গোলা-গুলি ও মাইন ইত্যাদি।

পরদিনই (১৭ই ফেব্রুয়ারি) সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের ফারের পার্কে জড় করে তুলে দেওয়া হল ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে। এখন থেকে তোমাদের ভাল-মন্দ সব কিছু দেখাশোনা করবেন এই মোহন সিং। তোমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে আশা করি।

কে এই মোহন সিং? কেন তাঁর ওপর এত বড় দায়িত্ব অর্পণ করলেন জাপানী অফিসার মেজর ফুজিয়ারা? সেকথা বলব তোমাকে আরো পরে।

ওদিকে খবর শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল।

হিটলারের হাতে মার খেলে তত দুঃখ ছিল না। হাজার হোক, হিটলার ইয়োরোপীয়ান। তা বলে এশিয়ার ঐ ক্ষুদে জাপানীদের কাছে!

নাঃ! মান-মর্যাদা আর রইল না। এর চাইতে মৃত্যুও বুঝি ভাল ছিল।

অনেক যুক্তিই সেদিন চার্চিল দেখালেন জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-ভাষণ দিতে গিয়ে।

হ্যাঁ, আমরা সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছি, একথা ঠিক। তবে এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব-পালনে আমরা কোন ত্রুটি রাখিনি। জাপানীরা অসাধারণ যোদ্ধা। জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্র তারা সমান শক্তিশালী। তবে কিনা অত্যন্ত নৃশংস, বেপরোয়া আর বিশ্বাসঘাতক।

'No one must underrate any more the gravity and efficiency of the Japanese war machine. Whether in the air or upon the sea or man to man on land, they have already proved themselves to be the most formidable, deadly and, I am sorry to say, barbarous antagonist.'

আর ইংরেজ ঐতিহাসিকের ভাষায় সিঙ্গাপুরের এই চরম বিপর্যয় সম্বন্ধে বলা হল ঃ

'...the most humiliating and impressive disaster which the British empire had suffered for more than a century...'

অন্যদিকে জাপানীদের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি লক্ষ্য করে পৃথিবীর তুই প্রান্তে অবস্থিত তুটি ঘর-ছাড়া মানুষের কিন্তু সেদিন তৎপরতার আর সীমা-পরিসীমা ছিল না, মল্লিকা।

টেবিলের ওপর রক্ষিত বিরাট মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়, তবু স্বপ্ন দেখার বুঝি আর শেষ নেই।

এমনি করে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। মাসের পর মাস।

একজন মহানায়ক রাসবিহারী। অন্যজন সুভাষ।

পূর্ব দিগন্তে নতুন দিনের নতুন সূর্য উঠেছে। থাইল্যাণ্ড, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। বর্মাও যায় যায়। কিন্তু তারপর?

প্রথমে হংকং। তারপর মালয়। সবশেষে সিঙ্গাপুর। একে একে সব কিছুই চলে গেল জাপানীদের দখলে।

খবর শুনে গোটা পৃথিবী স্তম্ভিত। সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা ও তার অভাবনীয় সামরিক শক্তি সম্বন্ধে কত গাল-গল্পই না এতদিন প্রচার করা হয়েছিল সারা বিশ্বের কাছে! কোথায় গেল সব! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

সিঙ্গাপুরের পতন হল ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ সালে। ঠিক তার চার দিন পরেই (১৯শে ফেব্রুয়ারি) আবার সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠ ভেসে এল ইথার-তরঙ্গে:

'আমি সুভাষ বলছি…'

সুভাষ! দেখতে দেখতে একটা চাপা চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ল এখানে-ওখানে সর্বত্র। চুপ! কথা বলো না কেউ! সুভাষ কি বলছেন, শোন:

'…I have waited silently and patiently on the course of events; now that the hour has struck, I can come forward and speak…

In this struggle, and in this subsequent period of reconstruction we will co-operate whole-heartedly with all those who help us to destroy the common enemy.'…

এতদিন আমি অলক্ষ্যে থেকে ধৈর্য ধরে সব কিছু লক্ষ্য করছিলাম। এবার আঘাত করার সময় এসেছে। তাই আমি এখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।…সবার সাধারণ শত্রুকে ধ্বংস করতে যারা আমাদের সাহায্য করবে, এ যুদ্ধে তাদের সঙ্গেই আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

ব্রিটিশের সত্যিই সেদিন বড় দুর্দিন, মল্লিকা। শুধু হংকং, মালয় বা সিঙ্গাপুর নয়, তারপর একে একে সব কিছুই তাদের হারাতে হল জাপানীদের কাছে।

এই নিয়ে আমাদের দেশে সেদিন কত ছড়া! কত গান!

একটি গানের কথা আজো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

শুধু আমি কেন, এমন একটি লোকও বোধ হয় তুমি খুঁজে পাবে না, যাকে সেদিন অজ্ঞাত কবির এই গানটি শুনতে হয়নি পথে-প্রান্তরে। বিশেষ করে ছোটদের মুখে।

গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন হল :

"সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি
বোম ফেলেছে জাপানী
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপ্‌রে বাপ্‌!"

তথ্যগত দিক থেকে কিছুটা ভুল থাকলেও জাপান যে সেদিন মহাশক্তিমান ব্রিটিশকে সত্যিই চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে ছেড়েছিল, তার মধ্যে কিন্তু এতটুকুও অত্যুক্তি নেই, মল্লিকা।

২০শে তারিখে জাপানীরা বলিদ্বীপে অবতরণ করল বিরাট এক নৌ-বহরের সাহায্যে।

আর ২৭শে তারিখে! সেদিন জাপানী নৌ-বহরের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড নৌ-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল জাভা সাগরে।

প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হল জাপানীদের।

বিশেষ করে, মার্কিন মহল থেকে ক্ষয়-ক্ষতির যে বিবরণ প্রচার করা হল, তা সত্যিই অভূতপূর্ব।

দেখা গেল যে, জাপানী নৌ-বহরের আর কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। সব শেষ। কারণ, একচল্লিশটি জাহাজ তাদের ধ্বংস হয়েছে

সংঘর্ষের ফলে। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে আরো পনেরোটি। সব মিলিয়ে মোট ছাপান্নটি।

আর মিত্রপক্ষের!

না, তাদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। সব ক'টি জাহাজই তাদের নিরাপদে ফিরে এসেছে নিজেদের ঘাঁটিতে।

কিন্তু একি!

এতবড় ক্ষয়-ক্ষতির পরেও জাপানীরা বলিদ্বীপে অবতরণ করে সঙ্গে সঙ্গেই বিমানঘাঁটি ইত্যাদি দখল করে নিল কি করে?

তবে কি সবটাই যুদ্ধকালীন প্রচারকার্য মাত্র?

আসল খবর জানা গেল ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে। মিত্রপক্ষীয় নৌ-বহর শেষ। এমন কি, বংশে বাতি দেবার জন্য একটিও অবশিষ্ট নেই।

শুরু হয়েছিল বিকেল চারটেয়।

ব্রিটিশ, মার্কিন ও ওলন্দাজ নৌ-বহর তখন প্রস্তুত। জাপানী নৌ-বহর এদিকেই আসছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আসুক না একবার! কাকে বলে নৌ-যুদ্ধ দেখিয়ে দেব!

সত্যিই ওরা দেখাল, মল্লিকা। কি করে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে হয়, তা বোধহয় এমন করে আর কেউ কোনদিন দেখাতে পারেনি ওদের মতো।

তা বলে রেহাই নেই। ততক্ষণে জাপানী নৌ-বহরের সবগুলি দূরপাল্লার কামান সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রচণ্ডভাবে।

সঙ্গে সেই মারাত্মক 'মিৎসুবিসি-৯৬' ডাইভ বম্বার। বিমানবাহী জাহাজ থেকে সঙ্গে সঙ্গে তারা তীরের মতো ছুটে এল আকাশের বুকে পাখা মেলে। যুদ্ধ করবে তোমরা আমাদের সঙ্গে! বেশ, কর!

প্রথমেই ঘায়েল হল ব্রিটিশ ক্রুজার 'এক্সিটর'।

ঘায়েল হল একেবারে মোক্ষম জায়গা, অর্থাৎ বয়লার ঘর।

তারপরই শুরু হল দৌড়—দৌড়—দৌড়!

কিন্তু যাবে কোথায় ? একবার যখন বেড়াজালে আটকে পড়েছে, তখন কি আর রক্ষা আছে নাকি ?

এক্সিটরের পরে ওলন্দাজ ডেস্ট্রয়ার 'কোর্টেনার'। তারপর ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'ইলেকট্রা'।

বেগতিক দেখে বাকি জাহাজগুলি সরে পড়তে চেষ্টা করল ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। আর যুদ্ধ করে কাজ নেই। অনেক হয়েছে! এখন মানে মানে সরে পড়তে পারলে তবেই রক্ষা!

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং অনেকটা নিশ্চিন্ত। আর ভয় নেই। এবারের মতো খুব রক্ষা পাওয়া গেছে।

দ্রাম! ঠিক তখনই ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'জুপিটার' থর থর করে কেঁপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরই সব শেষ।

পরবর্তী বিস্ফোরণ ঘটল রাত এগারোটায়। এবার গেল ওলন্দাজ ক্রুজার 'ডি-রুয়েটার'। তারপর আরো একটি ওলন্দাজ ক্রুজার 'জাভা'।

একটার পর একটা। জাভার পরে গেল অস্ট্রেলিয়ান ক্রুজার 'পার্থ'। সেই সঙ্গে গেল মার্কিন ক্রুজার 'হাউস্টন'।

তারপর আরো দুটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার 'পিলস্‌বারি' আর 'এডসাল'। সঙ্গে সহযাত্রী হল ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'এনকাউন্টার' এবং মার্কিন ডেস্ট্রয়ার 'স্ট্রং হোল্ড্', মার্কিন গান বোট 'এসডিলা' ও আরো ছ'টি জাহাজ।

তারপর পরম নিশ্চিন্তে দ্বীপে অবতরণ এবং বিমানঘাঁটি ইত্যাদি দখল।

বাধা দেবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কে বাধা দেবে? নৌ-বহর তখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত। ইচ্ছা থাকলেই বা মিত্র বাহিনীর পক্ষে সে সাধ্য তখন কোথায় ?

শুধু একটি-দুটি ক্ষেত্রে নয় মল্লিকা, মিত্র বাহিনীর যুদ্ধকালীন প্রচারকার্য এমনি হাসির খোরাক যুগিয়েছিল অসংখ্য বার।

যেমন—পরবর্তী কালে মিডওয়ের সামুদ্রিক এলাকায় অনুষ্ঠিত নৌ-যুদ্ধ।

মার্কিন সমর বিভাগের দাবী, সে যুদ্ধে তারা মোট ৫৩টি জাপানী ক্রুজার ধ্বংস করেছে।

খুব ভাল কথা। কিন্তু জাপানী নৌ-বহরে কোনদিনও ৫৩টি ক্রুজার ছিল কি?

মোটেই না। তাদের ক্রুজার ছিল সব মিলিয়ে মোট ৩৫টি। তার একটিও বেশি নয়। তাহলে বাকিগুলো এল কোথা থেকে?

ওদিকে বেগতিক দেখে ৩রা মার্চ তারিখে জেনারেল ওয়াভেল ভারতবর্ষে ফিরে এলেন প্রাচ্যের অধিনায়কের পদ থেকে বিদায় নিয়ে।

প্রাচ্য রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে পদে পদে জাপানীদের হাতে অপদস্থ হওয়া ছাড়া আর এমন কিছুই তিনি করতে পারেননি, যা নিয়ে এতটুকু গর্ব করা চলে। দেখা যাক, ভারতবর্ষের প্রধান সেনা-পতির পদ গ্রহণ করে এবার কিছু করা যায় কিনা!

ঠিক তার দুদিন পরেই (৫ই মার্চ) জাভার রাজধানী বাটাভিয়া চলে গেল জাপানীদের দখলে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনেও সেই একই অবস্থা। সেই একঘেয়ে পশ্চাদ-পসরণের ইতিহাস। মারগুই, টেভয়, মৌলমেন ইত্যাদি সব গেছে।

মৌলমেন শুধু বর্মার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরই নয়, চমৎকার একটি বিমান-বন্দরও বটে। সেদিক থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে মৌলমেন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত জাপানীদের অবিশ্রান্ত বোমা ও মর্টারের গোলা-বর্ষণের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ বাহিনীকে নৌকো-

যোগে মৌলমেন ত্যাগ করে আশ্রয় নিতে হল পরবর্তী ঘাঁটি—মার্তাবানে।

২৩শে তারিখে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল সিতাং নদীর মোহনার কাছে।

জেনারেল হাটন তখন তার ১৭নং ডিভিশন নিয়ে প্রস্তুত।

যে করে হোক, সিতাং নদীর সেতুমুখ রক্ষা করতেই হবে। নয়তো রেঙ্গুনকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং জান কবুল!

শুরু হল উন্মত্ত, বেপরোয়া হাতাহাতি যুদ্ধ। তবু কিছুতেই কিছু হল না। বাধ্য হয়েই তখন জেনারেল হাটনকে সেতুপথ ধরে ওপারে চলে যেতে হল তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে। তারপরই সেতু-পথটাকে উড়িয়ে দেওয়া হল শক্তিশালী ডিনামাইট চার্জ করে।

আর ভয় নেই। জাপানীরা এপারে রয়েছে। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু যে ভারতীয় সৈন্যগণ এতক্ষণ সর্বস্ব পণ করে কেবলমাত্র কুক্‌রি ও সঙ্গীনের সাহায্যে জাপানীদের ঠেকিয়ে রেখেছিল, তাদের কি হল? তাদের অধিকাংশই এপারে রয়ে গেল যে!

যাকগে। কথায় বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ভাড়াটে সৈন্যরা মরল কি বাঁচল, সেকথা চিন্তা করার মতো অবকাশ তখন কোথায়?

শুধু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে নয় মল্লিকা, গত বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর এমনি হৃদয়হীনতার দৃশ্য দেখা গিয়েছিল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

কি আফ্রিকা, কি মালয়, কি সিঙ্গাপুর, কি সিতাং নদীর সেতুমুখ, সর্বত্র সেদিন তারা এমনিভাবে গা-ঢাকা দিতে চেষ্টা করেছিল ভারতীয় সৈন্যদের কামানের মুখে ঠেলে দিয়ে।

অথচ এই ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যেই তারা এতদিন তাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল এশিয়া ভূখণ্ডে।

এদিকে পিছু হটতে হটতে সেতুমুখ বরাবর গিয়েই ভারতীয় সৈন্যগণ অবাক। আশ্চর্য, সেতুপথের কোন চিহ্নও নেই সেখানে!

এখন উপায়! সামনে খরস্রোতা সিতাং নদী। পেছনে ক্ষমাহীন শত্রু। কি করা যায় এখন এই অবস্থায়!

এক মুহূর্তের দ্বিধা। ক্ষীণ একটা সন্দেহের ঝিলিক। তারপরই হতভাগ্য ভারতীয় সৈন্যগণ উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সিতাং নদীর জলে। সামান্য কয়েকজন বহু কষ্টে ওপারে যেতে সক্ষম হল। বাদবাকি সবাই প্রবল স্রোতের টানে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে!

পরবর্তী লক্ষ্য—পেগু ও রেঙ্গুন।

১৭নং ডিভিশন পুরোপুরি বিধ্বস্ত। সুতরাং যাকে বলে একেবারে খোলা মাঠ।

তাছাড়া জাপানীরা প্রত্যাশিত উন্মুক্ত প্রান্তরের পথ ধরে আসেনি। এসেছে অরণ্যভূমির কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে। এ অবস্থায় জঙ্গল-যুদ্ধে অভিজ্ঞ জাপানীদের বাধা দিতে চাইলেই বা ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে সে সাধ্য তখন কোথায়?

বর্মার সর্বত্র সেদিন পালাই পালাই রব।

বিশেষ করে প্রবাসী ভারতীয়দের তো কথাই নেই। ভয়ে-আতঙ্কে প্রতিটি প্রাণী তখন উদ্বিগ্ন, দিশেহারা।

কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে! কোথায় যাওয়া যায়! কার কাছে!

নিরুপায় দেখে শেষ পর্যন্ত সবাই পাড়ি দিল দেশের দিকে। জাহাজে স্থান না পেয়ে অনেকেই তখন দল বেঁধে রওনা দিল হাঁটা-পথে।

কত বিচিত্র ছবি। কত বিচিত্র ঘটনা। কত অন্তহীন মানুষের মেলা। যেন শেষ নেই এই পথ-চলা মিছিলের।

সর্বত্র সামাল সামাল রব। জাপানীরা নাকি আর খুব একটা দূরে নেই। যে কোন মুহূর্তে রেঙ্গুনের পতন হওয়া নাকি মোটেই বিচিত্র নয়।

সবাই ভীত। সবাই সন্ত্রস্ত। কখন কি হয় কে জানে!

এ জগতের আকাশে-বাতাসে মৃত্যু। জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। অলক্ষ্য থেকে কখন যে মৃত্যু এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা কে বলতে পারে!

সর্বোপরি দস্যু, তস্কর ও লুণ্ঠনকারীদের ভয়। এ অবস্থায় কে শত্রু, আর কে যে মিত্র তা বোঝাও মুশ্‌কিল।

এমনি করে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

যত দূর চোখ যায় সেই একই দৃশ্য। সকাল-সন্ধ্যা শহরের বাইরে ছুটে চলেছে ভয়ার্ত নাগরিকদল।

সবাই রিক্ত। সবাই সম্পদহীন। দেহ অবশ। পা চলতে চায় না। তবু অনির্দিষ্টভাবে সবাই এগিয়ে চলেছে ঘরের মানুষ ঘরে ফিরবে বলে।

নানা জাতের, নানা মতের মানুষ। কিন্তু সবার হৃদয় যেন একই সূত্রে গাঁথা। পেছনে তাকাবার সময় নেই। এ হচ্ছে বাঁচার সংগ্রাম। যে করে হোক, বাঁচতে হবে। সেই বাঁচার তাগিদেই সবাই এগিয়ে চলেছে কোনদিকে দৃকপাত না করে।

প্রায়ই শোনা যায় আশে-পাশে কামান দাগার শব্দ। চোখে পড়ে, মাথার ওপর দিয়ে শিস্ দিতে দিতে কামানের গোলা-গুলি উল্কার মতো ছুটে চলেছে দিক-বিদিকে।

কোন কোনটা আবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে কত দূরে গিয়ে পড়ছে, তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। শুধু দেখা যায়, দূরে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া আকাশে গিয়ে আস্তে আস্তে মেঘের আকার ধারণ করছে।

গোলা-গুলি একটু থামতেই আবার শুরু হয় পথ-চলা।

সেকি দৃশ্য তখন! যত দূর চোখ যায়, শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস! একটু আগেও যা ছিল সমৃদ্ধ জনপদ, তখন তার আর চিহ্নমাত্রও নেই। শুধু পড়ে আছে কতগুলো পোড়ো জমি মাত্র।

সেই দৃশ্যকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে মানুষের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ। পথের ধারে ধারে পূতিগন্ধময় শবদেহের দৃশ্য। সে যে কি বীভৎস, তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়।

শুধু অসামরিক জনসাধারণ নয়, সৈন্যদের মধ্যেও ছত্রভঙ্গ ভাব বেড়েই চলেছে ক্রমশ।

পথে-ঘাটে দেখা যায়, কাতারে কাতারে দলছাড়া সৈনিক চলেছে। হাতে হাতিয়ার নেই। গায়ে সম্পূর্ণ উর্দি নেই। অনেকের পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। তবু তারা এগিয়ে চলেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কোথায় যাচ্ছে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

কলকাতা মহানগরীতেও তখন সেই একই দৃশ্য।

শহর খালি করে কাতারে কাতারে লোক তখন গ্রামাঞ্চলের দিকে ছুটে চলেছে জাপানী বোমার ভয়ে। আকাশপথে রেঙ্গুন থেকে কলকাতার দূরত্ব কতটুকুই বা! সুতরাং আর বিশ্বাস নেই।

ওদিকে তখনো আস্ফালন চলছে সেই একই ভাবে। আসুক না জাপানীরা! দেখে নেব ওদের কতখানি হিম্মৎ!

দরকার হলে আফ্রিকার তব্রুকের মতো এখানেও আমরা দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ-যুদ্ধ চালাব, তবু রেঙ্গুন কিছুতেই ছাড়ব না।

কোথায় যুদ্ধ, কোথায় কি!

যুদ্ধ তো দূরের কথা, তার সামান্য চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না কোন একটি ক্ষেত্রে। বরং তার আগেই ব্রিটিশ জেনারেল আলেকজাণ্ডার সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করলেন ডক, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একাকার করে দিয়ে।

পেগু ও রেঙ্গুনের পতন হল ৮ই মার্চ।

আর ২৫শে মার্চ হারাতে হল বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গোটা

আন্দামান। হারাতে হল বেসিন, প্রোম, টাঙ্গু, মেমিও, আকিয়াব ইত্যাদি সব কিছু।

৫ই এপ্রিল জাপানী বিমান-বহর হানা দিল কলম্বোতে।

আর ৮ই এপ্রিল সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ হল ভারতের মূল ভূখণ্ড মাদ্রাজ উপকূলে অবস্থিত ভিজাগাপট্টম ও কোকনদে।

ভিজাগাপট্টম আক্রান্ত হল ভোরবেলা। লক্ষ্য—পোতাশ্রয়ে অবস্থিত জাহাজগুলি। দশটি করে বিমান অংশগ্রহণ করেছিল প্রতিবারের হানাতে। বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল মোট কুড়িটি। সব-গুলিই ফেলা হয়েছিল ডক এলাকায়। শহরে বা অন্য কোথাও নয়।

কোকনদে প্রথমবারে একটি মাত্র বিমান বোমা-বর্ষণ করেছিল ভোরবেলায়। দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটে দুপুর একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

সেবার অংশগ্রহণ করেছিল মোট পাঁচটি বিমান। লক্ষ্য—তেলের গুদাম। বলা বাহুল্য যে, সে লক্ষ্য ভেদ করতে তাদের এতটুকুও কষ্ট হয়নি।

৯ই এপ্রিল আবার বোমা-বর্ষণ করা হল সিংহলের শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি ত্রিঙ্কোমালিতে। ক্ষয়-ক্ষতি হল বিস্তর।

কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নিজেই সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন কমন্সসভার এক গোপন অধিবেশনে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি আমাদের হয়েছে। পোতাশ্রয়ে অবস্থিত সবগুলি জাহাজই জখম হয়েছে গুরুতর ভাবে। তীর-রক্ষী কামানগুলিও অকেজো হয়ে পড়েছে জাপানীদের এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে।

কিন্তু কেন? আমাদের বিমান-বহর তখন কোথায় ছিল? চেপে ধরলেন বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ, তারা কেন বাধা দিল না জাপানীদের?

দিয়েছিল। খুবই বীরত্বের সঙ্গেই তারা বাধা দিয়েছিল। তবে কিনা শেষ পর্যন্ত আর একটিও অবশিষ্ট ছিল না। শত্রুর প্রভূত ক্ষতি করে শেষ পর্যন্ত সবগুলিই হয় নষ্ট, নয়তো জখম, কিংবা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।

প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের রাজকীয় বাহিনীর এই ব্যর্থতার কারণ কি ?

কারণ—আমাদের রাজকীয় বাহিনী এখন খুব নগণ্য অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্রপথে সৈন্য পাঠানোরও কোন উপায় নেই। কারণ, গোটা বঙ্গোপসাগরই এখন জাপানীদের আয়ত্তাধীনে। একমাত্র আসামের পার্বত্য-পথ দিয়েই সামান্য কিছু লোক ও রসদপত্র পাঠানো সম্ভব।

'Our Imperial forces are, however, reduced to very small proportions. There is no means of bringing reinforcements to them by sea. The Japanese hold complete command of the Bay of Bengal and only trickles of man and supplies can come over the mountain roads and tracks from Assam.

বর্মার খবর কি ?

মোটেই আশাপ্রদ নয়। এমন কোন খবরই আমার কাছে নেই, যা শুনে মাননীয় সদস্যগণ এতটুকুও উৎসাহ বোধ করতে পারেন। বরং এই পর্যন্ত আমরা আশা করতে পারি যে, আমাদের সেনা বাহিনীর পশ্চাদপসরণের কাজটি যত ধীরে-সুস্থে ঘটে, ততই মঙ্গল। তার গুরুত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে পারে।

'I cannot encourage the House to expect good news from the Burma theatre. The best that can be hoped for is that the retreat will be as slow as possible and give time for other factors to make

their weight tell.' [Secret Session speeches : Churchill : P.—43-58]

ক্ষয়-ক্ষতি এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা। ত্রিঙ্কোমালি আক্রান্ত হয়েছিল ৯ই এপ্রিল।

আর ১১ই এপ্রিল! সেদিন কি হল?

হবে আবার কি? যা হয়ে আসছে এতদিন, তাই হল। আবার কপাল ভাঙল ব্রিটিশের।

এ ঘটনা ঘটেছিল একেবারে আমাদের ঘরের সামনে, উড়িষ্যার উপকূল থেকে সামান্য কিছু দূরে।

সেদিন ব্রিটিশ নৌ-বহরের বিরাট একটা কনভয় এগিয়ে চলেছিল উড়িষ্যার উপকূল ধরে। ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ সব কিছুই ছিল সেই কনভয়ের মধ্যে।

সকাল তখন প্রায় আটটা। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে জাহাজগুলি এগিয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ ভেঙে। যুদ্ধ চলেছে অনেক দূরে। এখানে তেমন কোন আশঙ্কা নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

হঠাৎ এক সময়ে জাহাজের সবগুলি বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন আর্তনাদ করে উঠল—উঁ-উঁ-উঁ-উঁ······

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল প্রতিটি জাহাজের অভ্যন্তরে।

বিমান! বিমান! বিমান! জাপানী বিমান! হুঁশিয়ার! বিমান-ধ্বংসী কামান নিয়ে সবাই তৈরি হও।

বেশি নয়, একটি মাত্র বিমান। তাও বম্বার নয়, পর্যবেক্ষণকারী সাধারণ বিমান। বার দুয়েক চক্কর খেয়ে কি ভেবে বিমানটি আবার এক সময়ে মিলিয়ে গেল দূর-দিগন্তে। ভাবটা এই যে, যাবে কোথায়! দাঁড়াও, সবাইকে ডেকে আনছি। তখন দেখা যাবে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই এসে হাজির। মোট তিনটি আক্রমণকারী জাহাজ। তার মধ্যে দুটি বড় ক্রুজার ও একটি ডেস্ট্রয়ার।

মুহূর্তে ত্রিভূজাকৃতি ব্যূহের আকারে দাঁড়িয়ে তিনটি জাহাজই একসঙ্গে আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

ঘটনাটা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি আকস্মিক।

এত আকস্মিক যে, প্রত্যুত্তরে একটি গোলাও বর্ষণ করা সম্ভব হল না ব্রিটিশ কনভয় থেকে। তার কোন সুযোগই পেল না তারা।

ফলে, যা হবার তাই হল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'ডরসেটসায়ার' ও 'কর্নওয়াল', বিমানবাহী জাহাজ 'হারসিস্' এবং আরো ছ'টি জাহাজ নিমজ্জিত হল বঙ্গোপসাগরের অতল তলে।

৩০শে এপ্রিল হাতছাড়া হল উত্তর ব্রহ্মের লাসিও। ২রা মে মান্দালয়।

তবে মান্দালয় শহরের বিশেষ কিছুই তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। সব কিছুই তার পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল বোমার আগুনে। সংবাদ-পত্রের ভাষায়ঃ 'No one, not even a dog, could be seen in the streets.'

১১ই মে ব্রহ্মদেশের লাটসাহেব তাঁর লাটগিরিকে লাটে তুলে দিয়ে পালিয়ে এলেন ভারতবর্ষে।

দুই সামরিক ভাগ্য-বিধাতা জেনারেল আলেকজাণ্ডার এবং জেনারেল স্টিলওয়েলও একদিন দুর্গম পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে মণিপুরে এসে পা দিলেন গোটা ব্রহ্মদেশকে জাপানীদের হাতে তুলে দিয়ে। অনেক যুদ্ধ হয়েছে! আর নয়!

শুরু হয়েছিল ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে। শেষ হল ১৭ই মে, ১৯৪২ সালে।

মাত্র পাঁচ মাস। এই পাঁচ মাসের মধ্যেই ব্রিটিশকে মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্মা ইত্যাদি উপনিবেশগুলি হারাতে হল জাপানীদের কাছে।

বাকি রইল শুধু ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ ঘাঁটি —ভারতবর্ষ।

এবার আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা। কারণ, জাপানীদের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ইতিমধ্যে আমি এত দূর এগিয়ে গিয়েছি যে, পেছনের অনেক কথাই তোমাকে বলা হয়নি। এবার সে-সব কাহিনী তোমাকে শোনাব একে একে।

হংকং-এর পতন হয়েছিল ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে।

সুভাষের পক্ষেও কিন্তু এ তারিখটা কম উল্লেখযোগ্য ছিল না, মল্লিকা।

ইতিমধ্যে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠেছে সুদূর জার্মানীতে। সার্থক হয়েছে তিল তিল করে গড়ে ওঠা বহুদিনকার স্বপ্ন।

এবার তাদের শিক্ষার কাজ।

কূটনীতি হিসেবে ব্রিটিশ এসব ভারতীয় সৈন্যদের একমাত্র রাইফেল চালনা ছাড়া আর কিছুই শেখায়নি বলতে গেলে। কারণ, —সেই ভয়। কি জানি, যদি কোনদিন ওরা বিগড়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে!

কিন্তু এ যুদ্ধ আগেকার সেই পরিখা-যুদ্ধ নয়, যান্ত্রিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষার জন্য প্রথমে মাত্র পনেরো জনের একটি দলকে পাঠানো সাব্যস্ত হল লিজিয়নের হেড কোয়ার্টার ফ্রাকেন বুর্গ ক্যাম্পে।

তারিখটা ছিল ২৫শে ডিসেম্বর।

সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়গণ সেদিন এসে সমবেত হলেন পনেরো জনের সেই ছোট্ট দলটিকে সংবর্ধনা জানাতে। বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! আমরা তোমাদের কোনদিন ভুলব না। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক!

আবার তোমরা আমাদের মাঝে ফিরে এসো শিক্ষা সমাপ্ত করে। আমরা তোমাদের পথ চেয়ে থাকব।

আর সুভাষ! আক্রমণোদ্যত বাঘ আঁকা ব্যাজের সঙ্গে একটি করে ফুল তিনি সেই পনেরো জনকে পরিয়ে দিলেন নিজের হাতে। এই নাও বন্ধুগণ! এই একটি মাত্র ফুল ছাড়া তোমাদের দেবার মতো আজ আর আমার কিছুই নেই।

সামরিক কায়দায় নেতাজীকে অভিবাদন জানিয়ে শুরু হল তাদের ঐতিহাসিক যাত্রা—লেফ্‌ট্‌-রাইট, লেফ্‌ট্‌-রাইট, লেফ্‌ট্‌···

শেষ পর্যন্ত সুভাষ তাকিয়ে রইলেন তাদের চলার পথের দিকে। দু চোখে তাঁর আনন্দাশ্রু। জয় হোক! জয় হোক! স্বাধীনতার অগ্রদূত তোমরা। তোমাদের এই ঐতিহাসিক যাত্রা সার্থক হোক! ভারত স্বাধীন হোক!

'Netaji in his capacity as the leader and originator of this idea spoke in very touching language. He blessed the Legion, the first of its kind in the history of the struggle for Indian freedom.

One could never have dreamt of raising a trained military force of this type even in India under the British rule although many a national leader would have been glad to lead one.

With a heavy heart Netaji took leave of this first batch of volunteers of this Legion and christened this organisation as Azad Hind Fauz. Tears of joy stood in his eyes.' [Ganpuley : P.—73

এবার তোমাকে একবার পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা। পিছিয়ে যেতে হবে ১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে।

লেফ্‌ট্‌-রাইট—লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌—লেফ্‌ট্‌-রাইট—লেফ্‌ট্‌···

তালে তালে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার তরুণ যুবক। এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিত নারী বাহিনী। এগিয়ে চলেছে অশ্বারোহী বাহিনী, মোটর সাইকেল বাহিনী, মেডিকেল কোর বাহিনী, এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি—'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'।

দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত। কি সংবাদপত্র, কি ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলাই তো আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। সুভাষ দেখালে বটে!

শুধু খুশি হতে পারলেন না একজন। তিনি হলেন অহিংস মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজী। তাঁর মতে এসব হল—'পার্ক সার্কাসের সার্কাস'।

১৯২৮ থেকে ১৯৪১। মাঝে ক' বছরই বা! পার্ক সার্কাসের সেই সার্কাসটাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে খুব একটা দেরি হয়েছিল কি, মল্লিকা?

যাক, পরের কাহিনী শোন। প্রথম বাহিনীকে সংবর্ধনা জানানো হল ২৫শে ডিসেম্বর। পরদিন ভোরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল এ্যানহলটার রেলস্টেশনে।

সেকি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সেদিন গোটা জার্মানী জুড়ে! সকাল থেকে ঝুর ঝুর করে বরফ ঝরছে তো ঝরছেই। এ আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে পা বাড়ানোও মুশ্‌কিল।

তবু সব কিছু অগ্রাহ্য করে প্রতিটি ভারতবাসী সেই প্রথম বাহিনীকে বিদায় দেবার জন্য এ্যানহলটার রেলস্টেশনে গিয়ে হাজির। দেখে কে বলবে যে, এটা বিদেশ! মনে হয়, এ যেন আমাদেরই দেশের কোন রেলস্টেশন। মুখে তাদের একই ধ্বনি। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ!

'On such a wintry cold morning of 26th

December all the Indian residents of Berlin gathered on the Anhalter station to see the first batch···For a time Anhalter station was a scene of an Indian platform.

There was a lot of handshaking and embracing in Indian fashion. It was full of cheerful enthusiasm, the young men leaving for their military camp, were already feeling like great heroes.

The train moved out of the station in the midst of loud cheers of 'Azad Hind Zindabad,' 'Inquilab Zindabad,' 'Netaji Zindabad'.' [Ganpuley : P.—76]

একই সময়ে আরো তুজন স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠানো হল অন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র Messeritz ক্যাম্পে।

এত অল্পতে খুশি নন সুভাষ।

এ আর কতটুকু! সবে তো শুরু মাত্র। একে পরিপূর্ণভাবে রূপ দিতে হলে আরও অনেক কিছুই চাই যে! তাই আবার নির্দেশ গেল জার্মানীর সেই বৈদেশিক দপ্তরের কাছে।

লামসডর্ফ ক্যাম্প ও আফ্রিকার সাইরেনাইকা বন্দী-নিবাসের সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের আমার চাই। সবাইকে নিয়ে এস ড্রেসডেনের আনাবুর্গ ক্যাম্প বন্দী-নিবাসে। অবিলম্বে।

ফিল্ড মার্শাল রোমেল মিশরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন।

ওখান থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্যারাসুটবাহী সৈন্যদের ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে নামিয়ে দেবার এই তো অপূর্ব সুযোগ!

ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশের অধীনস্থ সেনা বাহিনী নিশ্চয়ই তখন তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে।

কেন দেবে না? তারাও যে ভারতীয়। ভারতের স্বাধীনতা

তাদেরও কি কাম্য নয়? দেশ শত্রু-কবল মুক্ত হোক, তারাও কি তা চায় না?

চাই প্রচার। তেমনভাবে বোঝাতে পারলে একদিন না একদিন তারা ঘুরে দাঁড়াবেই।

কেটে গেল আরো কয়েক সপ্তাহ।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ, বেতার এবং সেনা বাহিনীর প্রস্তুতির কাজ নিয়ে সুভাষ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। শুধু কাজ—কাজ আর কাজ! নিরবচ্ছিন্ন কাজ।

মাঝে মাঝে যেতে হয় বাইরে। কখনো হামবুর্গের সংগ্রহশালায়। তন্ন তন্ন করে সেখানে খুঁজে দেখেন ভারতের অর্থনীতি ও কৃষি সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণামূলক গ্রন্থ। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। সঞ্চয়ের ঝুলি ভরা যাক। দেশ স্বাধীন হবার পরে এসব অভিজ্ঞতা কাজে আসবে।

কখনো বা চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত অস্ত্র তৈরির কারখানা স্কোডায়। শুধু কৃষি বা অর্থনীতির দিক থেকেই নয়, স্বাধীন ভারতকে একদিন অস্ত্র বলেও বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে। সুতরাং সব কিছুই দেখে রাখা দরকার।

একটু ফাঁক পেলেই ছুটে যান আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই শিক্ষা শিবিরে। এ যে তাঁর নিজের হাতের গড়া। নিজের সৃষ্টি। যত কাজই থাক না কেন, নিজের সন্তান সম এই জওয়ানদের কাছ থেকে তিনি দূরে সরে থাকবেন কি করে?

সেকি আনন্দ-উচ্ছ্বাস তখন জওয়ানদের! নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী এসেছেন! আমাদের নেতাজী!

আজাদ হিন্দ ফৌজের জার্মান ট্রেনার ওয়ালটার হারবিচ্-এর ভাষায়ঃ

'Whenever his busy routine permitted it, His Excellency Bose, with several gentlemen from the Free India Centre, came to the fellowship evenings which were held at regular but long intervals and was happy to find the Indian soldiers in a relaxed mood and happy spirits. The performances (theatre, music, songs, sketches etc.) during these fellowship evenings were of a pleasing character.'

[Netaji in Germany : Walter Herbich : P.—45]

দিনের পর রাত্রি। আবার রাত্রিও এক সময়ে হারিয়ে যায় নতুন দিনের সমারোহে।

হঠাৎ একদিন কি শুনে দারুণভাবে চঞ্চল হয়ে উঠলেন সুভাষ। কে! কে! কে কথা বলছে! কার কণ্ঠ ভেসে আসছে দূরাগত সমুদ্র কল্লোলের মতো?

তোজো! তোজো! তোজো! জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো!

সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। ভেসে আসছে তোজোর এক ঐতিহাসিক ঘোষণা।

ভারত, ভারতবাসীদের জন্য। সামনে তার স্বুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। জাপান আশা করে, ভারত এবার নিজেকে তার উপযুক্ত মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

'It is a golden opportunity for India having, as it does, several thousand years of history and splendid cultural tradition, to rid herself of the ruthless despotism of Britain and participate in the construction of the Greater East Asia Co-prosperity Sphere.

Japan expects that India will attain her proper status as India for the Indians and will not stint herself in extending assistance to the patriotic efforts of the Indians.

Should India fail to awaken to her mission for getting her history and tradition and continue as before to be beguiled by the British cajolery and manipulation and act at their beck and call, I cannot but fear that an opportunity for renaissance of the Indian people would be for ever lost.'

[Chalo Delhi : S. A. Das & K. B. Subbaiah : P.—11-12]

দেয়ালে টাঙানো ভারতবর্ষের বিরাট মানচিত্রটার দিকে একদৃষ্টে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুভাষ। মাথার মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে সেই একটি মাত্র কথা :

India for the Indians ! India for the Indians ! India for the Indians !

India for the Indians !

ওদিকে সেই একই ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, জাপান প্রবাসী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।

চঞ্চল হয়ে উঠেছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, স্বামী সত্যানন্দ পুরী (প্রফুল্ল সেন), দেবনাথ দাস, আনন্দ মোহন সহায়, এন. রাঘবন ও দেশপাণ্ডে প্রমুখ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশপ্রেমিক ভারতীয়গণ।

আর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন গিয়ানী প্রীতম সিং এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং।

সর্বত্র জাপানীদের জয়-জয়কার। গিলবার্ট, গুয়াম, ফিলিপাইন,

বোর্ণিও, নিউগিনি, পেনাং, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, জাভা, বাটাভিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে জাপানীদের শুধু জয় জয় আর জয়!

আর মিত্রশক্তি! সর্বত্র তাদের প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে জাপানীদের কাছে। কোথাও তারা দাঁড়াতে পারেনি জাপ-যোদ্ধাদের কাছে। একটি ক্ষেত্রেও না।

সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ সিংহ এখন রিক্ত, হৃতসর্বস্ব, নখদন্তহীন।

এই তো সুযোগ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের এই চরম সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লক্ষ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। ডেকে বলতে হবে—ভয় পেও না তোমরা। সোজা হয়ে দাঁড়াও। এসো, হাতে হাত মেলাও!

উৎসাহ আরো শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর নতুন নীতির কথা। ভারত ভারতীয়দের জন্য। সামনে তার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। জাপান আশা করে, ভারত এবার নিজেকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

'It is a golden opportunity for India···Japan expects that India will restore its proper status as India for the Indians.'

আবার নতুন করে বলেছেন ১২ই মার্চ তারিখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, 'ভারত ভারতীয়দের জন্য'—এ নীতি কার্যকরী করে তুলতে হলে এই হল উপযুক্ত সময়।

চল্লিশ কোটি ভারতবাসী এই আশাই পোষণ করে আসছে বহু দিন ধরে।

'It is my firm belief that now is the time to

establish India for the Indians, which has for many years been the aspiration of the 400 million Indian people'.

গ্রেট ব্রিটেন দীর্ঘকাল ধরে ভারতকে ঠকিয়ে এসেছে এবং ভারতের ওপর তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়ে এসেছে। গত বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতিদানে ভারত কি পেয়েছিল, আমার বিশ্বাস ভারতবাসীর স্মৃতিতে এখনো তা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'Great Britain has for long deceived and continued her arbitrary rule over India. What was the reality of the British promise made to India in the last Great War must be still fresh, I believe, in the memory of the Indian people'.

৯ই এবং ১০ই মার্চ মালয় সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এন. রাঘবনের আহ্বানে বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিবৃন্দ জড় হলেন সিঙ্গাপুরে।

বলো, আমাদের এখন কি করা উচিত! যে ব্রিটিশ আমাদের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে সবার আগে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, এর পরেও তাদের প্রতি আমাদের আনুগত্যের আর কোন কারণ থাকতে পারে কি?

উত্তর পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কথায়ঃ

'ব্রিটিশ তার দায়িত্ব পালন করেনি। যেদিন এভাবে আমাদের ফেলে রেখে তারা পালিয়ে গেছে, সেইদিন, সেই মুহূর্তেই তাদের প্রতি আমাদের আনুগত্য শেষ হয়ে গেছে।

এত দিন তারা আমাদের বুঝিয়েছিল যে, এ যুদ্ধ নাকি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং এমনি সব বড় বড় আদর্শের জন্য। তাই যদি হয়, তবে যে স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে তারা রক্ত দিতে বলেছে, সেই

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটা তারা ভেবে দেখতে রাজী নয় কেন? স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার ভারতবাসীকেই বা তারা কারারুদ্ধ করেছে কেন?'

ডাক পাঠালেন মহানায়ক রাসবিহারী বসু। তোমরা সবাই টোকিওতে এসো ভাই। এখানে বসেই সবাই মিলে আমরা ঠিক করব যে, কোন পথে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

কে এই মহানায়ক রাসবিহারী বসু?

ক্যাপ্টেন মোহন সিং-ই বা কে?

কেন সেদিন মেজর ফুজিয়ারা সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের তুলে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে?

কি তাঁর পরিচয়?

প্রথমে শোন মোহন সিং-এর কথা।

১৯৪১ সাল। ডিসেম্বর মাস।

প্রতিটি ব্রিটিশ বাহিনী তখন মালয় থেকে পিছু হটছে জাপানীদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে।

একই ভাবে ১।১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট বাহিনী তখন পিছু হটতে শুরু করেছে মালয় থেকে। ছত্রভঙ্গ। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। দিশেহারা। জাপানীরা আর দূরে নেই। এসে পড়ল বলে!

দলে রয়েছে কম্যাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল ফিজ প্যাট্রিক, ক্যাপ্টেন মোহন সিং, ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ প্রমুখ সেনানায়কবৃন্দ।

অনাহারে অনিদ্রায় সবাই তখন রীতিমত কাতর। তদুপরি কম্যাণ্ডিং অফিসার ফিজ প্যাট্রিক আহত। এক পা এগিয়ে চলাও তার পক্ষে দস্তুর মতো কষ্টকর।

এ অবস্থায় যা স্বাভাবিক, তাই হল। এক এক করে সবাইকেই সেদিন বন্দী হতে হল জাপানীদের হাতে।

এগিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ শিখ। ভয় পেও না তোমরা। সাহস হারিও না। সুদিন আবার আসবে।

মোহন সিং অবাক। কে এই সদানন্দ বৃদ্ধ! দেখেই বোঝা যায় যে, সাধুসন্ত মানুষ। কি নাম ওঁর ?

আমার নাম প্রীতম সিং। গিয়ানী প্রীতম সিং। তোমরা সবাই এসো আমার সঙ্গে। দ্বিধার কোন কারণ নেই। নির্ভয়ে চলে এসো।

কোথায়! মোহন সিং অবাক।

মেজর ফুজিয়ারার কাছে। সবরকম বোঝা-পড়াই তাঁর সঙ্গে আমার হয়েছে। এলেই সব জানতে পারবে।

যেতে যেতে সব কথাই জানতে পারলেন মোহন সিং। স্বাধীনতাকামী বৃদ্ধের একমাত্র সাধ, বন্দী সৈন্যদের সাহায্যে একটি মুক্তি-ফৌজ গঠন করে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কবল থেকে মুক্ত করা। এ ব্যাপারে সব রকম সহায়তা করতে মেজর ফুজিয়ারা তাঁর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

কাজও শুরু হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। ইতিমধ্যেই একটি 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' গড়ে উঠেছে উভয়ের প্রচেষ্টায়। লক্ষ্য সেই একই। অর্থাৎ—ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশ প্রভুত্ব দূর করা।

কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস কি ? খোলাখুলি ভাবেই মোহন সিং প্রশ্ন রাখলেন মেজর ফুজিয়ারার কাছে, ব্রিটিশের মতো তোমরাও যে একদিন সেই একই ভূমিকায় দেখা দেবে না, তার গ্যারান্টি কোথায় ?

এটা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন। যুক্তি দেখালেন মেজর ফুজিয়ারা, তেমন কোন উদ্দেশ্য থাকলে তোমাদের সহযোগিতার কি প্রয়োজন! জাপানের নিজের শক্তিই কি সেখানে যথেষ্ট নয় ?

মানলাম, কিন্তু এর পেছনে তোমাদের কোন লাভের প্রশ্নই কি নেই ?

আছে বৈকি! আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, এশিয়া ভূখণ্ড থেকে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্বকে চিরতরে নির্মূল করে 'বৃহত্তর এশিয়া' পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলা। তাতে শুধু আমরাই উপকৃত হবো না, উপকৃত হবে এশিয়া ভূখণ্ডের প্রতিটি রাষ্ট্র।

প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা শেষ করে অবশেষে রাজী হলেন মোহন সিং। বেশ, তাই হোক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমি সব কিছুই করতে প্রস্তুত।

শুরু হল নতুন জীবন। শুরু হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে ছত্রভঙ্গ ভারতীয় সেনা বাহিনীকে। বসে থাকলে চলবে না। সময় যে বয়ে যায়!

ওদিকে তখন জাপ বাহিনী দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে সিঙ্গাপুরের দিকে। কণ্ঠে তাদের একই সুর। 'সিঙ্গাপুর এ কোসিন'! চলো সিঙ্গাপুর! চলো সিঙ্গাপুর! চলো সিঙ্গাপুর!

পেছনে পেছনে চলেছেন মোহন সিং, রাসবিহারীর বিশ্বস্ত সহকর্মী দেবনাথ দাস ও আরো কয়েকজন। উদ্দেশ্য—বন্দী ভারতের সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, আর অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয়দের ধন-সম্পত্তি এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি আছেই। তবু যতটা সম্ভব ওদের সব কিছু থেকে আড়াল করে রাখতে হবে।

এমনি করে সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুরের পতন হল ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ সালে।

সব মিলিয়ে প্রায় একলক্ষ সৈন্যকে সেদিন বন্দী হতে হল জাপানীদের হাতে। তার মধ্যে চল্লিশ হাজারই ভারতীয়।

পরদিনই সেই চল্লিশ হাজার সৈন্যকে তুলে দেওয়া হল মোহন সিং-এর হাতে। সেনা বাহিনীর প্রতি মেজর ফুজিয়ারার নির্দেশ—

আজ থেকে মোহন সিং-ই তোমাদের নেতা। তোমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে আশা করি।

মল্লিকা, এই হল মোহন সিং। আর মহানায়ক রাসবিহারী! তিনি কে?

সে কাহিনী জানতে হলে আমাদের অনেকগুলি দিন পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা। ফিরে যেতে হবে অগ্নিযুগের সেই রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে, যা আজো অম্লান, অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

I was a fighter,
One fight more,
The last and
The best.

Rash Behari Bose
25/4/42

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল।

উৎসব-মুখর দিল্লী মহানগরীকে সেদিন আর চেনাই যায় না। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু আলো আর পতাকার সমারোহ। শুধু কালো কালো মানুষের মাথা।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে ঐতিহাসিক দিল্লী দরবার। তারই শোভাযাত্রা চলেছে দিল্লী মহানগরীর রাজপথ দিয়ে।

প্রথমেই হাতির পিঠে চেপে সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। পেছনে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী, দেশীয় রাজা-মহারাজা ও মোসাহেবের দল।

এতদিন ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। এবার থেকে দিল্লী। শোভাযাত্রা শেষে বড়লাট বাহাদুর তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আনুষ্ঠানিক ভাবে।

কলকাতার ছেলেদের মতি-গতি মোটেই সুবিধের নয়। ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেনের মতো ছেলেরাই সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছে বার বার। সুতরাং একটু দূরে থাকাই ভাল। সেদিক থেকে দিল্লী অনেকটা নিরাপদ।

পথের দু পাশের বাড়িগুলোতে অসম্ভব ভীড়। ছাদে, বারান্দায়, এখানে-ওখানে কোথাও বুঝি তিল-ধারণের জায়গা নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ!

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তিনতলা বাড়িটাতেও সেই একই অবস্থা।

পুরুষদের স্থান একতলা ও তিনতলায়। দোতলাটা রাখা হয়েছে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য। পুরুষদের সেখানে কোন প্রবেশাধিকার নেই।

কুইন্স্ গার্ডেন হয়ে শোভাযাত্রা তখন চাঁদনীচক পর্যন্ত এসে পড়েছে। ঐ যে দূরে এক বিপুল-দন্তী রাজহস্তীর পৃষ্ঠে সস্ত্রীক

বড়লাটকে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মাথার ওপর ছত্র ধরে আছে এক করদরাজ্য থেকে আগত জঙ্গী জোয়ান—মহাবীর সিং।

হঠাৎ কোথা থেকে একটি সুবেশা তরুণী এসে আশ্রয় নিল দোতলার বারান্দায়। সেকি তার মন-ভোলানো রূপ! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে ভরপুর যৌবনের উজ্জ্বল একটি শিখা যেন।

তোমার নাম কি বহিন? বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন জনৈকা গুজরাটী মহিলা।

নাম? হাসলেন তরুণীটি, মেরা নাম লীলাবতী।

শোভাযাত্রা এসে গিয়েছে। দোতলার ঠিক নিচেই হাতির পিঠে উপবিষ্ট সস্ত্রীক বড়লাট।

সত্যিই অপূর্ব। এত জাঁকজমক, এত সমারোহ, এত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ইতিপূর্বে দিল্লীর ইতিহাসে আর কোনদিনও দেখা যায়নি।

সহসা গোটা রাজপথটা থর থর করে কেঁপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে—বুম্‌ম্‌ম্‌!

কি হল কিছুই দেখা গেল না। কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

তবে এটুকু বোঝা গেল যে, কলকাতার মতো দিল্লীও আর নিরাপদ নয়।

শুরু হল চিৎকার, চেঁচামেচি আর হৈ-চৈ। পালাও! পালাও! বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও! আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

নিচে তখন চরম বিশৃঙ্খলা। চারিদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার। হুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। তার মধ্যে সবাই ঠেলাঠেলি করে পালাতে ব্যস্ত। এ ব্যাপারে রাজা-মহারাজাদের উৎসাহটাই দেখা গেল সবচাইতে বেশি। প্রাণে বাঁচলে তবে তো দরবার!

বিশৃঙ্খলা আরো শতগুণ বাড়িয়ে তুলল মিছিলের সুসজ্জিত

হাতিগুলি। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেকি তাদের উন্মত্ত ছোটাছুটি! ফলে, তাদের পায়ের চাপে কত লোক যে জখম হল, তার বোধ হয় কোন গোনাগুনতিই নেই।

ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল এক বীভৎস দৃশ্য।

হাতির মাহুতটি মারা পড়েছে। লাট-বাহাদুরের অবস্থাও প্রায় লাটে ওঠবার মতো।

বোমার একটা টুকরো তাঁর পিঠের মাংস ছিঁড়ে কাঁধের ওপরে উঠে গিয়ে মস্তবড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে সেই ক্ষতস্থান থেকে। তাছাড়া ঘাড়ে এবং দেহের এখানে-ওখানে অসংখ্য আঘাত। কি হবে বলা শক্ত।

ছুটে এলেন এক বিশিষ্ট রাজপুরুষ কর্নেল ম্যাক্সওয়েল। তারপরই তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। ফলে, আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ-গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। তাঁর হয়ে সে-কাজ সম্পন্ন করলেন অন্য একজন রাজপুরুষ।

আশ্চর্য! এই হট্টগোলের মধ্যে সেই সুবেশা তরুণী লীলাবতী যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কেউ তা টের পেল না। খেয়ালই করল না কেউ।

তবে কি সে-ই বোমাটি নিক্ষেপ করেছিল দোতলা থেকে? না কি অন্য কেউ?

অনেক গবেষণা। অনেক তদন্ত। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না।

আক্রোশে ফেটে পড়লেন শাসক-সম্প্রদায়। এতবড় সাহস! শেষে কিনা সম্রাটের সর্বোত্তম প্রতিনিধি বড়লাটের গায়ে হাত দেয়! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজাটা!

বটেই তো! বটেই তো! সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরলেন দেশীয় রাজা-মহারাজার দল। এ কি অন্যায় কথা! বড়লাট বাহাদুর না থাকলে

আমাদের খেতাব দেবে কে ? নাঃ! এবারের দরবারটাই মাঠে মারা গেল দেখছি!

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন সরকার বাহাদুরের একান্ত অনুগত ভক্ত, ডেরাডুন বন-বিভাগের এক বিশিষ্ট কর্মচারী রাসবিহারী বসু।

রাজকর্মচারীদের উপস্থিতিতে ডেরাডুনে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ-সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সেকি তাঁর গরম গরম তর্জন-গর্জন! সেকি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন!

ধিক সেই পাষণ্ড আততায়ীকে, যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে এমন ঘৃণ্য পন্থায় আক্রমণ করেছে! একজন রাজভক্ত প্রজা হিসেবে আমার একমাত্র অনুরোধ, আততায়ীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে চরম শাস্তি দেওয়া হোক!

বলতে বলতে রাগে দুঃখে কেঁদে ফেললেন রাসবিহারী। তারপরই সভামঞ্চ থেকে নিচে নেমে এলেন চোখের জল মুছতে মুছতে।

কাণ্ড দেখে শাসক-সম্প্রদায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাসবিহারীর সত্যিই তুলনা হয় না। বেশ বোঝা যায় যে, আঘাতটা ওঁর খুবই লেগেছে।

লাগবেই তো! এমন রাজভক্ত প্রজা ক'জন আর আছেন ভারতবর্ষে!

প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদাই তাঁর দহরম-মহরম। সবাই তাঁর বন্ধু। সবাই তাঁর নামে অজ্ঞান। এমন কি, শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যমণি স্বয়ং ভারত সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারি পর্যন্ত রাসবিহারীর ভক্ত। নিজে তিনি বাংলা শেখেন তাঁর কাছে।

শুধু কি তাই! কি করে বাংলার বিপ্লবীদের দমন করা হবে, সে সম্বন্ধেও তাঁর শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা হলেন রাসবিহারী। কতদিন তিনি এই নিয়ে কত গুরুতর পরামর্শ করেছেন রাসবিহারীর সঙ্গে! কত গল্প!

এহেন রাসবিহারী যে বড়লাটের ওপর এই ঘৃণ্য আক্রমণে খুবই মর্মাহত হবেন, তাতে আর বিচিত্র কি!

কিন্তু কে এই আক্রমণকারী ?

কি তার নাম ?

সুবেশা তরুণী লীলাবতীই বা কোথায় গেল ?

এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতাই বা কে ?

অনেক চেষ্টা করেও এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া গেল না। রহস্য যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল।

১৯১৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি পুরস্কার হিসেবে বিরাট টাকার অঙ্ক ঘোষণা করা হল সরকারী তরফ থেকে। আততায়ীকে তোমরা ধরিয়ে দাও। আমরা তোমাদের একলক্ষ টাকা দেবো। কথা দিচ্ছি।

কোথায় আততায়ী, কোথায় কি! হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ কোন সূত্র খুঁজে পেল না আততায়ী সম্বন্ধে।

১৭ই মে তারিখে আবার বোমা নিক্ষিপ্ত হল লাহোরের লরেন্স গার্ডেন্স্-এ অবস্থিত পুলিশ ক্লাবে। লক্ষ্য, শ্রীহট্টের প্রাক্তন এস. ডি. ও., —বর্তমানে পাঞ্জাবের সহকারী কমিশনার মিঃ গর্ডন। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার দরুন প্রাণ দিতে হল ক্লাবের একজন চাপরাশিকে।

পুলিশ বিভাগ দিশেহারা। এই সেদিন দিল্লীতে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, আবার এরি মধ্যেই কিনা লাহোরে এই কাণ্ড! নাঃ! যে করে হোক, এ রহস্য ভেদ করতেই হবে।

রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলল দীর্ঘ একবছর বাদে কলকাতার রাজাবাজারে।

তারিখটা ছিল ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর। অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী অমৃত হাজরার খোঁজে হঠাৎ সেদিন ১৯৬।১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের একটা গোপন আস্তানায় পুলিশ গিয়ে হাজির। কোথায় অমৃত হাজরা ? ধরো তাকে।

ফল হল মারাত্মক। দেখা গেল যে, ১৯৬।১ নম্বরের এই গুপ্ত আস্তানাটা আসলে একটা মারাত্মক বোমা তৈরির কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে চমকে উঠল পুলিশ বাহিনী। বোমার এই খোলগুলি কি দিল্লীতে নিক্ষিপ্ত বোমাটির মতো নয়?

ধরা পড়লেন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী অমৃত হাজরা। ধরা পড়লেন দীনেশ দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে, সারদাচরণ গুহ প্রমুখ আরো কয়েকজন। সেই সঙ্গে ঘর তল্লাশি করে পাওয়া গেল একটুকরো কাগজ, যার মধ্যে কতগুলো হিজিবিজি চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই।

পুলিশ অবাক। এই হিজিবিজি চিহ্নগুলোর মানে কি। কি ব্যাপার!

অসাধ্য সাধন করলেন পুলিশের ডি. আই. জি. মিঃ ডেনহাম। অনেক চেষ্টার পরে তিনি সক্ষম হলেন ঐ হিজিবিজি চিহ্নগুলোর মর্মোদ্ধার করতে। ওখানে লেখা রয়েছে ছোট্ট একটি নাম। আমীরচাঁদ। দিল্লীর আমীরচাঁদ। সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক আমীরচাঁদ।

ধরা হল আমীরচাঁদকে। সেখানে পাওয়া গেল আরো একটি নতুন নাম। নামটি হল—দীননাথ তলোয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে ধরা হল দীননাথ তলোয়ারকে। এবার কাজ হল। দীননাথ অপরাধ স্বীকার করলেন। ফলে, বড়লাটের ওপর বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে সেদিন যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বালমুকুন্দ, অবোদবিহারী, বসন্ত বিশ্বাস প্রমুখ সবাই ধরা পড়লেন একে একে।

আমীরচাঁদ ও তাঁর ভাইপো ধরা পড়লেন ১৯১৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি। বসন্ত বিশ্বাস তখন বাংলাদেশে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে ধরা হল কৃষ্ণনগরে।

এবার রহস্যের অবগুণ্ঠন পুরোপুরিভাবে খুলে গেল।

জানা গেল, সেদিনের সেই সুবেশা তরুণী লীলাবতী আদপেই কোন তরুণী নন। তিনি বাংলাদেশের এক দামাল কিশোর বসন্ত বিশ্বাস। লরেন্স গার্ডেন্স্-এর পুলিশ ক্লাবে বোমা নিক্ষেপটাও তাঁরই কীর্তি। তখন তাঁর নাম ছিল 'বিষিন দাস'।

আর এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা কে ?

তিনিও বাঙালী। নাম তাঁর রাসবিহারী। চন্দননগরের রাসবিহারী। মহামান্য সরকার বাহাদুরের একান্ত রাজভক্ত প্রজা রাসবিহারী। ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী।

রাসবিহারী ! চেনা পরিচিত প্রতিটি মানুষ স্তম্ভিত। বলে কি ! রাসবিহারী তো পুলিশের গুপ্তচর। নইলে বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর এত মাখামাখি কেন ?

হ্যাঁ, এই ধারণাই সেদিন সবাই পোষণ করতেন রাসবিহারী সম্বন্ধে। পুলিশ রিপোর্টেও তাই লেখা রয়েছে ঃ

'...it is the general belief there amongst the Bengali community that Rash Behari was a police spy and used to supply information to the C. I. D. officers'. [The weekly Report of the Intelligence Branch, Bengal, dated July 20, 1914. Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherjee.]

বিস্ময় সেদিন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এরও কম ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তী কালে তাঁর 'My Indian Years, 1910—1916' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা সত্যিই বড় কৌতুকপ্রদ, মল্লিকা।

দিল্লীর ঘটনার পরে ডেরাডুনে এসে রাসবিহারীকে তিনি কোন্ ভূমিকায় দেখতে পেয়েছিলেন, সে কাহিনী তাঁর নিজের মুখ থেকেই তুমি শোন ঃ

'...when driving in a car from the station to my bunglow, I passed an Indian standing in front of the gate of his house with several others, all of whom were very demonstrative in their salaams.

On my inquiring who these people might be I was told that the principal Indian there had presided two days before at a public meeting at Dehra Dun and had proposed and carried a vote of condolence with me on account of the attack on my life.

It was proved later that it was this identical Indian who threw the bomb at me.'

অর্থাৎ—স্টেশন থেকে গাড়ি করে বাংলোতে যাবার পথে একটা বাড়ির দরজায় আমি জনৈক ব্যক্তিকে তার কয়েকজন সঙ্গীসহ দেখতে পেলাম। তারা আমাকে সেলাম জানাচ্ছিল। শুনলাম, আমার প্রতি ঐ আক্রমণের জন্য তারা নাকি ডেরাডুনে একটি প্রতিবাদ-সভাও করেছিল। পরে জেনেছিলাম যে, ঐ ব্যক্তি নাকি বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে নাটের গুরু।

বোধহয় সবচাইতে বেশি বিস্মিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ শাসক-সমাজ। শ্রেষ্ঠ রাজভক্ত প্রজা রাসবিহারী কিনা আসলে শ্রেষ্ঠ রাজদ্রোহী! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত! ঠিক আছে, ধর এবার রাসবিহারীকে।

কোথায় রাসবিহারী! ডেরাডুন থেকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ততক্ষণে তিনি হাওয়া। তন্ন তন্ন করে সারা ভারত চষে ফেলা হল, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না।

গর্জে উঠলেন শাসক-সম্প্রদায়। যে করে হোক রাসবিহারীর শির চাই। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। উহুঁ, ওটা সাড়ে সাত হাজারই রইল। মোদ্দা কথা, তাকে চাই।

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।'

সুতরাং রাজা-মহারাজারা পুনরায় ঘোষণা করলেন আরো একলক্ষ

টাকা। বড়লাটের গায়ে হাত দেওয়া—একি চাট্টিখানি কথা! দেখি এত দেমাক ওর কোথায় থাকে! যে করে হোক ধরতেই হবে!

বটে! মনে মনে হাসলেন রাসবিহারী। আমাকে ধরবে! ঠিক আছে, পারো তো ধর!

শুরু হল কানামাছি খেলা। এ ঘরে পুলিশ, ও ঘরে রাসবিহারী। রাস্তার এপাশে বাদী, ওপাশে আসামী। রেলের একই কামরায় এক আসনে পুলিশের সর্বময় কর্তা, অন্য আসনে লক্ষ টাকার ফেরারী বিদ্রোহী রাসবিহারী। যেন দুটি সমান্তরাল রেখা। পাশাপাশি স্থান, তবু যেন কতদূর!

ব্যর্থতার জ্বালায় এবার যেন ক্ষেপে গেলেন শাসক-সম্প্রদায়। যেভাবে হোক ধরতেই হবে রাসবিহারীকে। ঠিক আছে, আরো পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। মোট সাড়ে বারো হাজার।

সেই সঙ্গে তাঁর ছবি ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল ভারতবর্ষের সর্বত্র। এই সেই লোক। তোমরা একে ধরিয়ে দাও। টাকা তো পাবেই, সেই সঙ্গে খেতাব।

সব বৃথা। কোথায় রাসবিহারী! এ যুগের সব্যসাচী রাসবিহারীকে ধরা এত সহজ নয়। সম্ভবও নয়।

সত্যিই সম্ভব নয়, মল্লিকা। ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত। তাছাড়া নিমেষে ভোল পরিবর্তন করতে যাকে বলে একজন সত্যিকারের সুদক্ষ শিল্পী।

এহেন রূপকারকে ইচ্ছা করলেই কি ধরা যায়! না কি তা সম্ভব!

তাই এত তৎপরতা সত্ত্বেও আজ লাহোর, কাল অমৃতসর, পরশু কলকাতা, চন্দননগর ইত্যাদি করে দিব্যি তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে।

তাছাড়া কত নাম! কখনো ফ্যাটবাবু। কখনো সতীন্দ্রচন্দর। কখনো বা চুচেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দর বা অন্য কিছু।

কতবার মুখোমুখি হয়েছেন। কথাবার্তা বলেছেন কতবার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

আশ্চর্য, কেউ তাঁকে ধরতে পারেনি। সন্দেহ পর্যন্ত হয়নি কারো।

ভারতবর্ষে রাসবিহারী তখন হিরো। কত গল্প সেদিন তাঁকে ঘিরে। কত অবিশ্বাস্য কাহিনী। হয়তো বা মুখে মুখে ছড়ানোর ফলে কিছুটা অতিরঞ্জিত হতে পারে, তবু প্রচলিত কয়েকটি ঘটনার কথা তোমাকে শোনাচ্ছি।

এ ঘটনা ঘটেছিল কাশীতে। হঠাৎ সেদিন কি দেখে চমকে উঠলেন রাসবিহারী।

বাইরে পুলিশ। গোটা বাড়িটাই তারা ঘিরে ফেলেছে। এখন উপায়!

কে আছ ভেতরে? হুঙ্কার শোনা গেল বাইরে থেকে, দরজা খোল।

বেরিয়ে এল একটি উড়ে ঠাকুর। চোখে-মুখে তার সুস্পষ্ট ভীতির ছাপ।

বেশ বোঝা যায় যে, পুলিশ দেখে সে ভয় পেয়েছে। দারুণ ভয়!

রাসবিহারী ভেতরে আছেন? প্রশ্ন করলেন পুলিশ অফিসারটি।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল উড়ে ঠাকুরটি। বাবু ভেতরেই আছেন। ঘুমোচ্ছেন।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে।

কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! আশ্চর্য, কেউ নেই। সেই উড়ে ঠাকুরটিও নেই। কথাবার্তার ফাঁকে কখন যে সে কেটে পড়েছে, কেউ তা খেয়াল করেনি।

আর একবার কলকাতায়। শেয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সেদিন পুলিশে পুলিশে একেবারে একাকার। রাসবিহারী এসেছেন। এখানেই কোথাও তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। একেবারে পাকা খবর।

তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হল, কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! না, কোথাও নেই।

অথচ খবর সত্যিই পাকা। কারণ, শেয়ালদা পোস্ট অফিসের দোতলায় বসে যে প্রৌঢ় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকটি তখন তন্ময় হয়ে বেহালায় সুর তুলছিলেন, তিনি কিন্তু আসলে স্বয়ং রাসবিহারী ছাড়া আর কেউ নন।

একবার জন্মভূমি চন্দননগরে। চারপাশে সেদিন পুলিশের দৃঢ় বেষ্টনী। মশা-মাছির পর্যন্ত এদিক-ওদিক মাথা গলাবার উপায় নেই। অভ্রান্ত খবর। রাসবিহারী এই বাড়িতেই রয়েছেন। যে করে হোক, এবার তাকে ধরতেই হবে।

সব বৃথা। তার আগেই কখন যে এক ফাঁকে পাখি শিকলি কেটে পালিয়ে গেল, কেউ তা টের পেল না।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল! ইতিমধ্যে একটি প্রাণীও এ বাড়ি থেকে যেতে বা আসতে পারেনি। তাহলে গেল কোথায়?

তবে কি ময়লার বালতি হাতে নিয়ে একটু আগে যে ঝাড়ুদারটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তিনিই সেই রূপকথার জাদুকর মহানায়ক রাসবিহারী!

রূপকথার জাদুকর। কথাটা অত্যুক্তি নয়, মল্লিকা। প্রমাণ পাওয়া গেল অন্য একটি ক্ষেত্রে। সেই মুহূর্তেই তাঁর সে বাড়ি পরিত্যাগ করা দরকার। নইলে সমূহ বিপদ।

কিন্তু যাবেন কি করে? চারদিকেই যে পুলিশ!

সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান। দেখা গেল, জনকয়েক লোক একটা খাটিয়া কাঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে। কণ্ঠে তাদের সেই পরিচিত অন্তিম প্রার্থনা—রাম নাম সত্ হ্যায়! রাম নাম সত্ হ্যায়!

বিচিত্র মানুষ। বিচিত্র তার মন। বিচিত্র তার কর্মধারা। চেনা যায় না। বোঝাও যায় না।

কখনো বিদ্রোহী। কখনো পাকা অভিনেতা। আবার কখনো বা সত্যিকারের একজন সুদক্ষ শিল্পী। মাঝে মাঝেই তখন তিনি বেহালায় করুণ সুরের মূর্ছনা তোলেন তন্ময় হয়ে। তখন মনে হয়, এই আপনভোলা মানুষটি বুঝি সংসারে একমাত্র সুর ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

আবার কখনো বা অকারণেই দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেন বাইরের দিকে। দূরে। বহু দূরে। আকাশের দূর-দিগন্তে।

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়, তবু নির্জনতার সেই মায়ালোক থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে এতটুকুও বুঝি ইচ্ছা হয় না তাঁর।

ইতিমধ্যে দু-দুবার গুরুতর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে রাসবিহারীকে।

একবার কলকাতার বাদুরবাগান মেসে।

ঢাকা থেকে বিপ্লবী বীরেন চ্যাটার্জীর আনা একটা রিভলবার অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কখন যে ট্রিগারে হাত রেখেছেন, টেরও পাননি রাসবিহারী। টের পেলেন গুলির শব্দে। দেখা গেল বাঁ-হাতের তৃতীয় আঙুলটা রক্তাক্ত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক প্রতুল গাঙ্গুলী। একে গুলির শব্দ, তার ওপর আবার আহত! এরপর আর এক মুহূর্তও এখানে থাকাটা ঠিক নয়।

বাদুরবাগান থেকে ২৯৬।১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের আস্তানায়।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন নলিনীকিশোর গুহ প্রমুখ দলীয় সদস্যবৃন্দ। আর দেরি নয়। এখুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। অবিলম্বে।

আশ্চর্য, খবরটা কিন্তু পুলিশের কানে যেতে এতটুকুও দেরি হয়নি, মল্লিকা। প্রমাণ—গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট। স্পষ্টই সেখানে তাঁর বাঁ-হাতের তৃতীয় আঙুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যথাযথভাবে।

উল্লেখ করা হয়েছে এমন আরো অনেক কিছুই, যা থেকে রাসবিহারীর বৈপ্লবিক চরিত্রের অন্তত কিছুটা অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে তোমার চোখের সামনে ঃ

'Fairly tall ; Stoutish ; Large eyed ; Moustache recently shaved, third finger of one hand stiff and scarred as result of accident ; Aged about 30. Dressed sometimes as Punjabi and sometimes as Bengali. May probably be wandering about in the guise of a Sannyasi. Frequents Rawalpindi, Multan, Ambala, Simla, Amritsar, Gurudaspur, Ferozepur, Jhelum and Lahore. Bengali Kalibaries and colonies and Hindu Shiwalas & C., should be carefully scrutinised as well as Sarais and Railway Stations.'

[Vide File No. 430/14 of the I. B. Records of the Government of West Bengal. Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherjee : P.—138]

আর একবার দুর্ঘটনা ঘটেছিল কাশীর ডাঃ কালীপ্রসন্ন সান্যালের বাড়িতে। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তবে সেদিন শুধু রাসবিহারী নন, অন্যতম সহকর্মী শচীন সান্যালও আহত হয়েছিলেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে।

সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীকে সরিয়ে দেওয়া হল অন্যত্র। সাবধানের মার নেই। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে এক্ষুনি যে পুলিশ ছুটে আসবে না, তা কে বলতে পারে!

১৯১৪ সালের ২১শে মে দিল্লীর দায়রা-জজ মিঃ হ্যারিসনের আদালতে শুরু হল বিচার।

আসামী আমীরচাঁদ, অবোদবিহারী, বালমুকুন্দ, বসন্ত বিশ্বাস ও আরো সাতজন।

ধরা সম্ভব হয়নি একজনকে। নাম তাঁর মণীন্দ্র নায়েক। চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েক। আসলে সেদিনের সেই মারাত্মক বোমাটি তাঁরই তৈরি। কিন্তু পুলিশ তা জানতেই পারেনি কোনদিন।

রায় দেওয়া হল ৫ই অক্টোবর।

আমীরচাঁদ, অবোদবিহারী ও বালমুকুন্দকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বয়স কম। এত কম বয়সে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সংবিধানসম্মত নয়।

দুত্তরি তোর সংবিধান! গর্জে উঠল শ্বেতাঙ্গ-সমাজ। হলই বা বয়স কম! তা বলে এসব ডেঞ্জারাস ছেলেদের ছেড়ে দিতে হবে নাকি! ওসব চলবে না বাপু। ফাঁসির হুকুম চাই।

সুতরাং ২২শে অক্টোবর তারিখে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হল পাঞ্জাব চীফ কোর্ট আদালতে। ওসব দ্বীপান্তর-টীপান্তর আমরা বুঝি না। ফাঁসির হুকুম চাই।

এবার কাজ হল। ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯১৫ সাল) পাঞ্জাব চীফ কোর্ট মান রাখলেন তার জাতভাইদের। না, দ্বীপান্তর নয়, ফাঁসিই দেওয়া হবে বাংলাদেশের ঐ দুরন্ত ছেলে বসন্ত বিশ্বাসকে।

এবার আপীল করা হল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে। সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল। না, কোন দয়া বা অনুকম্পা নয়। ঐ ফাঁসি-কাঠেই ঝুলতে হবে বসন্ত বিশ্বাসকে।

কাজেও তাই হল। ১৯১৫ সালের ১১ই মে চারজনকেই ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করতে হল আম্বালা জেলের অভ্যন্তরে।

যাবার আগে রাসবিহারীর প্রধান সহকারী অবোদবিহারী রেখে গেলেন তাঁর সেই স্মরণীয় উক্তি:

'Death is for all and we shall die the death of a hero.'

রাসবিহারী কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। মাথায় তখন তাঁর অন্য পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও তিনি শুরু করে দিয়েছেন বেশ কিছুদিন আগে থেকেই।

ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইংরেজ এখন তার নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই তো সুযোগ। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

কিন্তু একাজে বিপ্লবী তরুণদলই যথেষ্ট নয়। সাহসে, শৌর্যে, বীর্যে এবং ত্যাগে বিপ্লবীদের তুলনা নেই। সত্যিকারের সৈনিকের যা কিছু থাকা প্রয়োজন সব কিছুই তাদের আছে।

নেই শুধু উপযুক্ত অস্ত্র। সে অস্ত্র রয়েছে সেনা বাহিনীর হাতে। সুতরাং তাদের দলে টানতে হবে।

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। যুগ যুগ ধরে বিদেশীর দাসত্ব করাটা তাদের এমনই মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, স্বাধীনতার কথা তারা ভাবতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে সেই অসম্ভবকেই আজ সম্ভব করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তখন তারা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে।

কেন করবে না ? এ দেশ কি তাদের নয় ?

স্বাধীনতা কি তাদেরও কাম্য নয় ?

তাহলে কেন তারা সেই মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করবে না ? নিশ্চয়ই করবে। সেভাবে তাদের গড়ে নিতে হবে।

গড়ার দায়িত্ব নেবে বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। সবাইকে একাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বিদেশে অবস্থিত বিপ্লবী তরুণদেরও এ সময়ে দূরে থাকলে চলবে না। অবিলম্বে ফিরে এসে সবাইকে এ কাজে উপযুক্ত অংশগ্রহণ করতে হবে। কাউকে দূরে থাকলে চলবে না।

ডাক শুনে ছুটে এলেন ভারতের এখানে-ওখানে ছড়ানো বিভিন্ন দলের বিপ্লবী তরুণবৃন্দ।

এলেন শচীন সান্যাল, নগেন দত্ত, বিষেণ সিং, জগৎ সিং, স্বরণ সিং, হরনাম সিং, দামোদর স্বরূপ, বিনায়ক রাও কাপলে, বিভূতি হালদার, প্রিয়নাথ, বিশ্বনাথ পাঁড়ে প্রমুখ দুঃসাহসী তরুণের দল।

এলেন দিল্লা সিং, মঙ্গল পাণ্ডে, নলিনী মুখার্জী, নরেন ব্যানার্জী, আউধবিহারী, ভাই পরমানন্দ, অনুকূল চক্রবর্তী, হির্দেরাম প্রমুখ এমনি আরো অনেকেই।

বিদেশস্থ বিপ্লবীরাও পিছিয়ে রইলেন না। আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন গদর পার্টির প্রাণ-সম্পদে ভরপুর শিখ যুবক কর্তার সিং।

একাই এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন গদর পার্টির আরো চার হাজার তরুণ শিখ। আরো বিশ হাজার শীগ্‌গিরই আসবে। তারও ব্যবস্থা করে এসেছেন তিনি।

আর এলেন পিংলে। দুরন্ত দুঃসাহসী মারাঠী যুবক—পিংলে।

দেখে আশায়-আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে রাসবিহারীর।

অদ্ভুত ছেলে কর্তার সিং আর পিংলে। ওদের চিনতে সময় লাগে না। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতেই ওদের ভেতরের চেহারাটা স্পষ্ট নজরে পড়ে।

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে প্রথম সারির কর্মীবৃন্দ চলে গেলেন তাঁদের নিজ নিজ এলাকায়।

এবার সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাদের মধ্যে মিশে যেতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে।

এলাহাবাদের সেনাদলের ভার নিলেন দামোদরস্বরূপ। বিভূতি হালদার আর প্রিয়নাথ নিলেন বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টের দায়িত্ব। রামনগর সিক্রোলের ভার নিলেন মোট তিনজন। বিশ্বনাথ পাঁড়ে,

মঙ্গল পাণ্ডে আর দিল্লা সিং। জব্বলপুরের জন্য নলিনী মুখার্জী একাই যথেষ্ট।

জলন্ধরে অবস্থিত সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব নিলেন হির্দেরাম। ওখানকার ডোগরা রেজিমেণ্টকে চাই-ই!

হরিচরণ হাল্লার ও পিয়ারা সিং গেলেন কোহাটের দিকে। আর সন্ত গুলাব সিং ও হরনাম সিং গেলেন বান্নু।

ওখানকার ৩৫তম রেজিমেণ্টের সহযোগিতা দরকার।

মুলা সিং চলে গেলেন গাঁয়ের দিকে। ইঙ্গিত পেলেই তিনি গাঁয়ের কৃষকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন লাহোর ও অমৃতসরের ওপর।

দিল্লীর সেনা বাহিনীর দায়িত্ব সন্ত বাসাখা সিং-এর ওপর।

বাংলা সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে বাঘাযতীন একাই একশো। আগে থেকেই দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন নিজেদের মধ্যে। ঠিক হয়েছে,—রাসবিহারী সেনা-বিদ্রোহের ব্যবস্থা করবেন। এদিকে বাঘাযতীনের লক্ষ্য হবে প্রধানত জার্মানী থেকে গোপনে আগত অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলির দিকে। বার্লিন কমিটির মাধ্যমে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে। ম্যাভারিক, এস. হেনরী ইত্যাদি জাহাজ-গুলি এসে পড়ল বলে!

সবচাইতে গুরুদায়িত্ব নিলেন পিংলে আর কর্তার সিং। তাঁরা একই সঙ্গে আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট ইত্যাদি সেনা-নিবাসে ঘুরে ঘুরে কাজ চালাবেন।

হেড কোয়ার্টার্স হবে লাহোরে। সেখানের দায়িত্ব নেবেন স্বয়ং রাসবিহারী॥ যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব বিনায়ক রাও কাপলের। তিনিই প্রতিটি কেন্দ্রের খবরাখবর যথাযথভাবে রিপোর্ট করবেন সর্বাধিনায়কের কাছে।

কোথায় হেড কোয়ার্টার্স, কোথায় কি!

পুলিশের কড়া নির্দেশ—কোন অচেনা অবিবাহিত লোককে লাহোরে বাড়ি ভাড়া দেওয়া চলবে না।

ভাবনায় পড়ে গেলেন রাসবিহারী। তাই তো! কি করা যায় এখন?

সমাধান করলেন দলের বিশিষ্ট কর্মী রামশরণ দাসের স্ত্রী, তোমরা বাড়ি ঠিক করো। আমি সেখানে থাকব বোসবাবুর স্ত্রীর পরিচয়ে।

তাই থেকেছেন। একদিন-দুদিন নয়, পুরো দুমাস। এতটুকুও তিনি দ্বিধা করেননি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে।

আপত্তি করেননি রাসবিহারীও। কেনই বা করবেন? উনি যে সাক্ষাৎ-মা। মা তাঁর ছেলের আশ্রয়ে থাকবেন, তাতে আপত্তি কিসের!

অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল প্রতিটি সেনা-নিবাস থেকে। আমরা প্রস্তুত। ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামে আমরাও পিছিয়ে থাকব না। অস্ত্রের জন্য ভাবনা নেই। সব অস্ত্র আমাদের হাতে। সব আমাদের হবে।

সাঁওতাল বাহিনীও প্রস্তুত। এ দেশ আমাদের। আমরা এদেশের লোক। বিদেশীর শাসন আর আমরা মানব না।

প্রস্তুত বাংলাদেশের বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। সর্বত্র সাজ-সাজ রব। খবর চলে গেছে দূর থেকে দূরান্তরে। তৈরি হও। আর সময় নেই।

জেলাগুলিতেও তৎপরতার অন্ত নেই। কোন্ জেলায় কতগুলো বন্দুক আছে তার সঠিক হিসেব চাই। কোন্ থানায় কতগুলি রাইফেল রয়েছে তার নির্ভুল রিপোর্ট চাই। শুধু রিপোর্ট দিলেই চলবে না, ওগুলো যে করে হোক হাত করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় ময়মনসিং ও রাজসাহীর সুরুলের জঙ্গলে তরুণ বিপ্লবীদের রণ-কৌশল ট্রেনিং দেবার কাজ শুরু হয়েছে। তার জন্য আরো বন্দুক, আরো রাইফেল প্রয়োজন।

পার্বত্য ত্রিপুরার বিলোনিয়া ও উদয়পুর সেন্টারের জন্যও আরো কিছু অস্ত্র-শস্ত্র চাই। সুতরাং ওগুলো হাত না করলেই চলবে না।

কাজ—কাজ আর কাজ! নিরবচ্ছিন্ন কাজ। আর সময় নেই। তার মধ্যেই যাবতীয় কাজ সেরে নিতে হবে।

বিশেষ একটি দায়িত্ব নিয়ে ঢাকার সশস্ত্র শিখ বাহিনীর কাছে ছুটে গেলেন অনুকূল চক্রবর্তী। এই দেখ ভাই লাহোর ক্যাণ্টনমেন্টের সেনানায়কের চিঠি। তিনি নিজে তোমাদের অনুরোধ করেছেন। তোমরা হাত মেলাবে না আমাদের সঙ্গে?

আলবৎ! 'হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলিল দিক।'

কিন্তু শুধু এখান থেকে আঘাত হানলেই হবে না। একই সঙ্গে বাইরে থেকেও আঘাত হানা প্রয়োজন।

আমরা প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ব্রহ্ম, মালয় ও সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সেনা বাহিনী। এতদিন পরের জন্য লড়াই করেছি। এবার লড়াই করব নিজের দেশের জন্য। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের ঘায়েল করব।

বার্লিনে অবস্থিত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, অজিত সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদ প্রমুখ বিপ্লবীদেরও ব্যস্ততার অন্ত নেই।

লোকজন, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তুরস্ক ও কাবুল হয়ে এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহাযজ্ঞে নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিতে হবে। চলো সবাই!

বিদ্রোহ ঘোষণার দিন ধার্য হল ২১শে ফেব্রুয়ারি। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি।

ঐদিনই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর। তারপরই ঐ মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ বাহিনীকে সাগরজলে ভাসিয়ে দিয়ে সুউচ্চে তুলে ধরবে ভারতের নিজস্ব পতাকা।

বিরাট সংগঠন। পেশোয়ার থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিরাট পটভূমিকা। বিরাট সংগ্রাম-প্রস্তুতি। কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

প্রতিটি সৈন্যের জন্য নিজস্ব ইউনিফর্ম প্রস্তুত। প্রস্তুত স্বাধীন ভারতের নিজস্ব পতাকা বাহিনী। যুদ্ধ-ঘোষণার খসড়াও প্রস্তুত।

বার্লিন থেকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, অজিত সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদও প্রস্তুত হয়ে আছেন কাবুলে এসে। এমন কি, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজও প্রস্তুত। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষামাত্র।

আহার-নিদ্রা ভুলে গেছেন রাসবিহারী। আর দেরি নেই। লগ্ন আগত প্রায়।

একই অবস্থা তখন পিংলে ও কর্তার সিংয়ের। বেসামরিক লোক হয়েও সামরিক বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁরা প্রতিটি সেনা-নিবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিঃশঙ্ক নির্ভয় চিত্তে। আর দেরি নেই। তৈরি হও।

প্রতিটি সেনা-নিবাসে তখন সেকি উত্তেজনা! সেকি অভূতপূর্ব আলোড়ন! আর কত দেরি ভাই? কবে আমরা স্বাধীন হবো? কবে?

সহসা কৃপাল সিং ও নবাব খান নামে ছুটি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক এগিয়ে এল গুটি গুটি পায়ে। সবাইকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার মিলবে। অনেক টাকা পুরস্কার! না, এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না।

সেনা বাহিনী অবাক। অফিসার-মহলে কিসের যেন একটা চাপা চঞ্চলতা। কেমন যেন একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। মনে হয় আড়ালে আড়ালে কিছু যেন একটা ঘটেছে। তবে কি দলের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

ত্রস্তে খবর চলে গেল রাসবিহারীর কাছে। পরিস্থিতি সন্দেহজনক। নির্দেশ চাই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানালেন তাঁর নতুন নির্দেশ। এত চেষ্টা, এত আয়োজন এভাবে ব্যর্থ হতে দেওয়া চলবে না। বরং ছুদিন এগিয়ে দাও। ২১শে'র পরিবর্তে বিদ্রোহ-ঘোষণার তারিখ হোক—১৯শে ফেব্রুয়ারি।

কিছুতেই কিছু হল না। তার আগেই অতর্কিতে ইংরেজ বাহিনী

ঝাঁপিয়ে পড়ল অপ্রস্তুত ভারতীয় সেনাদলের ওপর। বাধা দেবার মতো কোন অবকাশই তারা পেল না। ফলে, সবাইকে বন্দী হতে হল একে একে।

আর একদল ভারী কামান স্থাপন করল অস্ত্রাগারের দরজায়। কাউকে এগুতে দেওয়া হবে না এদিকে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হবে সবাইকে।

অবশ্য সর্বত্রই যে অপ্রস্তুত সেনা বাহিনীকে এভাবে কাবু করা সম্ভব হয়েছে, তা নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে বাধাও পেতে হয়েছে বিস্তর।

যেমন ফিরোজপুর। কিছুতেই ওখানকার সেনা বাহিনী আত্ম-সমর্পণ করতে রাজী হল না ব্রিটিশের কাছে। ফলে, প্রায় পঞ্চাশজনকে সেদিন প্রাণ দিতে হল মেশিনগানের গুলিতে।

বিপ্লবী তরুণদলও বাধা দেবার মতো কোন সুযোগ পেলেন না। একই দিনে একই সঙ্গে লাহোরের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঘরে পুলিশ হানা দিল মাইকেল ও'ডায়ারের নেতৃত্বে।

মণিরাম ও বিনায়ক রাও কাপলের কলকাতা থেকে আনা অস্ত্র-শস্ত্রও উদ্ধার করা হল প্রচুর। আর কত যে গ্রেপ্তার করা হল তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই। কর্তার সিং প্রমুখ কেউ বাদ গেলেন না। সবাইকে ধরা পড়তে হল একে একে।

কেবলমাত্র চারটি বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হল তেরজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে। সেই সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা তৈরির মাল-মশলা, বৈপ্লবিক পুস্তক-পুস্তিকা ও চারটি বিদ্রোহ পতাকা।

একমাত্র ব্যতিক্রম পিংলে আর রাসবিহারী। বিপদের সুস্পষ্ট আভাস পেয়ে ততক্ষণে পিংলেকে নিয়ে রাসবিহারী পাড়ি দিয়েছেন কাশীর দিকে।

এ প্রসঙ্গে জালিয়ানওয়ালা বাগের কুখ্যাত নায়ক মাইকেল ও'ডায়ার পরবর্তী কালে তাঁর 'India as I knew it' গ্রন্থে কি বলেছেন, শোন ঃ

'On the morning of the 19th February, we had information from our spies that Rash Behari and Pingle had moved their head-quarters to Lahore, that suspecting the leakage of their plans they had decided to antidate the rising to the night of the 19th and had sent messages and emissaries to various selected centres, including several cantonments, to act accordingly. We had then to act.

Thirteen of the most dangerous revolutionaries were captured with their paraphernalia of conspiracy —arms, bombs, bomb making materials, revolutionary literature and four rebel flags.'

দুর্ভাগ্য! সখেদে বলেছেন মাইকেল ও'ডায়ার, এত করেও রাসবিহারী বা পিংলেকে ধরা সম্ভব হল না।

'Unfortunately Rash Behari and Pingle were not among those who were captured.'

এদিকে কলকাতায় তখন দারুণ উৎকণ্ঠা। পাঞ্জাব মেল এসে গিয়েছে কি? না এলেই বুঝতে হবে যে, গণ-বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিপ্লবীরা বীর-বিক্রমে হানা দেবে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ওপর। তাদের ওপর তাই নির্দেশ দেওয়া আছে।

কিন্তু একি! পাঞ্জাব মেল তো যথাসময়েই এসে গেল!

তবে কি কোন কারণে বিদ্রোহ শুরু হয়নি? না কি তারিখ পিছিয়ে গেল?

একই প্রশ্ন তখন ব্রহ্ম ও মালয়ে অবস্থিত সেনা বাহিনীর মনে। কই, কোন নির্দেশ তো এল না! তবে কি সব পিছিয়ে গেল?

স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল একমাত্র সিঙ্গাপুরে। তাও সাময়িকভাবে।

২১শে তারিখে গণ-বিদ্রোহ শুরু হবে, শুধু এইটুকুই তাদের জানা ছিল। পরবর্তী আর কোন নির্দেশই তারা পায়নি। সেই অনুযায়ী ২১শে তারিখে উষালগ্নেই তারা ভীম-বিক্রমে আক্রমণ চালাল সিঙ্গাপুরস্থ ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর।

ঝড়ের মতো উড়ে গেল বীরপুঙ্গবের দল। সিঙ্গাপুর স্বাধীন হল। ইউনিয়ন জ্যাক-এর পরিবর্তে সেখানে উড়তে লাগল স্বাধীন ভারতের সেনা বাহিনীর নিজস্ব পতাকা। সেই সঙ্গে সমস্ত জার্মান যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হল কারাগার থেকে।

একে একে কেটে গেল সাত দিন। ভারতীয় বাহিনী চিন্তিত। কি ব্যাপার! এখনো কোন নির্দেশ আসছে না কেন ভারত থেকে?

তবে কি কোন অঘটন ঘটেছে? নিশ্চয়ই তাই। নইলে এমন তো হবার কথা নয়!

বাধ্য হয়েই তখন আবার তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হল ইংরেজ বাহিনীর কাছে। সিঙ্গাপুর আবার পরাধীন হল।

এ প্রসঙ্গে Lt. General Sir George Macmunn-এর 'Turmoil & Tragedy in India' গ্রন্থে কি বলা হয়েছে শোন:

'The mutineers at first at sixes and sevens, now broke up into three parties, one to overpower the men guarding the German internment camp and release the prisoners, another to attack the Colonel's house, and a third to prevent any assistance arriving down the road from Singapore. Further, several small parties made off, apparently to murder stray Europeans.'

[Turmoil & Tragedy in India : Lt. General Sir George

Macmunn : P.—105-113 : Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherjee.]

এ তো গেল ব্রিটিশপক্ষের বক্তব্য। অপরপক্ষের বক্তব্য কি ?

প্রখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী তখন সিঙ্গাপুরে। এ সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী কালে কি বলেছেন, শোন :

" 'ফিফ্‌থ লাইট ইনফ্যান্ট্রি' পাঞ্জাবী ও পাঠান দ্বারা গঠিত।··· ঘটনার দিন সকালে কুচকাওয়াজে সিপাহীদের আসিতে দেরি হইল। সুবেদার মেজর ডাণ্ডি খাঁ মোটেই আসিলেন না।

ডাণ্ডি খাঁ'র অফিসে ডাক পড়িলে তিনি উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট তুইজন অফিসারকে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করিলেন না। ইহাতে অফিসারদ্বয় ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

একজন বলিয়া বসিলেন—'শুয়ার কী বাচ্চা, কেঁও তুম্ প্যারেড্ মে নেহি আয়া ?'

ডাণ্ডি খাঁ রিভলবার বাহির করিয়া মুহূর্ত মধ্যে ঐ তুইজনকে হত্যা করিয়া বাহিরে আসিয়া ফল্ ইন্-এর হুকুম দিলেন। তখনই অস্ত্রাগার দখল করিয়া অস্ত্রাদি বণ্টন করিয়া দিবার পর কেল্লার সমস্ত ব্রিটিশ অফিসারকেই হত্যা করা হইল।

এদিকে প্রায় আড়াইশত সিপাহী বিভিন্ন রাস্তায় বাহির হইয়া বাছিয়া বাছিয়া লালমুখ দেখিয়া হত্যা করিতে লাগিল। কিন্তু জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিল না।" [সে যুগের আগ্নেয়পথ : পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী : পৃঃ—৮৩]

প্রাণের ভয়ে বাদবাকি শ্বেতাঙ্গের দল ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল জাহাজের অভ্যন্তরে। তারপরই রেডিওর মাধ্যমে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে লাগল এখানে-ওখানে।

হেল্প ! হেল্প ! বিদ্রোহীরা কেল্লা দখল করেছে। আমরা বিপন্ন। প্লীজ হেল্প !

উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান এবং রাশিয়া ছিল

ব্রিটিশের পক্ষে। বিপদজ্ঞাপক বার্তা শুনে প্রথমেই এগিয়ে এল একটি রাশিয়ান যুদ্ধ-জাহাজ।

কিন্তু তারপর! সে কাহিনী শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর লেখনী থেকেই শোন :

'বিদ্রোহের তৃতীয় দিন সকালের দিকে একটি রাশিয়ান যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া পৌঁছিবার পর শহরে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ-এর বিরতি হয়। এ তিনদিনই বন্দরের জাহাজ হইতে এস-ও-এস যাইতে থাকে। রাশিয়ান জাহাজটি নিকটে থাকায় তৃতীয় দিন সকালের দিকেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

...ধীরে-সুস্থে রুশ যুদ্ধ-জাহাজের সৈন্যগণ ব্যাণ্ড বাজাইয়া পতাকা উড়াইয়া কেল্লার দিকে অগ্রসর হইয়া উহার ঢালু জায়গা দিয়া উঠিতে লাগিল---যেন কেল্লায় ঢুকিলেই উহা দখল হইয়া যাইবে।

বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় সেই সৈন্যগণকে উঠিতে দিয়া মাঝপথ বরাবর প্রচণ্ডবেগে গুলি চালাইতে থাকে। এইভাবে শিলাবৃষ্টির মতো গুলি চলিবার পর রুশগণের প্রায় প্রত্যেকেই হতাহত হইয়াছিল, ইহাই জনরব।

কেল্লা বিদ্রোহীদের হাতে আরও দুইদিন থাকিবার পর পঞ্চম দিনে একটা জাপানী ক্রুজার আসিয়া বহুদূর হইতে কেল্লার উপর কামান দাগিতে আরম্ভ করে।

প্রথম প্রথম বিদ্রোহীরাও ২।৪টি কামান দাগিয়াছিল বটে, কিন্তু জাপানী জাহাজটির অবিরাম নির্ভুল গোলা-বর্ষণের ফলে কেল্লার সমস্ত প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

ইহার পরই বিদ্রোহীরা সাদা নিশান উড়াইয়া দেয়। জাপানীগণও ব্যাণ্ড বাজাইয়া পতাকা উড়াইয়া কেল্লায় উঠিল, কিন্তু এবার বিনা আয়াসে কেল্লা দখল করিল—কেল্লায় বহু বিদ্রোহী কামানের গোলায় হতাহত হইবার পর।

ভারতে সৈন্যগণের বিদ্রোহ নিশ্চিত মনে করিয়া সিঙ্গাপুরের সৈন্যদের বিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্পনা মতোই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ভারতে কেহ জানিল না এই বিদ্রোহের কথা—এই বীরত্বের কাহিনী।

ভারত হইতে দূরে, বহু দূরে তাহাদের এই জীবন-দানের গৌরব ব্যর্থতার গ্লানি লইয়াই মুছিয়া গেল। স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা হইতেছে। জানি না এই হতভাগ্যদের বীরত্বের কাহিনী তাহার এককোণে স্থান পাইবে কিনা! [সে যুগের আগ্নেয়পথ : পৃঃ—৮৪]

এদিকে কাশীতে এসে একটা দুর্নিবার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন পিংলে।

এভাবে ব্যর্থতা মেনে নিলে চলবে না। আবার বেরিয়ে পড়তে হবে বিভিন্ন সেনা-নিবাসের উদ্দেশ্যে। আবার তাদের গড়ে তুলতে হবে। দেরি করলে চলবে না।

রাসবিহারীর ইচ্ছা অন্যরকম। অবস্থাটা তিনি আরো দিন কয়েক পর্যবেক্ষণ করে দেখতে চান।

কিন্তু পিংলে মরিয়া। অসীম সাহসে ভর করে একাই তিনি এবার রওনা দিলেন মীরাটের দ্বাদশ-সংখ্যক রেজিমেণ্ট বাহিনীর উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিলেন দশটা মারাত্মক বোমা, যা গোটা একটা রেজিমেণ্টকে উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ফাঁদ পাতাই ছিল, তাই বোমা সমেতই পিংলে এবার ধরা পড়লেন, মীরাটের ইংরেজ বাহিনীর হাতে।

২৭শে এপ্রিল শুরু হল ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

আসামী সংখ্যা শুরুতে বাষট্টিজন। পরে আশী। তার মধ্যে ষোলজন তখনো পলাতক।

বলা বাহুল্য যে, উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে এতটুকুও ভুল করলেন না ইংরেজ সরকার। তাই মোট চব্বিশজনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। ছাব্বিশজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আপীলে কিছুটা হেরফের হল। সেখানে প্রাণদণ্ড বহাল রইল মোট সাতজনের। এই সাতজন হলেন, কর্তার সিং, পিংলে, সুরাইন সিং (এক নম্বর), সুরাইন সিং (দু নম্বর), হরনাম সিং, জগৎ সিং আর বখশীশ সিং।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দীরা সবাই অস্বীকার করলেন প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাতে। ইংরেজ তাঁদের শত্রু। বিপ্লবী হয়ে শত্রুর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতেও তাঁদের সম্মানে বাধে।

বরং দীপ্তকণ্ঠে জানালেন বীর বিপ্লবী কর্তার সিং : 'কেন প্রাণভিক্ষা চাইব ? আমার যদি একটার বেশি প্রাণ থাকত, তবে সবক'টি প্রাণই আমি উৎসর্গ করতাম দেশের জন্য।'

মল্লিকা, এই কর্তার সিং-এরই ভাবশিষ্য হলেন অমর শহীদ সর্দার ভগৎ সিং, যিনি পরবর্তী কালে শুকদেব ও রাজগুরুসহ একই সঙ্গে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন ফাঁসিমঞ্চে। কর্তার সিং-এর জ্বলন্ত দেশপ্রেমই ছিল তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রেরণা।

শুরু হল মৃত্যু-মিছিল। এক যায়, আর আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের।

এবার শুরু হল দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

আসামী সংখ্যা মোট একশো বারোজন। তার মধ্যে উত্তম সিং, ইসার সিং, বীর সিং, রঙ্গ সিং, রুর সিং—এই পাঁচজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড।

তারপর তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। সেখানেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল পাঁচজনকে। এই পাঁচজন হলেন, বলবন্ত সিং, মৌলভী হাফিজ আবদুল্লা, অরুর সিং, হরনাম সিং আর বাবুরাম। উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দীদের মতো এঁরাও গদর পার্টির সদস্য।

সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক সৈনিকরাও রেহাই পেলেন না। তাঁদেরও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হল সামরিক আদালতের বিচারে।

তার মধ্যে কেবলমাত্র ২৩নং অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যেই বারোজনকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসির রজ্জুতে।

আর সিঙ্গাপুর! সিঙ্গাপুরের সেই বিদ্রোহী সৈন্যদের কি হল?

প্রত্যক্ষদর্শী বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখনী থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন:

...'কিছুদিন বিচার চলিবার পর শহরের গায়ে পোষ্টার পড়িল,—কেল্লার দেওয়ালের ধারে কয়েকজনের বিচারের হুকুম শুনান হইবে, জনসাধারণ পরিখার অপর পাড় হইতে উহা দেখিতে পাইবে।

যথাস্থানে পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। গিয়া দেখিলাম, ৬ জন লোক দাঁড়াইয়া আছে— সম্মুখে বন্দুক তাক করিয়া ২০।২৫ জন গোরা সৈন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমরা পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই জলদগম্ভীর স্বরে একজন বলিলেন, —'দাস্ জাষ্টিস ইজ ডান্।'

সঙ্গে সঙ্গেই একজন হাঁকিলেন—'রেডি—ফায়ার!' একসঙ্গে সবগুলি রাইফেল গর্জিয়া উঠিল।

দুই ভলি গুলি ছোঁড়া হইল। প্রথম ভলিতেই ছয়জন পড়িয়া গেল। তারপর আসিল ছয়টি স্ট্রেচার ও একজন ডাক্তার। পরীক্ষার পর দেহগুলি লইয়া গেল। আমরাও বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিলাম।

এই ঘটনার কয়দিন পর আবার পোষ্টার পড়িল, -২২ জনের হুকুম শুনান হইবে। বিদ্রোহের দলপতি সুবেদার মেজর ডাণ্ডি খাঁ'রও হুকুম এইদিন হইবে পোষ্টারে দেখিলাম।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই আসিয়া পঁহুছিলাম। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল।

দেখিলাম, পরিখার অপর পাড়ে প্রায় ১০০ জন গোরা সৈন্য অর্ধ-চন্দ্রাকারে অর্ধেক দাঁড়াইয়া আর অর্ধেক হাঁটুভাঙা অবস্থায় বসিয়া আছে। উহারই সম্মুখে ২২টি খুঁটি এবং তাহার পশ্চাতেই প্রাচীর। একপার্শ্বে উচ্চপদস্থ অফিসারগণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

ইহার পরই অপরাধিগণ আসিল। পরণে সাদা পায়জামা ও গায়ে কুর্তা, হাতে উর্দী (ইউনিফর্ম)। শুনিলাম, ইহারা সকলেই এন-সি-ও এবং ভি-সি-ও, অর্থাৎ—সুবেদার মেজর, সুবেদার, জমাদার ও হাবিলদার শ্রেণীর।

দুই পার্শ্বে দুইজন করিয়া সৈন্য। প্রত্যেককে এক একটি খুঁটির সম্মুখে দাঁড় করান হইল। প্রায় মধ্যস্থানে দেখিলাম বিশালকায়, গৌরবর্ণ এবং বৃহৎ গুম্ফ-বিশিষ্ট পুরুষসিংহ।

অপরাধিগণ দাঁড়াইতেই অত্যন্ত কর্কশ গলায় হুকুম হইল 'স্বন্' (এ্যাটেনসন্)। গোরা সৈন্যগণ অপরাধিগণের দিকে বন্দুক তাক্ করিল। অপরাধিগণও সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

হুকুম পাঠ আরম্ভ হইল। প্রথমে মালয় ভাষায়, পরে উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় পাঠ হইল। প্রত্যেক ভাষায় পাঠের পর ইংরেজীতে 'দাস্ জাষ্টিস ইজ ডান্' বাক্য হইল। যতক্ষণ পাঠ চলিল, অপরাধিগণ কেবলই উপরের দিকে তাকাইতে থাকিল। যেন কিছুতেই বন্দুকের নলের দিকে তাকাইতে পারিতেছে না। কেবল ডাণ্ডি খাঁ নির্বিকার চিত্তে সোজা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হুকুম পাঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম হইল—'রেডি—ফায়ার!' ১০০টি রাইফেল একসঙ্গে গর্জিয়া উঠিল—দুইবার। অর্থাৎ দুই ভলি বন্দুক দাগা হইল।

সকলেই পড়িয়া গেল। কেবল ডাণ্ডি খাঁ চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া তখনও টলিতে থাকিলেন, যেন কিছুতেই পড়িতে চাহিতেছেন না।

...আবার হুকুম হইল—'ফায়ার!' এবারও দুই ভলি গুলি চলিল। ডাণ্ডি খাঁ অবশ্য প্রথম ভলিতেই পড়িয়া গেলেন। ইহার পর স্ট্রেচার আসিল, ডাক্তার আসিল। পরীক্ষা করিয়া যে ২।১ জনের তখনও মৃত্যু হয় নাই, তাহাদের কানের উপর পিস্তল রাখিয়া দাগা হইল।

ডাণ্ডি খাঁ আমারই মতো স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মিগণের জীবন দান হয়তো বৃথা যায় নাই। কেবল ভারতে কেহই জানিল না তাঁহাদের মহান্ ত্যাগের কথা। ইহার পর আরও কয়েকবার এইভাবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হইয়াছে, কিন্তু আর যাই নাই, যাইবার প্রবৃত্তিও আর ছিল না। [সে যুগের আগ্নেয়পথ ঃ পৃঃ—৮৫-৮৬]

আশাভঙ্গের বেদনায় ততদিনে রাসবিহারী চলে এসেছেন বাংলাদেশে। সহকর্মীরা সবাই ধরা পড়েছেন একে একে। কি হবে আর ওখানে থেকে ? দেখা যাক, এবার বাংলায় গিয়ে নতুন কোন কাজ শুরু করা যায় কিনা !

এলেন কলকাতায়। তারপর চন্দননগর। সবশেষে নবদ্বীপ।

শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছা অন্যরকম। পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাসবিহারীর জন্য। আজ হোক বা কাল হোক, ধরা তাকে পড়তেই হবে। কি লাভ শুধু শুধু এখানে থেকে ধরা দিয়ে! তার চাইতে সে দূরে চলে যাক। এই হতভাগ্য দেশের জন্য এখনো তার অনেক কিছু করার আছে। দূর থেকেই সেই প্রচেষ্টা সে চালিয়ে যাক।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষপর্যন্ত শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছাই মেনে নিলেন রাসবিহারী। তাই হোক। তাই হোক। দূরেই আমি চলে যাব।

কিন্তু একটা কথা। সংসারে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একদিন আমার কথাও হয়তো তোমরা ভুলে যাবে। তবু যদি কেউ কোনদিন প্রশ্ন করে যে, 'রাসবিহারী কে ছিল',—তাহলে কি উত্তর দেবে ?

বলব—'তিনি আমাদের নেতা ছিলেন।'

না-না-না। কক্ষণো না। নেতৃত্বের অভিমান আমার মধ্যে

কোনদিনও ছিল না, আজও নেই, থাকবেও না কোনদিন। আমাদের সবার শুধু একটাই পরিচয়, আমরা বিপ্লবী। জন্ম থেকেই দেশের জন্য আমরা বলি-প্রদত্ত। তাই কেউ প্রশ্ন করলে বোলো যে,—রাসবিহারী একজন যোদ্ধা ছিলেন। 'I was a fighter.'

এবার পাসপোর্ট সংগ্রহ। ইচ্ছা করলেই বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য পাসপোর্ট চাই।

সেখানেও রাসবিহারী এক ও অদ্বিতীয় মহানায়ক। নইলে মাথার দাম যার লক্ষ টাকা, সেই লোক কখনো নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্য দিবালোকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে হাজির হতে পারে, এমন অসম্ভব কথা চিন্তা করতে পার একবার?

রাসবিহারী কিন্তু তাই করলেন। সটান পাসপোর্ট অফিসে ঢুকে তিনি প্রশ্ন করলেন:

May I see the Passport Officer?

Yes. I am the Passport Officer, please take your seat.—শিষ্টাচার জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বললেন ইংরেজ ভদ্রলোকটি।

Thank you. I am Raja P. N. Tagore, Poet Tagore's relative.

I am glad to meet you, what can I do for you?

I want a Passport for Japan. You must have seen in the newspaper that Poet Tagore is shortly going to visit Japan. I am going there as his emissary to make the necessary arrangements for his stay there.

অর্থাৎ—আমি কবিগুরুর আত্মীয় রাজা পি. এন. ঠাকুর। কবি

শীগগিরই জাপান যাচ্ছেন। আমাকে আগে থেকেই সেখানে গিয়ে তাঁর জন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে হবে। সুতরাং অবিলম্বে পাসপোর্ট চাই।

এতটুকুও আপত্তি করলেন না পাসপোর্ট অফিসারটি।

পোয়েট রবীন্দ্রনাথ জাপান যাচ্ছেন—এ তো সবাই জানে। সংবাদপত্রেই তার বিস্তৃত বিবরণ বেরিয়েছে। সুতরাং আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাসপোর্ট নিয়ে দিব্যি বেরিয়ে এলেন রাসবিহারী। তারপরই ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের গুপ্ত-আস্তানায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, পাসপোর্ট পেতে দেরি হয়নি।

অবশ্য হবার কথাও নয়। একে রাজাবাহাদুর, তার ওপর আবার পোয়েট রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি। একি চাট্টিখানি কথা!

১২ই মে, ১৯১৫ সাল।

রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও একান্ত সচিব পি. এন. ঠাকুর পরিচয়ে জাপানী জাহাজ 'সানু কী মারু'র ডেকে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো নিজের জন্মভূমিকে দেখে নিলেন রাসবিহারী।

দু চোখে তাঁর বাঁধনহারা অশ্রু। এই দেশ, এই মাটি তাঁর কত প্রিয়। কত দিবারাত্রির স্বপ্ন জড়ানো এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশ!

আজ সেই একান্ত প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে অনেক দূরে।

মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। তবু যেতেই যে হবে!

দু চোখে গভীর তৃষ্ণা নিয়ে শেষ পর্যন্ত খিদিরপুর ডকের বারো নম্বর জেটিতে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্তরঙ্গ সহচর শচীন সান্যাল আর গিরিজাবাবু।

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। আশ্চর্য মানুষ। শুধু দিয়েই গেলেন চিরদিন। এমন কি, শেষ মুহূর্তে নিজের

রিভলবারটা পর্যন্ত তুলে দিয়ে গেলেন তাঁদের হাতে। বিনিময়ে কোনদিনই কিছু চাইলেন না কারো কাছে।

ঐ যে 'সান্থ কী মারু' জাহাজটা একটু একটু করে দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রাসবিহারীকে নিয়ে। না, আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু আকাশের বুকে খানিকটা কালো ধোঁয়া ছাড়া আর কোন কিছুই নজরে পড়ে না। অগ্নিযুগের মহানায়ক চিরদিনের জন্যই চলে গেলেন তাঁর একান্ত প্রিয় জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে।

এবার তোমাকে আমি রাসবিহারীর পরবর্তী ঘটনা-বহুল জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলব, মল্লিকা।

'সান্থ কী মারু' জাহাজযোগে ২২শে মে সিঙ্গাপুর। ২৯শে হংকং। ৫ই জুন জাপানের কোবে বন্দরে।

পরিচয় হল মহাচীনের সংগ্রামী যোদ্ধা সানইয়াত সেনের সঙ্গে। একই পথের পথিক, তাই সখ্যতা গড়ে উঠতে দেরি হল না দুজনের মধ্যে।

দিন কয়েকের জন্য সাংহাই। উদ্দেশ্য—সহকর্মীদের জন্য ভারতবর্ষে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণ করা। জার্মান দূতাবাসের সাহায্যে চীনা এজেন্টের মাধ্যমে পাঠানোও হল কিছু অস্ত্র-শস্ত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-সব আর কোন কাজেই এল না। মাঝপথেই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ধরা পড়ে গেল ব্রিটিশের হাতে।

সাংহাই থেকে আবার জাপানে। খবরটা কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের জানতে খুব একটা দেরি হয়নি, মল্লিকা। সঙ্গে সঙ্গেই কড়া নোট। রাসবিহারী এবং আমেরিকা থেকে আগত বিপ্লবী হেরম্ব গুপ্তকে জাপান থেকে বহিষ্কার করতে হবে। অবিলম্বে।

রাজী হল জাপান। কোথাকার কে রাসবিহারী, তার জন্য তারা ব্রিটিশের সঙ্গে বিবাদ করতে রাজী নয়।

সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ জারি করা হল রাসবিহারী ও হেরম্ব গুপ্তের ওপর। অবিলম্বে তোমাদের চলে যেতে হবে জাপান ত্যাগ করে।

মনে রেখো,– শেষ তারিখ ২রা ডিসেম্বর।

ভাবনায় পড়ে গেলেন রাসবিহারী। কঠিন সমস্যা। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে!

বুদ্ধি দিলেন সানইয়াত সেন। এক্ষুণি তুমি চলে যাও মিৎসু তোয়ামার কাছে। তোয়ামা শুধু জাপানের শক্তিশালী বামপন্থী দল ব্ল্যাক ড্রাগনের অবিসম্বাদী নেতাই নন, মানুষ হিসেবেও তিনি অতুলনীয়।

হিসেবে ভুল হয়নি সানইয়াত সেনের। খবর শুনে দুজনকেই তিনি নিজের গৃহে স্থান দিলেন পরম সমাদরে।

১লা ডিসেম্বর। আর একদিন মাত্র বাকি। তারপরই দুজনকে বিদায় নিতে হবে জাপান থেকে।

সেদিনই তোয়ামার বাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে রাসবিহারী সব কথা খুলে বললেন একে একে।

আমি তোমাদের দেশে আশ্রয়প্রার্থী। অথচ ব্রিটিশের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে জাপান সরকার আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার করার জন্য বদ্ধপরিকর। সত্যিই দুঃখের কথা। কারণ, এশিয়ার একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র জাপানের কাছ থেকে এটা আমি কোনদিনই আশা করিনি।

পরদিনই এ খবর প্রকাশিত হল জাপানের প্রতিটি সংবাদপত্রের পাতায়। সমালোচনাও করা হল বিস্তর। রাসবিহারী আমাদের আশ্রয়প্রার্থী। অথচ সরকার তাঁকে তুলে দিতে চাইছে তাঁর পরম শত্রু ব্রিটিশের হাতে।

কখনো না। প্রতিবাদ জানাল ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি, আশ্রয়প্রার্থীকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হলে ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি কিছুতেই তা সহ্য করবে না।

২রা ডিসেম্বর। আজ রাসবিহারীকে চলে যেতে হবে জাপান থেকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়। তারপরই শেষ-বিদায়।

ওদিকে পুলিশ বাহিনী তখন প্রস্তুত। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। তার মধ্যে ওরা চলে যায় তো ভালই, নয়তো সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার।

নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে হাজির হল তোয়ামার বাড়িতে। কোথায় ওরা? শীগগির ওদের তুলে দাও আমাদের হাতে।

ওরা নেই। তোয়ামার সংক্ষিপ্ত উত্তর, অনেক আগেই ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেছে এখান থেকে।

সত্যিই তাই। তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হল, কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! কোথায় হেরম্ব গুপ্ত! আশ্চর্য, কেউ নেই!

পুলিশ বাহিনী অবাক। তাই তো! গেল কোথায়? হাওয়ায় উড়ে গেল নাকি লোক ছুটো?

ওঁরা তখন এক রুটি-কারখানার মালিক মিঃ সোমার আশ্রয়ে। খবরের কাগজ থেকে সব কিছু জানতে পেরে তিনি নিজেই আগ্রহ করে তাঁদের স্থান দিয়েছেন পরম সমাদরে। তাঁর মতে—এভাবে ব্রিটিশের চাপে পড়ে ছুজন আশ্রয়প্রার্থীকে বহিষ্কার করাটা জাতীয় অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুরু হল ঠাণ্ডা লড়াই। একদিকে জাপ-সরকার, অন্যদিকে ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি। কেউ কারো দাবী ছাড়তে রাজী নয়। ছু পক্ষই সমান।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ভাবনায় পড়ে গেল ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি। ইতিমধ্যে হেরম্ব গুপ্ত চলে গেছেন আমেরিকায়। রয়েছেন রাসবিহারী একা। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কতদিন আর তাঁর পক্ষে এভাবে লুকিয়ে থাকা সম্ভব?

একই ভাবনা তখন ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টির নেতা মিঃ তোয়ামার মনে। কি করা যায় এখন রাসবিহারীকে নিয়ে?

ভয় জাপান সরকারকে ততটা নয়, যতটা ব্রিটিশ দূতাবাসকে। যে করে হোক, রাসবিহারীকে শিক্ষা দেবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর।

হন্যে হয়ে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে রাসবিহারীকে। খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের নিজস্ব গুপ্তচর ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আগত সুদক্ষ ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল। এমন কি, সুযোগ পেলে তারা তাঁকে হত্যা করতেও পিছ-পা নয়।

এ অবস্থায় রাসবিহারীকে বাঁচাতে হলে চাই এমন একজন মানুষ, যিনি দিনরাত্রি সর্বক্ষণের জন্য তাঁকে আগলে রাখতে সক্ষম। কে সেই লোক, যাঁর ওপর এ ব্যাপারে পুরোপুরি ভাবে নির্ভর করা চলে ?

পরের কাহিনী আশ্রয়দাতা রুটি-কারখানার মালিক মিঃ সোমার স্ত্রী শ্রীমতী সোমার মুখ থেকেই শোন :

কিছুদিন আমাদের এখানে থাকার পরে রাসবিহারীর জন্য তখন অন্য একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।...

একদিন মিঃ তোয়ামা আমাদের বড় মেয়ে তোসিকোর সঙ্গে রাসবিহারীর বিয়ের প্রস্তাব জানালেন। আমরা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব শুনে।

রাসবিহারীকে আমরা ছেলের মতোই ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। সে-ও আমাদের বাবা-মা বলেই ডাকে। তা বলে তোসিকোর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার কথা কোনদিন কল্পনাও করিনি। তাছাড়া তোসিকোকে আমি একথা বলবই বা কি করে ? ও যে তরুণী বালিকা মাত্র। তখনো স্কুলে পড়াশুনা করছে।

তবু রাসবিহারীর বিপদের কথা চিন্তা করে মনে মনে প্রার্থনা করলাম—ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের মুখ চেয়ে তোসিকো যেন এই বিপদজনক দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়।

শেষ পর্যন্ত আমিই একদিন বললাম—তুমি কি মিঃ বোসকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পার না তোসিকো ?

তোসিকো শান্ত ভাবে জানাল—আমাকে একটু ভাবতে দাও, মা।

একমাস বাদে তোসিকো কুণ্ঠিত নতমুখে জানাল—তাই হোক মা। আমি মনস্থির করেছি।

অশ্রুসজল কণ্ঠে বললাম—এখনো ভেবে দেখ তোসিকো। এ বিয়ে কিন্তু মোটেই আনন্দদায়ক হবে না।

তোসিকো তখন দৃঢ়সঙ্কল্প।

'I explained the situation again and again. She was determined.'*

১৯১৮ সালের জুলাই মাসে বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হল সবার অগোচরে। পৌরোহিত্য করলেন মিঃ তোয়ামা স্বয়ং।

নতুন জীবন। নতুন পরিবেশ। কিন্তু কোথায় নিশ্চয়তা, কোথায় কি!

পলাতক জীবন। এ জীবনে পদে পদে ভয়। পদে পদে সংশয়। কখন যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে হানা দেবে, কে তা বলতে পারে!

সব কিছুই হাসিমুখে মেনে নিলেন প্রিয়তমা পত্নী তোসিকো। ইতিমধ্যে সতেরো বার তাঁদের বাসা পরিবর্তন করতে হয়েছে পুলিশের ভয়ে। তবু এ নিয়ে কারো বিরুদ্ধেই তাঁর কোন নালিশ নেই। কোন দুঃখও নেই। এ যে হবে,—এ তো জানা কথাই।

বিপ্লবের পথ কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে যারা এসেছে, তাদেরই সর্বাঙ্গে বয়ে গেছে রক্তের বসুধারা। তা হলে দুঃখ কিসের!

ইতিমধ্যেই রাসবিহারী জাপানী ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছেন

*'Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence.' গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

বেশ ভালভাবেই। আশ্চর্য, মাত্র চার মাসেই তিনি ঐ দুর্বোধ্য ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন নির্ভুলভাবে। কোন শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয়নি। পরবর্তী কালে বেশ কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন জাপানী ভাষায়। সুধী-মহলে তা সাড়াও জাগিয়েছিল প্রচুর।

দুঃসহ জীবনের অবসান ঘটল দীর্ঘ আট বছর বাদে, ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে। সেদিনই সর্বপ্রথম তিনি স্বীকৃতি পেলেন জাপানী নাগরিক বলে।

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রাসবিহারী। মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! অবারিত মুক্তি! দুঃখ-রজনীর অবসান ঘটেছে। আর ভয় নেই। কোন বিধি-নিষেধও নেই। এবার নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ শান্তি।

কোথায় শান্তি, কোথায় কি! সুখের দিনের প্রারম্ভেই হারাতে হল প্রিয়তমা পত্নী তোসিকোকে। ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ সর্বংসহা তোসিকো শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন একটি পুত্র ও কন্যা রেখে।

মল্লিকা, তুমি তো একালের মেয়ে। পারো কি তুমি একবার নিজেকে তোসিকোর ভূমিকায় কল্পনা করতে?

কিসের অভাব ছিল সেদিন তোসিকোর? কি তাঁর ছিল না? তা সত্ত্বেও জেনে-শুনে সহায়-সম্বলহীন এক পলাতক বিপ্লবীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে সেদিন বিদেশী মেয়ে তোসিকো যে অপূর্ব ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, সংসারে তার তুলনা কোথায় বলতে পারো?

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-পরিচয় একটি বিপন্ন মানুষকে বাঁচানোর জন্য ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টির নেতা তোয়ামা এবং সোমা-পরিবার যে নিঃস্বার্থ কর্তব্যবোধের নিদর্শন রেখেছিলেন, তারই কি কোন নজীর আছে সংসারে?

আর রাসবিহারী! তাঁরই বা তুলনা কোথায় বলো?

পরবর্তী কালে তোসিকোর মা শ্রীমতী সোমা একদিন আবার

বিয়ে করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন রাসবিহারীকে। কি উত্তর রাসবিহারী সেদিন দিয়েছিলেন শ্রীমতী সোমাকে ?

অসম্ভব! যে তোসিকো দীর্ঘ আট বছর সুখে দুঃখে সর্বক্ষণ আমার পাশে ছিল, আজো সে আমার পাশে তেমনিই রয়েছে। তার জায়গায় আর কাউকে বসানো সম্ভব নয়।

সেদিনের সেই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমতী সোমার মুখ থেকেই তুমি শোন ঃ

'Ten years later, I spoke to Mr. Bose, "You should now enter into a new life."

But he laughed at the idea of another marriage.

"Mother, it is impossible to find Tosiko's love again···it is painful for me even to think of such a thing. I have my dear mother and father. That is more than enough. I am happy. Tosiko is always with me as she was during my lovely eight years in concealment. Moreover my life is not mine, it is offered to my native country. I was and am satisfied to have had eight years with Tosiko. That is more than enough."

Hearing this, I said to my daughter living in my memory :

"Tosiko, what a happy girl you are ! Mr. Bose is truly a big man. He is a little too big for you. Is it not so ? You are quite happy, are you not" ?'

[Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—36-37]

নিঃসঙ্গ মহানায়ক।

এতদিন তবু তোসিকো ছিলেন। আজ সর্বক্ষণের সঙ্গিনী সেই তোসিকোও পাশে নেই। নির্বান্ধব পৃথিবীতে মহানায়ক একেবারেই নিঃসঙ্গ। একা।

তবু ভাগ্যের কাছে এতটুকুও নতি-স্বীকার করলেন না মহানায়ক। বরং বিধি-নিষেধ থেকে রেহাই পেয়ে আবার তিনি নতুন উদ্যমে ঝাঁপ দিলেন কর্মসাগরে।

সর্বক্ষণ একই চিন্তা। কবে আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে? কবে আবার আমি তাকে দেখতে পাব দু চোখ ভরে? সেই দিন, সেই শুভ লগ্ন কবে আসবে? কবে?

প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Indian Independence League)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ এক হও। সুযোগ একদিন আসবেই।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩৭ সালে। শুরু হল চীন-জাপান যুদ্ধ। টোকিওর রেনবোতে অনুষ্ঠিত এক ভারতীয় সমাবেশে সেদিন এক নতুন ঘোষণা শোনা গেল রাসবিহারীর কণ্ঠে—'Asia for the Asians. Go home white.'

দেখতে দেখতে রাসবিহারীর সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র। ছোট-বড় প্রতিটি মানুষের মুখে সেই একই কথা। 'Asia for the Asians. Go home white.'

একই কথা সোচ্চার হয়ে উঠল প্রতিটি জাপানীর কণ্ঠে:

'আজিয়া ওয়া আজিয়া, জিন নো তামে নো আজিয়া, হাকুজিন ইয়ো কিকোকুসেও—'

অর্থাৎ—এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য, শ্বেতাঙ্গ বিদেয় হও।

এল ১৯৩৯ সাল। শুরু হল যুদ্ধ। জাপানও একদিন সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল অনিবার্যভাবে।

সেদিনের সেই যুবক রাসবিহারী তখন বৃদ্ধ, অসুস্থ। তবু তিনি শেষবারের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন যুদ্ধ-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর সেই আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবার তার চরম বদলা নিতে হবে। ঘৃণ্য ঐ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এশিয়া ভূখণ্ড থেকে।

ইতিমধ্যেই তাদের সর্বত্র মার খেতে হয়েছে জাপানীদের হাতে।

এই তো সুযোগ! ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে ব্রিটিশের এখন নাভিশ্বাস উঠেছে। এখন চাই শুধু শক্ত একটা আঘাত। সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটা শক্ত আঘাত হানতে পারলে পরাধীনতার অভিশাপ থেকে ভারতকে মুক্ত করা এখন আর এমন কিছু কষ্টকর কাজ নয়।

দেখে দেখে ক্রমশ সুভাষের মতোই মরিয়া হয়ে উঠলেন রাসবিহারী।

দেহ অপটু। চলাফেরা করতেও রীতিমত কষ্ট হয়। তবু তিনি সব কিছু অগ্রাহ্য করে ছুটে বেড়াতে লাগলেন সর্বত্র। মুখে সেই চিরন্তন ডাক :

'I was a fighter, one fight more, the last and the best'.

উঠে দাঁড়াও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। স্বাধীনতা অর্জনের চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে। এগিয়ে এস ভাইসব। হাতে হাত মেলাও। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

এখানেই থামলেন না রাসবিহারী। দুর্দিনের বন্ধু তোয়ামার যোগাযোগে দেখা করলেন জাপানের ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের সর্বাধিনায়ক ফিল্ড-মার্শাল সুগিয়ামার সঙ্গে। আমি অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয়দের নিরাপত্তা এবং নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে গ্যারান্টি চাই।

রাজী হলেন ফিল্ড-মার্শাল সুগিয়ামা। বেশ, তাই হবে। কথা দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার নতুন দাবী। ব্রিটিশের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে আমরা প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে হবে। প্রমাণ দিতে হবে যে, 'India for the Indians,' তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র একটা কথার কথা নয়।

এবারও রাসবিহারীর প্রস্তাব গৃহীত হল যথাযথভাবে। সহযোগিতার নিদর্শন হিসেবে প্রথমেই মেজর ফুজিয়ারাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল জাপ-ভারত সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার রূপে। তাঁর প্রধান কাজ হবে—অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে সহায়তা করা।

মল্লিকা, কেন যে সেদিন এই ফুজিয়ারা চল্লিশ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে মোহন সিং-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন; এবার তুমি তা বুঝতে পেরেছ আশা করি। আসলে সব কিছুর মূলেই ছিলেন রাসবিহারী, যাঁর অবদানের কথা সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি আছেই। বিশেষ করে, রণোন্মত্ত সেনা বাহিনী যখন বিজয়গর্বে এগিয়ে চলে, তখন তো কথাই নেই। যে কোন সেনা বাহিনীর পক্ষেই বোধ হয় একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ক্ষেত্রেও কোন ভারতীয় নারী বা তাদের ধন-সম্পত্তির এতটুকুও ক্ষতি হয়েছিল কি ?

না, হয়নি। কারণ—রাসবিহারী। শুরুতেই তিনি সেনা বাহিনীর মধ্যে ছোট ছোট পুস্তিকা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জাপ-ভারত মৈত্রীর কথা উল্লেখ করে। কিভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলতে হবে, কোন্ ভাষায় ভারতীয় নারীদের সম্ভাষণ করতে হবে, সব কিছু নির্দেশই তার মধ্যে দেওয়া হয়েছিল যথাযথভাবে।

ফল হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল

শাহ্‌নওয়াজ খান তাঁর 'I. N. A. & its Netaji' গ্রন্থে কি বলেছেন, শোন :

'ভারতীয়দের প্রতি জাপানীদের ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।... ভারতীয় সৈন্যদের তারা বলত,—'তোমরা আমাদের শত্রু নও, ভাই।'...যুদ্ধক্ষেত্রে যে-সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছিল, জাপানীদের হাতে তারা ভাল ব্যবহারই পেয়েছিল।

...ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, ফরাসী ইন্দোচীন, সাংহাই, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ইত্যাদি জায়গায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সমস্ত শাখাই রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হত।

পূর্ব-এশিয়ায় এইসব শাখা স্থাপন করে রাসবিহারী খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।...কোথাও ভারতীয় নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটেনি। 'I will say this much for them that they never molested any Indian woman'. বরং বহু চীনা এবং ইউরেশিয়ান মেয়েই সেদিন শাড়ি বা দোপাট্টা পরে রেহাই পেয়েছিল নিজেদের ভারতীয়া বলে পরিচয় দিয়ে।

জাপানী সৈন্যদের দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সৈন্য হিসেবে তারা খুবই ভাল। ওপরওয়ালাদের আদেশ তারা বিশ্বস্তভাবে মেনে নিতেই অভ্যস্ত। প্রায়ই দেখা যেত, ভারতীয়দের গৃহে গিয়ে তারা আলাপ করার চেষ্টা করছে। প্রশ্ন করত—'গান্ধী ক্যা?' অর্থাৎ তুমি কি গান্ধীর দলের লোক? উত্তরে 'হ্যাঁ' বললেই ওরা খুশি হয়ে নমস্কার বা করমর্দন করে চলে যেত।' [I. N. A. & its Netaji : P.—11-15]

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব রাসবিহারীর। যেভাবে সেদিন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ নরনারীর ধন-প্রাণ, মান-মর্যাদাকে যক্ষের মতো আগলে রেখেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার নজীর আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার জানা নেই।

ওদিকে রাসবিহারীর মাথায় তখন অন্য পরিকল্পনা।

শুধু বাইরে থেকে নয়, আঘাত করতে হবে ঘরে-বাইরে দুদিক থেকেই। এক সঙ্গে দুদিক থেকে আঘাত হানতে পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য। তার জন্য সর্বাগ্রে চাই উপযুক্ত প্রচার। এই প্রচারের সাহায্যেই ডাক পাঠাতে হবে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে। বলতে হবে—আমরা প্রস্তুত। তোমরাও প্রস্তুত হও। আর দেরি নয়। সংগ্রাম আসন্ন।

আবার যোগাযোগ করলেন জাপান সরকারের সঙ্গে। জাপ-ভারত সহযোগিতার নিদর্শন হিসেবে সব রকম প্রচারের সুযোগ চাই। অবিলম্বে।

রাজী হল জাপান। বেশ, তাই হোক।

শুরু হল প্রচারের কাজ। তারিখটা ছিল ৯ই মার্চ, ১৯৪২ সাল। দীর্ঘ সাতাশ বছর বাদে হঠাৎ সেদিন জন্মভূমির উদ্দেশ্যে রাসবিহারীর কণ্ঠ সরব হয়ে উঠল টোকিও রেডিও থেকে:

'I, Rash Behari Bose, representing the Indians living in East Asia, pay my homage to you.

...I must pay homage to all those Indians, some of them known and honoured by their countrymen but most of them "unwept, unhonoured and unsung", who, since India lost her freedom to the British, have individually and collectively made an offer of their lives to regain it...'. [Rash Behari Bose—His struggle for India's Independence: P.—160-161]

৯ই মার্চ প্রণাম জানালেন বিপ্লব-গুরু ঋষি অরবিন্দের উদ্দেশ্যে:

'This is a salute to him to whose inspiring call owes the birth of positive Indian nationalism...and due to whose burning speech and thundering pen,

patriotism came to have a fresh and profound meaning for modern Indians.

This salute is offered to him in the time-honoured Indian custom of asking for the blessings of the elders and pioneers before undertaking a great and noble task.' [Ibid : P.—162-163]

১৩ই মার্চ আবেদন জানালেন গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে :

'I, Rash Behari Bose, representative of Indians now living in East Asia, regard you as the sole leader of the Indian nation, and have no hesitation in saying that the fate of the Indian nation is secured in your hands.

···I shall be greatly pleased to receive your blessings in my present undertaking. May God show you the proper way to lead India to complete freedom···' [Ibid : P.—163-165]

তারপর একে একে জওহরলাল, বীর সাভারকার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রাজাগোপাল আচারিয়া, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মুসলীম লীগ-প্রধান জিন্না, সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফর খান প্রমুখ সবার উদ্দেশ্যে। বক্তব্য সেই একই। চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে। সুতরাং আর দেরি নয়। চাই সংগ্রাম।

এরি মধ্যেই এক ফাঁকে ডাক পাঠালেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রীতম সিং, এন. রাঘবন প্রমুখ থাইল্যাণ্ড ও মালয়ের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে।

তোমরা সবাই একবার টোকিওতে এসো ভাই। আসন্ন টোকিও সম্মেলনে বসেই সবাই মিলে আমরা ঠিক করব যে, কোন্ পথে

আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। সম্মেলন শুরু হবে ২৮শে মার্চ। ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ।

মনে রেখো, লক্ষ্য আমাদের সবারই এক। One nation—India. One enemy—England. One goal—Independence.

না, নেতৃত্বের কোন মোহ আমার নেই। আগেও ছিল না, এখনো নেই। শুধু একটি মাত্র কামনা। আমি যেন আমার সেই ফেলে-আসা জন্মভূমিকে শেষবারের মতো একবার দেখে যেতে পারি। একবার যেন তার পায়ে মাথা রেখে বলতে পারি—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

না, আর আমার কিছু চাইবার নেই সংসারের কাছে। শুধু এইটুকুই। তারপরই আমার ছুটি। চিরদিনের মতোই ছুটি।

ওদিকে সুভাষ তখন এগিয়ে চলেছেন জোর কদমে।

শুধু কাজ—কাজ আর কাজ! অফুরন্ত কাজ। একটার পর একটা। অসংখ্য।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের নিজস্ব মুখপত্র চাই। নিজস্ব ডাকটিকেট চাই। অফিসার ও সৈন্যদের জন্য নিজস্ব ইউনিফর্ম, ব্যাজ ও মেডেল চাই। অবিলম্বেই চাই। ব্রিটিশ সিংহ ফাঁদে পড়েছে। আর সময় কোথায়! এই তো সুযোগ!

তারপর বেতার-ভাষণ। নিয়মিতভাবে সব কথা দেশবাসীকে জানাতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের আসল চেহারাটা সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। সবাইকে ডেকে বলতে হবে যে,—আর সময় নেই। সংগ্রাম আসন্ন। সবাই তার জন্য প্রস্তুত হও।

কোন্ কোন্ স্টেশন থেকে সেদিন সুভাষের বেতার-ভাষণ প্রচারিত হত, জানো মল্লিকা?

পডিব্র্যাড ও হুইজেন থেকে। রেকর্ড-করা সেই ভাষণ ২০'৩৪ মিটারে প্রচার করা হত পডিব্র্যাড থেকে। সময় ওখানকার হিসেবে বিকেল পাঁচটা পনেরো মিনিট থেকে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত।

আর ১৯'৭১ মিটারে শর্টওয়েভ লেংথে প্রচার করা হত হুইজেন থেকে।

সেই একই খবর আবার পরদিন ভোর তিনটে ত্রিশ থেকে পাঁচটা ত্রিশ পর্যন্ত পডিব্র্যাড থেকে প্রচার করা হত ২০'৩৪ ওয়েভ লেংথে।

নির্দিষ্ট সময়ে রেডিও খুললেই শোনা যেত সেই পরিচিত কণ্ঠ :

'আমি সুভাষ বলছি···'

তা বলে কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না, মল্লিকা।

বার্লিন থেকে প্রচারিত কোন খবর শোনা এবং সংবাদপত্রে তার বিবরণ প্রকাশ করা—দুই-ই ছিল সেদিন আইনত নিষিদ্ধ। তাই শুনতে হত ভাল করে দরজা-জানালা বন্ধ করে, অতি সন্তর্পণে।

তাও সব কথা ভাল করে শোনা যেত না। শত্রুপক্ষ সব কিছুই জ্যাম করে দিতে চেষ্টা করত একই তরঙ্গে নানাবিধ বিশ্রী শব্দ প্রচার করে। উদ্দেশ্য, সুভাষের বক্তব্য যেন এখানে কেউ শুনতে না পায়।

তাছাড়া ছিল নানাবিধ পাল্টা অপপ্রচার। আজ আর তাদের চেনা যায় না। নইলে দেশের তথাকথিত স্বনামধন্য ব্যক্তিরা কি সেদিন ব্রিটিশের হয়ে কম সুভাষ-বিরোধী প্রচার-কার্য চালিয়েছিলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে! বিনে পয়সায় নয়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পকেটে নিয়েই।

ওদিকে আজাদী বাহিনীর শিক্ষার কাজ তখন এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ওয়ালটার হারবিচ্-এর ওপর।

এতদিন একমাত্র রাইফেল ছাড়া আর কোন কিছুই তারা ব্যবহার করতে খুব একটা অভ্যস্ত ছিল না। অধুনা পর্বতারোহণ,

প্যারাস্যুট ব্যবহার, ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের কলা-কৌশল ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধের সব কিছুই তাদের আয়ত্তের মধ্যে।

বেতার, টেলিগ্রাফ, নানাবিধ সাঙ্কেতিক লিপি, অদৃশ্য কালির ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে এরই মধ্যেই বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছেন এন. জি. স্বামী ও আরো কয়েকজন। শত্রুপক্ষের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে নানাবিধ সামরিক তথ্য সংগ্রহ করতে হলে এসব কায়দা-কানুন ও যন্ত্র-কৌশল আয়ত্তে থাকা খুবই প্রয়োজন।

শুধু সামরিক শিক্ষা নয়, সৈন্যদের সবচাইতে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে মানসিক দিক থেকে।

ভাড়াটে সৈনিক বলে এতদিন তাদের সম্মান বলতে কোথাও কিছুই ছিল না। সর্বত্র তারা ছিল অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র।

আজ তারা ভারতের আজাদী সৈনিক। তাদের সম্মান আলাদা। ইজ্জত আলাদা। ভাবতে গেলেও যেন বুকটা দশ হাত উঁচু হয়ে ওঠে। অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ!

আশ্চর্য, ধূর্ত ইংরেজের প্রচার-কৌশলে সব কিছু তারা ভুলে গিয়েছিল এতদিন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, সবার ধর্ম ছিল সেদিন আলাদা।

সেনা বাহিনীও আলাদা। সব কিছুই সেখানে গড়ে উঠেছিল ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিতে। উদ্দেশ্য,—প্রয়োজন হলে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে শায়েস্তা করা।

ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি আহার্যের ব্যাপারেও পর্যন্ত সেদিন কারো সঙ্গে কারো এতটুকুও মিল ছিল না।

আজ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

তাই অনায়াসেই এখন তারা বুক ফুলিয়ে বলতে পারে:

'In India we have many religions and many gods.

But here everything is Jai Hind.' [The Springing Tiger : Hugh Toye : P.—74]

[ভারতবর্ষে আমাদের বহু ধর্ম, বহু দেবতা। কিন্তু এখানে সব কিছুই 'জয় হিন্দ্'।]

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। 'জয় হিন্দ্'—এই একটি মাত্র কামনা ছাড়া সেদিন বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না আজাদী সৈনিকদের জীবনে।

মাঝে মাঝেই সুভাষ গিয়ে দেখে আসেন তাঁর একান্ত প্রিয় আজাদী বাহিনীকে। সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। ওরাই তো সেদিন সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে যাবে সংগ্রামের পুরোভাগে। ওদের ছেড়ে তিনি থাকবেন কি করে ?

ওদিকে তখন জাপানীদের জয়ের পালা চলেছে। সেই সঙ্গে বার বার ভেসে আসে জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা :

India for the Indians ! India for the Indians ! India for the Indians !

ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের জন্য। হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে তোজোর এই ঘোষণা অভিনন্দনযোগ্য। ভারতবাসীদের কাছে এর চাইতে বড় সত্য আর কিছুই নেই।

ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে যান সুভাষ। ডুবে যান নীরব মধুর এক নিঃসঙ্গতার গভীরে। জার্মানী থেকে ভারতের দূরত্ব প্রায় ছ'হাজার মাইল। কিন্তু বর্মা ও ভারত একেবারে পাশাপাশি। সংখ্যার দিক থেকেও ভারতীয়রা ওখানে অনেক বেশি। একবার যাওয়া যায় না ওখানে ?

দেখা করলেন বার্লিনের জাপানী রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমা এবং তাঁর সামরিক উপদেষ্টা কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে। ওখানে একবার পাঠাতে পারো না আমাকে ?

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল টোকিওতে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী চন্দ্র বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক। এ সম্বন্ধে নির্দেশ চাই।

যথাসময়ে তার উত্তর এল টোকিও থেকে। অত্যন্ত হতাশ-ব্যঞ্জক উত্তর ঃ

'তোকিয়ো নিওয়া সুদেনি দাই কাকুমেকা রাসবিহারী বোস সেন্‌সেগা ইরু। গেনজুই নো আকুজি কিয়োকুজি নি তানো কাকুমেংকা ও নাজে বেরুরিন কারা ইয়োবানাকারেতা নারানাই নো কা'।

অর্থাৎ, বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বোস এখানেই রয়েছেন। তা সত্ত্বেও এ পরিস্থিতিতে আর একজন বিপ্লবী কেন?

তবু হাল ছাড়লেন না সুভাষ। আবার তিনি দেখা করলেন জেনারেল ওসিমা ও কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে।

একবার নয়, বার বার। বর্মা ও ভারত পাশাপাশি। এমন সুযোগ যে জীবনেও আর কোনদিন পাওয়া যাবে না! এত সহজে হতাশ হলে চলবে কেন? দেখাই যাক না!

সুভাষ এবং রাসবিহারী। পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবস্থিত দুটি ঘরছাড়া মানুষ।

দুজনেরই তখন একমাত্র লক্ষ্য—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ব্রিটিশ সিংহ বেকায়দায় পড়েছে। এই তো সুযোগ। পৃথিবীব্যাপী এই ভাঙা-গড়ার সুযোগে যে করে হোক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে।

দিশাহীন নেতৃত্বের ফলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। বিশেষ করে কংগ্রেসের। যুদ্ধ শুরু হয়েছে তিন বছর, কিন্তু সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে তখনো পর্যন্ত তাদের আবেদন-নিবেদন চলছে সেই একইভাবে।

সত্যি বলতে কি, গত তিন বছরের মধ্যে একমাত্র সুভাষকে দল থেকে বহিষ্কার করা, আর কারণে-অকারণে মুসলীম লীগ-প্রধান জিন্নাকে তোষণ করা ছাড়া কংগ্রেস আর এমন কিছুই করেনি, যা উল্লেখ করার মতো।

সর্বত্র হতাশা। সর্বত্র বিভ্রান্তি। কোথাও কোন আলোর চিহ্ন-মাত্রও নজরে পড়ে না।

শুধু মাঝে মাঝে সেই দূরাগত কণ্ঠ সব কিছু ছাপিয়ে ভারতের তটে এসে আছড়ে পড়ে অভয় মন্ত্রের মতো ঃ

'আমি সুভাষ বলছি…

আজকের দিনে ব্রিটিশের মতো স্বাধীনতা ও প্রগতির এতবড় শত্রু আর নেই। ব্রিটিশ শাসন ধ্বংসের অর্থই হল ভারতবর্ষের এক অত্যাচারী স্বৈর শাসনের পরিসমাপ্তি। প্রিয় ভাইবোনেরা, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

যে সাম্রাজ্যের জন্ম হয়েছিল দস্যুতার মধ্য দিয়ে, সে সাম্রাজ্য যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন লুণ্ঠন, অত্যাচার কোন কিছু করতেই সে বাকি রাখবে না। তাদের যুদ্ধ জয়ের অর্থই হল আমাদের নিজেদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করা।

না। সমস্ত ষড়যন্ত্র, সমস্ত ধূর্ততা দিয়েও ব্রিটিশ এবার আর ভারতকে প্রতারিত করতে পারবে না। আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব। শুধু নিজেদেরই আমরা স্বাধীন করব না, স্বাধীন করব এশিয়াকে। গোটা পৃথিবীকে। জয় হিন্দ্!'

একইভাবে মহানায়কের কণ্ঠ ভেসে আসে সুদূর টোকিও থেকে

বন্ধুগণ, আর কথা নয়। অনেক কথা হয়েছে। এবার কথা বন্ধ রেখে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হোন।

'Action is more important and effective than words. The less you talk, the more energy you conserve for action.'

কোথায় সংগ্রাম, কোথায় কি! বরং অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে গান্ধীজীর ভুল বোঝাবুঝির ফলে।

গান্ধীজীর অভিমত: সর্বাগ্রে অহিংসা। সুতরাং সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে যা-ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন, সব কিছুই হবে অহিংস পন্থায়।

জওহরলাল, আজাদ প্রমুখ বেশির ভাগ সদস্যই তা মানতে রাজী নন। তাঁদের বক্তব্য: কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান হলেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কোন আপত্তি নেই, যদি বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায়।

এই নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি। ফলে, শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ত্যাগ এবং কংগ্রেস কার্যত দ্বিধাবিভক্ত।

'...The majority of Congress Leaders rejected Gandhi's policy and called for some sort of co-operation with the British....Congress remained divided.' [Last years of British India : Michael Edwardes : P.—86]

অবশ্য গান্ধীজীর পক্ষে এটা নতুন কিছু নয়। এর আগেও তিনি কয়েকবার সরে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে বেশি দিন নয়, তারপরই আবার একদিন যথাস্থানে ফিরে এসেছেন পূর্ণ মর্যাদায়। সুভাষের ভাষায়:

'Whenever any opposition raised outside his cabinet, he could always coerce the public by threatening to retire from the Congress or to fast unto death.' [The Indian Struggle : Subhas Chandra Bose.]

অর্থাৎ—যখনই গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ উঠত,

ঠিক তখনই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া বা আমরণ অনশন করার হুমকি দিয়ে সবাইকে তাঁর মতে চলতে বাধ্য করতেন।

নিস্তরঙ্গ নদীতে ঢেউ তুললেন চীনের রাষ্ট্র-নায়ক চিয়াং কাইশেক।

ওদিকে জাপানীদের তখন জয়ের পালা চলেছে। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। বর্মাও যায় যায়।

প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নির্বিকার। সব যাক, তবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনরকম মীমাংসায় আসতে তিনি রাজী নন। কংগ্রেস বা অন্যান্য দলগুলি সহযোগিতা করুক বা না করুক, তাতে তাঁর কিছু আসে-যায় না।

দেখে-শুনে ভয় পেয়ে গেলেন চিয়াং কাইশেক। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর মার্কিনী শিক্ষায় শিক্ষিতা সুন্দরী পত্নীসহ ভারতবর্ষে ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে।

জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে চীনের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। বর্মাও গেল বলে!

জাপানীদের অগ্রগতি রোধ করতে হলে এ সময়ে ভারতবাসীর সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

জওহরলাল পুরনো বন্ধু। দেখা যাক, তাঁকে বলে-কয়ে কিছু হয় কিনা!

জওহরলাল এককথায় রাজী। জাপান সাম্রাজ্যবাদী। যে করে হোক, তাদের রুখতেই হবে। সুতরাং রাজী না হবার কোন কারণ নেই।

রাজী হলেন না গান্ধীজী।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তাঁর কি কথা হল ঠিক জানা গেল না। কিন্তু দেখা গেল যে, সহযোগিতার ব্যাপারে তিনি জওহরলালের সঙ্গে একমত নন।

বিপদ দেখে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্মরণ নিলেন চিয়াং কাইশেক।

ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য অবিলম্বে আপনি আরো বেশি করে চার্চিলের ওপর চাপ দিন। নইলে জাপানীদের হাত থেকে কি চীন, কি ভারত, কিছুই রক্ষা করা যাবে না। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এটা একান্ত প্রয়োজন।

এবার কাজ হল। হাজার হোক, রুজভেল্ট তখন মিত্রপক্ষের বড় তরফের কর্তা। লোকবল, ধনবল ও সমর-সম্ভার ইত্যাদির ব্যাপারে তিনিই তখন ইংল্যাণ্ডের একমাত্র বল-ভরসা। তাঁর কথা অগ্রাহ্য করার মতো শক্তি ইংল্যাণ্ডের তখন কোথায়?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৯শে মার্চ তারিখে চার্চিল ঘোষণা করলেন তাঁর সদিচ্ছার কথা।

শীগ্‌গিরই আমি আমাদের ক্যাবিনেট-সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে মস্ত বড় একটি উপঢৌকনসহ ভারতে পাঠাচ্ছি। ভারতীয়রা নিশ্চয়ই এবার খুশি হবে।

খুশি হলেন জওহরলাল। হবারই কথা। কারণ, চিন্তাধারার দিক থেকে দুজনেই এক। কাজের বেলায়ও তাই। সুতরাং খুশি না হবার কোন কারণ নেই।

আশাবাদী নন গান্ধীজী। তাঁর অভিমত ঃ ক্রীপস্ অত্যন্ত ভাল মানুষ। কিন্তু যে যান্ত্রিক যানে তিনি উঠেছেন, সেটা হল অতি পরিচিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ফলে, যত ভাল মানুষই হোন না কেন, শেষ পর্যন্ত সেই যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করতে তিনি বাধ্য।

ওদিকে ঘোষণা শুনে ততক্ষণে প্রায় সবগুলি দলই সোচ্চার হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দাবী নিয়ে।

বেশ বোঝা যায় যে, স্বাধীনতা আসন্ন। শুধু ক্রীপস্ আসার অপেক্ষামাত্র। সুতরাং আগে থেকেই নিজেদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার।

কবে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে তার কোন ঠিক নেই, তবু কত রকম দাবী! একটার পর একটা। অসংখ্য দাবী।

কংগ্রেসের দাবী, আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তবে বিনিময়ে কি পাব, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা চাই।

হিন্দু মহাসভার মুখে অন্য কথা। কংগ্রেস! সে আবার কে? ও তো কতকগুলি বিত্তশালী লোকের একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র। হিন্দুদের হয়ে কথা বলবার ওদের কি রাইট আছে? তা যদি বলতে হয় তো আমরাই বলব। হ্যাঁ, আমরাও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। হিন্দু যুবকরা দলে দলে ঢুকে যাও সেনা বাহিনীতে।

আর কমিউনিস্ট পার্টি! সেকথা তোমাকে আমি বলব আরো পরে।

লীগ-প্রধান জিন্না এর কোনটাই মানতে নারাজ। তাঁর সাফ কথা, আমাদের যা বক্তব্য, তা লাহোর অধিবেশনেই বলা হয়েছে। হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। আমরা আলাদা জাত। কিন্তু আমাদের কোন আলাদা দেশ নেই। সুতরাং আমরা পাকিস্তান চাই।

'Pakistan is our deliverance, defence, destiny. Pakistan is our only demand and we will have it.'

শিখ-সম্প্রদায়ের বক্তব্য—মুসলমানরা যদি পাকিস্তান চাইতে পারে, তাহলে আমরাই বা ছাড়ব কেন? সুতরাং আমাদেরও আলাদা 'শিখিস্তান' চাই।

শুধু এইটুকুই! ফুট্ কাটলেন আচার্য কৃপালনী, কেন, আলাদা জেনানাস্তান চাই নে! সরোজিনী নাইডু, কমলা দেবী প্রমুখরা দাবী তুললেই তো হয়!

লক্ষ্য কর মল্লিকা যে, প্রায় সবগুলি দাবীই গড়ে উঠেছে ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিতে, জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ—নিঃশর্ত স্বাধীনতা আমাদের কাম্য নয়, চাই ধর্ম ও সম্প্রদায়-ভিত্তিক স্বাধীনতা।

আর সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজ! সেখানেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক কম ছিল না।

কিন্তু না, একমাত্র 'জয় হিন্দ্' ছাড়া আজ আর তাদের কোন আলাদা ধর্ম নেই। তাদের একমাত্র পরিচয়—তারা ভারতীয়। তাছাড়া আর সব পরিচয়ই আজ মিথ্যে হয়ে গেছে তাদের জীবনে।

কারণ—নেতাজী। নেতাজীই তাদের শিখিয়েছেন যে, হিন্দুস্থান এক ও অভিন্ন। সেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই।

'Netaji had determined to abolish or ignore all caste and religious distinction. This had great effect and in course of time it was not 'gods' that mattered but the Nation and 'Jai Hind' that ruled the hearts of men.'

[Ganpuley : P.—97]

ওদিকে সুভাষও তখন তৎপর হয়ে উঠলেন চার্চিলের ঘোষণা শুনে।

অবিলম্বে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিতে হবে ক্রীপস্ সম্বন্ধে। মানুষ ঠেকে শেখে। আমরাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে বিশ্বাস করে ঠেকে শিখেছি। সুতরাং আর ও-পথে যেতে আমরা রাজী নই।

যথাসময়ে সুভাষের সেই সতর্ক-বাণী ভেসে এল সুদূর বার্লিন থেকে:

'আমি সুভাষ বলছি···

আমার ভাইবোনেরা, ব্রিটিশ মিশন আপনারা প্রত্যাখ্যান করুন।

ভারত সম্বন্ধে তাদের সদিচ্ছা প্রমাণ করার জন্য ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা অবিরাম আবেদন জানিয়ে এসেছি। কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। বিশ্বাসহীন মিথ্যা ও চটুল চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই আমরা পাইনি আমাদের আবেদনের উত্তরে।

আজ ব্রিটিশ প্রচারকগণ ভারতবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, শত্রুর আসন্ন আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতবর্ষ বিপন্ন। তার জন্যই ভারতবাসীকে এখন অপরিমিত রক্ত, শ্রম ও অশ্রু দিতে বলা হয়েছে।

কিন্তু আমি বলছি যে, ভারত-সীমান্তের বাইরে আমাদের কোন সত্যিকারের শত্রু নেই। আসল শত্রু আমাদের ঘরেই।

জার্মানী, ইতালী বা জাপান—ভারতের বিপদের কারণ হবে, এর চাইতে বড় মিথ্যে আর কিছু নেই। আমি তাদের যতটুকু চিনি, তাতে আমি জোরের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ছাড়া আমাদের সম্বন্ধে আর কোন ধারণাই ওরা পোষণ করে না।

আজ আমাদের আনন্দের দিন যে, ত্রি-শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের চিরকালের শত্রু ব্রিটিশের সাম্রাজ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন যে, সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি স্তম্ভ চোখের সামনে খসে ধসে পড়ছে।

আজ আমাদের আনন্দের দিন, কারণ আজ নতুন দিনের শুরু—যে-দিন শৌর্য ও বীর্য দিয়ে অর্জন করবে ভারতের স্বাধীনতা। ভারতের ন্যায্য অধিকার। ভারতের সুখ, ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি। জয় হিন্দ্!'

সুভাষের পরে রাসবিহারী।

১৬ই মার্চ রাসবিহারী আবেদন জানালেন টোকিও রেডিও থেকে।

ক্রীপস্ যতই ভাঁওতা দিতে চেষ্টা করুক না কেন, ওদের পুরনো চালে আর আমরা ভুলব না। কি পেয়েছিল ভারত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অকুণ্ঠ সহযোগিতার বিনিময়ে? একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু পেয়েছিল কি? আজ সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

…'I like to warn you again, Oh Indian brothers and leaders of Indian nationals, against Britain's old

tricks. She is now sending Sir Stafford Cripps to India to deceive the Indian nation.

Be not befooled this time. Do not forget the story of the last European war. India made enormous sacrifice for helping Britain win that war.

In lieu of her sacrifices England promised India self-rule. But, what did India get? India got martial laws and Jalianwalla Baghs'. [Rash Behari Bose—His struggle for India's Independence : P.—167]

এখানেই থামলেন না রাসবিহারী। একই দিনে আবার তিনি আবেদন জানালেন মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্নার উদ্দেশ্যে।

অতীতের সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে আবার আপনি আগেকার মতো সত্যিকারের জাতীয় নেতা রূপে অবতীর্ণ হোন, জিন্না সাহেব। এ সুযোগ একবার হারালে আর কোনদিনই যে ফিরে পাওয়া যাবে না।

'A great mission awaits you, Janab Jinnah, in this connection....I assure you that we are all awaiting your emergence once more as a national leader.'

[Ibid : P.—169].

ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ যতটা ওয়াকিবহাল, রাসবিহারী ঠিক ততটা নন। কারণ, দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি দেশছাড়া। তাই গভীর প্রত্যাশা নিয়ে একের পর এক তিনি আবেদন জানাতে লাগলেন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের কাছে।

১৮ই মার্চ আবেদন জানালেন জওহরলালের উদ্দেশ্যে :

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হওয়া দরকার। এশিয়ার জাতিপুঞ্জের মধ্যে স্বাধীন ভারতের পুনরুত্থান সব দিক থেকেই কাম্য।

'On behalf of the Indians in East Asia, my only prayer to you at this moment is that you realise that the doom of the British Empire is a historic necessity, and the rise of a free India as a member of the Asiatic comity of nations, is the wish of Providence itself.' [Ibid : P.—171]

২১শে মার্চ বীর সাভারকারের উদ্দেশ্যে :

ব্রিটিশ আজ হয়তো সব রকম প্রলোভনই দেখাবে। এমন কি, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিও দিতে পারে। কিন্তু তাদের সেই ফাঁদে পা দেওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না, যদি তার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

'At this stage, Britain may offer all kinds of temptations to Indians—she might even offer independence. But please do not accept even independence if it would involve India in a war with which she has got nothing to do.' [Ibid : P.—174]

সাভারকারের পরে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের উদ্দেশ্যে :

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ না দেবার যে নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল, তাতে অবিচলিত থাকুন। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

'At this time when the whole world is facing a radical change in the course of its history, and when consequently the fate of our nation seems to hang in the balance, I, Rash Behari Bose, appeal to you with respect, hopes and expectations.

...Appealing to you once more to stick to your fixed policy of refusing to participate in any imperia-

listic war of England, Revered Maulana Saheb, I, at the same time, pray to God to grant you sufficient strength to lead the country to independence and security. [Ibid : P.—174-177]

এবার চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়ার উদ্দেশ্যে :

কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ বা উদ্ভট কল্পনা দ্বারা দৃষ্টি-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে লাভ নেই। কোনরকম আন্তর্জাতিক জটিলতায় জড়িত না হয়ে স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

…'request you all not to let your vision be blurred by ideological chimeras, and to set independence without international complications alone as the guiding star on your present perilous journey'. [Ibid : P.—370]

রাজাগোপাল আচারিয়ার পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল :

চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। স্পষ্ট ভাষায় আমাদের ঘোষণা করা উচিত যে, আমরা শর্তহীন স্বাধীনতা চাই।

'Now is the time for the last supreme effort on your part as well as on the part of us Indians abroad. Now is the time to assert in unmistakable terms our national birthright, that is, immediate, complete and unconditional independence.' [Ibid : P.—179]

সবশেষে সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফর খান সাহেবের উদ্দেশ্যে :

দুঃসাহসী পাঠানদের নিয়ে এগিয়ে আসুন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এবার আমরা পৌঁছে যাবই।

'Come forward with your brave Pathans, Khan Saheb, and utilize this golden opportunity afforded

us by the war of Greater East Asia, to lead India to complete independence.' [Ibid : P.—394]

সেই সঙ্গে জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজোর আবার একটি ঘোষণা শোনা গেল নতুন করে :

'The British influence in India is now about to be exterminated. I wish once again to repeat at this juncture Japan's expectation that not only the leaders in India but the four hundred million people there, while avoiding unnecessary calamities which will result from their being misled by sweet flatteries of Britain, the nation, destined to down fall, will take full advantage of this heaven-sent opportunity and break away from the British bonds which have so long shackled them and thus go vigorously forward to realize truly their long-cherished aspiration of "India for the Indians".'

ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাবার মুখে। এই সন্ধিক্ষণে আমি আবারও বলছি যে, জাপান আশা করে, শুধু ভারতীয় নেতৃবৃন্দই নয়, তার চল্লিশ কোটি অধিবাসীও যেন ব্রিটিশের মিষ্টি কথায় ভুলে এমন পথে না যান, যার পরিণাম হবে মারাত্মক।

যে ব্রিটিশের পতন অবশ্যম্ভাবী, তাদের স্তোকবাক্যে না ভুলে তাঁরা যেন সেই পথে এগিয়ে যান, যার মূলকথা হল—'ভারত ভারতীয়দের জন্য'।

সহসা একটা মারাত্মক খবর ভেসে এল সুদূর লণ্ডন থেকে। সুভাষ বেঁচে নেই। রয়টারের এক সংবাদদাতা জানিয়েছেন—

তিনি নাকি টোকিও যাবার পথে নিহত হয়েছেন আকস্মিক এক বিমান-দুর্ঘটনার ফলে।

খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। আপসহীন সংগ্রামী সুভাষ যে এমন আকস্মিকভাবে প্রাণ হারাবেন, তা কে জানত! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

তার পাঠালেন গান্ধীজী। তার পাঠালেন আরো অনেকেই। সুভাষ বেঁচে নেই! এ জীবনে আর কোনদিনই তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না! এ দুঃখ যে কোনদিনই যাবার নয়!

'আমি সুভাষ বলছি...'

কে! কে! চমকে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। কে কথা বলছে? কার কণ্ঠ ভেসে আসছে অদৃশ্য-লোক থেকে?

'আমি সুভাষ বলছি। ব্রিটিশ সংবাদ-প্রচারকেরা সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছে যে, টোকিও যাবার পথে এক বিমান-দুর্ঘটনায় আমি মারা গিয়েছি। আমি মারা গেলেই যে তারা খুশি হয়, তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, আজও আমি বেঁচে আছি।

সম্প্রতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ লণ্ডন থেকে যে বেতার-বক্তৃতা দিয়েছেন, তা আমি বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখেছি।

তিনি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই চিরাচরিত ভেদনীতিকে কাজে লাগাবার জন্য ভারত যাত্রা করেছেন, একথা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, খ্রীষ্টীয় যুগের কয়েক শতাব্দী আগে, এমন কি ইংল্যাণ্ডের একত্রিত হবার হাজার বছরেরও বেশি আগে, মহারাজ অশোকের রাজত্বে ভারতবর্ষ একত্রিত হয়েছিল। বহু জাতির সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশের ভেদনীতির ফলেই।

তাই একদিকে তিনি যখন একদল রাজনীতিকের সঙ্গে আলাপ-

আলোচনা করার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখনও স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের নির্ভীক ও দুর্দম যোদ্ধাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

আমি বিশ্বাস করি যে, একদিন এই স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের অকৃত্রিম আত্মশক্তি ঐ কারাগারের শক্ত প্রাচীরগুলিকে ভেঙে চৌচির করে দেবে, ভারতের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের জানাবে যে, এ অপমান শুধু তাদের অপমান নয়, এ অপমান সমস্ত দেশের, সমস্ত ভারতের।

স্যার স্ট্যাফোর্ড যদি মনে করে থাকেন যে, বরাবরের মতো এবারও ভারতবাসীকে ভাঁওতা দিয়ে কার্যোদ্ধার করা যাবে, তাহলে আমি বলব যে, তিনি নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সাহায্যেই ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিনিময়ে কি পেয়েছিল সেদিন ভারত? পেয়েছিল অশেষ নির্যাতন আর অগণিত নরহত্যা। সেকথা আমরা কোনদিনই ভুলিনি।'

দূরাগত কণ্ঠ নীরব হল। প্রমাণিত হল যে, সুভাষ বেঁচেই আছেন। তাহলে কেন ব্রিটিশের এই মিথ্যে প্রচার? কি এর উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য—সুভাষের সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া, আর এই সুযোগে সুভাষ সম্বন্ধে ভারতবাসীর সত্যিকারের মনোভাব যাচাই করে দেখা।

দেখে খুশি হয়েছিল কি? তোমার কি মনে হয়, মল্লিকা?

সুভাষের বক্তব্য কিন্তু এখানেই শেষ হল না। আবার একসময়ে তাঁর দূরাগত কণ্ঠ ভেসে এল ইথার-তরঙ্গে।

তবে এবার আর ভারতবাসীকে লক্ষ্য করে নয়, ক্রীপস্-এর উদ্দেশ্যে।

'আমি সুভাষ বলছি···

আপনাকে আমি খোলাখুলিভাবে গুটি-কয়েক প্রশ্ন করতে চাই, স্যার ক্রীপস্।···

আপনি যখন শ্রমিক দলের হয়ে সংগ্রাম করতেন, তখন অনেকের মতো আমিও আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম। কারণ, বরাবরই আপনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।

এমন কথাও আপনি বলেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের রাজার সিংহাসন ত্যাগ করা উচিত। কারণ, এই সিংহাসনই হল সাম্রাজ্যবাদের আসল ভিত্তি।

কিন্তু আজ ?

গোটা ইংল্যাণ্ডে চার্চিলের মতো এমন ভারত-বিদ্বেষী লোক আর দ্বিতীয়টি নেই। একথা যে কতবড় সত্য, তা আপনার চাইতে বেশি বোধ করি কেউ জানে না।

কিন্তু কই, তা সত্ত্বেও তাঁর অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে আপনার তো একটুকুও আপত্তি দেখা গেল না !

আপনি শ্রমিক দলের নেতা। কিন্তু মুখে ভাল ভাল কথা বলা ছাড়া রক্ষণশীল দলের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সঙ্গে আপনাদের তফাত কোথায় বলতে পারেন ?

কি হয়েছিল ১৯২৪ সালে ?

কি হয়েছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩১—এই তিন বছরে ?

আপনারাই তো সেদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন শাসন-ক্ষমতায়। তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সময় তখন আমাদের কেটেছিল লৌহ-কারার অন্তরালে। তাও সাধারণভাবে নয়, বিনা বিচারে।

মোট এক লক্ষ লোককে সেদিন আপনারা ঠাঁই দিয়েছিলেন কারাগারে।

তাছাড়া কথায় কথায় বেপরোয়া লাঠি-চার্জ, পেশোয়ারে নির্বিরোধী জনতার ওপর অমানুষিক গুলি-বর্ষণ, বাংলাদেশের গ্রামকে

গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা, নারী-নির্যাতন,—এসব তো আছেই। তাহলে তফাতটা কোথায় ?

একথা কি আপনি জানেন না যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস হল প্রতিশ্রুতি ভাঙা এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ না করারই ইতিহাস ?

একথা কি আপনি জানেন না যে, আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র দাবী হল—পূর্ণ স্বাধীনতা ? তা সত্ত্বেও আপনার মতো খ্যাতিমান লোকের অন্য কোন বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে ওখানে যাবার মধ্যে সার্থকতা কোথায় ?

সাধারণ মানুষের কাছে আপনার এই ভূমিকা অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মতোই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাময় বলে মনে হবে। কারণ, তারা জানে যে, ভারতের একমাত্র শত্রু হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং সেই সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্ত হওয়াই ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য।'

২২শে মার্চ তারিখে ক্রীপস্ এসে পা দিলেন ভারতের মাটিতে।

অবশ্য দু বছর আগেও তিনি একবার এসেছিলেন। তবে সেবার এসেছিলেন বেসরকারী দূত হিসেবে। এবার মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে।

তাছাড়া এ ক্রীপস্, সে ক্রীপস্ নন। ইংল্যাণ্ডে তিনিই এখন সবচাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তি।

কারণ—রাশিয়া। মস্কোর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতরূপে তিনিই যে সেদিন নানাভাবে প্ররোচনা দিয়ে শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেকথা কোন রকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

নীতিগত দিক থেকে হাজার অমিল থাকা সত্ত্বেও দেশের চরম দুর্দিনে রাশিয়ার মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রকে মিত্ররূপে পাওয়া কি কম কৃতিত্বের কথা ?

এবারও যে বেছে বেছে তাঁকেই ভারতে পাঠানো হয়েছে তার কারণও সেই একই।

ক্রীপস্ অভিজ্ঞ লোক। রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রকে যিনি কাছে টানতে পেরেছেন, ভারত তো তাঁর কাছে কিছুই নয়। সুতরাং সাফল্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

যথাসময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানানো হল ক্রীপস্-এর পক্ষ থেকে। এসো, আলাপ-আলোচনা করে একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসা যাক।

কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক! না, ক্রীপস্ সাহেব ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে কথা বলতে রাজী নন। ওদের হুঁকো-নাপিত বন্ধ।

কারণ! প্রশ্ন তুললেন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রেসিডেণ্ট আর. এস. রুইকর।

কারণ! উত্তর দিলেন ক্রীপস্ সাহেব,—কারণ তোমাদের নেতা শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করছেন।

'Owing to the fact that the President of your organisation has been actively co-operating with enemy powers.'

অবশ্য সরকারী মুখপত্র স্টেটস্‌ম্যানের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। ক্রীপস্-এর মতো রেখে-ঢেকে না বলে খোলাখুলিভাবেই তারা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের কর্তব্যের কথা।

না, কোন দয়া নয়। কোন ক্ষমা নয়। সরকারের উচিত বাংলাদেশের সুভাষ-সমর্থকদের অবিলম্বে হত্যা করা। হত্যাই তাদের একমাত্র শাস্তি।

'...Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but convinced pro-fascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose.

It is the business of the Government to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be

given to them···The penalty for traitors to India must be death.' [The Statesman : 13-3-42]

জবাব দিয়েছিলেন তখনকার সময়ের 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা সম্পাদিকা বিপ্লবী-নায়িকা লীলা রায়ঃ 'We shall not stand it.' এ আমরা সইব না।

যথাসময়ে ক্রীপস্ তাঁর উপঢৌকন বের করলেন ঝুলি থেকে। সেই পুরানো কায়দা। তোমরা যুদ্ধে নামো, আমরা তোমাদের খুশি করে দেব। তবে কিনা এখন নয়, যুদ্ধে জয়ী হবার পরে। কথা দিলাম।

জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ সবাই রাজী। চমৎকার প্রস্তাব। সুতরাং আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু কংগ্রেসে জওহরলালই সব নন। সুতরাং সে দায়িত্ব নিতে হল অগতির গতি সেই গান্ধীজীকেই।

কিন্তু সব বৃথা। ক্রীপস্ বুদ্ধিমান লোক। কথাও বলতে পারেন চমৎকার। তবু জওহরলাল আর গান্ধীজী এক নন। তাই কথার মারপ্যাঁচে সবাইকে ভোলাতে পারলেও হোঁচট খেতে হল এই অসাধারণ মানুষটির কাছেই।

সহজ সরল কথা। তোমরা আমাদের খুশি করতে চাইছ যুদ্ধ জয়ের পরে। যুদ্ধে যে তোমরা জয়ী হবেই তার কি মানে আছে? গ্যারান্টি আছে কিছু? এ তো 'A post-dated cheque on a crashing bank.'

বার বার অনুরোধ জানালেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট।

একটা কিছু মীমাংসায় না এসে ক্রীপস্ যেন ভারত থেকে বিদায় না নেয়। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে যুদ্ধে জয়ী হতে হলে ভারতবর্ষের সহযোগিতাই আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন।

চার্চিলকেও তিনি তার পাঠালেন অনুরূপভাবে। সত্যিই যদি ভারতকে তোমাদের খুশি করার মতো সদিচ্ছা থাকে, তবে হুদিন

আগে করলেই বা ক্ষতি কি! কথাটা একবার ভেবেই দেখো না দয়া করে!

এখানেই শেষ নয়। সেই সঙ্গে আরো একটি অভিনব প্রস্তাব করা হল মার্কিন মহল থেকে:

'There is only one possible chance to make up a little of the lost time to spike the guns of Bose opposition. Nehru must be asked to become Prime Minister and Minister for Defence...' [Leadership and Political Institution of India.]

অর্থাৎ—পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য নেহরুকে একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করা হোক।

না, অন্য কোন কারণে নয়, সুভাষের অগ্রগতি রোধ করার জন্য।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা, মল্লিকা! সুভাষের গতিরোধ করার কথা চিন্তা করতে গিয়ে মার্কিনদের সেদিন জওহরলালের কথা মনে হল কেন?

না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর আমার জানা নেই।

কোন প্রস্তাবেই রাজী হলেন না চার্চিল। ভারত এখন গুরুতর বিপদের সম্মুখীন। এ সময়ে তাদের ওপর শাসনভার ছেড়ে দিলে তারা কি পারবে জাপানীদের হাত থেকে নিজেদের দেশ রক্ষা করতে?

না, তা হয় না। জেনে-শুনে ভারতকে তিনি এতবড় বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে রাজী নন। হাজার হোক, ভারত সম্বন্ধে তাঁর একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে বৈকি! তবে হ্যাঁ, যুদ্ধের পরে যত শীগ্‌গির সম্ভব ভারতের কথা তিনি বিবেচনা করে দেখতে রাজী আছেন।

কেউ রাজী হল না ক্রীপস্‌-এর প্রস্তাবে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা—কেউ না।

খবর শুনে মন্ত্রিসভায় সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে আনন্দে নেচে উঠলেন চার্চিল। যাক বাপু, সাপও মরেছে—লাঠিও ভাঙেনি। আমরা তো ওদের স্বাধীনতা দিতেই চেয়েছিলাম। ওরা যদি নিজেরা একমত হতে না পারে তো আমরা তার জন্যে কি করতে পারি, বলো!

'When Churchill received news from India that the Cripps' Mission had failed, he is reported to have danced around the cabinet room.' [Last years of British India : Michael Edwardes : P.—30]

রুজভেল্টের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। তাঁর মতে ব্রিটিশের সদিচ্ছার অভাবই এর জন্য দায়ী।

১২ই এপ্রিল তারিখে বেশ খোলাখুলিভাবেই সেকথা তিনি জানিয়ে দিলেন চার্চিলকে :

'...The deadlock has been due to the British Government's unwillingness to concede the right of Self-Government to the Indians...'

ব্যর্থ হয়ে ক্রীপস্ ফিরে গেলেন নিজের দেশে।

তবে একেবারে খালি হাতে নয়। সঙ্গে নিয়ে গেলেন জওহর-লালের দেওয়া অজস্র প্রতিশ্রুতি। গান্ধীজী বা কংগ্রেস সহযোগিতা না করলেও বন্ধু জওহরলাল তাঁকে এতটুকুও হতাশ করেননি এ ব্যাপারে। বলেছিলেন :

'...The Japanese must be resisted. We are not going to surrender to the invader'.

এখানেই থামেননি জওহরলাল। আসল কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন পরের লাইনটিতে :

'Inspite of all that has happened, we are not going to embarrass the British war effort in India...'

[India Wins Freedom : Azad]

অর্থাৎ—জাপানকে আমরা রুখবই। কিছুতেই আমরা ভারতবর্ষে ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এতটুকু ব্যাঘাত ঘটতে দেব না।

জওহরলাল জাপানকে রুখতে চান—ভালো কথা। কিন্তু একটা প্রশ্ন, মল্লিকা! ভারতকে কে পদানত করে রেখেছে দুশো বছর ধরে? জাপান, না ইংরেজ? তাহলে রাতারাতি সেকথা ভুলে গিয়ে সেই ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন আসে কি করে? কোন্ যুক্তিতে?

এর উত্তর রয়েছে গান্ধীজীর একটি উক্তির মধ্যে:

'He is more English than Indian in his thoughts and make up. He is often more at home with Englishmen than with his countrymen.'

অর্থাৎ—জওহরলাল যতটা না ভারতবাসী, তার চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ। তাই দেশবাসীর চাইতেও তিনি ঢের বেশি খুশি হন ইংরেজের সাহচর্য পেলে। [কংগ্রেসের ইতিহাস : ডাঃ পট্টভি : ২য় খণ্ড : পৃঃ ১৩২]

সুতরাং বিলিতি ভাবধারায় মানুষ জওহরলালের মতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নয়, সাম্রাজ্যবাদী হল এশিয়ার একমাত্র বিদেশী কবল-মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র জাপান। যে করে হোক, তাকে রুখতেই হবে।

কিন্তু একি!

সহসা ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবৃতি দেখে:

'জাপান যে ভারত আক্রমণ করবেই তার কি মানে আছে? নাও তো করতে পারে!

তবু যদি করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, ইংরেজরা এদেশে রয়েছে বলেই করেছে। তার চাইতে ওরা আমাদের দেশ থেকে চলে যাক। তারপর আমাদের ভাল-মন্দ আমরাই বুঝতে পারব।

আর আক্রমণ করলেই বা কি! ভারতবাসী আজ যে শোচনীয়

অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, জাপান আক্রমণ করলেও তার চাইতে খারাপ অবস্থা হবে না নিশ্চয়ই।'

এ কার বিবৃতি! একি চোখের ভুল, না কি দিবাস্বপ্ন!

না, কোনটাই নয়। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। কোথাও এতটুকু কুয়াশার জাল নেই। সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

বিবৃতি দিয়েছেন গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী।

কিন্তু এ কোন্ গান্ধী!

'সংগ্রাম চাই' বলে সুভাষ প্রতিনিয়ত মাথা খুঁড়ে মরলেও যে গান্ধী এতকাল সংগ্রামের পথ সযত্নে পরিহার করে কেবলমাত্র আবেদন-নিবেদন করাটাকেই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পন্থা বলে মেনে নিয়েছিলেন, এ কি সেই গান্ধীর উক্তি! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

'আমি সুভাষ বলছি···'

অভিনন্দন ভেসে এল সুদূর বার্লিন থেকে।

'প্রিয় ভাইবোনেরা, ক্রীপস্-প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এখনো আমাদের দেশের কোন কোন লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের কংগ্রেসী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, অথচ বিনা শর্তে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলতে তাঁদের এতটুকুও বাধে না।

এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি কি এতই কম যে, কংগ্রেসের আদর্শের কথা তাঁরা ভুলে গেছেন?

কি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত হরিপুরা কংগ্রেসে? যুদ্ধে অসহযোগিতার প্রস্তাবই কি সেদিন গৃহীত হয়নি?

এমন কথাও কি বলা হয়নি যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াতে চাইলে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করব?

এম. এন. রায়ের মতো খ্যাতিমান নেতা যুদ্ধে সহযোগিতার কথা

বলেছিলেন বলে ইতিপূর্বে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ যাঁরা কংগ্রেসের নীতি অমান্য করে সহযোগিতার কথা বলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তা নিশ্চয়ই আমরা জানতে চাইব।

অক্ষশক্তি আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের পক্ষে এটা একটা অপূর্ব সুযোগ।

ভারতের সবচাইতে বড় শক্তি—যুব-সম্প্রদায়। তাদের এখন একমাত্র কর্তব্য, বর্তমানের এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেওয়া, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ওপর এক নতুন স্বাধীন ভারত গড়ে উঠতে পারে।

জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর নীতিই আজকের দিনে একমাত্র বাস্তব নীতি। এর কোন বিকল্প নেই।

আমি অক্ষশক্তির সমর্থক নই। তাদের সমর্থন করা আমার পেশা নয়। আজকের দিনে যে-কোন চিন্তাশীল মানুষের কাছে একথা স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের সত্যিকার শত্রু শুধু একটিই। সে শত্রু হল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

দুটি মাত্র পথ এখন আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। হয় স্বাধীনতা, নয়তো চিরদাসত্ব। এর একটা আমাদের বেছে নিতেই হবে। জয় হিন্দ্!'

একইভাবে রাসবিহারী অভিনন্দন জানালেন টোকিও রেডিও থেকে :

'On behalf of the Indians in East Asia I wish to convey to you our sense of relief at the failure of Sir Stafford Cripps and his empty-handed departure from India.

By refusing to entertain any of his proposals,

your leaders have saved you from a danger the dimensions of which are hard to encompass.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—388]

ক্রীপস্ বিদায় নিলেন।

কিন্তু তারপর? যুদ্ধ শুরু হয়েছে তিন বছর, কিন্তু এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি কংগ্রেসের পক্ষে। এই অচল অবস্থা দূর করার উপায় কি?

উপায় বাত্‌লে দিলেন কংগ্রেসের অন্যতম মস্তিষ্ক, চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া। ঝুট্ ঝামেলা করে লাভ নেই। ওদের পাকিস্তান দাবী মেনে নাও। ব্যস, মুশকিল আসান!

শুধু মুখেই নয়, মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধানমণ্ডলীর সভা থেকে এই মর্মে এক প্রস্তাবও তিনি পাশ করিয়ে নিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। পার্টিশন ছাড়া কোন উপায় নেই। সুতরাং আর দেরি নয়।

প্রস্তাবের খানিকটা অংশ তুমি শোন :

'...this party is of opinion and recommends to the All-India Congress Committee that to sacrifice the chances of formation of a national Government at this grave crisis for the doubtful advantage of maintaining a controversy over the unity of India is a most unwise policy and that it has become necessary to choose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for separation...*

সর্বত্র বিরূপ সমালোচনা। সর্বত্র বিক্ষোভ। শেষে কিনা রাজাজীর মুখ থেকে এই কথা! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

* হে অতীত কথা কও : সত্যানন্দ স্বামী : পৃঃ ৪২২

রাজাজী অটল অনড়। শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে, পরে মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্যপদ থেকে। তবুও একচুলও তিনি নড়লেন না নিজের বক্তব্য থেকে।

মাদ্রাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য। সুতরাং রাজাজীর পক্ষে এভাবে পাকিস্তানের স্বপক্ষে প্রস্তাব পাশ করানোর মধ্যে আর যাই থাক না কেন, নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির কোন প্রশ্ন ছিল না।

কিন্তু তা যদি না হত? যদি মাদ্রাজের অবস্থাও বাংলা বা পাঞ্জাবের মতো হত? পারতেন কি তখন রাজাজী নিজেদের অঙ্গচ্ছেদ করে এ ধরনের উদারতা দেখাতে? তোমার কি মনে হয়, মল্লিকা?

আরো কথা আছে। শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে সুভাষকে একদিন বহিষ্কার করা হয়েছিল কংগ্রেস থেকে। কিন্তু রাজাজী! এত কাণ্ডের পরেও তাঁর বেলায় তেমন কিছু হয়েছিল কি?

না, হয়নি। গান্ধীজীর বৈবাহিক রাজাজী সম্বন্ধে সে প্রশ্নই সেদিন কারো মনে জাগেনি। তফাত এইখানেই।

২৮শে মার্চ টোকিও সম্মেলন শুরু হল রাসবিহারীর সভাপতিত্বে। শুরুতেই বিভ্রাট।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং, লেঃ কর্নেল গীল, এন. রাঘবন, গুহ, মেনন প্রমুখ প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম বিমানটি নির্বিঘ্নেই পৌঁছে গেল টোকিওতে।

যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন দুর্ঘটনা ঘটল পরেরটার বেলায়। জানা গেল, যাত্রীদের মধ্যে কেউ বেঁচে নেই। স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রীতম সিং, নীলকান্ত আয়ার, ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ প্রমুখ চারজনকেই প্রাণ দিতে হয়েছে আকস্মিক সেই বিমান-দুর্ঘটনার ফলে।

খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি নরনারী।

স্বামী সত্যানন্দ পুরী। থাইল্যাণ্ডের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা স্বামী সত্যানন্দ পুরী। বাংলার বৈপ্লবিক সংস্থা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য, ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ সত্যানন্দ পুরীর অভাব যে কোনদিনই পূর্ণ হবার নয়! অন্তত থাইল্যাণ্ডবাসীরা তাঁর অবদানের কথা বোধহয় ভুলতে পারবে না কোনদিনও।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বার্তা পাঠালেন জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজো:

'The cause for which they gave up their lives need not go in vain.

...In expressing sympathy over the loss of the four heroic souls I pledge to extend all possible aid for the complete independence of India.'

[Chalo Delhi : S. A. Das & M. B. Subbaiah : P.—13]

যে মহৎ উদ্দেশ্যে ওঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তা বৃথা যাবে না।

বীর চতুষ্টয়ের মৃত্যুতে আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্ভবপর সব রকম সাহায্যই আমরা করতে প্রস্তুত।

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। তাই নির্দিষ্ট দিনেই টোকিওর সান্নো হোটেলে সম্মেলন শুরু হল মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল টোকিও সম্মেলনে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে অবিলম্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি জায়গায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (Indian Independence League) শাখা অফিস গড়ে তুলতে হবে।

আর সুভাষের আদর্শে এখানেও একটি আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে হবে, যারা লড়াই করে ভারতভূমিকে শত্রুকবল-মুক্ত করবে নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে।

এ বাহিনী গঠিত হবে একমাত্র ভারতীয়দের নিয়ে। অভিযান পরিচালনা করবে একমাত্র তারাই। সেখানে বাইরের কোন হাত থাকবে না।

লীগের লক্ষ্য হবে মোট তিনটি। Unity, Faith, Sacrifice. একতা, বিশ্বাস ও বলিদান।

মোট দুটি বিভাগ থাকবে লীগের অধীনে। একটি সামরিক, অন্যটি অসামরিক। সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে—যুদ্ধ বিভাগ, রিক্রুটিং, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ, সামরিক পুলিশ বিভাগ ও যুদ্ধ-বন্দী বিভাগসমূহ।

আর বৈদেশিক, অর্থ, আইন, প্রচার, প্রশাসন, ত্রাণ, পুলিশ, গুপ্তচর বিভাগ, স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি দপ্তরগুলি থাকবে অসামরিক বিভাগের আওতায়।

চাই উপযুক্ত প্রচার। লীগের আদর্শ সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে। বেতার, ইস্তাহার, সংবাদপত্র, বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও সঙ্গীতের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘরে ঘরে ডাক পাঠাতে হবে। স্বাধীনতার ডাক। সংগ্রামের ডাক।

শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নয়, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও প্রচার-কার্য চালাতে হবে যথাযথভাবে। দরকার হলে গোপনে ভারতবর্ষে গিয়ে ওখানকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বলতে হবে—আমরা প্রস্তুত। তোমরাও প্রস্তুত থাকো সেদিনের জন্য।

আরো ঠিক হল যে, শীগগিরই একটি সম্মেলন ডাকা হবে ব্যাঙ্কক-এ। সেখানেই সবকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পাকাপাকিভাবে।

টোকিও সম্মেলন শেষ হল।

দেখতে দেখতে একটা ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠল যেন কোন্ মায়া কাঠির স্পর্শ পেয়ে।

সর্বত্র একই রব। এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো। পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশের ফুরসত নেই। সামনে দুরন্ত সংগ্রামের দিন। তার জন্য সবাই প্রস্তুত হও এখন থেকে।

বিদাদরী, নীস্থন, ক্রাঞ্জি ইত্যাদি ভারতীয় বন্দী-শিবিরের সেনা বাহিনীর মধ্যেও সেই একই চঞ্চলতা। কোথায় যেন একটা প্রহর বাজবার সঙ্কেত-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আর সময় নেই। সবাই প্রস্তুত হও।

মাঝে মাঝেই বার্লিন থেকে কার যেন উদাত্ত আহ্বান ভেসে আসে বেতার-তরঙ্গে :

'When British Imperialism is defeated, India will get her freedom. If on the other hand British Imperialism should somehow win the war, then India's slavery would be perpetuated for ever. India is therefore, presented with the choice between Freedom and Slavery. She must make her choice.'

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হলে তবেই হবে ভারতের মুক্তি। তারা বিজয়ী হলে ভারতবর্ষকে চিরকালের মতো দাসত্বের বোঝা বহন করতে হবে। সুতরাং ভারতকে আজ বেছে নিতে হবে যে, স্বাধীনতা এবং দাসত্বের মধ্যে কোন্‌টা তার কাম্য।

শুনতে শুনতে আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি সৈনিক। নেতাজী! নেতাজী! নেতাজীর কথা! কোন্‌টা সত্য! কোন্‌টা বেশি কাম্য! দেশের স্বাধীনতা, না বিদেশীর দাসত্ব?

এদিকে টোকিও থেকে ফিরে এসেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং এক সভা ডাকলেন বিদাদরী বন্দী-শিবিরে। খোলাখুলিভাবেই সেদিন তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন সেনা বাহিনীর কাছে।

এতকাল আমরা পরের জন্য লড়াই করেছি। এবার লড়াই করব নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য। নইলে কি বলবে আমাদের পৃথিবীর মানুষ! কি জবাবদিহি করব ভাবী বংশধরদের কাছে! স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অকৃতজ্ঞ বলেই কি আমরা চিহ্নিত হয়ে থাকব চিরদিন ?

প্রথমেই বেশ কয়েক হাজার সৈন্য যোগ দিল আজাদ হিন্দ বাহিনীতে। ক্রমশ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর দলে দলে। কাতারে কাতারে। সামরিক-অসামরিক সবাই।

'His propaganda was particularly successful and he managed to convince approximately 30,000 prisoners of war who volunteered to join the I.N.A.

He was particularly fortunate in having such men as Cols. Gill and Chatterjee to advise and assist him in his task.'

[I. N. A. & its Netaji : Shahnawaz Khan : P.—24]

অর্থাৎ—ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর প্রচারকার্য খুবই সফল হয়েছিল। প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজে। তাঁর সৌভাগ্য যে, এ ব্যাপারে তিনি কর্নেল গীল এবং চ্যাটার্জীর মতো অফিসারদের সহকারী এবং পরামর্শদাতারূপে পেয়েছিলেন।

কর্নেল এন. এস. গীল নীসুনে অবস্থিত যুদ্ধবন্দী হেড কোয়ার্টার্সের পরিচালক। আর চ্যাটার্জী! মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জীকে তো তুমিও জানো, মল্লিকা!

আশ্চর্য, আত্মসমর্পণের মাত্র পনের দিন আগে তিনি গিয়েছিলেন

সিঙ্গাপুরে। তারপরই বিপর্যয়ের মুখে। অবশেষে ডিরেকটার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেসরূপে আজাদ হিন্দ ফৌজে। কর্মদক্ষতার গুণে পরে আরো গুরুত্বপূর্ণ পদে। সে-সব কাহিনী তোমাকে শোনাব আরো পরে।

এপ্রিলের শেষ ভাগেই রাসবিহারী তাঁর হেড,কোয়ার্টার্স স্থাপন করলেন ব্যাঙ্কক-এ এসে। সঙ্গে এলেন আনন্দ মোহন সহায়, দেশপাণ্ডে প্রমুখ সহকর্মিবৃন্দ। ব্যাঙ্কক-এ সম্মেলনের দিন ধার্য হয়েছে ১৫ই জুন। তার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

অন্যতম সহকর্মী দেবনাথ দাস অবশ্য দেড় বছর আগেই ব্যাঙ্কক চলে এসেছিলেন রাসবিহারীর নির্দেশে। কাজও তিনি এগিয়ে রেখে-ছিলেন অনেকখানি। প্রধানত স্বামী সত্যানন্দ পুরী এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় সেখানে গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক 'থাই-ভারত কালচারাল লজ',—যার ফলে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ সেদিন পরস্পরকে চিনতে পেরেছিল একান্ত কাছের মানুষ বলে। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্য ছিল সত্যিই অপরিসীম।

ওদিকে সুভাষের মাথায় তখন একই চিন্তা। 'India for the Indians.' কবে এই স্বপ্ন সফল হবে? কবে?

অবশ্য মুসোলিনী আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, ইতালীই সুভাষের প্রধান কর্মকেন্দ্র হোক।

রাজী হতে পারেননি সুভাষ। স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েই এটুকু তিনি বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, মুসোলিনীর যতই আন্তরিকতা থাক না কেন, আসল চাবি-কাঠি রয়েছে জার্মানীরই হাতে।

মুসোলিনীর পরে তোজো। শুধু একবার নয়, বার বার তিনি ঘোষণা করেছেন সেই একই কথা: 'India for the Indians.'

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্ভবপর সব রকম সহযোগিতাই আমরা করতে প্রস্তুত।

কিন্তু শুধু মুসোলিনী বা তোজো ঘোষণা করলেই হবে না। পায়ের নিচে শক্ত জমি চাই। চাই ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা। অর্থাৎ—জার্মানী, ইতালী ও জাপানকে একসঙ্গে একথা ঘোষণা করতে হবে সুস্পষ্ট ভাষায়।

আলাপ-আলোচনার জন্য ২৯শে এপ্রিল তারিখে হিটলার আর মুসোলিনী একসঙ্গে মিলিত হলেন ওবেরশাল্‌জ্‌বুর্গে।

ভারত সম্বন্ধে সিনর ম্যাজিট্টো ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা দাবী করেছেন। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে ?

ঠিক হল—না, এখনও তার উপযুক্ত সময় আসেনি। কারণ—যুদ্ধ-পরিস্থিতি।

জার্মানীর গ্রীষ্মকালীন রাশিয়া অভিযান আসন্ন। এ সময়ে এতবড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। সময় হলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখা হবে।

সুভাষ তখন রোমে। খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গিয়ে দেখা করলেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী কাউন্ট চিয়ানোর সঙ্গে।

তারপর ৫ই মে খোদ মুসোলিনীর সঙ্গে। ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা চাই-ই! এটা করতেই হবে তোমাদের।

পরের ইতিহাস কাউন্ট চিয়ানোর ডায়েরী থেকেই তুমি শোন :

'Mussolini allowed himself to be persuaded by arguments produced by Bose to obtain a tripartite declaration in favour of Indian independence. He has telegraphed the Germans proposing—contrary to the Salzburg decisions—proceeding at once with the declaration'. [The Springing Tiger : P.—66]

অর্থাৎ—ভারতের স্বাধীনতার জন্য ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণার ব্যাপারে

শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী সুভাষচন্দ্রের যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। শাল্‌জ্‌বুর্গ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে জার্মানী যাতে তখনই ঐ ঘোষণার ব্যাপারে অগ্রসর হয়, সেজন্য তাদের কাছে তার পাঠালেন তিনি।

তার-যোগে আরও একটি কথা মুসোলিনী জানিয়ে দিলেন জার্মান সরকারকে। সুভাষকে তিনি পাল্টা সরকার গঠন করতে বলেছেন। এটা খুবই দরকার।

জার্মানী কিন্তু মুসোলিনীর এই প্রস্তাব খুব একটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি, মল্লিকা।

প্রমাণ, তাদের প্রচার-সচিব গোয়েবল্‌স্‌-এর ডায়েরী। সেখানে স্পষ্টই তিনি লিখেছেন :

'We don't like this idea very much, since we do not think the time has yet come for such a political manoeuvre. It does appear though that the Japanese are very eager for some such step. However, emigre governments must not live too long in a vacuum. Unless they have some actuality to support them, they only exist in the realm of theory'. [The Springing Tiger : P.—66]

অর্থাৎ—এ ধরনের কোন ঘোষণা করার উপযুক্ত সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি নে, যদিও জাপানীরা তার জন্য খুবই ব্যগ্র। অবশ্য কোন প্রবাসী সরকারের পক্ষে বেশি দিন এভাবে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ সমর্থন না পাওয়া যায়, ততক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার জগতেই তাদের বাস করতে হয়।

ওদিকে তখন বর্মার পতন হয়েছে। প্রধান সেনাপতি ওয়াভেল

পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতবর্ষে। অনেক যুদ্ধ হয়েছে আর ওসব নয়। এবার চাই একটু বিশ্রাম।

ভারতবর্ষ বর্মার ঠিক গায়ে গায়ে লাগানো। একবার যাওয়া যায় না ওখানে!

আবার সুভাষ দেখা করলেন বার্লিনের জাপ-রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওশিমার সঙ্গে। একদিন নয়, দিনের পর দিন। প্রতি সপ্তাহে।

মিলিটারী এটাচি হিগুতির ভাষায়ঃ

'The request of Mr. Chandra Bose became more and more fervent. He came almost every week.'

কথায় কথায় একদিন জানতে চাইলেন মিলিটারী এটাচি হিগুতিঃ

মহানায়ক রাসবিহারীর সঙ্গে পরিচয় আছে কি?

সুভাষের উত্তরঃ

'I don't know him. But the fact that he is fighting for the independence of India in Tokyo for so many years is very encouraging. I shall be happy if I can fight as a soldier under Mr. Rash Behari Bose, as it is good for the independence of India. In conclusion you must send me as soon as possible to Tokyo'. [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence.]

অর্থাৎ—না, পরিচয় নেই, তবে তাঁর দীর্ঘদিনব্যাপী সংগ্রামের কথা আমি জানি। তাঁর অধীনে একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলে আমি খুশি হব। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পার না তাঁর কাছে! দেখো না একবার চেষ্টা করে!

হ্যাঁ, এই হল সুভাষ। এ সুভাষ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এ সুভাষকে চিনতে সময় লাগে না। লক্ষ্য তাঁর একটাই। সে লক্ষ্য হল—

স্বাধীনতা। বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা কার নেতৃত্বে আসবে, সে-সব ক্ষুদ্র চিন্তা তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি কোনদিনও।

জাপ-দূতাবাস থেকে আশাব্যঞ্জক কোন খবর না পেয়ে ২২শে মে সুভাষ নিজেই এক নোট পাঠিয়ে দিলেন জার্মান সরকারের কাছে :

'দূর প্রাচ্যের ঘটনাবলী সবই অবগত আছেন। জাপানীরা ভারত-সীমান্তে উপস্থিত। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এই তো তার অপূর্ব সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আমার পক্ষে আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

এ সময়ে দূর প্রাচ্যে যাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। আশা করি, ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাকে ওখানে যাবার সুব্যবস্থা করে দিয়ে বাধিত করবেন, যাতে একজন জাতীয় বিপ্লবী নেতা হিসেবে স্বদেশের প্রতি আমার কর্তব্য আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারি।' [The Indian Struggle : Subhas Ch. Bose]

২৮শে মে সুভাষ দেখা করলেন নাৎসী-প্রধান হিটলারের সঙ্গে। সঙ্গে রইলেন দুর্দিনের বন্ধু সেই ভন ট্রট। তিনিই দোভাষীর কাজ করবেন দুজনের মধ্যে। কারণ, হিটলার ইংরেজী ভাষায় অভ্যস্ত নন।

অপরপক্ষে হিটলারের পক্ষে রইলেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী রিবেনট্রপ, এস. এস. বাহিনীর অধিকর্তা হিমলার আর স্টেট সেক্রেটারী কেপলার প্রমুখ নাৎসী নায়কবৃন্দ।

সুভাষের বক্তব্য সেখানে একটাই। ভারত সম্বন্ধে আমি ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা চাই।

ইতালী বা জাপান রাজী হলেও হিটলার কিন্তু এ ব্যাপারে একমত হতে পারলেন না তাদের সঙ্গে।

কারণ—যুদ্ধ-পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই তাদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। হু-হু করে জার্মানরা এগিয়ে

চলেছে ভরোনেশ, রোস্টভ, সেবাস্তোপোল, স্ট্যালিনগ্রাড ও ককেসাসের দিকে। এ সময়ে অন্য কোন কিছু চিন্তা করার মতো অবকাশ কোথায় ?

তাছাড়া ভারতবর্ষ এখনো অনেক দূর। এতদূর থেকে জার্মানীর পক্ষে আপাতত এ দায়িত্ব নেওয়া কি করে সম্ভব ?

ঘোষণা করা মানেই তো দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া। বর্তমান অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে তা সম্ভব কি ?

মিশরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। কারণ, ইতিমধ্যেই জেনারেল রোমেল পৌঁছে গেছেন মিশরের দ্বার-প্রান্তে। তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়াও প্রস্তুত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে অবস্থা এখনো আসেনি।

কথাটা মেনে নিতে পারলেন না সুভাষ। নানাভাবে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন হিটলারকে। নানা যুক্তি দিয়ে। ভারতবর্ষের সমর্থন পেতে হলে এখনই ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা করা উচিত।

অপরপক্ষে হিটলারেরও যুক্তির শেষ নেই। পরিস্থিতি সত্যিই বড় গুরুতর। হিজ এক্সেলেন্সী মাসসোত্তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন আশাকরি।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গেই সাফ জবাব :

'সারা জন্ম আমার রাজনীতি করেই কেটেছে, আমাকে উপদেশ দিতে হবে না।'

উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী স্তম্ভিত। জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা, ১৯৪২ সালের মহাপরাক্রান্তশালী হিটলারকে যে কেউ মুখের ওপর এমন জবাব দিতে পারে, তা বুঝি তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরিস্থিতি হালকা করে দিলেন সেই ভন ট্রট। দোভাষী হিসেবে কথাটা তিনি একটু নরম করে বুঝিয়ে বললেন হিটলারকে। উদ্দেশ্য, দুপক্ষের ভারসাম্য বজায় রাখা।

গল্প বলে মনে হয়, তাই না মল্লিকা ? হওয়াটা তো স্বাভাবিক।

অথচ এ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্যি। কারণ, এটা জার্মানদেরই কথা, আমার নয়।

'When the Chancellor in this connection asked what kind of political concept Netaji actually had in mind, Netaji became impatient and asked Trott to give the Chancellor (who neither spoke nor understood English) the following reply :

'Tell His Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from any side.'

Trott translated this reply in a more diplomatic form…' [Dr. Werth : P.—36]

মনে মনে বেশ একটু আহত হলেন সুভাষ। ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা জারি করা হলে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু এ অবস্থায় সে ভরসা এখন কোথায় ?

তাছাড়া তাঁর প্রধান শত্রু হল ইংরেজ। রাশিয়া বা আর কেউ নয়। কিন্তু ইয়োরোপে ইংরেজের অস্তিত্ব এখন কোথায় ?

ইচ্ছা ছিল মিশরের মধ্য দিয়ে কিছু প্যারাস্যুট সৈন্যকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নামিয়ে দেওয়া। কিন্তু রোমেলের আপত্তির ফলে সে ইচ্ছাও তাঁর কার্যকরী হয়নি। তাহলে এখানে থেকে লড়াই করবেন তিনি কাদের বিরুদ্ধে ?

কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে! এ অনিশ্চিত অবস্থাকে কতদিন আর মেনে নেওয়া সম্ভব!

ভাবতে ভাবতে একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন সুভাষ। ভারত ভারতবাসীদের জন্য—সুতরাং যে করে হোক, সেই এশিয়া ভূখণ্ডেই তাঁকে যেতে হবে।

যেতে হবে সেই নতুন সূর্যোদয়ের দেশে, যেখানে ভারতের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও নিরলসভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে। তাছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই চোখের সামনে।

কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এখন মহাযুদ্ধ চলছে। এ অবস্থায় যেতে চাইলেই তাঁর পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সময়ের দরকার। ততদিন তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে।

১৪ই জুন বার্লিনের ইণ্টারন্যাশন্যাল প্রেস ক্লাবে সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে। সেখানেও তাঁর মুখে শোনা গেল সেই একই কথা।

'ভারত ভারতবাসীদের জন্য'—বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে এশিয়ায় অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এর চাইতে বড় কাম্য আর কিছুই নেই। বিশেষ করে ভারতবর্ষের পক্ষে।

জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজোর এই নীতি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এক বেতার-ভাষণের মাধ্যমে এই স্পষ্ট ঘোষণার জন্য আগেই তাঁকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছি। আবারও জানাচ্ছি।

আজকের দিনে এটাই বাস্তব। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। সে স্বাধীনতা যে করে হোক, যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে হোক, আমাদের পেতেই হবে। হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি, এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই আমাদের সামনে।

দিনের পর দিন কেটে যায়।

সেই একই ভাবনা তখন সুভাষের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে বার বার। যে করে হোক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁকে যেতেই হবে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব! পথ কোথায়?

পথের ইঙ্গিত পাওয়া গেল ব্যাঙ্কক সম্মেলনে। সেকথাই তোমাকে আমি এখন বলব, মল্লিকা।

ঐতিহাসিক ব্যাঙ্কক সম্মেলন শুরু হল ১৫ই জুন। সভাপতি রাসবিহারী বসু। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান দেবনাথ দাস।

সারা ব্যাঙ্কক-এ সেদিন উৎসবের বন্যা।

শিলাপ্যাকর্ণ থিয়েটারের চারপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ! বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। কিন্তু লক্ষ্য তাদের সবারই এক। আমরা স্বাধীনতা চাই। সে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করব বুকের রক্ত দিয়ে, ভিক্ষাবৃত্তি বা দর-কষাকষি করে নয়।

এসেছেন মালয়, বর্মা, জাপান, থাইল্যাণ্ড, মাঞ্চুরিয়া, নানকিং, সাংহাই, ক্যান্টন, হংকং, বোর্ণিও, ম্যানিলা, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবৃন্দ। এসেছেন জাপান, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দূতাবাসের কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূতগণ। এসেছেন আরো অনেকেই।

উদ্বোধন করলেন থাইল্যাণ্ডের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব বিচিত্র বদকর্ণ। সেকি অভাবনীয় দৃশ্য তখন থিয়েটার ভবনের অভ্যন্তরে!

'The Silapakorn Theatre, Bangkok, was packed to overflowing. There was no standing room anywhere and even the spacious ground itself was packed to capacity, while the roads leading to it were crowded with people who were eager to get a glimpse of the distinguished visitors. A large number of Japanese, Thai and representatives of the Axis countries were also present.' [Chalo Delhi : P.—23]

প্রথমেই উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাষণ দিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান দেবনাথ দাস। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন টোকিও সম্মেলনে যাবার পথে নিহত স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রীতম সিং, নীলকান্ত আয়ার ও ক্যাপ্টেন আক্রাম খাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

তারপর একে একে ভাষণ দিলেন সভাপতি রাসবিহারী বসু,

আনন্দ মোহন সহায়, এন. রাঘবন, কর্নেল এন. এস. গীল এবং কাপ্টেন মোহন সিং প্রমুখ সামরিক নেতৃবৃন্দ। ভাষণ দিলেন জাপান, জার্মানী ও ইতালীর রাষ্ট্রদূতগণ। বক্তব্য সবারই এক। আর দেরি নয়। এবার প্রস্তুত হও সবাই।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠালেন থাই-প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল পিবুল সংগ্রাম। স্বাধীন ভারতবর্ষ পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোক, এর চাইতে বড় কাম্য আমার আর কিছু নেই।

বাণী পাঠালেন জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজো। আবার তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর নীতির কথা। ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত। শুধু আমরা নই, আসন্ন সংগ্রামে ভারত ত্রি-শক্তির সহযোগিতা থেকেও বঞ্চিত হবে না।

'Japan is quite prepared to give her unstinted support as it has been announced from time to time, and I might add that the Axis powers are ready to co-operate in according their full support.'

[Ibid : P.—37]

আরো স্পষ্ট করে বললেন জাপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ তোগো :

ভারতবর্ষ সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জন করুক, এছাড়া তাঁদের সম্বন্ধে অন্য কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই।

'Japan has no desire whatever towards India except to see her realize the restoration of freedom···'

[Ibid : P.—38]

বাণী পাঠালেন সুভাষ। এ যুদ্ধে যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকেই সাহায্য করছে। ব্রিটিশকে সাহায্য করছে তারাই, যারা আমাদের চিরস্থায়ী দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য বদ্ধপরিকর।

পৃথিবীর যেখানে যত ভারতবাসী আছে, তাদের সবাইকে নিয়ে

একটি মিলিত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। শুধু পরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলেই আমাদের চলবে না। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

'Britain will lose this war and that the British Empire will be completely dismembered. All the forces that are striving to destroy or weaken the British Empire are helping India's emancipation, while all forces that are endeavouring to save the British Empire are attempting to perpetuate India's slavery.

...It is now time to link up Indian nationalists all over the world in one all-embracing organisation.'

[Ibid : P.—44]

মোট পঁয়ত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হল নয় দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনে।

অবিলম্বে ব্যাপক স্বাধীনতা অন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ভারতীয়দের মধ্যে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের শাখা স্থাপন করতে হবে। কোথাও বাদ গেলে চলবে না।

বিচ্ছিন্ন সেনা বাহিনীকে সংগঠিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে। ক্যাপ্টেন মোহন সিং-ই হবেন তাদের কমাণ্ডার-ইন-চীফ।

সেনা বাহিনীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। শুধু অর্থ নয়, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ, সংস্থান, সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাদেরই। শুধু প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ-সরঞ্জাম, জাহাজ ও বিমানের জন্য সাহায্য চাওয়া হবে জাপান সরকারের কাছ থেকে।

লীগ বা সামরিক বাহিনী কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়, জাতীয় সম্পত্তি। তাই সব কিছুই পরিচালিত হবে একটি কাউন্সিল অফ এ্যাকশান বা কর্ম-পরিষদের নির্দেশে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের

খেয়াল-খুশিমত নয়। সেখানে অসামরিক বিভাগ থেকে থাকবেন এন. রাঘবন আর কে. পি. কে. মেনন। সামরিক বিভাগ থেকে লেঃ কর্নেল গিলানী আর মোহন সিং। সবার ওপরে সভাপতি রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

এবার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটিতে কি বলা হয়েছিল শোন :

'This Conference requests Sj. Subhas Chandra Bose to be kind enough to come to East Asia and appeals to the Imperial Government of Japan to use its good offices to obtain the necessary permission and conveniences from the Government of Germany to enable Sj. Subhas Chandra Bose to reach East Asia safe.'

অর্থাৎ—আমরা সুভাষকে চাই। জাপ-সরকারের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, তোমরা তাঁকে আমাদের কাছে এনে দাও। তিনিই হবেন আমাদের আসন্ন সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক।

এদিকে ব্যাঙ্কক সম্মেলন, ওদিকে শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান।

হাজার হাজার আজাদী সৈনিক সেদিন শপথ নিল সুভাষের নামে।

'In the name of God I take this holy oath that to liberate India and thirty-eight crores of my countrymen I will be absolutely faithful to our Leader, Subhas Chandra Bose, and shall always be prepared to sacrifice my life and all I have for the cause.'

ভগবানের নাম করে আমি এই শপথ করছি যে, ভারতবর্ষ এবং তার আটত্রিশ কোটি নরনারীকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত

করার জন্য আমি আমাদের নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি চিরবিশ্বস্ত থাকব এবং আমার সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকব।

এবার সেনা বাহিনীকে লক্ষ্য করে শুরু হল সুভাষের উদ্দীপ্ত ভাষণ ঃ

'বন্ধুগণ, আজ আপনারা শপথ গ্রহণ করেছেন যে, এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়িয়ে মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবেন। আপনারা স্বাধীন ভারতের জাতীয় সেনা বাহিনীর বীর সৈনিক। স্বেচ্ছায় আপনারা চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। আজ থেকে আপনাদের নিজস্ব বলতে যা কিছু, সবই ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পত্তি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে আপনারা সত্যিই প্রভূত গৌরবের অধিকারী। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আপনাদের নাম ও কীর্তির কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আজকের এই পবিত্র সংগ্রামে প্রতিটি শহীদের সম্মানার্থে স্বাধীন ভারতে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা হবে। আগামী দিনের মানুষেরা সেই শহীদ স্তম্ভের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করবে।

...যদিও এই পবিত্র উৎসব আমরা বিদেশে পালন করছি, তবু আমাদের ধ্যান জ্ঞান ভাবনা চিন্তা সব কিছু পড়ে রয়েছে নিজেদের দেশে।...যত শীগগির সম্ভব আমরা নিজেদের সব দিক থেকে তৈরি করে নেব, যাতে যে দায়িত্বভার আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি, তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি। সেদিন আর সুদূর নয়, যেদিন আপনাদের এই সামরিক শক্তি প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগাতে হবে।'

বলতে বলতে রক্তে যেন আগুন ধরে গেল সুভাষের। দীপ্ত কণ্ঠে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন ঃ

'আজ আমরা এই জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করেছি। এমন দিন আসবে, যেদিন আমরা লালকেল্লার ওপর দাঁড়িয়ে এই জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাব।

মনে রাখবেন, স্বাধীনতা অর্জনের উপযুক্ত মূল্য আপনাদের দিতেই হবে। ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। আসে শক্তি ও বলের বিনিময়ে। আসে রক্তের বিনিময়ে। আমরা কোন বিদেশীর কাছ থেকে নিশ্চয় স্বাধীনতা ভিক্ষা করব না। যথাযোগ্য মূল্য দিয়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করব। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, আমরা যখন সবাই মিলে ভারতবর্ষের দিকে বিজয় অভিযানে অগ্রসর হব, তখন আমিই পরিচালনা করব আমাদের সেনা বাহিনীকে।'

ভাষণ চলছে। আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর রীলে হয়ে চলেছে পৃথিবীর সর্বত্র। সেকথা উল্লেখ করে সুভাষ এবার বললেন :

'আজ আমরা এখানে যে উৎসব পালন করছি, তার খবর এতক্ষণে হয়তো ভারতবর্ষে পৌঁছে গেছে। আমাদের দেশে যে-সব বীর দেশ-প্রেমিকগণ খালি হাতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা নিশ্চয় এ খবর শুনে খুবই উৎসাহিত হবেন।

আমার সারা জীবনের স্বপ্ন, এমন একটি সেনা বাহিনী গড়ে তোলা, যারা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবে। আপনাদের অভিনন্দন জানাই, কারণ, এমন একটি সুসজ্জিত বীর সেনা বাহিনী গড়ে তুলতে পারার সম্মান আজ আপনাদেরই প্রাপ্য।

ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন। আজ যে কঠিন শপথ পালন করার জন্য আপনারা কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন, তা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারার জন্য তিনি যেন আপনাদের শক্তি দেন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সৈনিকের কণ্ঠে রব উঠল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ্!

না, আর সুভাষ নয়। এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ। সুতরাং এখন থেকে দেশবাসীর কর্তব্য হবে,—ব্রিটিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে।

অবশ্য কিছু একটা যে ঘটবে, সে আশঙ্কা আগে থেকেই ছিল। বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি রাশিয়া আক্রান্ত। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, তা বলাই বাহুল্য। তবু সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্ত ছিল খুবই বিতর্কমূলক। আজও সেই বিতর্কের শেষ হয়নি।

অথচ এর আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯৩৯ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কংগ্রেসের স্বপক্ষে এমন একটি ঘটনাও দেখানো যাবে না, যা উল্লেখ করার মতো।

কমিউনিস্ট পার্টির সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। মূল্যবান এই তিনটি বছর বৃথাই তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি।

প্রমাণ তাদের 'প্রলেটারিয়ান পাথ' নীতি,—যার মূল কথা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করা, বড় বড় কল-কারখানায় ধর্মঘট, থানা ও সেনা-শিবির ধ্বংস এবং শহরে ও গ্রামে জাতীয় সেনা বাহিনী গঠন করে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অচল করে দেওয়া।

দিয়েছেও। যেমন—বম্বের কাপড়ের কল ধর্মঘট। যেভাবে সেদিন তারা বম্বের কাপড়ের কলসমূহকে অচল করে দিয়ে সরকার ও মালিক-পক্ষকে নতি-স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল, তা নিঃসন্দেহ প্রশংসার যোগ্য।

বলা বাহুল্য যে, পাল্টা আঘাত আসতে দেরি হয়নি। ফলে, দলে দলে কারাবরণ এবং শেষ পর্যন্ত পার্টি বে-আইনী ঘোষণা।

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। তারপরই একদিন গোল বাধল হিটলারের রাশিয়া আক্রমণকে কেন্দ্র করে, যার শেষ পরিণতি—জনযুদ্ধের আহ্বান। সেই সঙ্গে নানাবিধ সুভাষ-বিরোধী সমালোচনা।

হিটলার ফ্যাসিস্ট। সুভাষ তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, সুতরাং তিনিও তাই। এরপর আর কোনরকমেই সমর্থন করা চলে না সুভাষকে।

রাশিয়া আক্রান্ত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ২২শে জুন।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ১৫ই ডিসেম্বর। সেদিনই দেউলী বন্দী-নিবাসে আবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করলেন তাঁদের এই নতুন নীতির কথা।

এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ। এবার থেকে জনসাধারণকে এই নতুন শপথ নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে সংগ্রামের পথে।

প্রস্তাবে বলা হল ঃ

'We are a practical Party, and in a new situation it is our task not only to evolve a new form of struggle for it, but also to advance new slogans,···

The key slogan of our Party (now) is 'make the Indian people play a people's role in the people's war'.' [History of the Freedom Movement in India : Vol. III : R. C. Mazumder : P.—689]

প্রথম সূত্রপাত দেউলী বন্দী-নিবাসে। তারপর বাংলার কমিউ-নিস্ট নেতৃবৃন্দের জেল থেকে প্রেরিত ইস্তাহারে। সেখানেও জন-সাধারণের উদ্দেশ্যে বলা হল সেই একই কথা।

বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি রাশিয়া আক্রান্ত। সুতরাং এ যুদ্ধ, 'জনযুদ্ধ'। যে করে হোক, সর্বশক্তি দিয়ে হিটলারকে রুখতেই হবে। তারই জন্য আজ ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

আপত্তি এইখানেই। হিটলারকে রুখতে হবে, ভাল কথা।

তা বলে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা কেন? ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলানোর অর্থ কি নিজেদের দাসত্ব শৃঙ্খলকে আরো সুদৃঢ় করা নয়? তাহলে অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই যে এত আত্মদান, এত রক্তপাত, এত নির্যাতন ভোগ,—এ সবের কি প্রয়োজন ছিল? রক্তের দাগ কি এত শীগগিরই মুছে গেল ফাঁসির রজ্জু থেকে?

অসম্ভব! সেই কবেকার কথা। তা বলে আজও কি কেউ ভুলতে পেরেছে ক্ষুদিরাম প্রমুখ শহীদবৃন্দকে?

তাঁদেরই উত্তরসূরী সুভাষ নিজের জীবনের ওপর সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে গৃহত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, একথা সত্য। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলানোটা কি অপরাধ?

গ্যারিবল্ডি, সানইয়াত সেন, ডি. ভ্যালেরা, দ্যগল প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামিগণ তাঁদের দেশের মুক্তির জন্য সাহায্য নেননি ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে? স্বয়ং লেনিন কি একদিন জার্মানীর সাহায্যে প্রবেশ করেননি রাশিয়ায়?

এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত কূটনীতিবিদ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত কৌটিল্য-শাস্ত্রে কি বলেছেন, শোনা যাক:

'কোন নৃপতির পক্ষে যদি একাকী শত্রুর মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে তার নিজের চাইতে দুর্বলতর, সমান সমান, অথবা অধিকতর শক্তিশালী নৃপতিদের সহযোগিতায় একত্রিত ভাবে আক্রমণ চালানো উচিত।'

তারপর মহাবীর নেপোলিয়ানের কথা। তাঁর উক্তি: 'যুদ্ধের সময়ে শত্রুর শত্রুই হল আমার শ্রেষ্ঠ মিত্র।'

সেদিক থেকে দেখতে গেলে শত্রুর শত্রুকে চিনে নিতে সেদিন কি কোন ভুল করেছিলেন সুভাষ?

জার্মানীর চাইতে বড় শত্রু কি সেদিন ইংল্যাণ্ডের আর কেউ ছিল সারা পৃথিবীতে?

তাছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জার্মান সহযোগিতা নতুন কোন কথা নয়। প্রমাণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সমন্বয়ে গঠিত 'বার্লিন কমিটি'।

বিপ্লবীদের প্রয়োজনে শুধু লক্ষ লক্ষ টাকাই নয়, তিন-তিনটে জাহাজ-বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্রও সেদিন পাঠিয়েছিল এই জার্মানীই।

তাদের প্রেরিত জাহাজ-বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র খালাস করতে গিয়েই যে সেদিন বাংলার মহান বিপ্লবী নায়ক বাঘা যতীন শেষ পর্যন্ত সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিয়েছিলেন, এ তো ঐতিহাসিক সত্য।

আর প্রয়োজনের তাগিদে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলানোটা যদি অপরাধ হয়, তবে রাশিয়া নিজেই কি সেই অপরাধে অপরাধী নয়?

পরস্পর সন্দেহ ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও মাত্র একবছর আগে নিজেই কি সে হাত মেলায়নি ফ্যাসিস্ট জার্মানীর সঙ্গে? তা বলে কি নিজের নীতি আদর্শ রাজনৈতিক লক্ষ্য ত্যাগ করে সে নাৎসীবাদ গ্রহণ করেছিল সেদিন থেকে?

তারপর ইংল্যাণ্ড। জন্মলগ্ন থেকে কমিউনিস্ট রাশিয়াকে ঘায়েল করার জন্য কি করেনি এই ইংল্যাণ্ড? কি করতে বাকি রেখেছিল?

জার্মানীকে দিয়ে রাশিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য এতকাল সে কি তলে তলে কম শক্তি যুগিয়েছিল হিটলারকে?

কিন্তু কই, সব কিছু জেনে-শুনেও তো সেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে হাত মেলাতে এতটুকুও আপত্তি দেখা গেল না রাশিয়ার দিক থেকে?

পরস্পরের এই হাত মেলানোর ফলে ইংল্যাণ্ডই কি নীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেছিল সেদিন থেকে? না কি রাশিয়া ধনতান্ত্রিকবাদে আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল পারস্পরিক এই চুক্তির ফলে?

বরং এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মুখে শোনা গেল এক নতুন কথা। 'হিটলার যদি নরক আক্রমণ করে তো নরকের সঙ্গে

হাত মেলাতেও আমি কুণ্ঠিত হব না'। অর্থাৎ, নেপোলিয়ানের সেই কথা—'যুদ্ধের সময়ে শত্রুর শত্রুই হল আমার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মিত্র'।

এবার ধরা যাক আমাদের যুক্তফ্রণ্টের কথা। বাংলাদেশে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হয়েছিল অনেকগুলো দলের সমন্বয়ে। তাদের একের সঙ্গে অপরের নীতির কোন মিল নেই। অন্তত, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তো নয়ই।

তবু তাদের একের সঙ্গে অন্যের হাত মেলাতে কোথাও এতটুকু বাধেনি। কারণ, লক্ষ্য ছিল তাদের এক। সে লক্ষ্য হল, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

সুভাষ বা হিটলারের লক্ষ্য কি সেদিন আলাদা ছিল ?

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে পরাজিত করাই কি সেদিন দুজনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না ?

তাহলে অন্যের বেলায় যা দোষণীয় নয়, সুভাষের বেলায় তা দোষের হবে কেন ?

এবার সেদিনের গোটা ছবিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। কারণ, সুভাষ ভ্রান্ত। মিসগাইডেড। অপরিণামদর্শী।

তাছাড়া ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে তাঁর মুখে সেই একই কথা,—'আধখানা স্বাধীনতা আমি চাইনে, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। চাই আপসহীন সংগ্রাম।' এ হেন সংগ্রাম-পাগল লোককে কংগ্রেসে রাখাটা কোনমতেই নিরাপদ নয়। সুতরাং, হটাও।

কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য আরো স্পষ্ট। সুভাষ বোস ফ্যাসিস্ট। দেশের শত্রু। হিটলারের তল্পি-বাহক।

আর ইংরেজ! হ্যাঁ, এ ব্যাপারে ইংরেজও তাদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

মহামতি চার্চিল তাঁর 'Second World War' বইটির চতুর্থ খণ্ডে খোলাখুলিভাবেই বলেছেন সেকথা :

'...only a small extremist section in Bengal led by men such as Subhas Bose, were directly subversive and hoped for an axis victory...'

অর্থাৎ—সবাই ভাল। সবাই বন্ধু। সবাই সেদিন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল যুদ্ধ-জয়ের ব্যাপারে।

যত নষ্টের গোড়া ছিল একমাত্র সুভাষ বোস ও তার অনুগামী দল। অর্থাৎ, বিরাট এই ভারতবর্ষে একটি মাত্র লোকই সেদিন ইংরেজের শত্রু ছিল, তিনি হলেন সুভাষ বোস।

ধন্যবাদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে। একমাত্র শত্রুকে চিনে নিতে সত্যিই সেদিন তিনি ভুল করেননি।

কিন্তু একটা কথা! যে লোক তার নিজের দেশের শত্রু, ইংরেজের কাছে তার তো সবচাইতে বড় মিত্র হওয়ার কথা! তা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কেন তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থে একমাত্র সুভাষকেই চিহ্নিত করেছেন ইংরেজের শত্রু বলে? এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়?

তাছাড়া আসল ঘটনা কি ছিল?

রাশিয়া আক্রান্ত বলে যাদের এত ক্ষোভ, সেই রাশিয়া সম্বন্ধে সুভাষের শ্রদ্ধা বা মমত্ববোধ কি কারো চাইতে কম ছিল?

কে না শুনেছে সোভিয়েত দেশের প্রতি সুভাষের অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা?

কে না জানে যে, সুভাষের ঐতিহাসিক প্ল্যানিং কমিশন সোভিয়েত আদর্শ থেকেই গড়া?

কত দিন তাঁকে বলতে শোনা গেছে—'পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যাদের কাছ থেকে ভারত তার স্বাধীনতা সংগ্রামে উপযুক্ত সহযোগিতা আশা করতে পারে।'

শুধু মুখেই নয়, একথা তিনি বিশ্বাসও করতেন সর্বান্তঃকরণে। তাই দেশ থেকে অন্তর্ধানের সময় তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল রাশিয়া। গিয়েওছিলেন তাই।

তবু কেন তাঁকে শেষ পর্যন্ত বার্লিন যেতে হল রাশিয়া থেকে বিদায় নিয়ে? রাশিয়ার প্রতিকূল মনোভাবের জন্যই নয় কি?

বার্লিন পৌঁছেই সুভাষ যে স্মারক লিপিখানি পাঠিয়েছিলেন জার্মান সরকারের কাছে, তাতে কি লিখেছিলেন তিনি রাশিয়া সম্বন্ধে? লিখেছিলেন:

'নিকট ও মধ্য প্রাচ্য থেকে ব্রিটিশ প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করতে হলে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বর্তমানে যে স্থিতাবস্থা চলছে, তা রক্ষা করা দরকার।'

সোজা কথায়—রাশিয়ার সঙ্গে কোনরকম বিবাদ নয়।

হিটলার রাশিয়া অভিযান শুরু করলেন ২২শে জুন। সুভাষ তখন রোমে।

ফিরে এসে এ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন জার্মান সরকারের কাছে? এতটুকুও তিনি সমর্থন করেছিলেন কি হিটলারের সেই অবিমৃশ্যকারিতাকে?

এ সম্বন্ধে জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী অব স্টেট হের ওয়রম্যান ১৭ই জুলাই তারিখে জার্মান সরকারের কাছে যে প্রয়োজনীয় রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি:

'মিঃ বসু ফিরে এসে রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

বসুর মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতবর্ষে খুবই জনপ্রিয়। ভারতবাসী বিশ্বাস করে যে, সোভিয়েতরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং তাদের মিত্র।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের ফলে ভারতবাসীর সহানুভূতি রাশিয়ার পক্ষে।

ভারতবাসীর ধারণা যে, জার্মানীই আক্রমণকারী এবং জার্মানী ভারতের পক্ষে আর একটি বিপজ্জনক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। যুদ্ধে

রাশিয়া পরাজিত হলেও ভারতবাসীর এ ধারণা বদলাবে বলে মনে হয় না।'

'...আমি বসুকে জানিয়েছি যে, স্বাধীন ভারতের ঘোষণা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তে আমরা অটল। তবে তার উপযুক্ত ক্ষণ আমাদের স্থির করতে হবে।

বসু জোরের সঙ্গে বলেন যে, জার্মান রাইখের বৈদেশিক মন্ত্রীকে অবিলম্বে একথা ঘোষণা করতে হবে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের ঘোষণা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত না হবেন, ততক্ষণ অন্যান্য সব কিছুই তাঁর কাছে গৌণ।'

কি মনে হয় এই রিপোর্ট ছুটি দেখে? সুভাষকে সোভিয়েত-বিরোধী বলে মনে হয় কি?

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। সামান্য ছু-একটি মাত্র উল্লেখ করছি।

সেদিন সারা পৃথিবীর মানুষ সুভাষের ব্রিটিশ-বিরোধী বেতার-বক্তৃতা শুনেছে আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে। একদিন ছুদিন নয়, দিনের পর দিন। মাসের পর মাস।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি কোনদিন কিছু বলেছিলেন কি?

পরবর্তী কালের সে-সব বক্তৃতামালা পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। আছে কি কোথাও তার সামান্যতম নজীর?

কম চেষ্টা করেননি প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবল্‌স্। কিন্তু উত্তর ছিল একটাই। না, তা হয় না। আমার শত্রু ব্রিটিশ, রাশিয়া নয়।

রাশিয়ারও সেই একই কথা। বন্ধু ব্রিটিশের দাবীর উত্তরে একটি কথাই তারা জানিয়েছে বার বার। বোস আমাদের শত্রু নয়। শুধু শুধু কেন আমরা তার বিরুদ্ধে বলতে যাব?

তারপর যুদ্ধ-ঘোষণা। ব্রিটিশ, আমেরিকা ও রাশিয়া সেদিন জোট-বদ্ধ। তা সত্ত্বেও সুভাষ যুদ্ধ-ঘোষণা করলেন কিনা কেবল মাত্র ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। রাশিয়াকে বাদ দিলেন কেন?

হ্যাঁ, এটাই হল আসল সত্য। ফ্যাসিস্ট জার্মানীর তল্পি-বাহক বলে সেদিন সুভাষের বিরুদ্ধে যতই অপপ্রচার করা হোক না কেন, হিটলারের সেই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য কেউ যদি সেদিন কার্যকরী-ভাবে প্রতিবাদ করে থাকেন, তো এই একটিমাত্র মানুষই করেছেন। দূর থেকে নয়, করেছেন জার্মানীর বুকে দাঁড়িয়েই।

'Hitler is at liberty to lick British boots.' (হিটলার ব্রিটিশের জুতো চাটতে পারে।)

এ উক্তি আর কারো নয়, সুভাষেরই।

'Tell His Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from any side.' (হিটলারকে বলো যে, সারা জন্ম আমার রাজনীতি করে কেটেছে, আমাকে উপদেশ দিতে হবে না।)

এ উক্তিও সুভাষই করেছিলেন। বাইরে থেকে নয়, করেছিলেন ১৯৪২ সালের অপরাজেয় নাৎসী-নায়ক হিটলারের মুখোমুখী দাঁড়িয়েই।

'I am not an apologist of the three powers and it is not my task to defend what they have done or may do in future. That is a task which devolves on these nations themselves. My concern is however, with India, and if I may add further, with 'India alone.'

আমি ত্রি-শক্তির প্রতিভূ নই। তাদের সমর্থন করা আমার কাজ নয়। তাদের ভাল-মন্দ সব কিছুর দায়-দায়িত্ব তাদেরই। আমার কাজ ভারতকে নিয়ে। ভারতের জন্যই আমি শুধু কাজ করে যাব।

এ উক্তিও সুভাষেরই। সারা পৃথিবী সেদিন সুভাষের মুখ থেকে শুনেছিল একথা।

কোন তল্পি-বাহকের পক্ষে পরের দেশে বসে তাদেরই বিরুদ্ধে এ ধরনের দুঃসাহসিক মন্তব্য করা সম্ভব কি ?

সুভাষ বোস ফ্যাসিস্ট!

তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জওহরলাল। যদিও ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যেই তাঁর ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়ে বলেছিলেন, 'হিন্দুস্থান কা হিটলারকী জয়,' সুভাষের উদ্দেশ্যে নয়।

তবে জওহরলালের ওই নব আবিষ্কারের পেছনে কিছুটা কারণ ছিল। কারণ—ত্রিপুরী কংগ্রেস।

দেশের অগণিত মানুষের কাছে গণতন্ত্রের আসল চেহারাটা সেদিন যেভাবে ধরা পড়ে গিয়েছিল, তাতে গান্ধী-কংগ্রেসের মুখরক্ষার জন্য সুভাষকে এভাবে মসীলিপ্ত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না জওহরলালের।

তাই একদিকে সুভাষ যখন ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার সঙ্কল্পে উন্মত্তপ্রায়, অন্যদিকে ঠিক তখনই জওহরলালের কণ্ঠ গর্জে ওঠে বজ্রের মতো:

'The way Subhas Bose has chosen is naturally wrong···I cannot accept but must oppose.'

[A. B. Patrika : 13. 4. 42]

বোধহয় দুহাত তুলে ব্রিটিশ সেদিন জয়ধ্বনি দিয়েছিল জওহরলালের নামে। শুধু একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন তারা এই উক্তিটি যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। 'I cannot accept but must oppose.'

বুদ্ধিমানরা ঠিকই বুঝেছিল, শুধু বুঝতে পারেনি কিছু-সংখ্যক বোকার দল। তাই চোখে-মুখে তাদের ফুটে উঠেছিল একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এ বিবৃতির মানে কি? এটা কি আসলে সুভাষ-বিরোধিতা, না ব্রিটিশ-সহযোগিতা? না কি একসঙ্গে দুই-ই?

এবার বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত সেই আবেদন-পত্রটি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। সেই সঙ্গে অপর পক্ষের বক্তব্যও এখানে তুলে দিচ্ছি পাশাপাশি। ছু পক্ষের এই বক্তব্য থেকেই সেদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তুমি কিছুটা আঁচ করতে পারবে আশা করি।

'মানব ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে সারা পৃথিবী যখন এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, যখন সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য এক অনিশ্চয়তায় দোতুল্যমান, তখন আমরা ভারতমাতার প্রত্যেকটি মহৎ সন্তানের কাছে আমাদের এই আবেদন পাঠাইতেছি।

...এই বিশ্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ফ্যাসিস্টদের পর পর বহু জয়লাভের ফলে এবং উহার পরিণতি হইয়াছে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণে। জার্মানীর এই আক্রমণ এক রাষ্ট্রের প্রতি অন্য রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শন রূপে ইতিহাসে চিরদিন উল্লিখিত হইবে।' [বাংলার বীর বন্দীরা : নিরঞ্জন সেন]

হয়তো তাই, কিন্তু একটা প্রশ্ন! জার্মানী তো এর আগেই পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স ইত্যাদি বহু দেশ দখল করেছিল। সেগুলো কি বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শন নয়?

কিন্তু কই, তখন তো কারো মুখ থেকে একটি প্রতিবাদ-ধ্বনিও শোনা যায়নি! বরং হিটলারের সেই একের পর এক জয়লাভে তাঁরাও তো সেদিন উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন অন্য সবার মতো। তাহলে এতদিন পরে হঠাৎ আজ এই নতুন কথা কেন?

মিউনিক চুক্তির নাম করে ব্রিটিশ এবং ফ্রান্স যখন ভেট হিসেবে চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল হিটলারের হাতে তুলে

দিয়েছিল, তখন পৃথিবীর একটি কণ্ঠও সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল কি ?

শুধু প্রতিবাদ করেছিলেন একজন। তিনি এই পরাধীন দেশেরই কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি সর্বপ্রথম রাশিয়ার প্রগতিশীল ভূমিকার কথা ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর অমর সৃষ্টি 'রাশিয়ার চিঠি'র মাধ্যমে।

মর্মাহত কবি সেদিন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট বেনেসের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় বলেছিলেন :

'বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হইয়া পড়িয়াছে। এই শোচনীয় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভ জানাইতেছি। আমি আশা করি এই আঘাত আপনার জাতির অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করিবে এবং ইহার ফলে সে নৈতিক জয় ও পূর্ণ আত্মোপলব্ধির অবাধ সুযোগ অর্জন করিবে।'

[আনন্দবাজার : ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সাল]

হ্যাঁ, মাত্র এই একজন। তাছাড়া সবাই ছিল সেদিন নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। অস্বীকার করবার উপায় আছে ?

'চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সম্মিলনে বিশ্বব্যাপী সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির ব্যাপকতম ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টই সৃষ্টি হইয়াছে। জনসাধারণের এই বিশ্বব্যাপী ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে রহিয়াছে ফ্যাসিজমের সম্মিলিত শক্তি, যাহা মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও মহান কীর্তিকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প।'

জনসাধারণের ফ্রণ্ট! কোথাকার জনসাধারণ? রাশিয়ার জনসাধারণ বুঝি! কিন্তু সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার

জনসাধারণকেও কি পৃথিবীর শোষিত জনগণের প্রতি সমান সহানুভূতিসম্পন্ন বলে ধরে নিতে হবে ?

অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও'ডায়ারকে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে কারা সেদিন সম্মান দেখিয়েছিল ? ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ নয় ?

যেভাবে একদিন মুসোলিনী গায়ের জোরে আবিসিনিয়া জয় করে নিয়ে ছিলেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু কেউ কি সেদিন এতটুকু প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই নিয়ে ? না কি খোলাখুলিভাবেই বাহবা দিয়েছিল মুসোলিনীকে ?

'If I had been an Italian, I am sure that I should have been whole-heartedly with you from the start to finish in your struggle…'

এ উক্তি কার ? ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নয় ?

এ ব্রিটিশ তার চিরাচরিত ভূমিকা ভুলে গিয়ে রাতারাতি ভারতবর্ষের বন্ধু হয়ে উঠবে, তাই কি বিশ্বাস করতে হবে আমাদের ?

'একমাত্র যদি স্বাধীনতা ও প্রগতির বিশ্বশক্তি বাঁচিয়া থাকে ও পুষ্টিলাভ করে, তাহা হইলেই যে ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা অর্জন করা ও টিকাইয়া রাখা সম্ভব,—এই সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি ?'

পারে। যুদ্ধে জয়ী হলেই যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, তার গ্যারাণ্টার কে ? রাশিয়া ? তাহলে আটলাণ্টিক চার্টারে সে-কথা অস্বীকার করা হল কেন ? কই, রাশিয়া তো তার কোন প্রতিবাদ করেনি ?

আটলাণ্টিক চার্টার ! ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। গত ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে,—নাম তার আটলান্টিক চার্টার। চুক্তিতে বলা হয়েছিল—যুদ্ধ-শেষে পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

খবর শুনে কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা। ব্যস, হয়ে গেল! নাঃ! সুভাষ বোস সত্যিই ভ্রান্ত। ভ্রান্ত বলেই শুধু শুধু যখন-তখন সংগ্রামের কথা বলে। নইলে লোক হিসেবে ইংরেজ মোটেই খারাপ নয়। এই তো কেমন দিব্যি ভদ্রলোকের মতো এককথায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলে!

কোথায় প্রতিশ্রুতি, কোথায় কি! সব কিছুরই অবসান হল ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের একটি উক্তি শুনে। ৯ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি দিয়ে খোলাখুলিভাবেই তিনি জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা। হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি আমরা ঠিকই দিয়েছি, এবং সে প্রতিশ্রুতি রাখবও। তবে কিনা ওটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

কারণ? হ্যাঁ, সেকথাও তিনি বলেছেন পরিষ্কারভাবেই:

'I have not become the king's first minister in order to preside over the liquidation of the British Empire.'

অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি। সাফ কথা এবং স্পষ্ট কথা। একথার মধ্যে আর যাই থাক না কেন, কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই।

এ হেন ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে জয়ী হলে তবেই নাকি আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। কথাটা বিশ্বাস করতে পারা যায় কি?

'মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর কীর্তির প্রতীক সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবান্বিত জনসাধারণ যদি নাৎসী যান্ত্রিক বাহিনীর শক্তির তলে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে কোথায় থাকিবে ভারতের স্বাধীনতা?'

যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে।

তাছাড়া রাশিয়া জয়ী হলেই বা ভরসা কোথায়? হিটলার পররাজ্য আক্রমণ করেছেন, সেজন্য নিন্দা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

কিন্তু শুধু কি হিটলার? রাশিয়াও কি সেই একই কারণে সমান-ভাবে নিন্দিত হবার উপযুক্ত নয়?

জাপানের সঙ্গে কি অনাক্রমণ চুক্তি ছিল না রাশিয়ার? তা সত্ত্বেও কি রাশিয়া যুদ্ধ-ঘোষণা করেনি জাপানের বিরুদ্ধে?

জাপান কিন্তু করেনি। লক্ষ্যণীয় যে, ত্রি-শক্তির অন্যতম অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেনি কোনদিনও। ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত সেই চুক্তির মর্যাদা তারা রক্ষা করে চলেছিল বরাবর।

কিন্তু যদি করত? হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে রাশিয়ার যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, তখন যদি তারা ত্রি-শক্তির অন্যতম অংশীদার হিসেবে আক্রমণ চালাত মাঞ্চুরিয়ার দিক থেকে? কোথায় থাকত তাহলে রাশিয়া?

ফল পেল হাতে হাতেই। ১৯৪৫ সালের ৭ই আগস্ট এ্যাটম বোমা ফেলা হল জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর। সুযোগ বুঝে পরদিনই অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতপ্রায় জাপানের ওপর। জার্মানীর ভাবনা তখন আর নেই। সুতরাং চালাও এবার।

হিটলার নিশ্চয়ই নিন্দার যোগ্য। নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গেলে, রাশিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাল, তা-ই কি সমর্থনযোগ্য?

এ তো গেল কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত। তা বলে এখানেই শেষ নয়। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখানো যায়, যা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ওঠা মুশকিল।

ছেড়ে দিলাম হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করে নেবার কথা। কিন্তু কি হয়েছিল লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলির বেলায় ?

মাত্র একবছর আগের কথা। অক্টোবর মাস। তখনও জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার মিত্রতা চলেছে।

হঠাৎ লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া প্রভৃতি দুর্বল বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির ওপর রাশিয়া এমন কতগুলো মারাত্মক দাবী চাপিয়ে দিল, যার একমাত্র অর্থ হল,—হয় দাবী মেনে নাও, নয়তো মর।

নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে সবাই মাথা নোয়াল রাশিয়ার কাছে। তাছাড়া উপায় কি! একফোঁটা দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে অমন বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো সাহস কোথায় ?

এবার ফিনল্যাণ্ডের পালা। সেই একই দাবী।

লেনিনগ্রাদ ও ভিবোর্গের মধ্যবর্তী সমস্ত এলাকা তোমাদের নিরস্ত্রীকৃত করতে হবে। ক্রোনস্টাড ও ভিবোর্গের মধ্যবর্তী তোমাদের বিজুর্ক নৌ-ঘাঁটি আমাদের সেনা বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আর ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের পশ্চিম প্রবেশ-পথে তোমাদের হাঙ্গো দ্বীপ ও বন্দর আমাদের কাছে ইজারা দিতে হবে।

রাজী হল না ফিনল্যাণ্ড। হওয়া সম্ভবও নয়। শুধু ফিনল্যাণ্ড কেন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই তাদের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি এভাবে অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

বটে! চোখ পাকিয়ে তাকাল লাল ফৌজ। আচ্ছা, মজাটা দেখাচ্ছি!

মজা দেখাল ১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর।

হঠাৎ সেদিন বিরাট এক সৈন্য বাহিনী রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্বল ফিনল্যাণ্ডের ওপর। বলো এবার ঘাঁটি ছাড়বে কি না ?

ক্রমান্বয়ে তিনমাস পর্যন্ত প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে গেল ফিনল্যাণ্ড। কিন্তু শক্তিশালী লাল ফৌজের তুলনায় তার সাধ্য আর

কতটুকু ? তাই শেষ পর্যন্ত তাকে হার স্বীকার করতে হল প্রবল প্রতাপশালী রাশিয়ার কাছে।

সন্ধি স্বাক্ষরিত হল ১৯৪০ সালের ১১ই মার্চ।

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শুধু পূর্বোক্ত ঘাঁটিগুলিই নয়, সেই সঙ্গে সমগ্র কারেলিয়ান যোজক, ভিবোর্গ বন্দর ও ম্যানারহাম লাইনসহ লাডোগা হ্রদের পশ্চিম তীর তাদের তুলে দিতে হল রাশিয়ার হাতে। আর দিতে হল হেলসিঙ্কির নিকটবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নৌ-ঘাঁটি।

এ তো গেল মার্চ মাসের কথা। আর জুলাই মাসে!

সেদিন বাল্টিক রাজ্যগুলির সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ রাশিয়া দখল করে নিল নিজের অধিকারে। পরে বাল্টিক রাজ্যের গোটাটাই। নিজের রাজ্য সুরক্ষিত করার জন্য ওগুলি নাকি তার বড্ড প্রয়োজন।

এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪০ সালের ২৬শে জুলাই।

হঠাৎ সেদিন চরমপত্র দেওয়া হল রুমানিয়াকে। দাবী খুবই সামান্য। তোমাদের বেসারাবিয়া ও বাকুলিয়া, এ দুটো অঞ্চল আমাদের চাই।

কাজেও তাই হল। তাছাড়া উপায় কি ? সবলের প্রয়োজনে দুর্বল মরবে, সংসারের নীতিই যে তাই।

বলা বাহুল্য যে, কোন কিছুই নজর এড়ায়নি হিটলারের।

আত্মরক্ষার নামে রাশিয়া যে তলে তলে রাজ্য বিস্তার করে ক্রমশই তাঁর দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে, তা তিনি বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন দূর থেকে।

তাছাড়া প্রতিরক্ষার ব্যয় বাবদ রাশিয়ার রুবলের অঙ্ক যে প্রতিবছরই বেশ মারাত্মকভাবে স্ফীত হয়ে উঠতে শুরু করেছে, সে খবরও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

১৯৩৫ সালে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়-বয়াদ্দ ছিল মোট ৮০০ কোটি রুবল। ১৯৩৯ সালে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল ৪,০০০ কোটি রুবল। অর্থাৎ, মোট বরাদ্দের চাইতে পাঁচগুণ বেশি। ১৯৪০ সালে ৫,৬০০ কোটি। আর ১৯৪১ সালে একলাফে ৭,১০০ কোটি রুবল। অর্থাৎ, শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বেশি। এ কি নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই, না কি অন্য কিছুর প্রয়োজনে?

কূটনীতি হিসেবে হিটলারকেও তখন হাত বাড়াতে হল বলকান রাষ্ট্রগুলির দিকে।

অনেকটা এগিয়ে এসেছে রাশিয়া। আর নয়। রাশিয়ার এই অগ্রগতি রোধ করতে হলে আগে থেকেই এই বলকান রাষ্ট্রগুলিকে হাতে নিয়ে রাখা দরকার।

কি মনে হয় গোটা ব্যাপারটাকে বিচার করতে গেলে? দোষ কি শুধু হিটলারেরই? যাক, ইস্তাহারের পরের অংশ শোন:

'পৃথিবীর প্রগতিশীল জনসাধারণ আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যে বৃহত্তর সংগ্রাম চালাইতেছে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস তাহা হইতে অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য।'

কি করে? ইংরেজ, রাশিয়া বা ফ্রান্স কেউ ভারতের মতো পরাধীন নয়। তারা সংগ্রাম করছে তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য। তাদের সংগ্রাম আর পরাধীন ভারতের সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য হবে কি করে?

'ফ্যাসিজমের পূর্ণ পরাজয় সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য। এই কারণে আজ "আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে" এই ধ্বনি না তুলিয়া "অন্যদের" স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা আমাদের কর্তব্য মনে করিতেছি।'

অদ্ভুত যুক্তি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর আছে কি, যেখানে কোন রাষ্ট্র "আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে," একথা না ভেবে "অন্যদের" স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে গেছে? আছে কি ব্রিটিশ, মার্কিন বা রাশিয়ার ইতিহাসে এমন নজীর?

রাশিয়া আক্রান্ত। তাদের কাছে এ যুদ্ধ, নিশ্চয়ই জনযুদ্ধ। তা বলে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত সেই রাশিয়ার জন্য আমরা কেন "আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে," একথা ভুলে গিয়ে এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে মেনে নিতে যাব?

আমাদের স্বাধীনতার কথা তাহলে কে ভাববে? ইংল্যাণ্ড? আমেরিকা? না কি রাশিয়া?

'বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যকে অগ্রসর করিবার এবং ভারতীয় জাতির চরম স্বার্থসিদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—যে সকল স্বাধীন জাতি আজ নিজেদের জীবন ও অস্তিত্বের জন্য লড়াই করিয়া সেই সঙ্গে স্বাধীন ও শ্রেষ্ঠতর জগৎ সৃষ্টির জন্য লড়াই করিতেছে, তাহাদের জয়কে নিশ্চিন্ত করা। সে জগতে সাম্রাজ্যবাদ ও অন্য জাতির উপর উৎপীড়ন করিবার শক্তির ভিত্তি সম্পূর্ণ টলিয়া শিথিল হইয়া যাইবে।'

গিয়েছে কি? কি দেখছি আজ তিব্বত, পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গেরী, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, রোডেশিয়া, কঙ্গো বা চেকোশ্লোভাকিয়াতে? দুর্বলের প্রতি সবলের উৎপীড়ন সেখানে এতটুকুও শিথিল হতে দেখা গিয়েছে কি?

যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ পঁচিশ বছর। কিন্তু সেই যে একদিন আমেরিকা ত্রাণকর্তার ভূমিকায় এসে ভিত গেড়ে বসেছিল, তারপর থেকে এ পর্যন্ত তাকে এক চুলও নড়ানো সম্ভব হয়েছে কি এশিয়া

ভূখণ্ড থেকে? তাহলে আজ ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার গা থেকে এমন করে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে কেন?

'জনসাধারণের এই সর্বস্ব-পণ সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস যদি প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে, তবে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী শক্তি-সম্মেলন যে কেবলমাত্র অপরিমেয় ক্ষমতা সঞ্চয় করিতে পারিবে তাহা নহে, জনগণের জয়লাভ ও ভারতবর্ষের স্বাধীন দিনও আসন্ন হইয়া উঠিবে।'

সত্যি কথা। যুদ্ধ-শেষে বিজয়ী দলগুলি যে অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী হবে, তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী করে তোলার জন্যই কি আমাদের যুদ্ধে সহযোগিতা করা প্রয়োজন?

নইলে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিশ্বমানবতা প্রদর্শনের জন্য আমাদের কেন এই অহেতুক মাথাব্যথা?

বিজয়ী দলগুলি বিশ্বে অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী হবে—ভাল কথা। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে—এমন প্রতিশ্রুতি কি একবারও দিয়েছে বিশ্বমানবতার অধিকারী তথাকথিত মিত্ররাষ্ট্রগুলি?

আর দিলেই বা কি? এমন কত গাল-ভরা প্রতিশ্রুতিই তো ভারতবর্ষকে দেওয়া হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে! কিন্তু তারপর?

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিশ্রুতি যে কি জিনিস তার একটিমাত্র নজীর তুলে দিচ্ছি।

আটলান্টিক চার্টারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট। তারপর যুদ্ধের ক'বছরব্যাপী এই নিয়ে দুই প্রধানের কত প্রতিশ্রুতি! কত বেতার-ভাষণ! ঘটা করে কত বাৎসরিক উৎসব পালন!

এ ব্যাপারে যেমন চার্চিল, তেমনিই রুজভেল্ট। দুজনের মুখে সেই একই কথা। আমাদের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর শোষিত জনগণের মুক্তি। শুধু যুদ্ধটা শেষ হতে দাও। তারপর দেখে নিও তোমরা।

এ প্রসঙ্গে প্রথম বার্ষিকী উৎসবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর বেতার-ভাষণে কি বলেছিলেন শোনা যাক ঃ

'A year ago to-day the Prime minister of Great Britain and I, as representatives of two free nations, sat down and subscribed to a declaration of principles common to our peoples.

We based, and continue to base, our hopes for a better future for the world on the realisation of these principles. This declaration is known as the Atlantic Charter···

We re-affirm our principles. They will bring us to happier world.'

অর্থাৎ—আজ থেকে একবছর আগে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং আমি দুটি স্বাধীন জাতির প্রতিনিধিরূপে কর্মনীতির এক ঘোষণা-পত্র লিপিবদ্ধ করি এবং তাতে স্বাক্ষর করি।

এই কর্মনীতিকে কার্যে পরিণত করার ওপর ভবিষ্যৎ সুন্দরতর পৃথিবী গঠন নির্ভর করে,—এ আশা সেদিনও আমরা করেছিলাম, আজও করি। এই ঘোষণা-পত্র আটলান্টিক চার্টার নামে পরিচিত।

···আমরা সেই কর্মনীতিতে আমাদের আস্থা পুনরায় ঘোষণা করছি। এর সার্থকতা আমাদের অধিকতর সুখময় পৃথিবীতে এনে দেবে।

এই হল রুজভেল্ট সাহেবের স্বীকৃতি। কিন্তু তারপর? সে কাহিনী লেখা রয়েছে তখনকার সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায়। সামান্য একটু নজীর তুলে দিচ্ছি ঃ

'গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৪৪) এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেছেন যে, আটলান্টিক সনদে কেউ কখনো স্বাক্ষর করেনি, বস্তুত এরূপ কোন দলিলই নেই এবং এরূপ সরকারী দলিল কখনও ছিল না।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই ঘোষণায় প্রায় সব দেশেরই লোক অল্প-বিস্তর রুষ্ট, বিক্ষুব্ধ বা বিস্মিত হয়েছে।

...আজ যে দলিলের অস্তিত্বই নেই বলে মিঃ রুজভেল্ট সব আশা-নিরাশার নিরসন করে দিয়েছেন, গত তিন বছরেরও বেশি কাল ধরে কিন্তু সেই দলিল মানুষের মনের আসর বেশ গরম করে ছিল। এ নিয়ে কত বাক্-বিতণ্ডা হয়েছে, কত কূট-তর্ক উঠেছে, কত ব্যাপারে এর দোহাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ ঘুণাক্ষরেও তো কখনো বলেনি, এরূপ দলিল নেই!'

[সাপ্তাহিক দেশ : ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সাল]

এই হল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়কদের প্রতিশ্রুতির নমুনা। এর পরেও যদি কেউ শোষিত জনগণের 'সত্যিকারের বন্ধু' ব্রিটিশ বা মার্কিন-এর প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করতে না পারে, তাহলে সেটা খুব একটা দোষের হবে কি?

'ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আসুন সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া বিশ্ব-মানবের আহ্বানে সাড়া দিই। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে জনসাধারণ যোগদান না করিলে চরম সর্বনাশ ও অনন্ত দাসত্বের ভয়াবহ অভিশাপ আমাদের চিরদিন বহন করিতে হইবে।'

আর ব্রিটিশ জয়ী হলে? তখন যে আমরা এই অনন্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব, সে দায়িত্ব কে নেবে? রুজভেল্ট! চার্চিল! না স্ট্যালিন? না, সে সম্বন্ধে ইস্তাহারে কিছু উল্লেখ নেই।

দীর্ঘ ইস্তাহার। প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিয়ে এ বিতর্কমূলক

অধ্যায়টি আমি আপাতত এখানেই শেষ করছি, মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে আবার তোমাকে আমি বলব আরো পরে।

ওদিকে তখন ঝড় উঠেছে অন্তর্ধান-পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক ব. ভি.-র সত্য বক্সীর মনে। শুধু ভাবনা আর ভাবনা। রাশি রাশি ভাবনা।

ভাবনার কারণ সুভাষ। সেই যে তিনি বার্লিন গিয়ে ২০শে মে তারিখে একটি নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর কোন খবরই পাওয়া যায়নি তাঁর দিক থেকে। কি ব্যাপার! এমন তো হবার কথা নয়!

ইতমধ্যে তিনি বার বার লোক পাঠিয়েছিলেন পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির কাছে, কিন্তু কোন সদুত্তর মেলেনি। যা পাওয়া গিয়েছে সবই অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা উত্তর। কেন ওদের এই নিরুত্তাপ শীতলতা? মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে।

এদিকে পুলিশও চুপচাপ বসে নেই। প্রমাণ—মেজদা শরৎ বসুর গ্রেপ্তার।

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। ঠিক তার চারদিন পরে (১১ই ডিসেম্বর) পুলিশ তাঁর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে গিয়ে হাজির। তোমাকে ভারত-রক্ষা বিধির ২৬ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হল।

অপরাধ? অপরাধ,—জাপানের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রয়েছে।

প্রমাণ? হ্যাঁ, প্রমাণ আমাদের হাতেই রয়েছে।

হৈ-চৈ করে উঠেছিল সংবাদপত্রগুলি। প্রমাণ যখন রয়েছে, তখন বিনাবিচারে আটক করা কেন? আদালতে গিয়ে প্রমাণ করলেই তো হয়!

পুলিশ কোন জবাব দিতে পারেনি। হয়তো বা দেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। ফলে, শেষ পর্যন্ত বন্দী-নিবাস।

এবার কার পালা? পরিস্থিতি সত্যিই বড় জটিল। কখন যে কি ঘটে যাবে, বলা শক্ত।

আশঙ্কা অমূলক হল না। লাহোর থেকে মারাত্মক খবর নিয়ে ফিরে এলেন বি. ভি.-র শান্তিময় গাঙ্গুলী। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কীর্তি কিষাণ পার্টি সুভাষের ব্যাপারে আর কোনরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। সুভাষ সম্বন্ধে আর কোনরকম উৎসাহও নেই তাদের।

বিপদের যেন সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেলেন সত্যবাবু।

কীর্তি কিষাণ পার্টি কোনরকম সহযোগিতা করুক, বা না করুক, তাতে আজ আর সুভাষের কিছু এসে-যায় না। কারণ তিনি এখন নাগালের বাইরে।

আশঙ্কার কারণ রয়েছে অন্য জায়গায়। অন্তর্ধান-পর্ব সম্বন্ধে কোন কিছুই কীর্তি কিষাণ পার্টির অজানা নয়। এ নিয়ে কোনরকম বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না তো?

এদিকে দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ প্রায় বাইরে নেই।

নরওয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল।

১২ই এপ্রিলের মধ্যেই বি. ভি.-র প্রথমশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পঁচিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একে একে। সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, মেজর সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, রসময় শূর, সুপতি রায়, নিকুঞ্জ সেন প্রমুখ কেউ বাদ নেই সেই তালিকা থেকে।

বাকি রয়েছেন গুটি কয়েক বিশ্বস্ত কর্মী মাত্র। আর রয়েছেন যতীশ গুহ, যিনি ইতিপূর্বে মেদিনীপুরের তৃতীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ-নিধন এবং দার্জিলিং-এ বাংলার গভর্ণর কুখ্যাত এণ্ডারসন-হত্যা প্রচেষ্টা দুটি পরিচালনা করেছিলেন অতি নিপুণভাবে।

পরিস্থিতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। মনে হয় শীগগিরই ঝড়

উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস। ঝড়ের সেই প্রচণ্ড দাপটে কে যে কোথায় হারিয়ে যাবে, বলা শক্ত।

অনুমান মিথ্যে হল না। প্রথমেই ধরা হল সত্য বক্সী আর যতীশ গুহকে। ওদিকে ধরা পড়লেন কাবুলের উত্তমচাঁদ। জীবনের অনেকগুলো বছরই তাঁকে কাটাতে হল লৌহ-কপাটের অন্তরালে।

অমলেন্দু ঘোষও রেহাই পেলেন না। তিনি তখন হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন কর্মী। কীর্তি কিষাণ পার্টির প্রতি যতীশ গুহের নির্দেশ ছিল, কোন জরুরী খবরাখবর থাকলে তাঁরই অফিসের ঠিকানায় যেন যোগাযোগ করা হয়। সুতরাং ধর এবার অমলেন্দু ঘোষকে।

কিন্তু কোথায় অমলেন্দু ঘোষ? ছুটি নিয়ে তিনি তখন ঢাকাতে।

সঙ্গে সঙ্গে জরুরী টেলিগ্রাম। শীগগির ধরো ওকে। খবরদার! কোনরকমেই যেন ফসকে যেতে না পারে।

পরবর্তী লক্ষ্য সেই ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার সত্যব্রত মজুমদার। কর্মী হিসেবে ততদিনে তিনি যোগ দিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী মিলের পাওয়ার হাউসে।

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ গিয়ে হাজির। কোথায় সত্যব্রত মজুমদার? এক্ষুণি তাকে চাই।

সব বৃথা। দূর থেকে ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরে ততক্ষণে পেছনের গেট দিয়ে সত্যব্রত মজুমদার হাওয়া।

সন্দেহক্রমে ধরা হল বিভিন্ন দলের আরো অনেককেই। দিন-কাল ভাল নয়। সুভাষ বোস নাগালের বাইরে। কখন যে তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ফিরে এসে কি কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন, কে জানে! সুতরাং সতর্ক থাকাই ভাল।

যতীশ গুহ ও সত্য বক্সীর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এবার এগিয়ে এল ব্রিটিশ মিলিটারী বাহিনী। কি করে কথা আদায়

করতে হয়, তা পুলিশের চাইতে আমরাই ভাল জানি। সুতরাং ওদের আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লালকেল্লার মিলিটারী হেপাজতে। তারপর যা হল তা সহজেই অনুমেয়। এমন অমানুষিক নির্মম নির্যাতন বুঝি একমাত্র ব্রিটিশ টমিদের পক্ষেই সম্ভব। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

সুভাষ বোস কি করে বার্লিন গিয়েছেন বলো? কোন্ পথে? তোমাদের মধ্যে কে কে জড়িত ছিলে এ ব্যাপারে? কবে উনি ফিরে আসবেন সৈন্য বাহিনী নিয়ে? কোন্ পথ দিয়ে? বলবে না? বেশ, তাহলে দেখ!

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও রেহাই নেই। কতক্ষণ আর থাকবে এভাবে? এক সময়ে না এক সময়ে জ্ঞান ফিরে আসবেই। তখন যাবে কোথায়?

দাঁত কামড়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলেন সত্যবাবু। সুভাষ শুধু তাঁর বিপ্লবী সতীর্থই নন, সুভাষ তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এমন একটি কথাও নয়, যার ফলে সুভাষের সেই মরণ-পণ প্রচেষ্টা এতটুকু ব্যাহত হতে পারে। প্রাণ চলে যায় যাক, তবু কোন কথা নয়।

সত্যবাবু তখন খুবই অসুস্থ। তা সত্ত্বেও কি করে যে তাঁর পক্ষে সেদিন সেই অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল, তা ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে। তাও একদিন-দুদিন নয়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

সহ্য করতে পারলেন না যতীশবাবু। দিনের পর দিন পৈশাচিক নির্যাতনের ফলে হঠাৎ একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল পররাজ্যগ্রাসী ইংরেজ সরকারের। তাই তো! এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি অবস্থা হয়ে দাঁড়াল দেখছি! এরপর

ভাল-মন্দ কিছু একটা হলে শেষে যে বদনাম কুড়োতে হবে সরকারকেই! সুতরাং দাও ওকে খালাস।

কিছুতেই কিছু হল না। মাত্র কিছুদিন বাদেই বি. ভি.-র সেই সার্থক নায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সৃষ্টি করে।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে গা-ঢাকা দিলেন কামাখ্যা রায়, বিনয় সেনগুপ্ত, ধীরেন সাহারায়, শান্তিময় গাঙ্গুলী, সত্যব্রত মজুমদার প্রমুখ বি. ভি.-র একনিষ্ঠ কর্মিবৃন্দ। কণ্ঠে তাঁদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ পর্যন্ত অনেক মূল্যই দিতে হয়েছে বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.-কে। দিতে হয়েছে স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্যে ভরপুর অসংখ্য তাজা প্রাণ।

প্রয়োজন হলে আমরাও দেব। তবু স্বাধীনতা অর্জনের এই প্রাণপণ প্রচেষ্টাকে দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোনরকমেই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

উপেক্ষিত নায়ক গান্ধীজী। কেউ নেই সেদিন তাঁর আশে-পাশে। কেউ নেই।

যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে সবাই সেদিন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ সবাই।

২৭শে এপ্রিল এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তাঁর প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়েছে। পরিবর্তে গৃহীত হয়েছে জওহরলালের প্রস্তাব। অন্য তো দূরের কথা, একান্ত ভক্তদের মধ্যেও কেউ সেদিন সমর্থন করেননি তাঁকে। সহকর্মীদের কাছে আজ তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

গান্ধীজী নির্বিকার। বাইরে কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সবই ঠিক আছে। সবই চলেছে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে।

শুধু বুকের মধ্যে কোথায় যে একটা কান্নার পাখি ক্রমাগত ডানা ঝাপ্‌টে মরছে, সে খবর কেউ জানে না।

দিনগুলি যেন দুঃস্বপ্নের মতো আসে আর যায়।

শুধু ভাবনা আর ভাবনা! অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা। ক্রীপস্-প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে। কি করা যায় এখন!

মাঝে মাঝে অতীতের জীর্ণ পাতা ভেসে আসে চিন্তার আবর্তে। মনে পড়ে পুরানো মানুষের কথা। পুরানো জীবনের ছন্দ।

মনে পড়ে বিদ্রোহী সন্তান সুভাষের কথা। বড় অভিমানী ছেলে, তাই অভিমান করে আজ সে দূরে সরে গেছে। যে করে হোক, যে-কোন উপায়ে হোক, স্বাধীনতা তার চাই-ই। তার জন্য কোনমতেই সে দেরি করতে প্রস্তুত নয়।

মত ও পথ আলাদা, নইলে স্বাধীনতা তাঁর নিজেরই কি কাম্য নয়? সারা জীবন কি তিনি সংগ্রাম করেননি পরাধীনতার বিরুদ্ধে?

সংগ্রাম—সংগ্রাম আর সংগ্রাম! সংগ্রামের নামে ছেলেটা একেবারে উন্মত্ত যেন। জীবনভোর একটাই মাত্র কথা। কোন আপস নয়। কোন দর-কষাকষিও নয়। সংগ্রাম চাই। আপসহীন সংগ্রাম।

সংঘাত বেধেছিল ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে।

তাঁর লক্ষ্য ছিল সেদিন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বা স্বায়ত্তশাসন। অপরপক্ষে সুভাষ পূর্ণ স্বাধীনতার কমে কিছুতেই রাজী নয়। তারপর সেকি তার উদ্দীপ্ত ভাষণ ঃ

'The youths of India are no longer content with handing over all responsibility to their older leaders and sitting down with folded hands or following like dumb-driven cattle.'

[Speeches and writings of Subhas Bose : P.—80-81]

১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে আবার নতুন দাবী। আমি পাশাপাশি জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে চাই।

তারপর ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত করাচী কংগ্রেস। ভগৎ সিং শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে সেকি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সেদিন! সুভাষের সেদিনের ভূমিকা কোনরকমেই ভুলে যাবার নয়।

তারপর দীর্ঘদিন ইয়োরোপে। সেখানেও তার সেই একই চেহারা। প্রমাণ, বসু-প্যাটেল বিবৃতি। গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অমন বিবৃতি দেবার মতো যোগ্যতা সেদিন সারা হিন্দুস্থানে ঐ একটি মানুষেরই বুঝি ছিল।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি। আশ্চর্য, সবার মুখে সেদিন একই কথা! প্ল্যানিং কমিশন! প্ল্যানিং কমিশন! প্ল্যানিং কমিশন!

সুভাষের মুখে প্ল্যানিং কমিশনের কথা শুনে সত্যিই সেদিন অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল সুধী-মহলে। ভারতবর্ষে এর আগে এমন কথা ভাবতেও বুঝি পারেনি কেউ।

সেই একই বছরে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সুভাষের মুখে শোনা গেল এক নতুন দাবী।

ইংরেজ, ভারত ছাড়। অবিলম্বে হাত গোটাও এদেশ থেকে। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষেরই দাদা শরৎচন্দ্র বসু।

তারপর ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সেই অবাঞ্ছিত অধ্যায়।

সেখানেও সুভাষের ভাষণে শোনা গেল সেই একই দাবী। ভারত ত্যাগ করার জন্য ইংরেজকে চরমপত্র দেওয়া হোক। মাত্র ছ'মাস সময়, তারপরই শুরু হবে ব্যাপক সংগ্রাম।

তারপর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন। সবশেষে অন্তর্ধান। তারিখটা ছিল ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি।

সুভাষের সেই অন্তর্ধান কি সেদিন খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল তাঁর কাছে?

না, ছিল না। মত ও পথ আলাদা, তবু যাবার আগে সুভাষ নিজেই একদিন তাঁকে খুলে বলেছিল সব কথা। বাইরে গিয়ে কিছু করা যায় কিনা, আমি তা একবার দেখতে চাই। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কৃতকার্য হলে আমিই সেদিন সর্বাগ্রে অভিনন্দন জানাব তোমাকে।

সুভাষ তার কথা রেখেছে। এরি মধ্যেই সে এক শক্তিশালী সেনা বাহিনী গড়ে তুলেছে সুদূর জার্মানীতে গিয়ে। সেখান থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসে তার সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর—'আমি সুভাষ বলছি।'

দিনের পর রাত্রি। আবার রাত্রিও এক সময়ে হারিয়ে যায় দিনের আলোর সমারোহে।

সেই একই ভাবনা তখন ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে গান্ধীজীর মনে।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ভারতের কোটি কোটি মানুষের বাপুজী হয়ে একমাত্র তিনিই কি শুধু নির্বাক একটি দর্শকের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন দেশের এই চরম বিপদের দিনে?

অসম্ভব! কিন্তু কি করা যায় এখন? কি করা উচিত?

'Azad Hind Radio, Berlin, I am Subhas calling…

Freedom is not given, it is taken. Freedom never could be a gift, because every gift carries its obligations, its ties…'

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! সেই কণ্ঠ! মুখে সেই চিরন্তন সংগ্রামের ডাক! স্বাধীনতা কেউ দেয় না, আদায় করে নিতে হয়।

কোন্‌টা আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন? সংগ্রাম, না সহযোগিতা? বন্ধুত্ব, না বিচ্ছেদ? স্বাধীনতা, না দাসত্ব?

'Britain's paid propagandists have been calling me an enemy agent. I need no credentials when I speak to my own people.

My whole life is one long persistent, uncompromising struggle against British Imperialism, and is the best guarantee of my bonafides···

All my life I have been the servant of India. Until the last hour of my life I shall remain one. My allegiance and loyalty have ever been and will ever be to India alone, no matter in which part of the world I may live···'

ব্রিটিশের ভাড়াটে প্রচারকরা আমাকে যতই শত্রুর এজেণ্ট বলুক না কেন, আমি যখন দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলি, তখন আমার কোন পরিচয়-পত্রের দরকার হয় না। সারা জীবন নিরলসভাবে আমার ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেটেছে। তা-ই আমার বিশ্বস্ততার গ্যারান্টি।

আমি ভারতবর্ষের সেবক। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, ভারতবর্ষের প্রতিই আমার আনুগত্য থাকবে চিরদিন।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়। তবু সেই কলকণ্ঠ কানের কাছে একটানা বেজে চলে বিরামহীনভাবে :

'Azad Hind! To fight and win India's liberty, and then build up in India, with full freedom to determine her own future—with no interference! Free India will have a social order based on the eternal principles of Justice, Equality and Fraternity.'

সব কথাই মিলিয়ে যায় আস্তে আস্তে। শুধু জেগে থাকে তিনটি মাত্র শব্দ। Justice! Equality! Fraternity!

ন্যায়! সমভাব! ভ্রাতৃত্ব! এই তিনটি নীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে সুভাষের স্বপ্নের ভারত।

এমনি করে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। নানা ভাবে। নানা ভাষায়।

'আমি সুভাষ বলছি···

আমার ভাইবোনেরা,

ব্রিটিশ অতীতে ভারতবর্ষকে দাস ও দরিদ্র করে রেখে যে নীতির অনুসরণ করে এসেছে, আজ তাকে তার অব্যর্থ ফলভোগ করতেই হবে।

একথা আজ অতি স্পষ্ট যে, এ সুযোগ কিছুতেই আমরা হেলায় হারাব না। ভারতের জাতীয় মুক্তির শেষ সংগ্রামের জন্য অচিরেই আমরা আমাদের অভিযান শুরু করব। আমরা সংগ্রাম করব আমাদের সকল শক্তি দিয়ে। বিধাতার আশীর্বাদে ও দেশবাসীর সহায়তায় আমরা জয় করব আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের মুক্তি।

হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি—এ ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই আজ আমাদের চোখের সামনে। জয় হিন্দ্!'

বুঝি-নিমেষে মনের মণিকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে গান্ধীজীর।

মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য রাজত্বের পরিবর্তে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম দাবী করেছিলেন দুর্যোধনের কাছে। মধ্যস্থতা করেছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

দাম্ভিক দুর্যোধন তাতে কর্ণপাত করেনি। হাজার বার, হাজার-ভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তার হৃদয়ের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। তাই তো মহাবীর অর্জুনকে শেষ পর্যন্ত গাণ্ডীব ধারণ করতে হয়েছিল নিরুপায় হয়ে।

তাই হয়। সংসারে দুর্যোধনরা কোন কালেই কারো উপদেশে কান দিতে জানে না। হাজার দৃষ্টান্ত দেখেও ওদের চৈতন্য হয় না। আজো তা হবে না। সে আশাও সুদূর পরাহত। সুতরাং

ভারতবাসীকে তার জন্মগত দাবী আদায় করতে হলে চাই সংগ্রাম। হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

এ ছাড়া আজ আর কোন পথই খোলা নেই ভারতবাসীর সামনে।

ওদিকে পুরানো সহকর্মিবৃন্দ অবাক।

বাপুজী যেন আর সে বাপুজী নেই। কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে তাঁর ভেতরে। কিসের যেন একটা ব্যাকুল ভাবনা। দিনে-রাতে। সময়ে-অসময়ে। সর্বক্ষণ।

ঠিক বোঝা যায় না, তবে তার আলোড়নটা যেন বাইরে থেকেও বেশ উপলব্ধি করা যায়। অব্যক্ত বোবা আলোড়ন।

কেন বাপুজীর এই বিস্ময়কর পরিবর্তন? কার কথা তিনি এমন করে ভাবছেন দিনে-রাতে? কে সেই লোক?

জানতেন শুধু একজন। তিনি হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। একমাত্র তিনিই সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাপুজীর আসল ব্যথা কোথায়।

ব্যথার কারণ – সুভাষ।

সেই সুভাষ, যাঁকে একদিন তিনি নিজেই বহিষ্কার করেছিলেন কংগ্রেস থেকে।

আশ্চর্য, আজ আবার সেই সুভাষের ভাবনাতেই সমস্ত চেতনা তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে আছে সর্বক্ষণ। সুভাষ যে তাঁর বিদ্রোহী সন্তান! তাঁকে তিনি ভুলবেন কি করে?

এ আমার কোন মনগড়া কাহিনী নয় মল্লিকা, এ ইতিহাস। এ ইতিহাসের সাক্ষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সুভাষের বেতার-ভাষণ অনেকেই সেদিন শুনেছেন। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দও তার ব্যতিক্রম নন। বহু দিন, বহুভাবেই তাঁরা তা শুনেছেন পরম আগ্রহভরে।

প্রমাণ, আজাদ সাহেবের একটি চিঠি। চিঠিতে বন্ধু জওহরলালকে তিনি লিখেছেন :

'…চার-পাঁচ দিন আগে বার্লিন থেকে সুভাষবাবুর একটা বিবৃতি বেতারে প্রচার করা হয়েছিল। পরদিন ঘোষণা করা হল, ঐ বক্তৃতাটি রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাতে সুভাষবাবুরই নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

আমি শুনেছি। সুভাষবাবুর কণ্ঠস্বর। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা রেকর্ড নয়, উনি নিজেই বলেছিলেন। তবে টোকিও থেকে যে বেতার-বক্তৃতা প্রচার করা হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই রেকর্ড। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, রেকর্ডখানা বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হচ্ছে।'

[পত্রগুচ্ছ : জওহরলাল]

সুভাষকে কেন্দ্র করে গান্ধীজীর এই বিস্ময়কর রূপান্তরের কথাও লিখে গেছেন আজাদ সাহেব নিজেই। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম' গ্রন্থে কি লিখেছেন, শোন :

'I also saw that Subhas Bose's escape to Germany had made a great impression on Gandhiji… and now I found a change in his outlook.'

এখানেই থামেননি আজাদ সাহেব। আরো লিখেছেন :

'…many of his remarks convinced me that he admired the courage and resourcefulness Subhas Bose had displayed in making his escape from India.'

'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম' নিয়ে কিন্তু পরবর্তী কালে আজাদ সাহেবকে কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি, মল্লিকা। হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। হলই বা সত্যি, তা বলে সুভাষ বোসকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন ?

৫ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়।

একদিকে গান্ধীজী একা, অন্যদিকে জওহরলাল, আবুল কালাম আজাদ, ভুলাভাই প্রমুখ সবাই।

প্রাণপণে বিরোধিতা করলেন জওহরলাল।

এ সময়ে কোনরকম সংগ্রাম শুরু করা ঠিক নয়। তাতে লাভ হবে ত্রি-শক্তির। জাপানীরা যে সেই সুযোগে ভারত আক্রমণ করবে না, তা কে বলতে পারে!

গান্ধীজীর মতে এটা কোন যুক্তিই নয়। জাপান আমাদের শত্রু নয়, ব্রিটিশের। তারা যদি আমাদের দেশে আসে তো ব্রিটিশের জন্যই আসবে, আমাদের জন্যে নয়। সুতরাং ব্রিটিশ বিদেয় হোক।

'...if the Japanese army ever come into India, it would come not as our enemy but as the enemy of the British.'

বাধা দিলেন জওহরলাল। বোঝাতে চেষ্টা করলেন নানাভাবে। কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান। এ সময়ে আন্দোলন শুরু করলে বিদেশে আমাদের মর্যাদার হানি হবে।

বটেই তো! বটেই তো! ফুট কাটলেন পরিহাস-প্রিয় আচার্য কৃপালনী, কিন্তু সাহেবরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববে, শুধু সেটা দেখলেই তো চলবে না। কিছু একটা করা না হলে দেশবাসী কি ভাববে,—সেটাও দেখতে হবে তো!

একই অভিমত কংগ্রেসের লৌহ-মানব সর্দার প্যাটেলের। অনেক দিন কেটে গেছে। আর কত!

অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্ক-বিতর্ক।

কিন্তু সব বৃথা। গান্ধীজী অটল, অনড়। শেষপর্যন্ত তিনি চরম-পত্র পেশ করলেন সহকর্মীদের কাছে।

তোমাদের কাউকে আমি চাই নে। কাউকে আমার দরকার নেই। কারণ, আমি জানি যে, তোমাদের আর আমার পথ আলাদা।

একসঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করা আর আমাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

'Things reached a climax when he sent me a letter to the effect that my stand was so different from his that we could not work together. [India Wins Freedom : Azad].

এখানেই শেষ নয়। এই সঙ্গে আরো স্পষ্ট করে গান্ধীজী জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা। কংগ্রেস যদি আসে তো ভালই, নইলে একাই আমি সংগ্রাম শুরু করব আমার অনুগামীদের নিয়ে। আর কোনরকম দেরি করতে আমি প্রস্তুত নই।

'...I shall have to fight against the whole world and stand alone. Even if all the United Nations oppose me, even if the whole of India tries to persuade me that I am wrong, even then I will go ahead, not for India's sake alone but for the sake of the world.

I cannot wait any longer for Indian freedom. I cannot wait until Mr. Jinnah is converted. If I wait any longer, God will punish me. This is the last struggle of my life'.

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন জওহরলাল প্রমুখ সহকর্মীর দল।

এ কার কণ্ঠ? বাপুজীর, না সুভাষের? মনে হয় এ যেন এতদিনকার চেনা সেই বাপুজী নন। আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? কোন্ অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে নিলেন জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ সহকর্মিবৃন্দ।

তাছাড়া উপায় কি! গান্ধীজী মানেই যে কংগ্রেস। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা মানেই যে চরম অবলুপ্তি!

একমাত্র সুভাষ ছাড়া সে সাহস, শক্তি বা যোগ্যতা ক'জনের ছিল গোটা ভারতবর্ষে? ছিল কি কারো? তোমার কি মনে হয়, মল্লিকা?

তা বলে মন থেকে কিন্তু জওহরলাল গান্ধীজীর সেই প্রস্তাব কোনদিনই সমর্থন করতে পারেননি, মল্লিকা। তাঁর মতে গান্ধীজীর সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত একটা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

'Gandhiji's approach also seemed to ignore international considerations and appeared to be based on a narrow view of nationalism.' [Discovery of India]

প্রস্তাব গৃহীত হল ১৪ই জুলাই।

তবে সবটা নয়, খানিকটা। গান্ধীজীর সেই প্রস্তাব নাকি বিপ্লবাত্মক। কিছুটা বিপদজনকও বটে।

তাই তাঁর অগোচরে কখন যে সেই মূল প্রস্তাব থেকে কিছুটা অংশ কোথায় উবে গেল, সে রহস্যের কিছুতেই আর সমাধান করা গেল না।

ওদিকে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সর্বত্র। পত্র-পত্রিকায় সমালোচনাও করা হল বিস্তর।

এ সময়ে মিঃ গান্ধীর আন্দোলন শুরু করার একমাত্র অর্থ ই হল দেশে অরাজকতা সৃষ্টি ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত করা। সুতরাং তাঁর এই আন্দোলন কোন দিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়।

তীব্র আক্রমণ করলেন সেই ক্রীপস্। লণ্ডন থেকে প্রচারিত এক বেতার-বক্তৃতায় খোলাখুলিভাবেই তিনি আবেদন জানালেন বড় তরফের কর্তা আমেরিকার কাছে।

মিঃ গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত অবিবেচনাপ্রসূত। এ আন্দোলন যে করে হোক, দমন করতেই হবে। তোমরাও এস আমাদের সঙ্গে।

আমেরিকারও সেই কথা। মিত্রশক্তির প্রধান যুদ্ধ-ঘাঁটি এখন ভারতবর্ষ। এ সময়ে যারা আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত করবে, তারা আমাদের 'শত্রু' ছাড়া আর কিছুই নয়।

হুমকি দিলেন যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেট মিঃ এল. এস. আমেরী। মিঃ গান্ধী তাঁর প্রস্তাবিত আন্দোলন শুরু করলে ভারত সরকার তার মোকাবিলা করার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত।

জবাব দিলেন গান্ধীজী।

আমার বক্তব্য এত স্পষ্ট, যা নির্বোধেরও বোধগম্য হওয়া উচিত। এ ধরনের হিস্টিরিয়া-সুলভ চিৎকার করে কোন লাভ নেই। যে যাই যুক্তি দেখাক না কেন, ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের আয়োজন নিছক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষারই আয়োজন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আমার মন ব্রিটিশকে নৈতিক সাহায্য দান করতে অস্বীকার করছে। আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, ব্রিটিশের উপস্থিতিই আজ জাপানকে ভারত-আক্রমণে উত্তেজনা দিচ্ছে। সুতরাং ব্রিটিশ আমাদের দেশ থেকে চলে যাক। তারপর আমাদের সমস্যা আমরাই বুঝে নিতে পারব।

'Let them (the British) withdraw from India and I promise that the Congress and the Muslim League will find it to their interest to come together and devise a home-made solution for the Government of India.'

গান্ধীজী সত্যাশ্রয়ী। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কোথাও তাঁর মধ্যে গোপনীয়তার কিছু নেই। তাই এবার তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যা মীরা বেনকে (মিস্ শ্লেড) দিল্লীতে পাঠালেন বড়লাট লিন্‌লিথগোর সঙ্গে দেখা করার জন্য। উদ্দেশ্য—আসন্ন আন্দোলন সম্বন্ধে সব কিছু খুলে বলা।

কোথায় বড়লাট!

জবাব দিলেন তাঁর সেক্রেটারী, না, দেখা হবে না। মিঃ গান্ধী বিদ্রোহের হুমকি দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে বা তাঁর প্রেরিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে ভাইসরয় কোনমতেই রাজী নন।

সরকারী ইস্তাহারে আরো পরিষ্কার করে বলা হল :

কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি, সরকার একথা মানতে রাজী নন। দেশে বিরাট এবং শক্তিশালী অন্যান্য দলও রয়েছে। এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও তারা জানিয়েছে। সুতরাং তাদের এই দাবীর পেছনে কোন যুক্তি নেই। মিঃ গান্ধীর এই চ্যালেঞ্জে ভারত সরকার দুঃখিত, তবে আন্দোলন যাতে বিস্তৃতভাবে হতে না পারে, সরকার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য আরো স্পষ্ট। এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ। সুতরাং সর্ব শক্তি দিয়ে এই আন্দোলন প্রতিহত করতে হবে। এমন কোন কিছু করতে দেওয়া হবে না, যাতে ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা এতটুকুও ব্যাহত হতে পারে। কারণ, ব্রিটিশও এখন জনযুদ্ধের অন্যতম সরিক।

অবশ্য শুরুতে তাদের এ মনোভাব ছিল না। তখন তাদের বক্তব্য ছিল—এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-আমেরিকার যুদ্ধ। সুতরাং, —'এক পাই, এক ভাই, নাহি দিব সমরে'।

মতের পরিবর্তন হল জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হবার পরে। তখন থেকেই দলীয় মুখপত্র 'অরণি', 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপলস্ ওয়ার'-এ শোনা গেল নতুন স্লোগান। 'চাল দাও, টাকা দাও, সেনাদলে ছেলে দাও'। কারণ এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ।

বছরের শুরুতেই আবেদন জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে। এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ। সুতরাং এখন থেকে আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব সরকারের সঙ্গে। জাপান সাম্রাজ্যবাদী। যে করে হোক, তাকে রুখতেই হবে।

জবাব মিলেছে ২২শে জুলাই। সেদিন এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হল ঃ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁদের অধিকাংশকেই মুক্তির আদেশ দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে পার্টি ঘোষিত হল বৈধ বলে।

সরকারী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে পরদিনই ভারত সরকারের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ নিম্বকার এক বিবৃতি দিলেন স্টেটস্‌-ম্যান পত্রিকায়। গান্ধী-আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য কমিউ-নিস্ট পার্টিকে মুক্তি দিয়ে সরকার যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন সুভাষ।

অজ্ঞাতেই বুঝি বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে ছোট্ট একটি নাম—গান্ধী! গান্ধী! গান্ধী! অহিংসা-মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজী!

রাজনৈতিক জীবনে কতবার তাদের মত বিরোধ ঘটেছে, সংঘর্ষ হয়েছে, এমন কি শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদও ঘটেছে দুজনের মধ্যে, তবু গান্ধীজী, গান্ধীজীই। জাতির গণ-জাগরণের মূলে তাঁর বিরাট অবদানের কথা কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

সংগ্রাম শুরু করার জন্য ইতিপূর্বে তিনি কম আবেদন জানাননি গান্ধীজীর কাছে। কম চাপ দেননি। কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই।

প্রতিবারই তিনি পিছিয়ে গিয়েছেন কোন-না-কোন একটা যুক্তির অবতারণা করে।

সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আজ সেই গান্ধীজী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন সবার পুরোভাগে। তাঁর জয় হোক। ভারত স্বাধীন হোক।

এক সঙ্গে ঘরে-বাইরে দুদিক থেকে আঘাত হানতে পারলে সাফল্য সুনিশ্চিত। জয় হিন্দ্‌!

ওদিকে রাসবিহারী বসুর চোখেও ঘুম নেই। তিনিও সেই

একই ভাবে প্রহর গুণে চলেছেন তাঁর একান্ত প্রিয় জন্মভূমির পানে তাকিয়ে। গান্ধীজী সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। কবে আসবে সেই শুভলগ্ন! কবে!

২৮শে জুলাই তারিখে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে মহানায়ক রাস-বিহারী এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানালেন থাইল্যাণ্ড রেডিও থেকে।

দিন আগত ঐ। সবাই আপনারা দলে দলে যোগ দিন গান্ধীজীর এই আন্দোলনে। মনে রাখবেন, জাতীয় জীবনে এমন সুযোগ বার বার আসে না।

'Friends, the hour has struck. We must now break the shuckles which the British had bound us hand and foot···India had lost everything but she has not lost her soul. Centuries of oppression and exploitation have not been able to kill her soul.···

···I therefore earnestly appeal to our compatriots at home to rally round Mahatma Gandhi in his campaign to compel the British to leave India immedeately···' [Rash Behari Bose—His struggle for India's Independence : P.—180]

রাসবিহারী তখন রীতিমত অসুস্থ। চলাফেরা করতেও কষ্ট হয়। তা বলে কি নিজের কথা চিন্তা করার মতো সেদিন এতটুকুও অবকাশ ছিল ঘরছাড়া এই মানুষটির?

ঘর পিয়াসী মহানায়ক তখন ঘরের নেশায় শিশুর মতো উন্মত্ত যেন। কবে আমি ঘরে ফিরে যাব! কবে আমি স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখতে পাব দু চোখ ভরে! কবে!

১লা আগস্ট তারিখে আবার মহানায়কের কণ্ঠ ভেসে এল সুদূর থাইল্যাণ্ড থেকে। আমার আন্তরিক অনুরোধ, সবাই গান্ধীজীর এই সংগ্রামে যোগ দিন দলে দলে।

'In my last broadcast to you on July 28th, I appealed for unqualified support to Mahatma Gandhi in his coming final fight for our freedom···

···In the name of our sacred Motherland, I implore you all, my compatriots, to rally under Mahatma Gandhi's banner of national independence and march on to victory'. [Ibid : P.—184-189]

৭ই আগস্ট বম্বেতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে, সে খবর রাসবিহারীর অজানা নয়। তাই তার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে (৫ই আগস্ট) আবার সতর্ক-বাণী ভেসে এল থাইল্যাণ্ড থেকে।

এবার মরিয়া হয়ে ব্রিটিশ তার শেষ কামড় দেবে ; তার জন্য আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ প্রস্তুত। অসুরকে কি করে আসুরিক ভাষায় জবাব দিতে হয়, তা আমরা জানি। একশো রুজভেল্টও এবার ব্রিটিশকে রক্ষা করতে পারবে না।

'···The British must leave India anyway···And a hunderd Roosevelts cannot save her.

Britain has warned India that she will not hesitate to crush the Independence Movement.···

I hasten to assure you that we Indians in East Asia are prepared to meet any eventuality. Even if the British overwhelm you, they will not have seen the last of India's national forces.

The British are preparing to crush you ; but we, sons of India in East Asia, are preparing to annihilate them. And I have no doubt that this time India must win and she will win.

Think of India's glorious past, her present

degradation and the brilliant future that awaits her. Let us march forward with faith in ourselves and in India's destiny. Do not look back ; do not falter ; go on to battle, to victory, and to complete independence.' [Ibid : P.—190-195]

পূর্ব নির্দিষ্টমত··৭ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল বম্বেতে।

নেতৃবৃন্দ সবাই এসে সেখানে সমবেত হলেন একে একে। এবার প্রস্তাব পাস করার পালা।

'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হল ৮ই আগস্ট রাত দশটায়। সেই সঙ্গে সঙ্কল্প হিসেবে গৃহীত হল ছুটি মাত্র ছোট্ট শব্দ। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আর 'ডু অর ডাই'।

আরো ঠিক হল, বরাবরের মতো এবারও আন্দোলন হবে সম্পূর্ণ অহিংস। অর্থাৎ, দরকার হলে বরাবরের মতো পিঠ পেতে মার খাব, তবু প্রত্যাঘাত কিছুতেই নয়।

ব্যস, সেই শেষ। কবে—কোথায়—কিভাবে আন্দোলন শুরু করা হবে, সে সম্বন্ধে আর কোন রকম নির্দেশই দেওয়া হল না জনসাধারণকে। হয়তো পরে দেবার ইচ্ছা ছিল বিস্তৃতভাবে।

সবশেষে গান্ধীজী জানালেন তাঁর সদিচ্ছার কথা।

আমি নিজে গিয়ে একবার দেখা করতে চাই বড়লাটের সঙ্গে। তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চাই সব কিছু। হয়তো তাতে কিছু কাজ হলেও বা হতে পারে।

কোথায় রইলেন বড়লাট, আর কোথায় গান্ধীজী !

পরদিন ৯ই আগস্ট ভোর হতে না-হতেই দেখা গেল, 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'। চল এবার বন্দী-নিবাসে। হ্যাঁ, সবাই।

সস্ত্রীক গান্ধীজী ও সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে নিয়ে যাওয়া হল আগা খাঁ প্রাসাদে।

জওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ঠাঁই হল আমেদাবাদ দুর্গে। বাদ বাকি সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে। সেই সঙ্গে কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল সারা ভারতবর্ষে।

শাসককুল নিশ্চিন্ত। যাক, বাঁচা গেল! নেতাদের সবাইকে আটক করা হয়েছে। যাকে বলে অঙ্কুরেই বিনাশ। সুতরাং আর আন্দোলন করতে হবে না বাছাধনদের।

কিন্তু সব বৃথা। ততক্ষণে আসমুদ্র-হিমাচল কাঁপিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ গর্জে উঠেছে—'কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!'

‘শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম। পরাধীনতাই পাপ।’

—স্বামী বিবেকানন্দ

কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

নিমেষে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। এই তো চাই। এই তো তারা চেয়েছিল এতদিন। এ তো শুধু গান্ধীজীর কথা নয়, এ যে সংগ্রামী ভারতের মর্মবাণী!

প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হল গান্ধীজী, জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ সবাইকে। তারপর শুধু গ্রেপ্তার—গ্রেপ্তার আর গ্রেপ্তার! প্রথম শ্রেণীর নেতা বলতে কেউ সেদিন রেহাই পেলেন না গ্রেপ্তারের হাত থেকে। একটি প্রাণীও না।

খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল সংগ্রামী ভারত। তারপরই একসঙ্গে সবাই গর্জে উঠল তীব্র আক্রোশে।

কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! এতকাল আমরা পিঠ পেতে অনেক মার খেয়েছি। এবার আমরা জবাব দেব। পাল্টা জবাব।

কংগ্রেসের মূলনীতি—অহিংসা। অহিংসাই তাদের সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার।

কোথায় গেল সেই অহিংসা, আর কোথায় রইল কি! দেখতে দেখতেই এতদিনকার সেই অহিংস নীতি কোথায় ভেসে গেল স্রোতের মতো।

প্রমাণিত হল যে, নেতা হিসেবে গান্ধীজীর স্থান সর্বোচ্চে, কিন্তু নীতির দিক থেকে নয়। একটা পলিসি হিসেবে বাহ্যত মেনে নিলেও ভারতবাসী কোনদিনই তাঁর সেই অহিংস নীতিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি মন থেকে।

তাই আগস্ট-আন্দোলনে নিয়েছিল তারা সুভাষের নীতি। অর্থাৎ, —আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার।

ভারত তখন অগ্নিগর্ভা। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ অনেকদিন আগে

থেকেই কারারুদ্ধ। কংগ্রেসেও নেতৃস্থানীয় বলতে কেউ সেদিন আর বাইরে নেই।

তা বলে সংগ্রামী ভারতবর্ষ কিন্তু এতটুকুও পিছিয়ে ছিল না, মল্লিকা। বিশেষ করে সুভাষ-সমর্থকদের তো কথাই নেই। ইংরেজ লেখক কুপল্যাণ্ডের ভাষায়ঃ

'The Revolutionaries of extreme left, specially in Bengal, were still ready to take their orders from Mr. Subhas Chandra Bose, even if they came by Radio from Berlin.' [Indian Politics : Coupland : P.—268]

ওদিকে পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে গা-ঢাকা দিলেন রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী প্রমুখ সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ।

কংগ্রেসের পক্ষে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, নেতৃবৃন্দ সবাই কারারুদ্ধ। তা বলে এই অপূর্ব সুযোগটাকে কোনরকমেই হেলায় হারালে চলবে না। সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার।

কিন্তু অহিংসা! এতদিনকার অহিংস নীতি ত্যাগ করে সহিংস আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা কি নীতি-বিরুদ্ধ নয়?

মোটেই না। যুক্তি দেখালেন সংগ্রামের প্রধান হোতা জয়প্রকাশ নারায়ণ।

কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সে স্বাধীনতাকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সহিংস পন্থা অবলম্বন করার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। গান্ধীজী তা সমর্থন করতে না পারলে আমি নাচার।

'My own interpretation of the Congress position (not Gandhiji's) is clear and definite. Congress is

prepared to fight aggression violently if the country become independent. Well, we have declared ourselves independent, and also named Britain as an aggressive power ; we are, therefore, justified within the terms of the Bombay resolution itself, to fight Britain with arms. If this does not accord with Gandhiji's principles that is not my fault.' [History of Freedom Movement : Vol.—III, P.—669]

এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা। আরো যুক্তি আছে। সে যুক্তি একদিন দেখিয়েছিলেন গান্ধীজী নিজেই।

সেদিন দেশবন্ধুর গৃহে বাংলার বিপ্লবী নায়কদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী এক আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

'Had India sword, I would have asked her to draw it. But she had no sword—I ask her to adopt non-violent, non-co-operation. Non-violence may be accepted as creed or policy. I am out to destroy this satanic Government.'

অর্থাৎ, ভারতবর্ষের তরবারী থাকলে আমি তাদের সেই তরবারী ব্যবহার করতে বলতাম। কিন্তু তা নেই। তাই বলছি যে, তোমরা আমার এই অহিংস অসহযোগের পথ গ্রহণ কর। অহিংসাকে কর্মপদ্ধতি বা পলিসি হিসেবে গ্রহণ কর। আমি এই শয়তান গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।

ভারতবাসীর তরবারী নেই, একথা সত্যি। কিন্তু নেই বলেই কি তাকে চিরদিন পিঠ পেতে মার খেতে হবে বোবা গরুর মতো ?

এই কি গান্ধীবাদ ?

অহিংসার নামে ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন দিয়ে জাতিকে নেতিবাদ শেখানোটাই কি গান্ধীনীতি ?

না, আমরা তা মানি নে। মানব না। সুতরাং আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত আমরা দেবই। মারের বদলে মার।

শুরু হল ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলন।

এই 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কিন্তু আদপেই গান্ধীজীর নয় মল্লিকা, সুভাষের। গান্ধীজী তা পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। শুধু একবার নয়, সুভাষের কথা এমনি পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি অসংখ্যবার।

যেমন ধর, ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসের কথা। সুভাষের দাবী, পূর্ণ স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতায় কোন খাদ নেই। শর্ত নেই।

বাদ সাধলেন স্বয়ং গান্ধীজী। তিনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস— অর্থাৎ ইংরেজের আওতায় থেকে আধখানা স্বাধীনতা পেলেই খুশি।

কি হল তার পরের বছর লাহোর কংগ্রেসে ?

আশ্চর্য, গান্ধীজী নিজেই সেখানে প্রস্তাব আনলেন—'আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।' অর্থাৎ, সুভাষ যে প্রস্তাব করেছিলেন একবছর আগে, তিনি তার পুনরাবৃত্তি করলেন পুরো একবছর বাদে।

তারপর ১৯৩৮ সালে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কথা। সুভাষই সেখানে সর্বপ্রথম প্রস্তাব আনলেন— ইংরেজ ভারত ছাড়! অবিলম্বে তোমরা হাত গোটাও আমাদের দেশ থেকে।

পরের বছর ত্রিপুরী কংগ্রেসেও তাঁর মুখে শোনা গেল সেই একই কথা। ইংরেজ বিদেয় হও! মাত্র ছ'মাস সময়। তার মধ্যেই তোমাদের চলে যেতে হবে আমাদের দেশ ছেড়ে। নয়তো শুরু হবে —সংগ্রাম।

সেখানেও বাদ সাধল সেই গান্ধীবাদী কংগ্রেস। ফলে, সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার।

তিন বছর বাদে এবারও সুভাষের সেই প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন—'ইংরেজ ভারত ছাড়! কুইট ইণ্ডিয়া!'

ঐতিহাসিক আগস্ট-আন্দোলন। বিরাট তার অবদান। বিরাট তার পটভূমিকা।

এত বিরাট যে, সামান্য দু-চার কথায় তার গুরুত্ব বোঝানো সম্ভব নয়। তাই সে চেষ্টা না করে আমি শুধু তার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোই তোমার কাছে তুলে ধরব, মল্লিকা।

গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন ৯ই আগস্ট ভোরবেলায়।

একই দিনে গ্রেপ্তার করা হল বম্বের মেয়র মিঃ মেহের আলী প্রমুখ খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দকে। কাউকে রেহাই দেওয়া হল না—একটি প্রাণীকেও না।

খবর শুনে তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল অশান্ত জনগণ। কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! দূর হও আমাদের দেশ থেকে।

শুরু হল আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, পুলিশের গুলিতে নিহত হল মোট ৫ জন। আহত—২০ জন। আমেদাবাদ এবং পুণাতে নিহত হল আরো ২ জন।

ঠিক সেইদিনই মহানায়ক রাসবিহারীর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ভেসে এল সুদূর থাইল্যাণ্ড রেডিও থেকে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, শোন। আমার দেশবাসী ভাইদের তোমরা এভাবে নির্বিচারে হত্যা করবে, আর আমরা তা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখব, সেকথা স্বপ্নেও ভেব না যেন।

মনে রেখো, আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ চুপ করে বসে নেই। সেদিন এই রক্তের ঋণ তোমাদের রক্তের বিনিময়েই শোধ করতে হবে।

'The world's eyes were focussed on Bombay..... Now the historic decision has been taken, India has declared war on Britain.

Perhaps they may, by sheer brute force, overwhelm the national forces for a time. But that cannot save them either. There are other and mightier forces outside of India's borders, standing ready to pounce on the Anglo-American forces in India and to annihilate them without the slightest mercy.

The battle has begun in dead earnest. The British have unleashed their reign of frightfulness. India must wade through blood before she reaches her goal of national independence. But this time India is prepared for any sacrifice and she will win.' [Rashbehari Bose—His struggle for India's Independence : P.—96]

১১ই আগস্ট বম্বেতে নিহত হল ১৩ জন, আর আহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩০। ১২ই আগস্টও বাদ গেল না। সেদিন দুটি নারী ও শিশুকে প্রাণ দিতে হল বুলেটের আঘাতে।

১৩ই আগস্ট পর্যন্ত বম্বেতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩০ আর আহত মোট ৩০০ জন। তাছাড়া আরো দুজনকে প্রাণ দিতে হল আমেদাবাদে।

ততদিনে বম্বের অধিকাংশ সরকারী ভবন, পোস্ট-অফিস, পুলিশ চৌকি ইত্যাদি সব শেষ।

তোমরা আমাদের হত্যা করবে, আর বরাবরের মতো এবারও আমরা নিঃশব্দে পিঠ পেতে মার খেয়ে অহিংসার গুণগান গাইব, ওসব চলবে না।

এবার আমাদের সোজা হিসেব, আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার। প্রাণ যায় সে ভি আচ্ছা, তা বলে কাউকে এবার ছেড়ে কথা বলব না।

একই অবস্থা চলেছে তখন কলকাতায়।

মল্লিকা, অধুনা কথায় কথায় ছাত্র-সমাজের সমালোচনা করা, কি আমাদের নেতৃবৃন্দ, কি তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা—সবার পক্ষেই যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রয়োজন হলেই তাঁরা বলে থাকেন—ছাত্ররাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তারাই আমাদের সংগ্রামের সবচাইতে বড় হাতিয়ার।

বেগতিক দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই আবার শোনা যায় বিপরীত কথা। যেমন—ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। অধ্যয়নই তাদের একমাত্র তপস্যা।

কোনরকম মন্তব্য না করে আমি শুধু একটি প্রশ্নই করব, মল্লিকা। ভারতবর্ষের প্রতিটি আন্দোলনে এই ছাত্র-সমাজই কি বরাবর সবার পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ায়নি?

বুকের রক্তে মাটি ভিজিয়ে দেয়নি?

ধর্মতলার রাজপথ থেকে রক্তের দাগ কি এত শীগগিরই মুছে গেল?

১০ই আগস্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হল। আর ১১ই আগস্ট!

সমস্ত স্কুল-কলেজ সেদিন ফাঁকা। একটা দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে সবাই তখন নেমে এসেছে রাস্তায়। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই! কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীও প্রস্তুত। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত। শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতিও নিষিদ্ধ। সুতরাং সাবধান! এ ধরনের বে-আইনী কাজ কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।

পরদিন সবাই জড় হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। উদ্দেশ্য—নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করা।

হঠাৎ শুরু হল লাঠি-চার্জ। না, কোনরকম সভা করা চলবে না। সুতরাং—পেটাও! আচ্ছা করে পেটাও সবাইকে!

প্রতিবাদে হাজার হাজার কণ্ঠ গর্জে উঠল একসঙ্গে। ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ইংরেজ ভারত ছাড়!

ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমানী মার্কেটের কাছে লুটিয়ে পড়লেন বৈদ্যনাথ সেন। ঐতিহাসিক আগস্ট-আন্দোলনে বাংলার প্রথম শহীদ বৈদ্যনাথ সেন।

দেখতে দেখতেই আগুন জ্বলে উঠল মহানগরীর সর্বত্র। কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ অবিলম্বে হাত গোটাও আমাদের দেশ থেকে। দূর হও!

পরদিন ভবানীপুরে আরো দুজন। যুদ্ধের প্রয়োজনে হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈন্য তখন কলকাতায়। আদেশ পেয়ে নির্বিচারে তারা হত্যাকাণ্ড চালাতে লাগল মহানগরীর বুকে। ফলে, দিনের শেষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল মোট ৬, আহত ৩৩, আর লাঠির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হল মোট ৬৬ জন।

দিলীপ ঘোষও রেহাই পেলেন না। বোনের বিয়ে। বাজারে না গেলেই নয়।

কিন্তু কোথায় বাজার! রাস্তায় পা দিতেই অহেতুক এক শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টের রিভলবার গর্জে উঠল—ড্রাম! যেন এ একটা খেলা আর কি!

সন্তানের মৃতদেহ বুকে নিয়ে হাহাকার করে উঠলেন বৃদ্ধ পিতা।

তবে বেশিক্ষণ নয়। চলমান সাঁজোয়া গাড়ি থেকে একঝাঁক গুলি এসে এবার তাঁকেও স্তব্ধ করে দিল চিরদিনের মতো। সেই সঙ্গে আরো একজনকে।

লাইন মেরামত-রত টেলিফোন-মিস্ত্রীরও রেহাই নেই। কাজ

করতে করতে আচমকা একসময়ে তার প্রাণহীন দেহটা নিচে আছড়ে পড়ল মিলিটারীর অব্যর্থ গুলির আঘাতে।

অপরপক্ষও চুপ করে বসে নেই। লেটার-বক্স, ফায়ার অ্যালার্ম, ইলেকট্রিক ফিউজ-বক্স, পোস্ট-অফিস, ট্রামগাড়ি ইত্যাদি অসংখ্য সরকারী সম্পত্তি তখন শেষ।

এমন কি সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারী বোঝাই আর্মার্ড কারগুলি পর্যন্ত রেহাই পেল না জনতার উন্মত্ত রোষ থেকে। সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে একাকার।

'কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস্ বিফোর দেয়ার ডেথস্, দি ভ্যালিয়াণ্ট নেভার টেস্টস্ অফ্ ডেথ বাট ওয়ান্স্।'

এবার তাকিয়ে দেখ যে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আমরা তোমাদের উপযুক্ত জবাব দিতে পারি কি না!

পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে মোট কত লোক সেদিন নিহত হয়েছিল কলকাতায়?

না, সে খবর কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলবে না। আন্দোলন সম্বন্ধে কোন কিছুই লেখা চলবে না সংবাদপত্রে। তাহলে কঠোর শাস্তি।

প্রতিবাদে ১৮ই আগস্ট থেকে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ রাখা হল একপক্ষ কালের জন্য।

শেষ পর্যন্ত একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের এক বিবৃতি থেকে।

গত দু সপ্তাহে কলকাতায় নিহত হয়েছে মোট ২০ জন। আহত ১৫২, আর গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩,৫০০ জনকে।

শহরবাসীর ধারণা অবশ্য অন্য রকম। তাঁদের মতে নিহতের সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

হঠাৎ একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। গ্রেপ্তারের পর জয়প্রকাশ নারায়ণকে রাখা হয়েছিল হাজারিবাগ

সেণ্ট্রাল জেলে। কিন্তু কোথায় জয়প্রকাশ নারায়ণ? ৮ই নভেম্বর এক ফাঁকে তিনি হাওয়া। একা নন, ছ'জন সঙ্গীসহ।

খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল ভারতবর্ষের সর্বত্র। কিন্তু সব বৃথা। দীর্ঘ রাস্তা পায়ে হেঁটে বেনারস পৌঁছে ততক্ষণে তিনি চলে গিয়েছেন নাগালের বাইরে।

তা বলে বিশ্রামের অবকাশ কোথায়! তাই সঙ্গে সঙ্গেই আবার তিনি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘূর্ণীর মতো।

আঘাতের বদলে আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার। তার জন্য আন্দোলনেকে আরো জোরদার করে তোলা দরকার। আরো সঙ্ঘবদ্ধ।

ইতিমধ্যেই ছুটি গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র বসানো হয়েছে সংগ্রামী জনগণকে নির্দেশ দেবার জন্য। একটি বম্বেতে, অন্যটি কলকাতায়।

বম্বের গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র পরিচালিত হত রামমনোহর লোহিয়ার নির্দেশে। সেখান থেকে কে সেদিন নিয়মিতভাবে সংবাদ পরিবেশন করতেন, জানো মল্লিকা?

তিনি তোমার মতোই একটি মেয়ে। নাম তার ঊষা মেহেতা।

এদিকে আন্দোলন তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র।

হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বোলপুর, বালুরঘাট, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, যশোহর, খুলনা, মেদিনীপুর সর্বত্র সেই একই চেহারা। শুধু আঘাত আর পাল্টা-আঘাত!

ঢাকায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল মোট ৬, মুন্সীগঞ্জে ৪ এবং তালতলা বাজারে ৩ জন। সেই সঙ্গে একজন কনস্টেবলকেও প্রাণ দিতে হল ক্রুদ্ধ জনতার হাতে। আর সরকারী সম্পত্তি যে কত বিনষ্ট করা হল, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই।

এবার পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে যোগ দিল বিমান-বহর। কোন দয়া নয়। কোন মায়া নয়। যেখানে কোনরকম আন্দোলন করতে

দেখা যাবে, সেখানেই বিমান থেকে মেশিনগান চার্জ করা হবে। সুতরাং সাবধান !

কাজেও তাই করা হল। রাণাঘাটে রেল-লাইনের ওপর কর্মরত কুলীদের ওপর নির্বিচারে মেশিনগান চার্জ করা হল বিমান থেকে। ওরাও নাকি আন্দোলনকারী !

৪

এবার শোন অন্যান্য প্রদেশের কথা।

১৪ই আগস্ট মাদ্রাজে ৪ জন নিহত হল পুলিশের গুলিতে। আহত মোট ১০ জন।

জবাব দেওয়া হল ১৭ই আগস্ট। বহু সরকারী ভবন ও রেল-স্টেশন সেদিন পুড়ে ছাই হয়ে গেল জনতার রোষে।

১৩ই আগস্ট ৭ জন নিহত হল বাঙ্গালোরে। আহত ৭ জন।

রামনাদে নিহত—৬, আর ৫ জন নিহত হল গোদাবরী জেলায়। ফলে, রামনাদের অধিকাংশ সরকারী অফিস, সাব-জেল, ট্রেজারী ইত্যাদি লুণ্ঠিত হল জনতার হাতে।

নীলগিরিতে নিহত হল ১ জন। মহীশূর ও মাদুরায় ৩ জন করে।

১৪ই আগস্ট মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে প্রাণ হারাল ৬ জন। ওয়ার্ধায়—৫ জন।

আর অস্তি ও চিমুর ! অস্তি ও চিমুরের কথা পরে আসছে।

দিল্লীতে সাত দিনে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪০, পরে মিলিটারীর গুলিতে আরো ৩ জন।

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে প্রথম গুলি-বর্ষণ করা হল ১৪ই আগস্ট।

আলিগড় স্টেশনে নিহত ২ জন। বেনারসে ১ এবং আহত ১২ জন।

তারপরই একদিন জোর সংঘর্ষ বেধে গেল মজঃফরনগর জেলের অভ্যন্তরে। একদিকে বন্দীর দল, অন্যদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী।

ফলে, বন্দীদের মধ্যে মোট ৬ জনকে প্রাণ হারাতে হল পুলিশের হাতে। আর পুলিশের মধ্যে নিহত হল মোট ২ জন।

এবার উত্তর-ভারতের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ শোন।

সরকারী হিসেবে পুলিশ কর্মী নিহত মোট ১৬, আর আহত ৩২ জন। রেল-স্টেশন ভস্মীভূত হয়েছে ১৫টি। ক্ষতিগ্রস্ত আরো ১০৪টি রেল-স্টেশন।

রেল-লাইন তুলে ফেলা হয়েছে ১৬ জায়গায়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন ধ্বংস হয়েছে ৪২৫টি। ১১৯টি পোস্ট-অফিস সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন।

পোস্ট ও টেলিগ্রাফ-কর্মী আহত হয়েছে ৩২ জন। আর সরকারী ভবন ও গুদাম যে কত ধ্বংস করা হয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

বিহারের অবস্থা আরো মারাত্মক।

শুরু হয়েছে ১১ই আগস্ট।

সেখানেও সবার পুরোভাগে সেই ছাত্র-সমাজ। একদল এগিয়ে চলেছে হাইকোর্টের দিকে। অন্যদলের লক্ষ্য—পরিষদ ভবন। ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ওখানে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে তারা বদ্ধ-পরিকর।

হাইকোর্টের দিক থেকে কোন বাধা এল না, এল পরিষদ ভবনের দিক থেকে।

বিরাট এক পুলিশ বাহিনী নিয়ে আই. সি. এস. অফিসার মিঃ আর্চার তখন প্রস্তুত। কোনরকমেই তিনি শোভাযাত্রীদের পরিষদ ভবনের দিকে যেতে দিতে রাজী নন।

ফলে, সাতজনকে সেদিন প্রাণ দিতে হল পুলিশের গুলিতে। এই সাতজন হলেন ঃ

উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিংহ, সতীশপ্রসাদ ঝা, জগপতি কুমার, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, রাজেন্দ্র সিংহ আর রামগোবিন্দ সিংহ।

দেখতে দেখতে একটা উন্মত্ত ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা বিহারের ওপর দিয়ে।

প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ। আমরা মরব দুঃখ নেই, তা বলে তোমাদেরও ছেড়ে দেব না। লাইফ ফর লাইফ! ব্লাড ফর ব্লাড! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

মুঙ্গের তখন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

আর ভাগলপুরের তো কথাই নেই। শৈরাম সিংয়ের নেতৃত্বে বলতে গেলে প্রতিটি থানাই তখন বিপ্লবীদের দখলে। মূল্যও তার জন্য দিতে হয়েছে যথেষ্ট। দিতে হয়েছে ২১৮টি তাজা প্রাণ। আর আহত মোট ২৮০ জন।

পীরপন্থীতে ৩৭ জনকে প্রাণ দিতে হল পুলিশের গুলিতে, আহত ২৬ জন। সুলতানগঞ্জে নিহত—৬৭, আহত—১৫০ জন।

দ্বারভাঙায় নিহত—৩৮, আহত—শতাধিক। কাটিহারে নিহত—৫, বিদপুরে—৮, সাহাবাদ জেলায়—৮, লাহেরিয়া সরাইতে—৯ এবং চম্পারণে—২ জন।

এবার পাল্টা-আক্রমণ। প্রথমেই আক্রান্ত হল রাঁচি জেলখানা। ১৬ই আগস্ট আক্রান্ত হল মিনাপুর থানা। ২ জন সাব-ইন্সপেক্টরকে সেখানে হত্যা করা হল আগুনে পুড়িয়ে।

সীতামারিতে মহকুমা-হাকিমের গাড়ি আক্রান্ত হল জনতার হাতে। শেষ পর্যন্ত গাড়ির আরোহী মহকুমা-হাকিম স্বয়ং, পুলিশ ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল, আরদালী ইত্যাদি সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করা হল এক এক করে।

তারপর পূর্ণিয়া জেলার রূশৌলী থানা। সেখানেও একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও দুজন পুলিশকে পুড়িয়ে মারা হল গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে।

পরবর্তী লক্ষ্য বিহারের কাটরা নামক স্থানে একটি থানা। রাইফেল নিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর ও ৮ জন পুলিশ তখন প্রস্তুত।

সাবধান! আর এগিও না বলছি। আর এক পা এগুলেই গুলি করা হবে।

তবে রে! সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ জনতা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল থানার ওপর। তারপর কোথায় গেল সিপাই-সান্ত্রী, আর কোথায় রইল কি!

ঘটনাস্থলেই হত্যা করা হল একজনকে। বাদ বাকি সবাই জ্ঞান-হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল প্রহারের চোটে। সব শেষে থানা-গৃহ পুড়িয়ে দেওয়া হল আগুন দিয়ে।

১৮ই আগস্ট যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন একটি সামরিক বিমান অবতরণ করতে বাধ্য হল নারায়ণপুরে।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বৈমানিকদের হত্যা করা হল অতি নৃশংসভাবে। অত্যন্ত সোজা হিসেব। হত্যার বদলে হত্যা। মারের বদলে মার!

একই ব্যাপার ঘটল মারহোয়ারাতে। মোট পাঁচজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে সেখানে বর্শা দিয়ে হত্যা করা হল মোটর থেকে টেনে নামিয়ে।

আবার হত্যা। ট্রেন থেকে টেনে নামিয়ে এবার হত্যা করা হল বিমান বিভাগের দুজন ক্যানাডিয়ান অফিসারকে।

তারপর একটা এক্কা গাড়িতে মৃতদেহ দুটি তুলে নিয়ে শুরু হল শহর-পরিক্রমা। যে যেখানে আছ তাকিয়ে দেখ যে, ভারতবাসী জবাব দিতে জানে কি না! ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

শুধু বাইরে নয়, জেলের অভ্যন্তরেও সেই একই রব। কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! তোমাদের শাসন আর আমরা মানি নে, মানব না।

দেখতে দেখতে একদিন জোর সংঘর্ষ বেধে গেল ভাগলপুর জেলের অভ্যন্তরে।

একদিকে নিরস্ত্র বন্দীর দল, অন্যদিকে সশস্ত্র শাসক-সম্প্রদায়।

কিন্তু কার সাধ্য সেদিন তাদের গতিরোধ করে! ফলে, স্বয়ং ডেপুটি জেল-সুপার, কার্ডিং মাস্টার এবং সেই সঙ্গে আরও ২৮ জনকে সেদিন প্রাণ দিতে হল উত্তেজিত বন্দীদের হাতে।

বিচারে ৩ জনকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসির রজ্জুতে, বাকি ৬ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অন্য একটি মামলায় ১০ জনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। বাকি ৫ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

অপরপক্ষে, ছাপরায় ৫ জন মিলিটারী ও ১ জন ইয়োরোপীয়ানকে প্রাণ দিতে হল জনতার হাতে।

ভাগলপুর জেলে ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিতে হল বিপ্লবী তরুণ মহেন্দ্র চৌধুরীকে। আজ মহেন্দ্র চৌধুরীকে কেউ চেনে না, কিন্তু সেদিন এই মহেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন সংবাদপত্রের মস্ত বড় একটা শিরোনামা।

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন 'সারংবাবা' এবং তাঁর স্ত্রী 'সাঁওতাল মাতা'।

কে এই সারংবাবা? সাঁওতাল মাতাই বা কে?

সারংবাবা হলেন লম্বোদর মুখার্জী। সাঁওতাল মাতা তাঁরই স্ত্রী উষারাণী মুখার্জী।

সুভাষ দুজনকেই চিনতেন। তাই দেশে থাকতেই তিনি সাঁওতাল পরগণার ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি রূপে নির্বাচিত করেছিলেন এই উষারাণী মুখার্জীকে।

লোক চিনতে ভুল করেননি সুভাষ। প্রায় পঁচিশ হাজার সাঁওতালকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এই মুখার্জী-দম্পতি সেদিন যেভাবে লাঠি পাহাড়ে অবস্থিত ব্রিটিশ মিলিটারীর বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন, তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী বাবা কাহু মুর্মু, গৈরিকধারী সন্ন্যাসী বাবা নিমচাঁদ, চরণ মুর্মু, পাইকা মুর্মু, ভাদো হেমরম, লাল হেমরম, বরিয়ার হেমরম, পাগল মুর্মু, সুকু মুর্মু, তালাসী মাঝি, রসনা দেহারী,

জমিদার বাবু ভগবানচন্দ্র দাস, সর্বানন্দ মিশ্র, ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী, আনন্দময়ী চ্যাটার্জী, ডঃ অনিমা ভট্টাচার্য, রামজীবন হিম্মৎ সিঙ্কা প্রমুখের ভূমিকাও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোট ৮০ জন সাঁওতাল বীর সেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন গেরিলা-যুদ্ধের ফলে। আহতের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

বিক্ষোভের আগুনে গোটা ভারত তখন জ্বলছে।

লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছে একটি মাত্র কামনা—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

একমাত্র ব্যতিক্রম কমিউনিস্ট পার্টি। তাদের বক্তব্য—এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ। সুতরাং এ সময়ে একমাত্র কর্তব্য হল ইংরেজকে সহায়তা করা। 'কুইট ইণ্ডিয়া' ধ্বনি তুলে যারা ইংরেজকে এ দেশ-ছাড়া করার আন্দোলন শুরু করেছে, তারা আসলে দেশদ্রোহী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কমিউনিস্ট পার্টির তৈরি দেশদ্রোহীদের তালিকায় কোন্ কোন্ দল সেদিন স্থান পেয়েছিল, শোন:

'The groups which make up the Fifth Column are the Forward Bloc, the party of the traitor Bose, the C.S. P. & the Trotskyte group···The Communist Party declare that all these three must be treated by every honest Indian as the worst enemy of the nation and driven out of political life and exterminated.' [Communist Party : Facts and Fiction.]

অর্থাৎ—সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লক, সি. এস. পি, ট্রটস্কীপন্থা ইত্যাদি সবাই বিশ্বাসঘাতক। জনসাধারণের উচিত, এই তিনটি ঘৃণ্য বিশ্বাস-ঘাতক দলকে তাদের রাজনৈতিক জীবন থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া।

লক্ষ্য কর মল্লিকা, তালিকায় কংগ্রেসের কোন নাম নেই। কিন্তু কেন?

কারণ, 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব নাকি আদপেই সেদিন গৃহীত হয়নি বম্বে অধিবেশনে। একটা খসড়ামত হয়েছিল মাত্র। সুতরাং তালিকা থেকে গান্ধীজী—তথা কংগ্রেস বাদ।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড পি. সি. যোশী, গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পরেই এক বিবৃতিতে কি বলেছিলেন, শোন:

'...কংগ্রেসসেবী সহকর্মীদের কাছে আমরা নিম্নলিখিত কথার মর্ম অনুধাবন করিতে ও দেশপ্রেমিক কর্তব্য স্থির করিতে আবেদন জানাইতেছি:

(১) কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানায় নাই। নির্বাচিত একমাত্র নেতা কোন নির্দেশ দেবার পূর্বেই গ্রেপ্তার হন।

(২) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নেতা গ্রেপ্তার হইলে আইন অমান্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই।

(৩) কংগ্রেস বা মহাত্মাজী কেহই বিশৃঙ্খলা বা নিরর্থক হিংসার জন্য আবেদন জানান নাই। এই কাজগুলি কংগ্রেস ও জাতীয়ত-বিরোধী।' [কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস: পি. সি. যোশী: পৃ.—৩৮]

২৩শে আগস্ট 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকায় তিনি আরো কি বলেছিলেন শোনা যাক:

'...গভর্ণমেণ্টের কাজে উত্তেজিত হইয়া আমাদের দেশ-প্রেমিকরা ভারতের স্বাধীনতার নামে জাতির দেশরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকরী উপকরণগুলি নষ্ট করিতে উদ্যত।...ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা লইয়া হেলাফেলা করা, ভারতীয় যানবাহন ব্যবস্থা অচল করিবার অর্থ ফ্যাসিস্ট শত্রুর সাহায্য করা, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা নয়।

…সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশ-প্রেমিকের কাছে আমাদের আবেদন এই :

ধ্বংসকার্য হইতে বিরত হও, উহাতে ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হইবে এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে ফ্যাসিজমের লাভ হইবে।… ইহাই তোমাদের দেশ-প্রেমিক কর্তব্য, কারণ, তোমরাই দেশের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মী।'

মল্লিকা, আমি রাজনীতির ছাত্র নই। কি কংগ্রেস, কি কমিউনিস্ট, কারো প্রতিই আমার এতটুকু বিদ্বেষ নেই।

বরং কমিউনিস্ট পার্টি একটি সত্যিকারের সংগ্রামী পার্টি বলেই আমার ধারণা। তার জন্য তাঁরা কিছু-না-কিছু নির্যাতনও ভোগ করেছেন।

সত্যি বলতে কি, এ হেন সংগ্রামী পার্টি কেন যে সেদিন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, তা আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, মল্লিকা। বুঝতে অনেক চেষ্টা করেছি, নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেও দেখেছি, কিন্তু কোনও সদুত্তর পাইনি।

অবশ্য মুসলীম লীগ, জাতীয়তাবাদী দল, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সংস্থাগুলিও নীতিগত দিক থেকে আগস্ট-আন্দোলন সমর্থন করেনি, তবু তাদের ভূমিকা আর কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এক নয়।

তারা সমর্থন করেনি একথা ঠিক, তা বলে বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও কোনদিন তাদের বড় একটা দেখা যায়নি।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে একথা খাটে না। তারা যে সেদিন খোলাখুলি ভাবেই সর্বশক্তি দিয়ে আগস্ট-আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, একথা ঐতিহাসিক সত্য।

প্রমাণ ১৭-৩-৪৬ তারিখে 'বম্বে ক্রনিকেল' পত্রিকায় প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্য মিঃ বাট্‌লিওয়ালার চিঠি। এ প্রসঙ্গে বরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন শোনা যাক :

'Batlivala added that Joshi had, as General Secretary of the Party, written a letter in which he offered 'unconditional help' to the then Government of India and the Army G. H. Q. to fight the 1942 underground work and the Azad Hind Fouz (I. N. A.) of Subhas Chandra Bose, even to the point of getting them arrested.

These men were characterised by Joshi in his letter as 'traitors and fifth columnists'. Joshi's letter also revealed that C. P. I. was receiving financial aid from the Government, had a secret pact with Muslim League, and was undermining Congress activity in various ways.'

[History of Freedom Movement : P.—680 : Vol.—III]

আরো প্রমাণ তাদেরই নিজস্ব পত্র-পত্রিকাগুলি। আগাগোড়াই তো সেগুলো আগস্ট-আন্দোলন, তথা সুভাষ-বিরোধিতায় ভরা। সুভাষের বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন কুৎসা প্রচার, নানাবিধ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ, কিছুই তো বাদ নেই সেখানে।

কমিউনিস্ট পার্টির সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, সে প্রশ্ন আমি তুলব না, মল্লিকা। তবে একথা ঠিক যে, সেদিনের সেই সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তী কালে তাদের মূল্য দিতে হয়েছিল প্রচুর। আজও বোধহয় সেই মূল্য দেবার পালা শেষ হয়নি।

কিন্তু যদি উল্টোটা হত?

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী অধিবেশনে শুধু কংগ্রেসই সুভাষের বিরোধিতা করেনি মল্লিকা, সোস্যালিস্ট পার্টিও করেছিল। সেই সোস্যালিস্ট পার্টিকে এবার দেখা গেল সংগ্রামের একেবারে পুরোভাগে।

আর কমিউনিস্ট পার্টি! সত্যি বলতে কি, ফরোয়ার্ড ব্লকের কথা বাদ দিলে সেদিন সুভাষের এতবড় সমর্থক আর কোন দলই বুঝি ছিল না।

'সুভাষকে দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি করা হোক'— এ দাবীও প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেই।

সেই সুভাষ এখন আর তাদের বন্ধু নন, শত্রু। ইংরেজকেও এখন আর সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর পর্যায়ে ফেলা চলে না, কারণ, তারা এখন রাশিয়ার বন্ধু।

কিন্তু যদি তা না হত? যদি বিরোধিতার পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টিকেও সেদিন সংগ্রামের পুরোভাগে দেখা যেত? আজ তাহলে কমিউনিস্ট পার্টির চেহারা পালটে যেত না কি? পালটে যেত না কি গোটা ভারতবর্ষের চেহারা?

তবে সুভাষ-বিরোধিতার জন্য শুধু একপক্ষকে দায়ী করলে চলবে না, মল্লিকা। এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই-ই প্রায় সমান।

কি পরিস্থিতি ছিল সেদিন ভারতবর্ষের? একদিকে কানের কাছে অষ্টপ্রহর বেজে চলেছে, সুভাষ বোস ভ্রান্ত। অপরিণামদর্শী। ফ্যাসিস্ট। 'I cannot accept but must oppose.'

অন্যদিকে সুভাষ দেশদ্রোহী। হিটলার-তোজোর হাতের পুতুল। কুইস্‌লিং।

একমাত্র ব্যতিক্রম আগস্ট-বিপ্লবের প্রধান নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ।

জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন পলাতক। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সেই পলাতক জীবন থেকেই তিনি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করলেন জাতির উদ্দেশ্যে।

না, সুভাষ কুইস্‌লিং নন। তাঁকে আমরা চিনি। দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এমন কাজ তিনি কখনোই করতে পারেন না।

'It is easy to denounce Subhas as a Quisling. Those who are themselves quislings of Britain find it easiest to denounce him. But nationalist India know him as a fervent patriot and as one who has always been in the forefront of his country's fight for freedom. It is inconceivable that he should ever be ready to sell his country.

...it is clear that he has premitted himself to accept aid from the enemies of his country's enemies in accordance with an age-old political maxim...older than Machiavelli and older than Kautilya.

In thus accepting help from a third party he may be deceived in the end, but there can be no question as to the honesty of his purpose and the scale of his resourcefulness.' [Rebel India : P.—232-233]

মল্লিকা, এই হল সেদিনকার পরিস্থিতি। এ পরিপ্রেক্ষিতে কেবল মাত্র কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করলে সেক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ করা হবে না কি ?

কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষ-বিরোধিতা করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু কংগ্রেস !

আজ যতই অস্বীকার করুক না কেন, সেদিন এই কংগ্রেসই কি খুব একটা পিছিয়ে ছিল সুভাষ-বিরোধিতার ব্যাপারে ? তফাত এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯৪২ সালে, আর কংগ্রেস শুরু করেছিল ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর থেকেই।

সামান্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি, শোন।

সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল : সুভাষ বোস ফিরে এলে আমরা তাকে বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা করব।

আর কংগ্রেস! কংগ্রেসই কি সেদিন তাঁকে রুখতে চায়নি খোলা তরবারী দিয়ে?

তফাতটা কোথায় বলতে পার মল্লিকা? যুক্তি-তর্ক দিয়ে একবার বুঝিয়ে দিতে পার আমাকে?

সেদিনের সেই সুভাষ-বিরোধিতার জন্য কম মূল্য দিতে হয়নি কমিউনিস্ট পার্টিকে।

এমন কি, এখনও নির্বাচনের প্রাক্কালে বিরোধী পক্ষের প্রতিটি বক্তার কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে ওঠে সেই একই অভিযোগ। কমিউনিস্টদের আপনারা চিনে রাখুন। মনে রাখবেন, ওরাই সেদিন আমাদের নেতাজীকে বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা করতে চেয়েছিল।

আর কংগ্রেস!

না, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন প্রশ্ন নেই। কোন অভিযোগও নেই। বোধহয় অহিংস মতে তরবারীটা বুলেটের মতো ততটা দোষণীয় নয় বলেই।

আজ কমিউনিস্ট পার্টির ভুল ভেঙেছে। প্রমাণ, তাদের একাংশের অবিসম্বাদী নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসুর স্বীকৃতি। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে আমি তুলে দিচ্ছি :

নেতাজী ও কমিউনিস্ট পার্টি

'নেতাজী সম্পর্কে আমরা, কমিউনিস্টরা অতীতে যে-সব কথা বলেছিলাম, তা ভুল। আমরা আজ আমাদের সে ভুল স্বীকার করছি। কারও পদানত হয়ে থাকবার জন্য নেতাজী কখনও কারও সাহায্য নেননি।'

বুধবার কলিকাতায় নেতাজী প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদদের ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রের প্রদর্শনীর এক প্যাভেলিয়নের উদ্বোধন করে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একথা বলেন।

নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রীবসু বলেন, 'নেতাজী জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন ঠিকই, জাপানের উদ্দেশ্যও হয়তো খারাপ ছিল, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া নেতাজীর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষ করে তাঁর মতো সংগ্রামী নেতা কখনও অন্যরকম ভাবতে পারেন না।'

শ্রীবসু আরও বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গান্ধীজীর অহিংসার দান যেমন আছে, তেমনি আছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট দান। নেতাজীর প্রেরণায় পরবর্তী কালে নৌ, পুলিশ ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেতাজীর অস্ত্রের আঘাতের জন্যই ইংরেজকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছে।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৯-১-৭০]

এ খবর উনত্রিশে জানুয়ারির। পরদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবসু কি বলেছিলেন, তাও এখানে আমি তুলে দিচ্ছি সংবাদ-পত্রের পাতা থেকে :

'আমাদের পার্টি জাপানকে সাম্রাজ্যবাদী বলে নিন্দা করে। নেতাজী সম্পর্কে ভুল করে কমিনিউস্টরা একসময়ে 'কুইস্‌লিং' অপবাদকে সমর্থন করেছিল। নেতাজীর মতো দেশপ্রেমিককে কখনই 'কুইস্‌লিং' বলা যায় না।'

নিঃসন্দেহে শ্রীযুক্ত বসুর এই স্বীকৃতি প্রশংসাযোগ্য। রাজনীতিতে বিভিন্ন মতামত থাকবেই। সেদিনও ছিল, আজও আছে, পরেও থাকবে। তা বলে ভুল করে সেকথা স্বীকার করার মতো সৎ-সাহস ক'জনের থাকে ?

কিন্তু কংগ্রেস ?

কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করেছে। দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে তার জন্য মূল্য দিয়েছে। আজ ভুলও স্বীকার করেছে।

কংগ্রেস স্বীকার করেছে কি? এই দীর্ঘ একত্রিশ বছরের মধ্যে একবারও তারা কোথাও বলেছে কি যে—'নেতাজীর ব্যাপারে সেদিন আমরা ভুল করেছিলাম?'

মল্লিকা, আমরা সাধারণ মানুষ। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ কোনদিনই আমরা বুঝিনে। তবে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এটুকু নিশ্চয়ই বুঝি যে, রোজ একটার পর একটা বিবৃতি দেওয়াটাকেই যখন স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পন্থা বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, তখন সারা ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র লোক, যিনি সেদিন কোন কিছুর পরোয়া না করে দুর্বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সত্যিকারের ক্ষত্রিয়ের মতো।

সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কি হবে, কেউ তা বলতে পারে না। তবু সব কিছু উপেক্ষা করে নিজের লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

কোন বাধাকেই বাধা বলে মানেননি। গ্রাহ্যই করেননি কোন কিছু। লক্ষ্য একটাই। সে লক্ষ্য হল, যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করা।

বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। যদিও পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। সেই আধখানাই। তবু তো স্বাধীনতা!

সারা দেশ জুড়ে সেদিন উৎসবের বন্যা। ছোট-বড় ধনী-গরীব সবাই সেদিন আনন্দে ভরপুর। সবার চোখে-মুখে নতুন দিনের আশা। নতুন দিনের স্বপ্ন। আমরা স্বাধীন! আমরা মুক্ত! দাসত্বের অভিশাপ থেকে আজ আমরা মুক্তি পেয়েছি।

সে উৎসবে দেখা মেলেনি শুধু সেই মানুষটির—যাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল—'অখণ্ড ভারত'।

বিশ্রাম ছিল না সেদিন দিল্লীর আকাশবাণী প্রতিষ্ঠানের। যাঁদের নেতৃত্বের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা এসেছে, তাঁদের নামে সেদিন কত প্রশস্তি! কত ঋণ স্বীকার! কত শ্রদ্ধা নিবেদন!

একবারও কি সেদিন আকাশবাণী থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সুভাষের নামটা?

যে সুভাষ এবং তাঁর আই. এন. এ.-র গৌরবকে মূলধন করে মাত্র কিছুদিন আগে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল, স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে সেই কংগ্রেস কি ভুলেও সেদিন একবার উল্লেখ করেছিল তাদের কথা?

না, করেনি। ভুলে নয়, ইচ্ছা করেই করেনি। কারণ—আত্মপ্রচার। অর্থাৎ, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কেউ যদি কোন মূল্য দিয়ে থাকে তো আমরা অহিংসপন্থীরাই দিয়েছি। সোজা কথায়—স্বাধীনতা সংগ্রামে কার কি অবদান সেটা বড় কথা নয়, পথটাই বড়।

যদিও কংগ্রেস বলতে শুধুমাত্র নির্ভেজাল অহিংসপন্থীদেরই বোঝায় না। প্রায় প্রতিটি বামপন্থী দলই সেদিন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমন কি বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলিও সেদিন কংগ্রেসের বাইরে ছিল না। তারাও কেউ কম মূল্য দেয়নি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য।

কিন্তু দিলে কি হবে? এতদিন নিশ্চয়ই তোমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। আজ কর্যোদ্ধার হয়ে গেছে। সুতরাং এবার তোমরা ভালোয় ভালোয় পথ দেখ।

কথাটা আমার নয় মল্লিকা, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদারের।

১৯৬৬ সালের ২৩শে জানুয়ারি সুভাষের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এ প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, শোন:

'What I have not been able to forget to this day,

was that the name of Subhas Chandra Bose was not mentioned even once. This, I think, was not accidental. It was sought to be conveyed that independence had been won through "non-violence" and that Netaji and the I.N.A. had not contributed any thing at all to it.'

কতখানি মর্মান্তিক দুঃখে যে একজন দল-নিরপেক্ষ বরেণ্য ঐতিহাসিককে একথা বলতে হয়েছে, ভাবতে পার একবার ?

সুভাষ-বিরোধিতার ব্যাপারে সেদিন কমিউনিস্ট পার্টিই অগ্রণী ছিল, একথা সত্য। কিন্তু এগুলোর জন্যও কি কমিউনিস্ট পার্টিই দায়ী ?

নইলে আজ সুভাষ ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা সব কিছুরই আড়ালে। কে তাঁকে স্বীকৃতি দিল, বা কে দিল না, তাতে তাঁর কিছুই এসে-যায় না। তা সত্ত্বেও কেন এই চিত্ত-দারিদ্র্য ?

আজ ভুল স্বীকার করে জ্যোতি বসু যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, কংগ্রেসের কাছ থেকেও কি দেশের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ তা আশা করতে পারে না ?

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এখানেই থাক, মল্লিকা। চলো আমরা আবার ফিরে যাই আগস্ট-বিপ্লবের সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়ে।

উল্লেখযোগ্য যে, 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেসের হলেও আন্দোলন পরিচালনার কৃতিত্ব তাদের নয়। সে দায়িত্ব সেদিন প্রধানতঃ বহন করেছিল সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলিই। যাক, পরের কাহিনী শোন।

ইতিহাস তখন এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। একটি একটি করে ঘটনা ঘটছে, আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

২০শে আগস্ট সরকারী কোষাগার আর অস্ত্রাগার দখল করার পরে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলাতে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হল ছিটু পাণ্ডের নেতৃত্বে।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার বিপ্লবী তরুণের কণ্ঠে রব উঠল—স্বাধীন ভারত কী জয়! ভারতমাতা কী জয়! ইংরেজ ভারত ছাড়! তোমাদের আমরা মানি নে, মানব না।

বিহারের উত্তর-ভাগলপুরেও স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল অনুরূপ ভাবে। তাদের কণ্ঠেও সেই একই শপথ। কুইট ইণ্ডিয়া! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

উড়িষ্যাও পিছিয়ে নেই। কোরাপুট জেলায় ৬ জন নিহত হল পুলিশের গুলিতে। আহত শতাধিক।

তারপরই শুরু হল পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, আরো ২৫ জন নিহত হল গুলির আঘাতে। লাঠির আঘাতে নিহত ২ জন। তাছাড়া আরো ৫০ জনকে প্রাণ দিতে হল কোরাপুট জেলের অভ্যন্তরে। একজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। ৩২ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ভদ্রক রেল-স্টেশনে নিহত হল ৮ জন। ফলে, পুরী প্যাসেঞ্জারের সব ক'টা বগিই পুড়ে ছাই হয়ে গেল জনতার রোষে। সেই সঙ্গে ভদ্রক ছাড়াও আরো চারটি রেল-স্টেশন।

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন 'পত্রী সরকার'।

নানা পাতিলের নেতৃত্বে এই পত্রী সরকার যেভাবে দীর্ঘদিন ব্যাপী ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

নানা পাতিল ছাড়াও এ ব্যাপারে পাণ্ডু মাস্টার, কিষাণবীর, আপ্পা

মাস্টার, শ্রীনাথ লাল, ডাঃ উত্তম রাও প্রমুখ বিপ্লবী নায়কদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবার স্বাধীন পত্রী সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কে কোন্ বিভাগ পরিচালনা করতেন শোন:

সর্বাধিনায়ক—নানা পাতিল। ডিক্টেটর—পাণ্ডু মাস্টার। গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার কর্ণধার—শ্রীনাথ লাল। গঠনমূলক পরীক্ষা ও প্রচেষ্টা—ডাঃ উত্তম রাও। তুফান সেনা পরিচালক—-আপ্পা মাস্টার।

হঠাৎ একদিন ডিক্টেটর পাণ্ডু মাস্টার ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের হাতে। রাখা হল তাঁকে যারবেদা জেলে। এবার বিচার।

কিন্তু কোথায় পাণ্ডু মাস্টার!

অদ্ভুত কৌশলে জেল থেকে পালিয়ে ততক্ষণে তিনি পৌঁছে গেছেন নিজের এলাকায়। কার সাধ্য তখন তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে!

ওখানে গেলে পত্রী সরকারের অন্যতম নায়ক আপ্পা মাস্টারের দুর্ধর্ষ তুফান সেনা তাদের দু টুকরো করে কেটে জলে ভাসিয়ে দেবে না! তুফান সেনার কাজই যে পত্রী সরকারের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

তরুণ বিপ্লবীদের দ্বারা গঠিত এই তুফান সেনা অল্প দিনের মধ্যেই যেভাবে তাদের এলাকায় কালোবাজার, বাল্য-বিবাহ, পণপ্রথা, সুরাপান এবং চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি নির্মূল করে দিয়েছিল, স্বাধীন ভারতেই বা তার তুলনা কোথায়?

পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দিল মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা জেলার অস্তি ও চিমুরে।

শুরু হয়েছিল ১৬ই আগস্ট। অস্তি ও চিমুরের হাজার হাজার বিপ্লবী জনতার কণ্ঠে সেদিন রব উঠল—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

প্রথমেই আক্রমণ করা হল পুলিশ থানা। তোমাদের কোন আইন আমরা মানি নে, সুতরাং থানা এখন তোমাদের নয়, আমাদের। ভাল চাও তো সরে দাঁড়াও।

থানার সাব-ইন্সপেক্টর ও সাতজন পুলিশ চেষ্টা করল বাধা দিতে। কিন্তু সে বাধা আর কতক্ষণ? ফলে, সেই সাব-ইন্সপেক্টর ও চারজন পুলিশকে প্রাণ দিতে হল উত্তেজিত জনতার হাতে।

সাব-ইন্সপেক্টরকে মারা হল থান ইট দিয়ে পিটিয়ে। আর পুলিশদের হত্যা করা হল গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে।

থানার পরে ডাকবাংলো। ওখানে স্বয়ং এস. ডি. ও. রয়েছে। ধরো ওকে। কাজেও তাই হল। ফলে, এস. ডি. ও. এবং সেই সঙ্গে একজন নায়েব তহশীলদারকে প্রাণ দিতে হল ঘটনাস্থলেই।

তারপর চিমুর থানা। সেখানেও একজন পুলিস ইন্সপেক্টর ও দুজন কনস্টেবলকে প্রাণ দিতে হল উত্তেজিত জনতার হাতে।

একদিকে রাইফেল ও মেশিনগানধারী বিমান-বহর সহ পুলিশ ও মিলিটারী, অন্যদিকে বিপ্লবী জনতা।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। তাই শেষ পর্যন্ত ডাকা হল বোমারু বিমান-বহরকে।

দলে দলে সবাই উড়ে যাও আকাশে পাখা মেলে। কে-কি-কেন-কি বৃত্তান্ত, কোন কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। যেখানে জনতা দেখবে, সেখানেই বোমা-বর্ষণ করবে। তারপর যা হয় পরে দেখা যাবে।

কাজেও তাই করা হল। মোট পাঁচ জায়গায় জনতার ওপর বোমা-বর্ষণ করা হল বিমান থেকে। সাহেবগঞ্জ, মুঙ্গের, রাণাঘাট, তালচের আর পাটনার কাছে একটি রেল-লাইনের ধারে।

কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

অযুত কণ্ঠের সেই বজ্র-হুঙ্কার একদিন গিয়ে আছড়ে পড়ল সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! আর অহিংসা নয়। এবার আমাদের সোজা হিসেব, আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার।

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হয়ে উঠলেন সুভাষ।

এই তো চাই! এই তো হওয়া উচিত! ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। অশেষ মূল্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়।

এই তো তার অপূর্ব সুযোগ! সুতরাং আরো বেতার-কেন্দ্র চাই। দেশের সংগ্রামী জনগণকে উপযুক্ত নির্দেশ পাঠাতে হবে। কঠোর সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে। এ সময়ে আরো অনেক বেতার-কেন্দ্র প্রয়োজন।

এতকাল সুভাষের যা কিছু বক্তব্য, সবই প্রচার করা হত আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে।

এবার খোলা হল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও। এর প্রধান কাজ হল, অত্যন্ত চাতুর্য সহকারে ভারতীয় সংবাদ প্রচার করা। কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, এ সংবাদ বাইরে থেকে প্রচারিত হচ্ছে। শুনে মনে হবে, যেন দেশেরই কোথাও অবস্থিত কোন গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে জনসাধারণকে।

এই কেন্দ্রের সাঙ্কেতিক নাম হল—'কঙ্কোরডিয়া-সি'।

কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন ডঃ গিরিজা মুখার্জী। সঙ্গে রইলেন আরো দুজন। বিক্রম জহুরী ও সুরেশচন্দ্র।

এই কেন্দ্রের মাধ্যমে খবর প্রচার করা হত হুইজেন থেকে শর্টওয়েভে ১৯.৭১ মিটারে। সেই একই খবর আবার প্রচার করা হত পডিব্র্যাড থেকে ২০.৩৪ মিটারে।

এখানেই থামলেন না সুভাষ। এবার গড়ে তুললেন আজাদ মুসলীম রেডিও। কারণ, মুসলীম-প্রধান জিন্না।

সব কিছুর পেছনেই ইসলাম বিপন্নের জিগির তোলা জিন্না-সাহেবের চিরাচরিত স্বভাব।

তার কারণও ছিল। কূটনীতিতে তিনি অদ্বিতীয়। একথা তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ও হিন্দু-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে হলে এর চাইতে সহজ

পন্থা আর কিছুই নেই। কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে শুধু এইটুকু মূলধন নিয়েই যদি কার্যোদ্ধার করা যায়, তো মন্দ কি!

বলা বাহুল্য যে, এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

আগস্ট-আন্দোলন শুরু হল ৯ই আগস্ট। ১৬ই থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত বম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনেই জিন্নাসাহেব ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা।

আগস্ট-আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধেও। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার নতুন আবিষ্কার।

১৫ই নভেম্বর এই আবিষ্কারের কথা তিনি ঘোষণা করলেন জলন্ধর থেকে।

যে-কোন বুদ্ধিমান লোকই বুঝতে পারবে যে, হিন্দু নেতা মিঃ গান্ধীর এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল মোট দুটি। এক, যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত ইংরেজকে ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করা; দুই, সেই দাবীর জোরে গোটা মুসলীম সমাজকে ধ্বংস করা। সরকারের যদি সত্যিই কোন শুভ অভিপ্রায় থাকে, তবে অনায়াসেই তারা এসময়ে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের বন্ধুত্ব পেতে পারেন। আমরা প্রস্তুত।

কিছুই জানতে বাকি নেই সুভাষের,। তাই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তিনি গড়ে তুললেন আজাদ মুসলীম রেডিও।

জিন্নার এই অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে। সমস্ত মুসলীম সমাজকে বোঝাতে হবে যে, তোমরা কেউ এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ো না। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। দেশের এই মুক্তি সংগ্রামে সবাই তোমরা যোগ দাও দলে দলে। স্বাধীনতা শুধু হিন্দুদের নয়, শুধু মুসলমানদেরও নয়, গোটা ভারতবাসীর। সুতরাং, সবাই তোমরা এগিয়ে এসে হাতে হাত মেলাও।

আজাদ মুসলীম রেডিওর সাঙ্কেতিক নাম হল—'কঙ্কোরডিয়া-এম'। পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন হায়দ্রাবাদের মুসলীম তরুণ সুলতান। অত্যন্ত চৌকস ছেলে। বিশেষ করে, উর্দু ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

আজাদ মুসলীম রেডিওর মাধ্যমে খবর বলা হত তুইজেন থেকে ১৯.৭১ ওয়েভ লেংথে। সময়—বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত।

আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে মোট ক'টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করা হত, জানো মল্লিকা?

মোট ছ'টি ভাষায়। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, ফার্সী, তামিল আর তেলেগু।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও থেকে চারটে ভাষায়। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী আর তামিল।

আর আজাদ মুসলীম রেডিও থেকে ভারতীয় মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হত কেবলমাত্র উর্দু ভাষায়। আলোচনা করতেন সুলতান নিজেই। অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি।

১৯৪২ সাল। আগস্ট মাস।

প্রতিটি কর্মী তখন অস্থির, চঞ্চল। শুধু কাজ—কাজ আর কাজ! ভারতে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত প্রতিটি খবর এখন নিখুঁতভাবে ধরতে হবে। তারপর আসল খবরটুকু আরো বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে পৃথিবীর সর্বত্র। সেই সঙ্গে জানাতে হবে ভারতবাসীর সঙ্কল্পের কথা। ইংরেজ ভারত ছাড়! কুইট ইণ্ডিয়া! ডু অর ডাই!

ঐতিহাসিক ১৯৪২।

বিক্ষোভের আগুনে সারা ভারত তখন জ্বলছে। গর্জে উঠেছে

আসমুদ্র-হিমাচল—ইংরেজ ভারত ছাড়! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

পিঠ পেতে মার খেয়ে অহিংসার গুণগান গাইতে আর আমরা রাজী নই। এবার আমাদের সোজা হিসেব—আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার।

৩১শে আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে নির্দেশ ভেসে এল সুদূর বার্লিন থেকে:

'আমি সুভাষ বলছি···

বন্ধুগণ, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে। দাবাগ্নির মতোই এই সংগ্রাম এখন ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে পল্লী অঞ্চলে।

আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী বাইরের জগৎকে জানানো খুবই কষ্টকর ছিল।

আজ আর এটা কোন সমস্যাই নয়। ভারতে আজ কি ঘটছে, তার সমস্ত ইতিহাস বাইরের পৃথিবীকে জানিয়ে সবার কাছে সহানুভূতি ও সাহায্য সংগ্রহ করার কাজে আমি নিজেকে ব্রতী করেছি।

আপনারা যদি নিজের চোখে দেখতেন বা শুনতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শত্রুদের কাছে ভারত আজ কতখানি সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা যত বেশি আত্মবলি দেব, যত বেশি উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করব, পৃথিবীর সামনে ততই আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

ইংল্যাণ্ডের আজ সত্যিই দুর্দিন। তাদের দেশে যে-সব আমেরিকানরা রয়েছেন, তাঁদের ওপর ব্রিটিশ আইন প্রযোজ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মার্কিন সৈন্যরাও আজ আর ব্রিটিশ সেনানায়কদের অধীনে যুদ্ধ

করতে রাজী নয়। ফলে, ব্রিটিশ এবং তার সাম্রাজ্য আজ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নয়া সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হতে চলেছে।

এর কোনটাই আমাদের কাম্য নয়। তাই নতুন এবং পুরানো—এই দুটি সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

আজ থেকে সাতাশ বছর আগে আমেরিকার এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে সুভাষ যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা কি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়নি, মল্লিকা? কি মনে হয় আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে? যাক, পরের অংশ শোন:

'সংগ্রামের শেষের দিকে আমাদের দুঃখ ও বেদনার অন্ত থাকবে না। অত্যাচার, উৎপীড়ন, হত্যাকাণ্ড সব কিছুই চলবে তখন বাধাহীন ভাবে। স্বাধীনতার জন্য এ মূল্য আমাদের দিতেই হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, অন্তিম সময়ে ব্রিটিশ একটা মরণ কামড় দেবে। তবে সে কামড় মুমূর্ষু সিংহের, সুতরাং তাতে আমরা মরব না।

নেতৃবৃন্দ কারাগারে, তা বলে ভয় পাবার বা হতাশ হবার মতো কিছু নেই। বরং তাঁদের দুঃখ, বেদনা ও নির্যাতনের ইতিহাস সমস্ত জাতির কাছে প্রেরণা নিয়ে আসবে।

এই সংকট-মুহূর্তে ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের বর্তমান যুদ্ধের নীতি। আমাদের চূড়ান্ত জয় আসবে কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টার মধ্য দিয়েই।

ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকার—উভয়ের গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা সত্ত্বেও আমি একাধিক উপায়ে আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছি। তার প্রমাণও আপনারা গত কয়েক মাসে বহু ভাবে পেয়েছেন।

আজাদ হিন্দ রেডিও এবং আমার সম্বন্ধে ভারত সরকারের কয়েকটি গোপন রিপোর্ট আমি দেখেছি। ওগুলি দেখে সত্যিই আমি না হেসে পারিনি।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, আমার সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, তাহলে আমি নাচার।

তবে একদিন যে আমার সঙ্গে তাদের মরণ-বাঁচনের চূড়ান্ত লড়াই হবেই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভারতবর্ষে আজ যে আন্দোলন চলছে তাকে মোটামুটি অহিংস গেরিলা-যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এই গেরিলা-যুদ্ধে আমাদের ছত্রভঙ্গের রীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ—আমাদের কার্যাবলী এমন ভাবে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে পুলিশ বা মিলিটারী এক জায়গায় তাদের আক্রমণ সংহত করতে না পারে। গভর্ণমেণ্ট যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে যে, পরবর্তী আঘাত কোন্‌দিক থেকে আসবে।

গেরিলা-যুদ্ধের রাজনীতি ও কায়দা-কানুন সম্বন্ধে এখানে আমি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছি। তাই আপনাদের আমি এমন কিছু পরামর্শ দিতে পারি, যা অনুসরণ করলে আপনারা নিশ্চয়ই এই সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবেন।

গেরিলা-যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হবে দুটি। এক : সমর-প্রচেষ্টা ধ্বংস করা। আর : ব্রিটিশ শাসন অচল করে তোলা। তাছাড়া :

১। গভর্ণমেণ্টকে সব রকম ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

২। কারখানার শ্রমিকদের অবস্থান ধর্মঘট করতে হবে। অথবা ইচ্ছে করে কাজে ঢিলে দিতে হবে। সেই সঙ্গে নাট, বল্টু ইত্যাদি খুলে ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে উৎপাদন ব্যাহত করতে হবে।

৩। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক কার্য চালাবার জন্য ছাত্রদের গোপনে গেরিলা-বাহিনী গঠন করতে হবে।

৪। গুপ্ত সংবাদ বহন এবং সংগ্রামী পলাতকদের আশ্রয় দেবার কাজে মেয়েদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে।

৫। যে-সব সরকারী কর্মচারী সংগ্রামে সহায়তা করতে ইচ্ছুক, তাদের পদত্যাগ না করে ভেতর থেকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সংক্রান্ত গোপনীয়

খবর বাইরে পাচার করতে হবে। তাছাড়া জনসাধারণকে আমি এই কাজগুলি করতে পরামর্শ দিচ্ছি ঃ

(ক) ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ও সরকারী দোকান-পাট পোড়ানো।

(খ) ব্রিটিশ ও তাদের সমর্থকদের বয়কট করা।

(গ) সরকারী নিষেধ অমান্য করে জনসভা ও শোভাযাত্রা করা।

(ঘ) গোপন প্রচার-পত্র ছড়ানো ও গুপ্ত বেতার-ঘাঁটি স্থাপন।

(ঙ) ব্রিটিশ কর্মচারীদের গৃহে অভিযান করে তাদের ভারত ত্যাগ করতে বলা।

(চ) শোভাযাত্রা করে সরকারী অফিস, দপ্তরখানা ও আদালত গৃহে প্রবেশ করে শাসন ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা।

(ছ) যে সমস্ত জেল-কর্মচারী সংগ্রামী জনসাধারণের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(জ) যেসব রাস্তায় পুলিশ বা মিলিটারীর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, সেখানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা।

(ঝ) যেসব ফ্যাক্টরিতে সামরিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, সেগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া।

(ঞ) ডাক, তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা বার বার বিচ্ছিন্ন করা।

(ট) যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহের সম্ভাবনা দেখলে রেলপথ, বাস ও ট্রাম চলাচল ব্যাহত করা।

(ঠ) থানা, রেল-স্টেশন ও জেলখানা ধ্বংস করা।

বন্ধুগণ, আমি নিঃসন্দেহ যে, এই কর্মসূচী কার্যে পরিণত করতে পারলে শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়বেই।

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গেরিলা-যুদ্ধে কৃষকদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। আমি লক্ষ্য করে খুশি হয়েছি যে, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি কয়েকটি প্রদেশে কৃষকরা ইতিমধ্যেই সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমরা স্বরাজ চাই জনসাধারণের জন্য। শ্রমিকদের জন্য। কৃষকদের জন্য। সুতরাং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যখন তৈরি হবে, তখন শ্রমিক ও কৃষকদের কর্তব্য জাতীয় বাহিনীর পুরোভাগে এসে দাঁড়ানো। যাঁরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করবেন, তাঁরাই লাভ করবেন ক্ষমতা ও দায়িত্ব, তাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

সব শেষে আমি বলতে চাই যে, আমাদের এই অভিযান প্রয়োজন হলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চালিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে আপনাদেরও সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ও উৎপীড়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রভাতের পূর্ব মুহূর্তটিই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। আপনাদের বিপ্লবের বাণী হোক 'হয় এখন, নয়তো কখনো না।' ডু অর ডাই!

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! জয় হিন্দ!'

ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

সারা ভারত তখন জ্বলছে বিক্ষোভের আগুনে। বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বম্বে, নাগপুর, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, আসাম—কেউ পিছিয়ে নেই। প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে সেই একই শপথ—ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

আসামে সংগ্রাম শুরু হল ১৫ই আগস্ট।

প্রথম সূত্রপাত গোয়ালপাড়াতে। কোনরকম সতর্ক না করে হঠাৎ সেদিন পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল এক ছাত্র মিছিলের ওপর। তারপরই লাঠি ও সঙ্গীন সহযোগে শুরু হল পৈশাচিক আক্রমণ।

ফলে, মোট ৯ জন ছাত্রকে সেদিন গুরুতর ভাবে আহত হতে হল পুলিশের হাতে।

শুরু হল পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, দেখতে দেখতেই পুলিশের গুলি-বর্ষণ উপেক্ষা করে দরং জেলার বিভিন্ন থানাগুলি চলে গেল

জনতার হাতে। মুখে তাদের সেই একই শপথ। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

২০শে আগস্ট হঠাৎ একদল সৈন্য অকারণে আক্রমণ চালাল বেবেজীয়ার কাছে ফুলগুরি গাঁয়ের নিরীহ অধিবাসীদের ওপরে। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ব্রিটিশ সিংহ এখনো মরে যায়নি। ভাল চাও তো এখনো সাবধান! নইলে কাউকেই বাঁচতে হবে না।

নিহত হল দুজন। আহত আরো কয়েকজন। তা বলে এখানেই কিন্তু শেষ হল না। আবার আক্রমণ চালানো হল গভীর রাত্রে। তারপরই অসহায় নরনারী ও শিশুদের ওপর শুরু হল অকথ্য নির্যাতন।

পরদিন ভোরে গাঁয়ের প্রায় চারশো নরনারীকে গরু-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল ৯ মাইল দূরবর্তী থানাতে।

সদ্যপ্রসূতি নারী। কোলে মাত্র তিন দিনের শিশু। তবু রেহাই নেই। যেতেই হবে তোমাকে থানাতে। নইলে—

ফলে, যা হবার তাই হল। মাঝপথেই শিশুটি মায়ের কোল খালি করে চলে গেল অন্য এক জগতে, যেখানে গেলে আর কেউ কোনদিন ফিরে আসে না।

প্রতিশোধ চাই!

নতুন করে শপথ নিলেন আসামের বিপ্লবী তরুণগণ। আসামের মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমরা আমাদের ওপর জুলুম চালাবে, তা আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। তোমাদের সমস্ত সমর-প্রচেষ্টা আমরা ব্যর্থ করে দেব। ভাল করে তাকিয়ে দেখ যে, আমরা তা পারি কি না!

কাজেও তাই করা হল। হঠাৎ সেদিন হাজার হাজার বিপ্লবী তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়লেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিমান-ঘাঁটি সরভোগের বরনগরের ওপর। তারপরই সব কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে একাকার। এমন কি, অফিসারদের বাংলো ও কোয়ার্টারগুলি পর্যন্ত রেহাই পেল না উন্মত্ত জনতার হাত থেকে।

১৬ই সেপ্টেম্বর কিছু-সংখ্যক নরনারী জড় হল নওগাঁ থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী বরহমপুরে। হাতে তাদের জাতীয় পতাকা। মুখে স্লোগান—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

রে-রে করে ছুটে এল পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী। এসব চলবে না। অবিলম্বে বন্ধ কর এসব।

সামনেই দাঁড়িয়ে কিশোরী রত্নমালা এবং অন্যান্য মহিলাবৃন্দ। হাতে তাঁদের জাতীয় পতাকা। কিছুতেই তাঁরা সেই পতাকা ত্যাগ করতে রাজী নন।

হোয়াট! এতবড় সাহস! সহসা এক ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল কিশোরী রত্নমালাকে।

বটে! ফুঁসে উঠলেন রত্নমালার বৃদ্ধা ঠাকুমা ভোগেশ্বরী ফুকননী। তারপরই তিনি হাতের পতাকার দণ্ড দিয়ে আঘাত করে বসলেন সেই ব্রিটিশ কম্যাণ্ডারকে।

ইয়োরোপ ও এশিয়া ভূখণ্ডের প্রতিটি রণাঙ্গনে মার খেলেও নিরস্ত্র বৃদ্ধার ওপর বীরত্ব দেখাতে কিন্তু এতটুকুও দেরি হল না শ্বেতাঙ্গ বীরপুঙ্গবের। ফলে, নিমেষেই বৃদ্ধার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অব্যর্থ গুলির আঘাতে।

ছুটে এসে মেয়েদের আড়াল করে দাঁড়ালেন বিপ্লবী তরুণদল।

এভাবে মেয়েদের নিগৃহীত হতে আমরা দেব না। প্রাণ যায় যাক, তবু নারীর মর্যাদা আমরা রক্ষা করবই।

ফলে, গুলির আঘাতে নিমেষে প্রাণ হারালেন দুই সহোদর ভাই বালুরাম ও থানুরাম, আর লক্ষীরাম নামে অন্য একটি তরুণ যুবক।

মৃত্যুর পূর্বে লক্ষীরাম তাঁর পকেটের ছ'টি পয়সা নিঃশব্দে তুলে দিলেন সহকর্মীদের হাতে। এই নাও ভাই। এ ছাড়া দেবার মতো আর কিছুই আমার নেই। এটাকে তোমরা কাজে লাগিও।

সামান্য ছ'টি পয়সা মল্লিকা! খুবই সামান্য। আজও সেগুলি

সংরক্ষিত রয়েছে আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে। সামান্য এই ছ'টি পয়সার মূল্য যে সত্যিই অসামান্য!

সামরিক দিক থেকে আসামের গুরুত্ব তখন অত্যন্ত বেশি।

সীমান্তের ঠিক ওপারেই দুর্ধর্ষ জাপ-বাহিনী। এপারেও তৎপরতার অন্ত নেই। রোজই দলে দলে সৈন্য এসে জড় হচ্ছে আসামের মাটিতে। যে করে হোক, জাপ-বাহিনীকে রুখতেই হবে।

রুখে দাঁড়ালেন বিপ্লবী তরুণ দল। সেনা বাহিনীকে ভাতে মারতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন এককণা খাদ্যশস্যও ওরা সংগ্রহ করতে না পারে।

কাজেও তাই করা হল। কোথায় খাবার! বাইরে থেকে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, দুধ, চাল, সব্জী—সব কিছু শহরে আসা বন্ধ। দেখি, তোমরা খাবার পাও কোথায়!

খাবারের সন্ধানে হন্যে হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে হানা দিল পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী। শীগগির বের কর খাবার। নইলে দেখে নেব।

ফলে, জোড়হাটে প্রায় পঞ্চাশ জনের অঙ্গহানি হল সারা জীবনের মতো।

একই অবস্থার সৃষ্টি হল তেওকারে। সেখানেও প্রায় পঁচিশ জনকে জখম করা হল সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে।

ঐতিহাসিক ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাণ দিলেন আসাম-গৌরব কুমারী কনকলতা।

হাজার হাজার নরনারীর কণ্ঠে সেদিন রব উঠল,—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! চলো ভাইসব গহপুর থানাতে। ঐ থানা এখন আমাদের।

সাবধান! বাধা দিল পুলিশ বাহিনী, আর এক পা এগুলেই গুলি করা হবে।

গুলি করবে! হাসলেন কনকলতা—বেশ, তাই কর। তবে আমাদের কাজ আমরা করবই। বলো ভাইসব, বন্দেমাতরম্!

দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! সঙ্গে সঙ্গে বীরাঙ্গনা কনকলতার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বন্দেমাতরম্! এবার এগিয়ে গেলেন মুকুন্দ কাকতি।

কনকলতার হাতের পতাকা নিজের হাতে তুলে নিয়ে দৃঢ় পায়ে তিনি এগিয়ে চললেন থানার দিকে। ফলে, তাঁকেও এবার শেষশয্যা নিতে হল শক্ত মাটির বুকে।

ততক্ষণে একদল বিপ্লবী তরুণ থানা-শীর্ষে জাতীয় পতাকা তুলে ধরেছেন সব কিছু উপেক্ষা করে। মুখে তাঁদের দুর্জয় সঙ্কল্প। কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! বন্দেমাতরম্!

একই দিনে আক্রান্ত হল ঢেকিয়াজুলি থানা। সেই একই দাবী। আমরা জাতীয় পতাকা তুলব এখানে।

ফলে, বারো বছরের স্বেচ্ছাসেবিকা ফুলেশ্বরী সহ নিহত হল মোট ২০ জন। আহতের সংখ্যা যে কত, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

এবার ছুটে এল মিলিটারী বাহিনী। কোথায় মিছিলকারীরা!

হদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বাজারের লোকদের লক্ষ্য করে শুরু হল বেপরোয়া গুলি-বর্ষণ।

কড়া হুকুম, জনতা দেখলেই গুলি চালাতে হবে। সে জনতা সত্যিই আন্দোলনকারী কিনা, তা ভেবে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং চালাও একতরফা। ফলে, নিহত হল আরো ১৬ জন। তার মধ্যে তিনজন মহিলা।

২১শে তারিখে এক প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করা হল তেজপুর শহরের টাউন ময়দানে। আমরা পুলিশ ও মিলিটারীর এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করার কোন অধিকার তাদের নেই।

শহরের প্রতিটি রাস্তা অবরোধ করে পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী ততক্ষণে প্রস্তুত।

না, ওসব প্রতিবাদ-ট্রতিবাদ চলবে না। কাউকে আজ যেতে দেওয়া হবে না টাউন ময়দানে। গেলে তক্ষুণি গুলি করা হবে।

তাই করা হল। ফলে, প্রায় শতাধিক লোককে সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হল টাউন ময়দানের মাটিতে।

২৫শে তারিখে মদন বর্মণ ও রাউতরাম দাস নামে দুটি ছাত্রকে প্রাণ হারাতে হল পাথরকুচি থানার দারোগাবাবুর গুলিতে।

তাঁরা নাকি জোলাহাট গাঁয়ে অনুষ্ঠিত সভা থেকে ফেরার পথে প্রকাশ্য রাস্তায় জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন। মারাত্মক অপরাধ সন্দেহ নেই! সুতরাং মৃত্যুদণ্ড তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য!

বন্দীদেরও রেহাই নেই। হঠাৎ একদিন জোড়হাট জেলে বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে জখম করা হল ১৮১ জন অসহায় বন্দীকে। দেখ আমাদের ক্ষমতা আছে কিনা! জার্মান বা জাপানীদের সঙ্গে না পারলেও নিরস্ত্র বন্দীদের শায়েস্তা করার মতো শক্তি আমাদের নিশ্চয়ই আছে!

পিঠ পেতে মার খাওয়া বিপ্লবীর ধর্ম নয়। তাঁদের নীতিই হল, আঘাতের বদলে আঘাত, মারের বদলে মার।

বিপ্লবী তরুণদের নিয়ে গঠিত আমাদের 'মৃত্যু বাহিনী' কিন্তু সেই পাল্টা-মার সেদিন কম দেয়নি, মল্লিকা।

আদালত-ভবন, রেললাইন, সরকারী ডাকবাংলো, পোস্ট-অফিস, পি-ডব্লিউ-ডি অফিস, সেনা-নিবাস, বিমান-ঘাঁটি কোন কিছুই সেদিন রেহাই পায়নি ধ্বংসের হাত থেকে।

চলন্ত ট্রেনকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছিল মোট ৬ বার।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল ২৬শে নভেম্বর। সেদিন সৈন্য-বোঝাই চলন্ত ট্রেনকে যেভাবে তাঁরা ধ্বংস করেছিলেন, দুঃসাহসিকতার ইতিহাসে সত্যিই তা অভিনব।

একবার নয়, বার বার। তার মধ্যে সরুপথার নামক স্থানে

সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বোঝাই মালগাড়ি ধ্বংস করার ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য।

জেলের অভ্যন্তরে তিলে তিলে প্রাণ দিলেন পার্বত্য জাতিভুক্ত বীর অহমকর্মী কমলা মিরি।

পুলিশের কঠোর নির্দেশ—কংগ্রেসের সঙ্গে কারো কোনরকম সম্পর্ক রাখা চলবে না।

রাজী হলেন না কমলা মিরি। কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব, বা না-রাখব, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে কোনরকম হুকুম মানতে আমি রাজী নই। ফলে, আট মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন কমলা মিরি। খুবই গুরুতর অসুস্থ। বাঁচবেন কিনা বলা শক্ত।

শুরু হল চিরাচরিত কূটনৈতিক চাল। বণ্ড লিখে দাও যে, আর কোনদিনও আন্দোলনে যোগ দেবে না, ব্যস, এক্ষুণি তোমাকে খালাস দিয়ে দিচ্ছি।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন কমলা মিরি। অসম্ভব! কোনরকম দাসখত্ দিয়ে মুক্তি পেতে আমি রাজী নই। তার চাইতে আমার মৃত্যু হোক।

তাই হল। মৃত্যুই তিনি বরণ করলেন তিল তিল করে, তবু এতটুকু মাথা নোয়ালেন না বিদেশী সরকারের কাছে।

অন্যতম নেতা কুশল কুঁয়র প্রাণ দিলেন ফাঁসিমঞ্চে।

যাবার আগে বলে গেলেন, 'মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। আমি ভাগ্যবান, তাই দেশের জন্য প্রাণ দেবার এই দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি। ভগবানের দেওয়া এই অশেষ করুণার দান আমি পরমানন্দে মাথা পেতে নিলাম। তোমরা থেমো না যেন। সংগ্রাম চালিয়ে যাও।'

জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, শ্রীমতী

অরুণা আসফ আলী প্রমুখ সোস্যালিস্ট নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে প্রতিটি সংগ্রামী তরুণ সেদিন অধীর, চঞ্চল।

অনেক মার আমরা খেয়েছি, আর নয়। এবার হয় মারব, নয়তো মরব। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

রূপকথার নায়িকা অরুণা আসফ আলী তখন কলকাতায়। মাথার দাম তাঁর ধার্য হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা।

হন্যে হয়ে শিকারী কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সুদক্ষ গোয়েন্দার দল। যে করে হোক, অরুণা আসফ আলীকে চাই-ই!

কিন্তু কোথায় অরুণা আসফ আলী? কতবার মুখোমুখি হয়েছেন। কথাবার্তাও বলেছেন কতবার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বুদ্ধির লড়াইতে সবাইকেই তাঁর কাছে হার মানতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

এমনি একদিনের কথা। হঠাৎ জরুরী খবর এসে হাজির। এক্ষুণি পালাতে হবে এখান থেকে। পুলিশ এসে পড়ল বলে!

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী আলী একটা ট্যাক্সি নিয়ে জনৈকা ইয়োরোপীয়ান মহিলার কাছে গিয়ে হাজির। খবরের কাগজে 'পেয়িং-গেষ্ট চাই' বলে তোমাদের বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি। এখানে থাকতে হলে আমাকে কি করতে হবে বলো?

কিন্তু আমরা তো ইয়োরোপীয়ান মহিলা চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছি!

জানি, তবু আমার বিশ্বাস যে, ইয়োরোপীয়ানের পরিবর্তে আমি থাকলেও তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

কথাবার্তা বলে অত্যন্ত খুশি হলেন শ্বেতাঙ্গ মহিলাটি। বাঃ! বেশ মেয়েটি। ঠিক আছে, এখানেই থাকো তুমি।

পলাতক জীবন অতি কঠোর। তাই দুদিন যেতে না যেতেই পুলিশ এসে হাজির। কোথায় সেই মেয়েটি? শীগগির বের করো তাকে।

তন্ন-তন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হল, কিন্তু সব বৃথা। শিকলি কেটে পাখি তার আগেই হাওয়া।

আর একবার জনৈকা শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর বাড়িতে। অরুণা তখন অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে অনেকখানি।

হঠাৎ সেখানে গৃহস্বামীর পরিচিত একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এসে হাজির। দু চোখে তাঁর অনন্ত বিস্ময়। কে এই অচেনা মেয়েটি! সেই দুরন্ত মেয়ে অরুণা আসফ আলী না!

হ্যাঁ, আমি। হাসলেন অরুণা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন আপনি!

বিহ্বল আত্মবিস্মৃতের মতো বসে পড়লেন সরকারী কর্মচারীটি। চোখে-মুখে তাঁর সম্ভ্রমের বিহ্বলতা। ও তো মেয়ে নয়, ও যে একটি জীবন্ত ইতিহাস। না, ওর কোন ক্ষতি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন দিল্লীতে। সেখান থেকেই তিনি ডাক পাঠালেন বিভিন্ন রাজ্যের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের কাছে। সবাই মিলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে একটা নীতি স্থির করা দরকার। তোমরা সবাই এস।

বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব সবাই মেনে নিলেন একবাক্যে। ঠিক হল, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে একই ধারায় সংগ্রাম পরিচালনা করা হবে এখন থেকে।

ডু অর ডাই! কোন রকমেই পিছিয়ে গেলে চলবে না। আঘাতের বদলে আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার।

প্রথম টার্গেট বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো। ওঁকে চাই-ই! যে করে হোক, ওঁকে শেষ করতেই হবে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল দিল্লীর একটা সিনেমা-হাউসে।

পাকা খবর, লিন্‌লিথগো নাকি সেদিন সেখানে সিনেমা দেখতে আসবেন সদলবলে। সিটও রিজার্ভ রাখা হয়েছে তাঁদের জন্য।

যথাসময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে গোটা সিনেমা-হাউসটা কেঁপে উঠল থর-থর করে।

কিন্তু কোথায় লিন্‌লিথগো! না, তিনি আসেননি। কি ভেবে সেদিন তিনি প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে।

দ্বিতীয় টার্গেট—প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল। স্টেশনে স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা বম্বে অভিমুখে যাত্রা করবে ওয়াভেলকে নিয়ে।

ওদিকে বিপ্লবিগণও তখন প্রস্তুত। আজ ওয়াভেলের শেষ দিন। যে করে হোক, শক্তিশালী ডিনামাইটের সাহায্যে ঐ স্পেশাল ট্রেনটাকে উড়িয়ে দিতে হবে।

প্রথমেই একটা পাইলট এঞ্জিন ছেড়ে গেল সতর্কতা হিসেবে। খানিকটা পেছনেই স্পেশাল ট্রেন।

নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন বিপ্লবীবৃন্দ। পাইলট এঞ্জিন চলে গেছে। এই ফাঁকে ডিনামাইট স্থাপন করতে হবে। আর সময় নেই। স্পেশাল ট্রেনটা এসে পড়ল বলে! ঐ যে তার এঞ্জিনটা ছুটে আসছে দৈত্যের মতো! তার আগেই সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তার পরেই, ব্যস্‌!

নিমেষে গোটা অঞ্চলটা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে।

কিন্তু কোথায় স্পেশাল ট্রেন! এ যে আর একটা পাইলট এঞ্জিন! সাবধানতা হিসেবে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে এবার যে পর পর দুটো পাইলট এঞ্জিন দেওয়া হবে, তা কে জানত!

ডিসেম্বর মাসে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে এক দীর্ঘ ইস্তাহার প্রচার করলেন সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশে:

'...As a matter of fact, had the very first assault been successful and had it completely crushed imperialism, that in reality would have been a matter for surprise. The very fact that the enemy

himself has admitted that the Rebellion came pretty near destroying his power, shows how successful was the first phase of our National Revolution.

…In the end, comrades, I should like to say that it has made me inexpressibly happy and proud to be able once again to place my services at your disposal. In serving you, the last words of our leader, 'Do or Die' shall be my guiding star, your co-operation my strength and your command my pleasure.

Jayaprakash Narain

From somewhere in India, December, 1942.'

জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন নেপালে। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করা।

আবার বিপর্যয় ঘটল পরের বছর মে মাসে। হঠাৎ সেদিন তিনি ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিক ভাবে। এবার রাখা হল তাঁকে হনুমান-নগর জেলে।

এদিকে বিপ্লবিগণ তখন প্রস্তুত। জয়প্রকাশজীকে চাই-ই! যে করে হোক, তাঁকে মুক্ত করতেই হবে।

করা হলও তাই। হঠাৎ একদিন রাত্রে সশস্ত্র বিপ্লবিগণ দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হনুমান-নগর জেলখানার ওপর।

বেগতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেপাই-সান্ত্রীর দল সব হাওয়া। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! কে যাবে ওদের গুলির মুখে সাধ করে প্রাণ দিতে!

ফলে, আগস্ট-বিপ্লবের বীর যোদ্ধা জয়প্রকাশ নারায়ণ আবার বেরিয়ে এলেন কারাগারের বাইরে। শুধু একাই এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন আরো ছ'জন অতি বিশ্বস্ত বন্দী সহকর্মীকে।

এবার জয়প্রকাশ নারায়ণ চলে এলেন কলকাতায়। মুখে বড় বড়

দাড়ি-গোঁফ। গায়ে মুসলমানী পোশাক। দেখে চেনাই যায় না। লক্ষ্য—সীমান্ত পেরিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হল না, মল্লিকা। ১৯৪৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর হঠাৎ তিনি একদিন ধরা পড়ে গেলেন লাহোরে।

রামমনোহর লোহিয়া ধরা পড়লেন ১৯৪৪ সালের মে মাসে। মাসের পর মাস তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হল জেলখানার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে।

ব্যতিক্রম অরুণা আসফ আলী। হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পুলিশ কোনদিনও পারেনি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। প্রকৃতপক্ষে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ১৯৪৬ সালের ২৬শে জানুয়ারি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেবার পরে।

এবার শোন মেদিনীপুরের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কথা।

অশান্তি ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। কারণ, সরকারের বঞ্চনা নীতি।

জাপানীদের বিশ্বাস নেই। যে-কোন মুহূর্তে ওরা এখানে এসে হামলা শুরু করে দিতে পারে। সুতরাং তোমাদের কাছে যত মোটর, নৌকো ও সাইকেল ইত্যাদি আছে, সব আমাদের কাছে জমা দাও। ওগুলো ওদের হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই! চেনো না তো তোমরা জাপানীদের!

আর হ্যাঁ, তমলুক, পাঁশকুড়া, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল ও ময়না থানার এই চিহ্নিত অঞ্চলগুলি আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে তোমাদের গাঁ-এর বাইরে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

সিঙ্গাপুর বা বর্মায় মার খেলেও এখানে ওদের আমরা রুখবই। সুতরাং দেরি না করে অবিলম্বে পাততাড়ি গোটাও। ভয় নেই, এজন্য তোমাদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ক্ষতিপূরণ সত্যিই দেওয়া হয়েছিল, মল্লিকা। অন্তত এই একটি ব্যাপারে মহামান্য সরকার বাহাদুর সত্যিই তাঁর কথার মর্যাদা রেখেছিলেন।

কিন্তু কত দেওয়া হয়েছিল শুনবে? এক-একটি সাইকেলের জন্য আট আনা থেকে পাঁচ টাকা। ফলে, যথাসর্বস্ব হারিয়ে মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষকে যে সেদিন কতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্ত এবং অজয় মুখার্জী, সুশীল ধাড়া, বরদা কুইতি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় তখন থেকেই গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী।

ইংরেজকে চিনতে আর বাকি নেই। বেকায়দা দেখলে বরাবরের মতো এখান থেকেও যে ওরা সব কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করবে, তাতে আর কোন ভুল নেই। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধ হও।

সংঘর্ষের প্রথম সূত্রপাত ৮ই সেপ্টেম্বর।

প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী সেদিন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জড় হল দানিপুরের একটা চাল-কলের সামনে। আমাদের অভুক্ত রেখে তোমরা যুদ্ধের প্রয়োজনে বাইরে চাল পাঠাবে, তা আমরা হতে দেব না। কিছুতেই না।

জবাব এল পুলিশের রাইফেলের মুখে। ফলে, নিহত হলেন মোট তিনজন। তারপরই তাঁদের দেহগুলিকে ফেলে দেওয়া হল নদীর জলে।

খবর পেয়ে দু হাজার লোক ছুটে এল চাল-কলের সামনে। কার সাধ্য আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়! না, আমরা তা হতে দেব না। কিছুতেই না। জান কবুল!

প্রথমেই সেই মৃতদেহগুলি তুলে নেওয়া হল নদী থেকে। ওঁরা শহীদ। শহীদের মর্যাদা দিয়েই আমরা ওঁদের দেহগুলিকে সৎকার করব।

ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ বাহিনী। না, আমরা তা হতে দেব না। যা করার আমরাই করব।

তাই করা হল। শেষ পর্যন্ত তিনজনকেই চাপিয়ে দেওয়া হল একই চিতায়। তারপরই শুরু হল ব্যাপক গ্রেপ্তার।

বিচারে দেড় থেকে দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল মোট আঠারো জনকে।

ওদিকে তখন শুরু হয়েছে জনতার বিচার।

নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য চাল-কল মালিককে দু হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আর কোনদিন এক ছটাক চালও পাচার করা হবে না জেলার বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গেই চাল-কল মালিক তা মেনে নিলেন নিঃশব্দে। এই নাও টাকা। কথা দিচ্ছি, আর কোনদিনও বাইরে চাল পাঠাব না।

ওদিকে আসমুদ্র-হিমাচল তখন গর্জে উঠেছে একই সঙ্কল্প নিয়ে—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুর চিরদিনই সবার পুরোভাগে।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। দেখতে দেখতে একদিন আন্দোলনের সেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরের বুকে। তারপরই আবালবৃদ্ধবনিতা গর্জে উঠল দারুণ রোষে—কুইট ইণ্ডিয়া! ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

২৭শে তারিখে নেতৃবৃন্দ মিলিত হলেন তমলুকের এক গোপন সভাতে।

সংগ্রাম আসন্ন। থানা, আদালত, ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি ধ্বংস করে সমস্ত শাসন ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মেদিনীপুর আজও মরে যায়নি। কোনদিনও মরবে না।

সংগ্রাম শুরু হবে ২৯শে সেপ্টেম্বর। সবার পুরোভাগে থাকবে সামরিক পদ্ধতিতে গঠিত বিদ্যুৎবাহিনী আর ভগ্নী শিবিরের সদস্যাগণ। নীতি হবে একটাই। ডু আর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

পরদিন থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সর্বত্র।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর কোনদিনও পিছিয়ে থাকেনি। এবারও থাকবে না। অবিলম্বে প্রস্তুত হও সবাই। হাতে আর একদিন মাত্র সময়। তার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে সবাইকে।

প্রথমেই মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে বহির্জগৎ থেকে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বাইরে থেকে সহসা কোন পুলিশ বা মিলিটারী বাহিনী এখানে এসে হাজির হতে না পারে।

রাত্রির অন্ধকারে দেখতে দেখতেই তমলুক, পাঁশকুড়া, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের যাতায়াতের পথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল বড় বড় গাছ ফেলে রেখে।

পুল ভেঙে দেওয়া হল বত্রিশটি। আর রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গর্ত করে রাখা হল কুড়ি জায়গায়।

টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের তার কেটে ফেলা হল সাতাশ মাইল পর্যন্ত। টেলিগ্রাফ পোস্ট উপড়ে ফেলা হল একশো পঁচানব্বুইটি।

কাঁসাই ও হুগলী নদীর খেয়া নৌকোগুলো পর্যন্ত ডুবিয়ে দেওয়া হল গভীর জলে।

ওদিকে শাসক-সম্প্রদায়ও চুপচাপ বসে নেই। শহরের সর্বত্র কিসের যেন একটা চাপা অস্থিরতা। মনে হয় কিছু যেন একটা ঘটবে।

অনুমান মিথ্যে হল না। পরদিন ২৯শে সেপ্টেম্বর। বিকেল তখন প্রায় চারটে। সহসা কানে এল লক্ষ লক্ষ মানুষের দূরাগত ক্রুদ্ধ হুঙ্কার—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

শহরের সব ক'টি রাজপথ অবরোধ করে নিমেষে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল শাসক-সম্প্রদায়।

শুধু একটি মিছিল নয়, চারদিক থেকে চারটি বিরাট মিছিল এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলতে চাইছে তমলুক শহরকে। না, কিছুতেই ওদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীকেও না।

বিদ্যুৎবাহিনীর নেতৃত্বে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় আট হাজার নরনারীর একটা শোভাযাত্রা এগিয়ে এল পশ্চিম দিক থেকে। লক্ষ্য তাদের স্থানীয় থানা। ঐ থানা আমরা চাই-ই! ওটা আমরা দখল করবই।

নিমেষে গুর্খা ও ব্রিটিশ মিলিটারী পোজিশন নিল মাটিতে হাঁটু মুড়ে। তারপরই তাদের হাতের রাইফেলগুলি গর্জে উঠল একসঙ্গে—ড্রাম! ড্রাম! ফলে, নিহত হল মোট পাঁচজন। আহত আরো পাঁচজন।

এখানেই শেষ হল না। আহত রামচন্দ্র বেরার তখন শেষ অবস্থা। সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে ফেলে দেওয়া হল থানার সামনে। যেমন কর্ম, তেমনি ফল! থাক পড়ে এখানে মাটিতে মুখ গুঁজে!

ওদিকে পুলিশ অফিসার মণীন্দ্র ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তখন শোভা-যাত্রাকারীদের ওপর অবিরাম গুলি চলছে বৃষ্টিধারার মতো।

আর এদিকে আহত রামচন্দ্র বেরা তখন অতি কষ্টে একটু একটু করে থানার দিকে এগিয়ে চলেছেন মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে। প্রাণ যায় যাক, তবু থানা দখল করে আমাদের প্রতিজ্ঞা আমরা রক্ষা করবই।

কাজেও তাই করলেন রামচন্দ্র বেরা। গড়িয়ে গড়িয়ে কোন-রকমে থানা প্রাঙ্গণে ঢুকেই সহসা একসময়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন দারুণ উল্লাসে :

'আমরা থানা দখল করেছি! আমরা থানা দখল করেছি!'

তারপরই তিনি চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন অনন্ত নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে। সে ঘুম আর কোনদিনই তাঁর ভাঙল না।

উত্তর দিক থেকে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে এগিয়ে এল আর একটি শোভাযাত্রা। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

বাধা দিল পুলিশ অফিসার অনিল ভট্টাচার্য। না, কাউকেই এগুতে দেওয়া হবে না। তাহলে গুলি করা হবে।

গুলি করবে! হাসলেন গান্ধীবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা, বেশ, কর না গুলি! তবে এগিয়ে আমি যাবই। তোমার ইচ্ছা হয় তো গুলি কর, নয়তো পরের গোলামী ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দাও।

নিশ্চিন্ত মৃত্যু জেনেও এগিয়ে গেলেন গান্ধীবুড়ি। এক হাতে তাঁর বিজয়শঙ্খ, অন্য হাতে জাতীয় পতাকা। মুখে সেই একই মন্ত্র, বন্দেমাতরম্! ইংরেজ ভারত ছাড়!

দ্রাম! অব্যর্থ গুলির আঘাতে হাত থেকে শঙ্খটি পড়ে গেল গান্ধীবুড়ির, তবু তিনি থামলেন না। অপর হাতে মাটি থেকে শঙ্খটি তুলে নিয়ে আবার তিনি চলতে শুরু করলেন সামনের দিকে। বন্দেমাতরম্! ইংরেজ ভারত ছাড়!

এবার জখম হল অন্য হাতটি, তবু সেই একইভাবে তিনি জাতীয় পতাকাটি সু-উচ্চে তুলে ধরে রইলেন আগেকার মতো। মুখে সেই একই ধ্বনি। বন্দেমাতরম্! ইংরেজ ভারত ছাড়!

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীবুড়ির প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আশ্চর্য! পতাকাটি কিন্তু তখনো পর্যন্ত ধরাই রয়েছে তাঁর হাতে। ঠিক তেমনি ভাবেই।

সংসারে এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের তুলনা কোথায় বলতে পারো, মল্লিকা? তোমরা একালের মেয়ে। পরাধীনতার যে কি দুঃসহ জ্বালা, তা তোমরা জান না। জানতেন এই গান্ধীবুড়ি। তাই তো

দেশের মুক্তি-যজ্ঞে নিজেকে, তিনি বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন এমনি করে।

গান্ধীবুড়ির নাম স্মরণ করে আজ তোমরা মাথা নোয়াবে না? ঋণ স্বীকার করবে না? না কি জাতির ইতিহাসে অকৃতজ্ঞ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরদিন?

পুলিশ ও মিলিটারীর হিংস্র আক্রমণে সেদিন শুধু গান্ধীবুড়ি একাই প্রাণ দেননি, মল্লিকা। প্রাণ দিয়েছিলেন পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা প্রমুখ আরো কয়েকজন।

আর প্রাণ দিয়েছিলেন তেরো বছরের দুঃসাহসী কিশোর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। তাঁকে মারা হয়েছিল রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে।

ততক্ষণে বিদ্যুৎবাহিনীর পরিচালনায় আর একটি শোভাযাত্রা এগিয়ে এসেছে দক্ষিণ দিক থেকে। সাকড়া বাঁধের কাছাকাছি আসতেই শুরু হল প্রচণ্ড গুলি-বর্ষণ।

ফলে, প্রাণ দিলেন নিরঞ্জন জানা, আর আহত হলেন পূর্ণচন্দ্র মাইতি ও আরো কয়েকজন। পূর্ণ মাইতি মারা গেলেন দুদিন বাদে, হাসপাতালে।

আহতদের মধ্যে কয়েকজন তখন গোঙাতে শুরু করেছেন—জল! একটু জল!

ছুটে গেলেন ভগ্নী সেনা-শিবিরের মেয়েরা। এই নাও ভাই জল। হাঁ কর, আমরা খাইয়ে দিচ্ছি।

খবরদার! রাইফেল বাগিয়ে ধরল সেনা বাহিনী। ওসব জল-টল দেওয়া চলবে না। আমাদের হুকুম।

বটে! সঙ্গে সঙ্গে আর একদল মেয়ে ছুটে গেলেন রণমূর্তি ধরে। দেখেছ হাতে এগুলো কি! আমাদের বাধা দিলে এই বঁটি দিয়ে কেটে দু টুকরো করে ফেলব না!

প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের আর একটি শোভাযাত্রা এগিয়ে

এল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

বাধা দিলেন সেনানায়ক অপূর্ব ঘোষ। আর এক পা এগিয়েছ কি মরেছ! সঙ্গে সঙ্গেই তাজা বুলেট।

শুনেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দিলেন কয়েকজন মহিলা। নাও, মারো আমাদের। মরতে আমরা সব সময়ে প্রস্তুত।

পিছিয়ে গেলেন সেনানায়ক অপূর্ব ঘোষ। সামনে বিশাল জনতা। এ যৌবনজলতরঙ্গ রুধিবে কে? তাই গুলির পরিবর্তে এবার তিনি লাঠি-চার্জ করার হুকুম দিলেন জনতার ওপর। ফলে, আহত হলেন বেশ কয়েকজন।

মহিষাদল থানার সামনেও সেই একই দৃশ্য।

সেখানে প্রথম দফায় প্রাণ দিলেন যামিনীকান্ত কামিলা, অনন্তকুমার পাত্র ও আরো তিনজন।

দ্বিতীয় দফায় শশীভূষণ মান্না, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং ধীরেন্দ্রনাথ দিড়াবেরা।

তৃতীয় দফায় ভোলানাথ মাইতি, হরিচরণ দাস, আশুতোষ কুইলা, সুধীরচন্দ্র হাজরা, প্রসন্নকুমার ভুঞা, পঞ্চানন দাস, রাখালচন্দ্র সামন্ত এবং ক্ষুদিরাম বেরা।

বেলকনি থানা অভিযানে প্রাণ দিলেন ভজহরি রাউত, বংশীধর কর, চন্দ্রমোহন জানা, হেমন্তকুমার দাস, চৈতন্য বেরা, বৈশ্যচরণ মহাপাত্র, শিবপ্রসাদ, চন্দ্রমোহন দাস, সর্বেশ্বর প্রামাণিক ও রামপ্রসাদ জানা।

বৃন্দাপুর থানা অভিযানে প্রাণ দিলেন মোট দুজন। গৌরহরি কামিলা আর গান্ধার সাহু।

ভগবানপুর থানা অভিযানে নিহত হলেন যুধিষ্ঠির জানা, বিভূতিভূষণ দাস, জগন্নাথ পাত্র, শ্রীনাথচন্দ্র প্রধান, হরিচরণ বেরা, রামকান্ত দাস, রঘুনাথ মণ্ডল, হরিপদ মাইতি, পরেশচন্দ্র জানা,

কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ দাশপাঠ ও ভূষণ সামন্ত প্রমুখ সংগ্রামী তরুণবৃন্দ।

কেশপুর থানা অভিযানে প্রাণ দিলেন শশীবালা দাসী, রামকৃষ্ণ ঘোষ ও আরো দুজন।

তারপর একে একে প্রাণ দিলেন অমূল্য শাসমল, সুধীর মাইতি, কেদারনাথ জানা, মুচিরাম দাস, ভগীরথ রথ, মুরারীমোহন বেরা, বিপিনবিহারী মণ্ডল, চন্দ্রমোহন দিন্দা ও হরেকৃষ্ণ ধর।

বিদ্যুৎবাহিনী ও ভগ্নী সেনা-শিবিরের পরিচালনায় সুতাহাটা থানা দখল করা হল একই দিনে।

প্রথমেই বন্দী করা হল একজন পদস্থ পুলিশ অফিসারকে। তারপর বাদ বাকি সবাইকে।

লাভও কিছু কম হল না। পাওয়া গেল ৬টি রাইফেল এবং বেশ কয়েকটি তরবারী। অসুরকে আসুরিক ভাষায় জবাব দিতে হলে এগুলো খুবই কার্যকরী।

থানা দখল শেষ। এবার বহ্নি-উৎসব।

দেখতে দেখতে একসময়ে গোটা থানা-ভবনটা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক ওরা মেদিনীপুরের মাটি থেকে।

সহসা কি শুনে চমকে উঠলেন বিপ্লবী জনগণ। কি ব্যাপার! কিসের শব্দ ওটা!

বিমান! বিমান! বিমান! একজোড়া বোমারু বিমান। ঠিক মাথার ওপরে। মনে হয় বোমা-বর্ষণ করবে।

হ্যাঁ, তাই। ঐ যে বিমান দুটি নিচে নেমে আসছে ছোঁ মেরে। ঐ যে বাতাসের বুকে তীক্ষ্ণ শিস্ দিয়ে বোমাটা নেমে আসছে মাটির দিকে। শীগ্‌গির শুয়ে পড় সবাই মাটি কামড়ে।

আদপেই কিন্তু কোন বিস্ফোরণ হল না, মল্লিকা। কারণ, বোমাটা পড়েছিল একটা পুকুরের মধ্যে।

ফল হল মারাত্মক। দেখতে দেখতেই খাসমহল অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড, রেজিস্ট্রি অফিস ইত্যাদি সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে গেল জনতার রোষে। কোথায় তোমাদের বোমারু বিমান! ডাকো তাদের। তারাই এসে তোমাদের রক্ষা করুক আমাদের হাত থেকে।

তারপর নন্দীগ্রাম থানা। সেখানে প্রাণ দিতে হল বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ভানু রায়, ভূতনাথ সাহু, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শেখ আলাউদ্দিন ও আরো চারজনকে। আহত ষোলজন।

কাঁথি মহকুমাতেও সেই একই অবস্থা। লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে একই শপথ— ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

সংঘর্ষের প্রথম সূত্রপাত ২২শে সেপ্টেম্বর।

পুলিশ ও সেনা বাহিনীসহ স্বয়ং মহকুমা-শাসক সেদিন হাজির। যাও, সমস্ত গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে এস। যে রাস্তা ওরা ভেঙেছে, ওদের নিজের হাতেই সে রাস্তা আজ মেরামত করে দিতে হবে। না আসতে চাইলে জোর করে তুলে নিয়ে আসবে।

রুখে দাঁড়াল হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। না, এ হুকুম আমরা মানতে রাজী নই। ইচ্ছে হলে তোমরাই নিজের হাতে মেরামত কর গে।

এতবড় কথা! আদেশ দিলেন মহকুমা-শাসক—ফায়ার! ফলে, নিহত হল মোট ছ'জন। আহত শতাধিক।

জনতার আক্রোশ এবার যেন শতধারায় ফেটে পড়ল পটাশপুর, খেজুরি ও ভগবানপুর থানার ওপর। ফলে, সব কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে একাকার।

কোথায় তোমাদের মনিব ইংরেজ সরকার, কোথায় তার একান্ত দাসানুদাস দারোগা সাহেবের দল! আজ তোমাদের বিচারের পালা।

বেগতিক দেখে পটাশপুর থানার দারোগা সাহেব আগেই হাওয়া। শেষপর্যন্ত খেজুরি ও ভগবানপুরের সার্কেল অফিসার এবং এগারোজন সশস্ত্র কনস্টেবলকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল সুন্দরবনে।

কেশপুর, ডেবরা, পিংলা, সবং, গড়বেতা, খড়্গপুর ইত্যাদি স্থানেও সেই একই চেহারা। গো ব্যাক ব্রিটিশ! কুইট ইণ্ডিয়া! তোমাদের শাসন আমরা মানি নে।

কোনরকমেই আন্দোলন দমন করতে না পেরে এবার অসংখ্য ব্রিটিশ ও পাঠান সেনা বাহিনীকে নিয়ে আসা হল মেদিনীপুরে।

বড্ড বাড় বেড়েছে এই মেদিনীপুরের! এবার দেখ যে, মেদিনীপুরকে আমরা শায়েস্তা করতে পারি কিনা! ভাল করে তাকিয়ে দেখ।

সত্যিই ওরা দেখাল, মল্লিকা। যে কোন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও বুঝি তা হার মানায়।

ইংরেজের প্রচার-মহিমায় হিটলারের কত নৃশংসতার কাহিনীই না আমরা শুনেছি। হিটলার দস্যু, হিটলার ডাকাত, এমনি কত কথা।

কিন্তু ইংরেজ নিজে কি? সে কি নিজে একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা?

যুদ্ধ শেষে হিটলারের ইহুদী-নির্যাতনের যেসব কাহিনী জানা গেছে, নিশ্চয়ই তা নিন্দার যোগ্য।

কিন্তু ব্রিটিশ! আমেরিকা!

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মৃতপ্রায় জাপানের বুকে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে যেভাবে তারা লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে হত্যা করেছিল, তা কি অভিনন্দন যোগ্য?

মনে রাখতে হবে যে, তার আগেই জাপান যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা করেছিল মিত্র পক্ষের কাছে। কিন্তু তারা রাজী হয়নি। কারণ, তখনো পর্যন্ত এ্যাটম বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখার কোন সুযোগ হয়নি। ওটা একবার দেখা দরকার।

হিটলারের নৃশংসতাকে নিশ্চয়ই আমরা নিন্দা করব। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ বলে এগুলোকেই কি আমরা বাহবা দেব? এগুলোও কি সমান নিন্দনীয় নয়?

কি করেছিল ইংরেজ সেদিন মেদিনীপুরে ? কি করেছিল অস্তি, চিমুর, বিহার বা বালিয়াতে ?

আন্দোলনকারীদের নাগাল না পেয়ে যেভাবে সেদিন তারা পৈশাচিক নারী-নির্যাতনে মেতে উঠেছিল, বিংশ শতাব্দীতে কোথাও তার একটা নজীর আছে কি ?

পশুত্বের দিক থেকে ফ্যাসিস্টরা কি এর চাইতেও নিকৃষ্ট ?

অথচ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাহেবের মুখে শোনা গেল বিপরীত কথা। না, এমন কিছু হয়নি ভারতবর্ষে। মাত্র ৯৪০ জন লোক মারা গেছে পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে। এ তো সামান্য ব্যাপার !

মাত্র ৯৪০ জন ! অথচ কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল, তাতে জানা গেছে যে, নিহতের সংখ্যা তেরো হাজারেরও বেশি।

তাহলে প্রচারবিদ হিসেবে কে বড়, মল্লিকা? 'ফ্যাসিস্ট' জার্মানীর ডঃ গোয়েবল্‌স্‌, না 'গণতন্ত্রী' ব্রিটিশের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ?

এদিকে তখন অত্যাচারের ঝড় বয়ে চলেছে মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে।

পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে লাঠি, গুলি, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারী-ধর্ষণ কিছুই বাদ নেই। মেদিনীপুরকে শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা দিতে হবে, যা জীবনেও যেন ওরা ভুলতে না পারে।

বিপদের ওপর বিপদ। সে বিপদ দেখা দিল ১৬ই অক্টোবর রাত্রে।

হঠাৎ সেদিন প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিবাত্যা এসে আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরের ওপর।

তারপর শুধু জল আর জল ! চারিদিকে থৈ-থৈ করা জল। বিধ্বংসী সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে কত শত অসহায় নরনারীকে যে পথে বসতে হল, তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই।

দেখে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন শাসক-সম্প্রদায়। গড্ সেভ দি কিং! এবার? এবার কোথায় যাবে মেদিনীপুর?

কিন্তু না, এ খবর এত শীগগির বাইরে যেতে দিলে চলবে না। সব চেপে রাখতে হবে সন্তর্পণে। কেউ যেন ওদের সহায়তা করতে না পারে বাইরে থেকে। ওদের উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

কাজেও তাই করা হল, মল্লিকা। সতর্কতা হিসেবে আগেই কলকাতা থেকে একাধিক টেলিগ্রাফ পাঠানো হয়েছিল মহকুমা-শাসকের কাছে। ঝড় আসন্ন। জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দাও:

সব চেপে দেওয়া হল নিপুণতার সঙ্গে। মেদিনীপুর শেষ হয়ে যাক। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। এই তো ওদের উপযুক্ত শাস্তি।

এত আঘাতের পরেও কিন্তু মেদিনীপুর মাথা নোয়াল না, মল্লিকা। বরং আঘাত সামলে নিয়ে আবার তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াল সবার পুরোভাগে। মেদিনীপুর আজও মরেনি। প্রমাণ শীগগিরই তোমরা পাবে।

কাজেও তাই হল। ১৭ই ডিসেম্বর স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল মেদিনীপুরের মাটিতে। আমরা স্বাধীন। আমরা মুক্ত। এ দেশ আমাদের। আমরাই এর মালিক। বিদেশী শাসনের কোন আইন আমরা মানি নে। মানব না।

কি ছিল না সেই স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকারের!

স্বরাষ্ট্র বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, জেলখানা, পোস্ট অফিস, সংবাদপত্র, ব্যাঙ্ক, নিজস্ব সেনা বাহিনী—কিসের অভাব ছিল!

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক পরবর্তী কালে ব্যবস্থাপক সভায় কি বিবৃতি দিয়েছিলেন, শোন:

'মেদিনীপুরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের নিজস্ব সৈন্য, পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ ছিল।

নিজস্ব কারা বিভাগও তাদের ছিল। প্রয়োজনবোধে সেখানে

অপরাধীদের আটক রাখা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা গভর্ণমেণ্টকে অচল করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।'

ওদিকে এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও মেদিনীপুরের ওপর সেই অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপা থাকেনি, মল্লিকা। মুখে মুখে একদিন সে কাহিনী পৌঁছে গেল এখানে-ওখানে সর্বত্র।

শুনেই গর্জে উঠলেন পুরুষসিংহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে গভর্ণর স্যার জন হারবার্টকে তিনি লিখলেন :

'...জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চলে যেরূপ নৃশংস অত্যাচারের কথা আমরা শুনতে পাই, মেদিনীপুরেও তাই চলেছে। সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে শত শত বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। হিন্দুদের বাড়ি লুট করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেই একাজ করেছে। এমন কি, ১৬ই অক্টোবরের ঝড়ের পরেও গৃহলুণ্ঠন ও গৃহদাহের কাজ সমানভাবেই চলেছে।

গভর্ণমেণ্টের লোকদের এসব অত্যাচার অত্যন্ত ঘৃণিত। সরকার কর্তৃক একপক্ষকাল ঝড়ের সংবাদ এবং সাহায্যের আবেদন গোপন রাখা অমার্জনীয় অপরাধ। ঝড়ের পর কতগুলি অফিসারের ঔদাসীন্য এবং হৃদয়হীনতার তুলনা কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

এমন একজন ভদ্রলোককে আমি জানি, যিনি কিছুসংখ্যক নরনারী ও শিশুকে জলে নিমজ্জিত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি নৌকা চেয়েছিলেন।

প্রার্থনা সরাসরি না-মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলে, বিপদগ্রস্ত লোকগুলি স্রোতের জলে ভেসে যায়। তাদের আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাইরের লোককে কোনরকম সাহায্য করতে দেওয়া হয়নি। সান্ধ্য-আইন জারি করে সে-পথ বন্ধ করা হয়েছে।

অধিকন্তু একজন অফিসার এই মর্মে সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে যে, আন্দোলনকারী জনসাধারণকে স্থায়ী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ওখানে একমাস পর্যন্ত সবরকম সরকারী সাহায্য বন্ধ করা উচিত।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে শুধু বেয়নেটের ভয়ে আর পদানত রাখা যাবে না।

যদি নিজের দেশকে স্বাধীন করা এবং বৈদেশিক প্রভুত্ব অবসান করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অপরাধ হয়, তবে প্রত্যেকটি আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন ভারতবাসীই আজ অপরাধী।

স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন না করে বিপ্লব দমন করার জন্য গভর্ণমেণ্ট গত তিনমাস ধরে এই দমন নীতির শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাতে লাভ হয়েছে এই যে, গত তিনমাসে জনসাধারণ বুলেটের ভয় হারিয়েছে।

নিরস্ত্র ও অসহায় জাতির সঙ্গে লড়াই করা খুবই সোজা।

ভারতবাসী নিরস্ত্র, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশপক্ষ থেকে বলা হয় যে, ভারতবাসী নাকি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেছে।

তাই যদি হয়, তাহলে ভারতবাসীকে অস্ত্র সরবরাহ করা হোক। তারপর সমত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ চলুক। অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিশ্চয় ভারতবাসী এই পরিবর্তনকে সাদরে সমর্থন জানাবে।'

উপসংহারে লিখলেন শ্যামাপ্রসাদ :

'I am sorry that our official association should end like this at this critical hour in the history of my province. I honestly feel I can be of no use to my countrymen or to you by remaining in office so long

as the general all-India policy remains what it is and the province is administered by you on lines which I consider inimical to its best interest.'

এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা। এবার পালা এল প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের। স্বয়ং গভর্ণর তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন রিভলবার দেখিয়ে।

অপরাধ? অপরাধ, মেদিনীপুর সম্বন্ধে তিনি তদন্ত করতে রাজী হয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণরের কৈফিয়ৎ তলব। আমরা যেখানে রাজী নই, সেখানে তুমি কার হুকুমে তদন্তের আদেশ দিয়েছ, তার কৈফিয়ৎ দাও।

এ প্রসঙ্গে আমি গভর্ণর স্যার হারবার্ট এবং জনাব ফজলুল হক লিখিত দুটি চিঠি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। এই চিঠি দুটি থেকেই তুমি সেদিনের ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাবে আশা করি।

১৫ই ফেব্রুয়ারি

'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনি মেদিনীপুর জেলার সরকারী কর্মচারীদিগের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে বলিয়া আজ আইনসভায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

আপনি ভালভাবেই জানেন যে, এই বিষয়টি আমার বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আপনি আরও জানেন যে, এই বিষয়ে কোন তদন্ত করা আমি অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

এই সংবাদ সত্য হইলে, সরকারের সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণিত এই বিষয়ে পূর্বেই আমার সহিত কোন আলোচনা করেন নাই।

আগামী কল্য প্রাতঃকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময়ে সে সম্পর্কে আপনার কৈফিয়ৎ প্রত্যাশা করিব।

— ভবদীয়, জে. এ. হারবার্ট'

চিঠি পেয়েই রুষ্ট বাঘের মতো গর্জে উঠলেন 'শের-এ-বঙাল' হক সাহেব। পরদিনই তিনি জবাব দিলেন :

'প্রিয় স্যার জন,

আপনার ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রের উত্তরে জানাইতেছি যে, আপনার নিকট কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আমি স্বীকার করি না। তবে মৃদু ভর্ৎসনার সহিত আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য যে, আপনার পত্রে যেরূপ অসৌজন্য-মূলক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে গভর্ণরের ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পত্রে সেরূপ ভাষা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

...আজ প্রাতে ১০টার সময় আপনার সহিত আমার দেখা করিবার কথা ছিল। ইতিপূর্বেই আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে মৌখিক জানাইয়াছি যে, আপনার নিকট যাওয়া ও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কেননা আমি মনে করি যে, আপনার পত্রে লিখিত ভাষার জন্য ত্রুটি স্বীকার না করিলে ক্রোধ-জর্জরিত মনোভাব লইয়া যে কথাবার্তা হইবে, তাহাতে কোনই লাভ হইবে না।

—ভবদীয়, এ. কে. ফজলুল হক'

প্রথমে পদত্যাগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। তারপর হক সাহেব। কারণ—মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর সম্বন্ধে কোনরকম তদন্ত কমিশন গঠিত হোক, সরকারের তা কাম্য নয়। দিনকাল ভাল নয়। বিক্ষোভের আগুনে সারা দেশ তখন জ্বলছে। এ অবস্থায় এ খবর যতদিন চেপে রাখা যায়, ততই ভাল।

তাই বলে নিজেদের সেই কীর্তি-কাহিনী কি সত্যিই চেপে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন শাসক-সম্প্রদায় ?

মোটেই না। সত্য কোনদিনও চাপা থাকে না। এখানেও তা থাকেনি।

পরবর্তী কালে কংগ্রেস তদন্ত কমিশনের সামনে মেদিনীপুরের অসংখ্য নির্যাতিতা নারী স্বেচ্ছায় যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, তা থেকে সামান্য কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

প্রথমে শোন সিন্ধুবালা দাসীর কথা :

'আমার বয়স ১৯ বৎসর। আমার একটি সন্তান আছে। ৯ই জানুয়ারি বেলা সাড়ে ন'টার সময় জনৈক পুলিশ অফিসার একদল সৈন্য সহ আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। ওরা আমার স্বামীকে অন্যত্র লইয়া যায় এবং বলপূর্বক আমাকে ধর্ষণ করে। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। এই দ্বিতীয়বার আমি ধর্ষিতা হইলাম।'

এবার শোন সন্তান-সম্ভবা নারী খুদিবালা পণ্ডিতের কথা।

সিন্দুবালা দাসীর মতো ইনিও একই দিনে, একই অফিসারের নির্দেশে ধর্ষিতা হন মহিষাদল থানার চণ্ডীপুর গ্রামে।

'আমার বয়স ২১ বৎসর এবং আমি তিনটি সন্তানের জননী। ৯ই জানুয়ারি বেলা ৯টার সময় জনৈক ব্যক্তি কয়েকজন সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্যত্র লইয়া যায়।

ঐ ব্যক্তির নির্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া পর-পর আমাকে ধর্ষণ করে। আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি। জ্ঞান ফিরিলে আমি দেখি, আমার স্বামীর শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তপাত হইতেছে।'

এবার শোন এক অসুস্থা নারী সুহাসিনী দাসের কথা :

'আমার বয়স ২০ বৎসর এবং কোন সন্তানাদি নাই। ৯ই জানুয়ারি 'জনৈক ব্যক্তি' একদল সৈন্য লইয়া আমার স্বামীকে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তির নির্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধে এবং চিৎকার করিলে গুলি করিব বলিয়া ভয় দেখায়। তারপর দুইজনই আমাকে ধর্ষণ করে। আমি লজ্জা ও ঘৃণায় সংজ্ঞাহীন হই। আমাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করুন।'

শুধু একটি-দুটি নয়, এমনি অসংখ্য ঘটনা, যা শুনলে লজ্জা-ঘৃণায় তোমরা শিউরে উঠবে।

তবে খুবই আনন্দের কথা যে, এসব নির্যাতিতা মহিলাদের সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মেদিনীপুরের সংগ্রামী জনসাধারণ সেদিন এতটুকুও পিছিয়ে থাকেননি। এখানেও তাঁরা সবার পুরোভাগে।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, মল্লিকা। ব্রিটিশ সেদিন যা কিছু করেছিল, সবই তার সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে।

কিন্তু মোসাহেবের দল? মনিবের স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট হয়ে কি করেনি সেদিন এই ঘৃণ্য স্বজাতদ্রোহী মোসাহেবের দল?

কি করতে বাকি রেখেছিল?

পুরস্কার ও খেতাবের লোভে এই দাসানুদাসের দলই কি সেদিন কম অত্যাচার করেছিল দেশবাসীর ওপর?

আজ তাদের চেনা যায় না। কারণ, তারাই আজ এই হতভাগ্য দেশের সবচাইতে উঁচুতলার জীব। ক্ষমাই আমাদের পরম ধর্ম কিনা—তাই রাতারাতি ভোল পাল্টে দেশসেবকের ভেক নিতে তাদের কাউকেই এতটুকু বেগ পেতে হয়নি।

ওদিকে পুলিশ তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেদিনীপুরের সর্বত্র। যে করে হোক, আন্দোলনের মধ্যমণিদের গ্রেপ্তার করা চাই-ই! অন্যথায় এ আন্দোলন কিছুতেই থামানো যাবে না।

সবার নামেই মোটা টাকা পুরস্কার। জীবিত অবস্থায় যদি ধরিয়ে দিতে পার তো ভালই, নয়তো অন্তত তাদের কাটা মুণ্ডগুলিও যদি এনে দেখাতে পার তো ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে কড়কড়ে টাকা!

তবে কাজটা সোজা নয়। চারপাশে অতন্দ্র প্রহরী বিদ্যুৎবাহিনী। তাছাড়া রয়েছে মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষ। এতগুলি চোখকে ফাঁকি দিয়ে কার সাধ্য তাদের একান্ত প্রিয় নেতৃবৃন্দকে স্পর্শ করে!

এত করেও কিছু হল না। হঠাৎ একদিন অজয় মুখার্জী ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে।

সেদিন তিনি তমলুকেরই কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়েছিলেন সংগঠনের কাজে। সেখানেই একটি চাপরাশী তাঁকে ধরিয়ে দিল পুরস্কারের লোভে।

তারপর বিচার। বিচারে ৬ বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে তিনি চলে গেলেন লৌহ-কপাটের অন্তরালে।

ধরা পড়লেন সতীশ সামন্ত, সতীশচন্দ্র সাহু আর বরদা কুইতি। সতীশ সামন্তকে দেওয়া হল আড়াই বছরের কারাদণ্ড।

সুশীল ধাড়া স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন আরো কিছুদিন বাদে।

কারণ—গান্ধীজী। আন্দোলনে অহিংসার মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। সুতরাং তাঁর নির্দেশ—অবিলম্বে সব কিছু স্থগিত রেখে আন্দোলনে লিপ্ত প্রতিটি লোককে আত্মসমর্পণ করতে হবে পুলিশের হাতে। অর্থাৎ, সেই ১৯২২ এবং ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি। দেশবন্ধুর ভাষায়ঃ

'The Mahatma opens campaign in brilliant fashion, he works it up with unerring skill, he moves from success to success till reaches the zenith of his campaign, but after that he loses his nerve and begins to falter'.

মহাত্মা তাঁর আন্দোলন খুবই চমকপ্রদ ভাবে শুরু করেন। নির্ভুল এবং অসাধারণ নৈপুণ্যে ক্রমশ সাফল্যের চরম মুহূর্তে এসে দাঁড়ান। কিন্তু তারপরই তাঁর স্নায়ুযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত পথচলা।

এবার মেদিনীপুরের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ শোন। এ সম্বন্ধে জনাব ফজলুল হকের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য সাময়িক পত্রিকা থেকে এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছিঃ

'বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন যে, ১৯৪২ সালের ঝঞ্ঝাবাত্যার পূর্বে এবং পরে তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায় সরকারের লোকজন ১৯৩টি কংগ্রেস ভবন এবং ক্যাম্প পোড়াইয়া দিয়াছে। এই সময় কংগ্রেসীরা ৮১টি থানা, অফিস, সরকারী বাড়িঘর প্রভৃতি পোড়াইয়াছে।

১৯৪২ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে কাঁথি এবং তমলুক মহকুমায় যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সহ স্থানীয় অধিবাসীদের বহু কাঁচা ও পাকা বাসভবন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিনা—মেদিনীপুরের জনৈক সদস্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল এই প্রশ্ন করিলে প্রধানমন্ত্রী তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থাৎ—সরকারের লোকজন শুধু কংগ্রেস ভবন ও ক্যাম্প পোড়াইয়াই নিরস্ত হন নাই, স্থানীয় অধিবাসীদের অস্থাবর সম্পত্তিসমেত বহু বাসভবন তাহারা জ্বালাইয়া দিয়াছে।

সরকারের লোকজন যেরূপ ব্যাপকভাবে অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতে সরকার প্রস্তুত আছেন কিনা—এই প্রশ্ন উঠিলে স্যার নাজিমুদ্দিন ক্রুদ্ধ হন।' [প্রবাসী : চৈত্র : ১৩৫০ সাল]

বিপদ কখনো একা আসে না। দেখতে দেখতেই বাংলার বুকে ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল ইচ্ছাকৃত সরকারী অব্যবস্থার ফলে।

পঞ্চাশের সেই মন্বন্তরে মোট কত লোককে প্রাণ দিতে হয়েছিল জানো ?

প্রায় ষাট লক্ষ।

আজ ১৯৭১ সালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যের কথা তুমি বোধহয় কল্পনাও করতে পারবে না, মল্লিকা।

পথে, ঘাটে, ফুটপাথে, পার্কে, যেদিকে তাকানো যায়, শুধু অগুন্তি মৃতদেহ। বেশির ভাগই ক্ষতবিক্ষত। ক্ষুধার্ত শকুন এবং কুকুরের দল আগে থেকেই তাদের শেষ করে দিয়েছে।

মল্লিকা, যুদ্ধ হয়েছে রাজায় রাজায়। আমাদের সেখানে কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। তাছাড়া আমাদের দেশে কোনদিন যুদ্ধ হয়ও নি। অথচ সর্বাগ্রে তার জন্য মাশুল দিতে হল কিনা আমাদেরই!

কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সেদিন যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, তাদের দেশে একটি লোককেও না খেতে পেয়ে তিলে তিলে প্রাণ দিতে হয়েছিল কি?

না, হয়নি। তফাৎটা এইখানেই।

বিয়াল্লিশের কাহিনী এখানেই শেষ করছি, মল্লিকা।

বিপ্লব কোনদিনও ব্যর্থ হয় না। আগস্ট-বিপ্লবও ব্যর্থ হয়নি। ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। তার জন্য যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয়। মৃত্যুভয়কে জয় করতে শিখতে হয়।

যে জাতি মৃত্যুভয় জয় করতে শেখেনি, স্বাধীনতা তাদের জন্য নয়। ঐতিহাসিক আগস্ট-আন্দোলনের সার্থকতা সেইখানেই।

ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষ সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা প্রাণ দিতে জানে। সুভাষের ভাষায়:

'In the history of India's struggle, 1942 will remain an unforgetable landmark, indicating the psychological transition from passive to active resistance.'

চলো এবার আমরা একটু পিছিয়ে যাই, মল্লিকা।

ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের দুরন্ত গতিবেগের মাঝে এতক্ষণ নিজেকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, পেছনের দিকে তাকানোর মতো অবকাশ পাইনি। এবার সে-সব ঘটনাগুলো তোমাকে শোনাব একে একে।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে। আর এ ঘটনা ঘটেছিল সেপ্টেম্বর মাসে।

সুভাষের মাথায় তখন দুঃসহ চিন্তা। চিন্তার প্রধান কারণ—অর্থ-সমস্যা।

শুরুতে ছিল মাত্র পনেরোজন। এখন তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার। আরো আসছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে।

কিন্তু টাকা! টাকা কোথায়? ফৌজের সংখ্যা বাড়ানো মানেই তো টাকা!

তাও সামান্য দু-দশ টাকার প্রশ্ন নয়। তাদের মাইনে, আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি মিলিয়ে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাবেন সুভাষ এত টাকা?

জার্মান সরকারের কাছ থেকে মাসে মাসে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা দয়া বা অনুকম্পার দান নয়, ঋণ। দেশ স্বাধীন হবার পরে সবই তখন আবার তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে সুদে-আসলে। ভারতবর্ষ গরীব দেশ। তার সাধ্য যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

এদিকে তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান গড়ার কাজ শেষ। এবার চাই চতুর্থ ব্যাটেলিয়ান। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা?

উপায় বাত্‌লে দিল জার্মানী। টাকার দায়িত্ব আমাদের। তবে একটা শর্তে। এবার থেকে তোমাদের সেনা বাহিনীকে যৌথভাবে উভয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হবে।

কূটনীতিতে সুভাষও কম যান না। কি করে যে তিনি একা

১৯৪২ সালের মহাশক্তিশালী তিন প্রধান—হিটলার, মুসোলিনী ও তোজোর সঙ্গে সমানে পাঞ্জা কষে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ পাল্টা চাল দিলেন পাকা দাবা খেলোয়াড়ের মতো। ঠিক আছে, তাই হবে। তবে একটা শর্তে। যেখানে উভয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য এক হবে, কেবলমাত্র সেখানেই আমরা সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব তোমাদের সঙ্গে, অন্যত্র নয়।...'only where common Indo-German interests were at stake.'

রাজী হল জার্মানী। বেশ, তাই হবে। সেনা বাহিনীর খরচ আমরাই বহন করব এখন থেকে।

নতুন শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল সেপ্টেম্বর মাসে।

সে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপ-দূতাবাসের কর্নেল ইয়ামামাতো। এই ইয়ামামাতোর কথা তুমি জানতে পারবে আরো পরে।

এবার আমি ছোট্ট, অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, মল্লিকা।

সুভাষ বোস জার্মানীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, একথা বোধহয় সারা পৃথিবী জানে।

কিন্তু এ খবর কেউ রাখে কি যে, সুভাষ নিজেই আবার সেই ঋণ পরিশোধ করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে?

অবশ্য মোট কত টাকা তিনি ঋণ নিয়েছিলেন, তার সবটাই তিনি পরিশোধ করার সময় পেয়েছিলেন কিনা, সে তথ্য আমার জানা নেই। তবে চেষ্টা যে করেছিলেন, তাতে আর কোন ভুল নেই।

সংগ্রামী ভারতের একক প্রতিনিধি হিসেবে দেশের মুক্তির জন্য সেদিন ঋণ গ্রহণ করেছিলেন সুভাষ নিজে। পরিশোধও করেছিলেন নিজের হাতেই।

জার্মানীর অস্তিত্ব তখন রীতিমত বিপন্ন। সে অবস্থায় ঋণ পরিশোধ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা বলে সুভাষ কিন্তু তাদের সেই বিপর্যয়ের সুযোগ বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করেননি, মল্লিকা। বরং নিজেই তিনি অগ্রণী হয়ে কিছুটা ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে।

প্রমাণ ডাঃ আলেকজেণ্ডার ওয়েরথ-এর নিজের মুখের স্বীকৃতি :

In 1944, 5,00,000 yen were handed over by the Japanese Government to the German Ambassador in Tokyo in the name of Netaji, to serve as the first partial repayment of loan which had been paid to the Free India centre by the German Government.

This amount was made of voluntary contributions made by Indians living in East Asia.

[Dr. Werth, P.—19]

অর্থাৎ—সেদিন ফ্রি ইণ্ডিয়াকে সহায়তা করার জন্য জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা সবটাই ঋণ হিসেবে। শর্ত ছিল—ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে সব অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

১৯৪৪ সালে জাপান সরকার সেই ঋণের প্রথম কিস্তি হিসেবে মোট পাঁচ লক্ষ ইয়েন টোকিওর জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নেতাজীর নির্দেশে। টাকাটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছিলেন নেতাজীকে।

ওদিকে বিক্ষোভের আগুনে গোটা ভারত তখন জ্বলছে। জ্বলছে সমগ্র বাংলাদেশ। জ্বলছে বাংলার হল্‌দিঘাট মেদিনীপুর। ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

অপরপক্ষও চুপ করে বসে নেই। দেখতে দেখতে ব্রিটিশ টমির দল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিল মেদিনীপুরের অসংখ্য গ্রাম। যদিও ফ্যাসিস্টদের নৃশংসতার কথা বলতে গিয়ে তাদের সবার মুখেই এক রা।

খবর শুনে রক্তে বুঝি আগুন ধরে গেল সুভাষের। তারপরই তিনি অগ্নি-ঝরা ভাষায় ডাক পাঠালেন জাতির উদ্দেশ্যে।

'আমি সুভাষ বলছি······

১৯৩০ সালে মেদিনীপুরে যখন ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তখনও তাদের বাড়ির পর বাড়ি, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, মেয়েদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছিল, ভারতবর্ষ কি সেকথা ভুলে গেছে?

১৯৩১ সালে হিজলীর বন্দী-শিবিরে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে যে নৃশংসতার অনুষ্ঠান হয়েছিল, বাংলার প্রতিটি ঘরে আজো তার স্মৃতি বিদ্যমান।

যুদ্ধ শুরু হবার পর বর্মার ব্রিটিশ টমিরা তাদের পরিবারের কাছে ছিন্নশির বন্দীদের যে-সব ছবি পাঠাত, তা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এ ধরনের নৃশংসতা কেবলমাত্র ব্রিটিশ টমিদের পক্ষেই সম্ভব।

স্বাধীনতা দাবী করার অপরাধে আজ ব্রিটিশ টমিরা নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর যে নৃশংস অনুষ্ঠান শুরু করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা আছে কি?

নৃশংসতার খেলায় যারা নিজেরা এতখানি পটু, অন্য কারো বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগ তাদের মুখে শোভা পায় কি?

অবশেষে আমি বাংলাদেশের অধিবাসীদের এই বলে সতর্ক করে দিতে চাই যে, শীগগিরই তাদের খুব দুর্দিন আসছে। পূর্বাঞ্চলে রক্তপাত ঘটবে। তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। এবার বাংলাকেই আবার তার উচ্ছেদের দায়িত্ব নিতে হবে।

…এজন্য বাংলার গর্বিত হওয়া উচিত। পথিকৃৎদের কর্তব্য চিরদিনই কঠিন, কিন্তু তা গৌরবের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাংলাদেশ তার কর্তব্যের উপযুক্ত হয়ে উঠবে এবং এ-যুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করবে।

স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হবে পূর্বাঞ্চলে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ!'

সেপ্টেম্বর গড়িয়ে অক্টোবর। তারপর নভেম্বর।

দেখতে দেখতে ক্রমশ একটা প্রশ্ন দানা বেধে উঠল সুভাষের মনে।

হঠাৎ জাপান এত চুপচাপ কেন? কি ব্যাপার! কোথায় এই রহস্যের উৎস?

একই প্রশ্ন তখন প্রতিটি ভারতবাসীর মনে। জাপানীরা এমন চুপচাপ কেন? তাদের পরবর্তী লক্ষ্য কি? অস্ট্রেলিয়া, না ভারতবর্ষ?

কোন জবাব নেই।

বর্মার পতন হয়েছে ১৯৪২ সালের মে মাসে। সেই থেকে দীর্ঘ আট মাস জাপানীরা একেবারে চুপচাপ।

কেন তাদের এই বেমানান নিঃশব্দতা? কি এর কারণ?

অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউওয়ে, কিস্কা, নিউগিনি, গুয়াদাল ক্যানাল ইত্যাদি দ্বীপগুলির ওপর বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আক্রমণ যে তারা না চালিয়েছে, এমন নয়।

বছরের শুরুতে (১৯শে ফেব্রুয়ারি) অস্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে বোমা-বর্ষণও করেছিল একবার। কিন্তু তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় না যে, অস্ট্রেলিয়া বা ভারতবর্ষে কোনরকম অভিযান চালাতে তারা বদ্ধপরিকর।

কারণ, সেই একবারই। তারপর আর কোনদিনই তারা হাত বাড়ায়নি অস্ট্রেলিয়ার দিকে।

অথচ নিরাপত্তার দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ, দুটোই তাদের পক্ষে বিপদজনক।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত ঘাঁটি। ওদিকে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থার তখন অস্ট্রেলিয়ায়। ওখানেই তিনি তাঁর হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করেছেন ফিলিপাইন থেকে বিতাড়িত হয়ে।

এ দুটি ঘাঁটি যতক্ষণ বজায় থাকবে, ততক্ষণ এশিয়া ভূখণ্ডে তাদের নিশ্চিন্ত হবার যো কোথায়।

কাজটা সহজ নয়। আধুনিক যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে হলে সব কিছুই নির্ভর করে উপযুক্ত সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর।

সেখানে সামান্য এদিক-ওদিক হলেই সমূহ বিপদ।

জাপানীরা একান্তভাবেই সমুদ্র-নির্ভর জাতি। এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড তখন তাদের দখলে। সেই বিরাট ভূখণ্ডে যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রেখে অস্ট্রেলিয়া বা ভারতবর্ষের মতো দুটি বিরাট মহাদেশে অভিযান চালানোর মতো নৌ এবং বিমান তাদের আছে কি?

সে লোকবলই বা জাপানীদের কোথায়?

তবে কি আক্রমণের পালা এখানেই শেষ?

ঘরের পাশে ব্রিটিশ এবং মার্কিনের মতো দু-দুটো বিরাট শক্তিকে অবস্থান করতে দেখেও কি তারা চুপচাপ বসে থাকবে হাত-পা গুটিয়ে?

প্রমাণ পাওয়া গেল ২০শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে।

কন্‌কনে শীতের রাত্রি। পথঘাট জনমানব শূন্য। প্রাণের কোন স্পন্দনই নজরে পড়ে না আশে-পাশে। শুধু ঠুলি-পরা লাইটপোস্ট-গুলি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

তবে এ ব্যাপারে একপক্ষকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। সবাই সমান।

যেমন জার্মানীর প্রচার-সচিব ডঃ গোয়েবল্‌স্, তেমনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল।

সত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কে যে বড়, তা রীতিমত গবেষণার বিষয়।

বরং সেদিক থেকে সোভিয়েত সামরিক ইস্তাহার ছিল কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, শুধু শত্রুপক্ষ নয়, সেই সঙ্গে নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির ও চরম বিপদের কথা কোনদিনই তারা গোপন করতে চেষ্টা করেনি দেশবাসীর কাছে।

মাঝে মাঝে এই নিয়ে মজাও হত মন্দ নয়। যেমন জাপানীদের বোমা-বর্ষণের ঘটনা।

সত্যি বলতে কি, অনেকেই সেদিন বিশ্বাস করেনি কথাটা। তাদের বক্তব্য: জাপানীরা আমাদের দেশে বোমা-বর্ষণ করেনি, করেছে ব্রিটিশ সরকার নিজেই। উদ্দেশ্য, আগস্ট-বিপ্লবকে অন্য পথে চালিত করা।

হয়তো সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহটা একেবারে অমূলক ছিল না। তবু একথা ঠিক যে, জাপানী বিমান-বহরই সেদিন বার বার হানা দিয়েছিল ভারতের বুকে, ব্রিটিশ নয়।

তবে ব্যাপক বিমান আক্রমণ বলতে যা বোঝায়, তা কোনদিনই ঘটেনি। যা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সবই অতি সাধারণ ধরনের ছোট বোমা।

উদ্দেশ্য, জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে যুদ্ধরত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করা, যা ইতিপূর্বে করা হয়েছিল পোল্যাণ্ড, প্যারিস, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি জায়গাগুলিতে।

লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভীড় যে ওসব স্থানের সামরিক ব্যবস্থাকে অনেকখানি বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, সেকথা কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

এখানেও তাই হল। দেখতে দেখতেই কলকাতা শহর প্রায় ফাঁকা। সবার মুখে একই রব। পালাও! পালাও! বাঁচতে চাও তো শীগগির পালাও! জাপানীরা এসে পড়ল বলে!

সকাল-সন্ধ্যা শহরের বাইরে ছুটে চলেছে ভয়ার্ত নাগরিকের দল।

কিন্তু যাবে কোথায়? ট্রেনে জায়গা পাওয়া তো দূরের কথা, স্টেশনের কাছাকাছিও যাবার উপায় নেই। অন্যান্য যান-বাহনেরও সেই একই অবস্থা। অগত্যা হাঁটা-পথে।

ভয়ে-ত্রাসে প্রতিটি প্রাণী দিশেহারা। কখন কি হয়, কে জানে! এ জগতের আকাশে-বাতাসে মৃত্যু। অলক্ষ্য থেকে কখন যে মৃত্যু এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে বলতে পারে!

পেছনে তাকাবার সময় নেই। এ হচ্ছে বাঁচার সংগ্রাম। সেই বাঁচার তাগিদেই সবাইকে অনিশ্চিতের পথে এগিয়ে যেতে হবে কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে।

নানা জাতের, নানা মতের মানুষ। কিন্তু সবার মন তখন একই সুরে বাঁধা। বাঁচতে হবে। যে করে হোক, আমাদের বাঁচতে হবে। তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও।

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষের কোথায়, মোট কতবার বিমান আক্রমণ ঘটেছিল, এবার মোটামুটি তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তোমার কাছে তুলে ধরব, মল্লিকা।

তবে ব্রিটিশ সামরিক বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত এ তালিকায় হতাহত এবং ক্ষয়-ক্ষতির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা যে কতখানি সত্য, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু আমি কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, আধুনিক যুদ্ধের প্রধান নীতিই হল গোপনীয়তা। সেখানে এর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবার মতো সাধ্য কোথায় বলো?

প্রথম আক্রমণ ঘটেছিল ১৯৪২ সালের ৬ই এপ্রিল ভিজাগাপট্টম ও কোকনদে। সেকথা তোমাকে আগেই বলা হয়েছে।

৮ই মে বোমা-বর্ষণ করা হল চট্টগ্রামে। শুধু বোমা নয়, মেশিন-গানও সেদিন চার্জ করা হয়েছিল বিমান থেকে। তবে ক্ষতির পরিমাণ খুবই নগণ্য। বিমান-ঘাঁটিতে কর্মরত অবস্থায় কুলী নিহত হয়েছিল মাত্র ১৫০ জন!

পরদিন ৯ই মে শনিবার আবার চট্টগ্রামে বোমা-বর্ষণ করা হল সকালবেলায়। ইস্তাহারে ক্ষয়-ক্ষতির কোন কিছু উল্লেখ নেই। বোধহয় নগণ্যই হবে!

১০, ১৬ এবং ১৮ই মে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য।

দীর্ঘ পাঁচ মাস চুপচাপ। তারপর আবার আক্রমণ চালানো হল ২৫শে অক্টোবর।

প্রায় ৯৫টি জাপানী বিমান সেদিন হানা দিল ডিব্রুগড়ে অবস্থিত মার্কিন বিমান-ঘাঁটির ওপর।

দেখতে দেখতে জোর লড়াই বেধে গেল দু পক্ষের মধ্যে। অন্তত পক্ষে দশটি জাপ-বিমান যে ধ্বংস হয়েছে, তাতে আর কোন ভুল নেই। মার্কিনদের মাত্র একটি!

একই দিনে আবার বোমা-বর্ষণ করা হল চট্টগ্রাম বিমান-ঘাঁটির ওপর। এই নিয়ে মোট তিনবার।

২৬ এবং ২৮শে আসামের বিভিন্ন স্থানে। ৫, ১০ এবং ১৫ই ডিসেম্বর আবার চট্টগ্রামে। ১৫ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল মোট দুবার।

বর্মা হাত-ছাড়া। পরবর্তী লক্ষ্য, নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ। তাই আসাম এবং পূর্ববাংলার চট্টগ্রাম, ফেনী, আগরতলা, সিঙ্গারবিল ইত্যাদি স্থানে তখন অসংখ্য বিমান-ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছিল সামরিক প্রয়োজনে।

যে করে হোক, জাপানীদের রুখতেই হবে। মালয়, বর্মা, সিঙ্গাপুর, হংকং, সবই তো গেছে। একমাত্র বাকি রয়েছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষও যদি চলে যায়, তো রইল কি!

কিছুই নজর এড়ায়নি জাপানীদের। জানতেও বাকি ছিল না কোনকিছু। আবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৬ই ডিসেম্বর। সেদিন সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ করা হল ফেণী বিমান-ঘাঁটিতে। সেই সঙ্গে চট্টগ্রামে।

২০, ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর পর-পর তিন দিন বোমা-বর্ষণ করা হল মহানগরী কলকাতায়। ২২শে ডিসেম্বর কোথায় বোমা পড়েছিল জানো, মল্লিকা ?

পড়েছিল—উত্তর কলকাতার হাতিবাগান বাজার ও একটা বস্তিতে। তিন দিনের আক্রমণে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২৫, আর আহত মোট ১০০ জন। দুটি জাপানী বিমান ঘায়েল হয়েছে বলে অনুমান।

২৩শে ডিসেম্বর আবার আক্রান্ত হল ফেণী বিমান-ঘাঁটি। এই সঙ্গে চট্টগ্রামও বাদ গেল না। লক্ষ্য—সেই বিমান-ঘাঁটি।

আবার পরদিন ২৪শে ডিসেম্বর কলকাতা।

প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সেদিন বোমা-বর্ষণ করা হল কলকাতায়। প্রায় সবগুলিই ছোট বোমা। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। বিমানধ্বংসী কামানের গোলায় একটি জাপানী বিমান ধ্বংস হয়েছে বলে সামরিক দপ্তরের ইস্তাহারে দাবী।

তিন দিন বিরতির পরে ২৭শে ডিসেম্বর আবার সেই কলকাতা। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম ও ফেণী।

১৫ই জানুয়ারি ১৯৪৩ সাল। আবার এক ঝাঁক বোমারু বিমান হানা দিল কলকাতার বুকে।

বাধা দিল এ পক্ষের বিমান-বহর। সামরিক দপ্তরের ভাষায়; ব্রিটিশ বিমান-বহরের ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট মিঃ স্প্রিং-এর অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন। মাত্র পাঁচ মিনিটে তিনটি জাপানী বিমান ধ্বংস। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। একটা কুলী-বস্তিতে বোমা পড়ায় সামান্য কিছু লোক হতাহত হয়েছে মাত্র।

১৭ই জানুয়ারি পর পর আক্রান্ত হল ফেণী, চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি অগ্রবর্তী সামরিক এলাকা।

১৯শে জানুয়ারি আবার কলকাতা। ধ্বংস হল দুটি জাপানী বিমান। এ পক্ষে একটি ভূপতিত। ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই।

২২শে জানুয়ারি আক্রান্ত হল পূর্ববাংলার কোন একটি জায়গা।

২৩শে চট্টগ্রাম। ঠিক একমাস পরে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বোমা-বর্ষণ করা হল উত্তর-পূর্ব আসামে অবস্থিত একটি মার্কিন বিমান-ঘাঁটির ওপর। একই বিমান-ঘাঁটি আবার আক্রান্ত হল ২৫শে তারিখে।

২রা মার্চ আবার চট্টগ্রাম। ২১শে মার্চ—ফেণী। ২৩শে মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি বিমান-ঘাঁটি। ২৪শে মার্চ আবার চট্টগ্রাম।

২৫শে মার্চ পূর্ববাংলার কোন একটি বিমান-ঘাঁটি।

২৭শে মার্চ তারিখে জাপানী বিমান-বহর সর্বপ্রথম হানা দিল কক্সবাজারে। ২৯শে মার্চ আবার কক্সবাজার।

৩০শে মার্চ বোমা-বর্ষণ করা হল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের ওপর।

১লা এপ্রিল ফেণী বিমান-ঘাঁটি। ৪ঠা এপ্রিল চট্টগ্রাম। ৫ই এপ্রিল প্রায় ৫০টিরও বেশি জাপানী বিমান হানা দিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে। ৬ই এপ্রিল আবার জাপানী বিমান এসে হাজির। সেই অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে।

৮ই এপ্রিল শহরের দক্ষিণে অবস্থিত সেই চট্টগ্রাম বিমান-ঘাঁটি।

পরদিন ৯ই এপ্রিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি সামরিক বিমান-ঘাঁটি। ২০শে এপ্রিল সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ করা হল ইম্ফলে। আবার আক্রমণ চালানো হল ২২শে এপ্রিল। ২রা এবং ৫ই মে আক্রান্ত হল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি বিমান-ঘাঁটি।

২২শে মে প্রচণ্ড আকাশ-যুদ্ধ সুরু হল কক্সবাজার ও ফেণীতে।

কক্সবাজারে জাপানী বিমান ধ্বংস হল চারটি। ফেণীতে ভূপতিত হল তিনটি। এ পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নেই।

২২শে এবং ২৯শে মে চট্টগ্রাম। সেই একই বিমান-ঘাঁটিতে।

বেশ কয়েকমাস চুপচাপ। বোমার আতঙ্ক থেকে রেহাই পেয়ে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। যাক, বাঁচা গেছে! আর বোধহয় জাপানী বিমান-বহর হানা দিতে আসবে না আমাদের দেশে।

কার্যত কিন্তু তা হল না, মল্লিকা। আবার আক্রমণ শুরু হল ১১ই অক্টোবর। সেদিন সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ করা হল মাদ্রাজে।

২০শে অক্টোবর চট্টগ্রাম।

২৫শে অক্টোবর কক্সবাজার। ৯ই নভেম্বর ইম্ফল।

১১ই নভেম্বর আবার বোমা-বর্ষণ করা হল মাদ্রাজে। ২৮শে ফেণী বিমান-ঘাঁটি। ২৯শে পূর্ববাংলার একটি বিমান-ঘাঁটিতে।

৫ই ডিসেম্বর দিনের বেলা বোমা-বর্ষণ করা হল খিদিরপুর ডক্ এরিয়ায়। একবার নয়, পর-পর দুবার।

সামরিক দপ্তরের মতে—ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। মাত্র একজন নিহত। আহত তেরোজন।

কর্পোরেশনের হিসেবে নিহত এ পর্যন্ত ৩৭০ জন। আরো অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

হৈ-চৈ করে উঠল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলি। বিশেষ করে স্টেটস্‌ম্যান। তীব্র আক্রমণ করে তাদের সম্পাদকীয় কলমে লেখা হল :

'...এই কি আমাদের জনপ্রিয় সরকারের প্রতিরক্ষার নমুনা! এই কি তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন! প্রকাশ্য দিবালোকে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু-বিমান এসে কলকাতার ওপর নির্বিচারে বোমা-বর্ষণ করে গেল, অথচ আমাদের দিক থেকে বাধা দেবার সামান্য চেষ্টা পর্যন্ত কোথাও দেখা গেল না! এই যদি প্রতিরক্ষার নমুনা হয়,

তবে এ সরকারের ওপর আমরা নির্ভর করব কি করে? কোন্ ভরসায়?…'

এবার শোন দেশীয় সাময়িক পত্রিকার মন্তব্য:

'…গত ১৯শে অগ্রহায়ণ বহুদিন পরে দুই ঝাঁকে জাপানী বিমান কলিকাতা অঞ্চলের উপর হানা দিয়াছিল। এবার আক্রমণ হইয়াছিল দিবাভাগে।

এই আক্রমণ আকস্মিকভাবে হইলেও ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। কলিকাতা অঞ্চল জাপানীদের বিমান আক্রমণের পাল্লার মধ্যে আছে এবং বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা সত্ত্বেও এই ধরনের আক্রমণ অসম্ভব করিয়া তোলা যায় না।

সরকারী বিবৃতিতে দেখা যায়, এই আক্রমণের ফলে একজন সামরিক ব্যক্তি হত এবং ১৩ জন আহত হইয়াছে। অথচ বেসরকারী মতে হতাহতের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত।…' [দেশ: ৪-১২-৪৩]

১৩ই ডিসেম্বর আক্রান্ত হল উত্তর-পূর্ব আসামে অবস্থিত একটি মার্কিন বিমান-ঘাঁটি। ২০শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম। ২৬শে ডিসেম্বরও তাই।

এই নিয়ে চট্টগ্রাম আক্রান্ত হল মোট ২০ বার। কলকাতা ৮ বার। ফেণী ৭ বার। ইম্ফল ও কক্সবাজার ৩ বার করে।

আগেকার দু বছরের তুলনায় ১৯৪৪ সালে বিমান-হানার সংখ্যা অনেকটা কম। তার মধ্যে ৩রা ফেব্রুয়ারি উড়িষ্যা-উপকূল ভাগে। ১৩ই মার্চ শিলচর এলাকায়, ১৬ই মার্চ ইম্ফল আর ২৫শে মার্চ বোমা-বর্ষণ করা হয়েছিল কক্সবাজারে।

দীর্ঘ ন'মাস চুপচাপ। তারপর আবার শুরু হল ডিসেম্বর মাসে। তার মধ্যে ৮ই ডিসেম্বর উড়িষ্যা-উপকূলে আর ২৫শে ডিসেম্বর পূর্ববাংলার একটি বিমান-ঘাঁটিতে।

২৫শে ডিসেম্বরই জাপানী বিমান-বহরের শেষ অভিযান। তারপর আর কোনদিনই তারা হানা দিতে চেষ্টা করেনি ভারতবর্ষে।

'ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে,
আজো রোমাঞ্চকর।'

কবি সুকান্তর রচনা। বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জ্বেলে সেদিন যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করেই সুকান্ত একদিন রচনা করেছিলেন এই অবিস্মরণীয় কবিতাটি।

কিন্তু আজ আর ঐ কথাগুলোর এক কানাকড়িও দাম নেই, মল্লিকা। তা যদি থাকত, তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস অন্য-রকম ভাবে লেখা হত। কিন্তু তা হয়নি।

সত্যেন বর্ধন, এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম্, মানকুমার বসু, ফৌজ সিং—এই নামগুলি তুমি কোনদিন শুনেছ কি, মল্লিকা? জানো ওদের কি পরিচয়?

নিশ্চয়ই জানো না। শুধু তুমি কেন, কেউ জানে না।

দোষ তোমাদের নয় মল্লিকা, আমাদের। আমরাই তোমাদের এতদিন ওদের কথা জানতে দিইনি। সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই আমরা ওদের নামগুলি মুছে দিয়েছি ইতিহাসের পাতা থেকে।

কারণ, আমরা নেতিবাদে বিশ্বাসী। কেউ আমাদের গালে এক চড় দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্য গাল পেতে দেব, তবু প্রত্যাঘাত কিছুতেই নয়। তাহলে সারা পৃথিবীর কাছে আমরা আদর্শভ্রষ্ট হব।

ওদের নীতি ঠিক তার বিপরীত। দেশের জন্য ওরা মরতে জানে, মারতেও জানে।

প্রমাণ—ইতিহাস। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ

করে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ওরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছে, তাকে অস্বীকার করার সাধ্য কোথায় ?

আপত্তি সেইখানেই। শুধু আপত্তি নয়, ভয়ও। কে জানে, ওদের নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে একদিন আমাদের বিরুদ্ধেই যদি তোমরা এমনি করে রুখে দাঁড়াও ?

না, আমরা তা হতে দিতে পারি নে। তার চাইতে যা চাপা আছে, তা চাপাই থাক।

ওদের চিনতে হলে আমাদের সেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রাম-মুখর দিনগুলিতে ফিরে যেতে হবে, মল্লিকা।

১৯৪২ সাল। যুদ্ধের আগুনে সারা পৃথিবী তখন জ্বলছে।

মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও মোহন সিংয়ের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয় সেদিন দেশপ্রেমের বন্যায় উদ্দীপ্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আহত ব্রিটিশ সিংহের অন্তিম সময় উপস্থিত। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। পতন হয়েছে গোটা বর্মার।

এই তো সুযোগ ! এবার একটা চরম আঘাত হেনে পররাজ্য-গ্রাসী ঐ রক্ত-চোষা জাতকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে দূর করে দিতে হবে।

জানি, তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অসংখ্য তাজা তরুণ প্রাণ। তাই দেব। তবু এবারের এই অপূর্ব সুযোগটিকে আমরা কোনরকমেই হারাতে রাজী নই।

তার আগে কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণকে উপযুক্ত বেতার ট্রান্সমিটারসহ গোপনে ভারতে ফিরে যেতে হবে।

ওখানে গিয়ে ট্রান্সমিটারের সাহায্যে জানাতে হবে শত্রুর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর। জানাতে হবে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা। জানাতে হবে সব কিছু।

সুযোগ এবং সুবিধামত সম-আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় নেতাদের

সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে। তারপর জনসাধারণের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের জানাতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সামরিক প্রস্তুতির কথা। বলতে হবে—আর সময় নেই। সংগ্রাম আসন্ন। সবাই প্রস্তুত হও।

কে যাবে এই কঠিন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে ভারতের মাটিতে? কাকে পাঠানো যায়?

সবাই রাজী। স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

মোহন সিংয়ের নির্দেশে সব কিছু ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন কর্নেল এন. এস. গীল। ঠিক হল, মোট চৌদ্দজনকে ভারতবর্ষে পাঠানো হবে বিভিন্ন দলে ভাগ করে।

মোহন সিংয়ের বিশ্বস্ত বন্ধু মেজর মহাবীর সিংয়ের নেতৃত্বে একদল যাবে কালেয়া ও চীন পাহাড় পেরিয়ে ইম্ফলের দিকে। সঙ্গে থাকবেন ক্যাপ্টেন বলবন্ত সিং, রাম সিং, পরব প্রমুখ সেনানীবৃন্দ।

অন্যদলের লক্ষ্য, আরকান, আকিয়াব, কক্সবাজার হয়ে সোজা বাংলাদেশ। বাদ বাকি সবাই সাবমেরিনে।

বিশ্বাসঘাতক সব দেশেই আছে। কি ইংল্যাণ্ড, কি রাশিয়া, কি আমেরিকা, কোথাও তার অভাব নেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

সহসা এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এল মাথা উঁচিয়ে।

সব পণ্ড করে দিতে হবে। সবাইকে ধরিয়ে দিতে হবে। ধরিয়ে দিলে অনেক টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। সেই সঙ্গে খেতাব। চাকুরি-জীবনে এ যে আশাতীত সৌভাগ্য! এই তো তার সুযোগ! না, এ সুযোগ হারালে চলবে না।

কে সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক? কি তার নাম?

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? কি করে ব্রিটিশ মিলিটারীর পক্ষে জানা সম্ভব হল তাঁদের অবস্থিতির কথা?

নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কে সেই বিংশ শতাব্দীর মিরজাফর?

মেজর মহাবীর সিং ধীলন। পুরস্কার ও খেতাবের লোভে সেই ঘৃণ্য দেশদ্রোহীই সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জীর ভাষায়:

'...they were surrounded and captured by the British Indian forces who must have received previously all the necessary information from those who had deserted under the leadership of Maj. M. S. Dhillon to the British.' [Ibid : P.—46]

এইখানেই শেষ নয়, মল্লিকা। এবার শোন সাবমেরিনযোগে আগত মুক্তি-যোদ্ধাদের কথা।

সবার আগে এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম্ প্রমুখ পাঁচজনের একটি দল এসে অবতরণ করলেন কালিকটের উপকূলে।

অন্যদলে রইলেন বেতার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বাঙালী তরুণ সত্যেন বর্ধন ও আরো চারজন। তাঁদের লক্ষ্য—কাথিয়াবাড়ের উপকূল।

দিগন্ত-বিস্তৃত আরব সাগর। অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া মিছিলের।

সহসা সেদিন একটা সাবমেরিনের পেরিস্কোপ আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াল জলের ওপর। তারপর গোটা সাবমেরিনটাই।

না, কাছে-কিনারে শত্রুপক্ষের কেউ নেই। সামান্য একটা জেলে-ডিঙি পর্যন্ত কোথাও নজরে পড়ে না। এই তো সুযোগ। এবার তোমরা রবারের ডিঙিতে চেপে নির্ভয়ে এগিয়ে যাও উপকূলের দিকে। মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্ব। আশা করি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই

তোমরা পৌঁছে যেতে পারবে। কামনা করি, তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হোক।

যাত্রাপথ কিন্তু মোটেই শুভ হয়নি, মল্লিকা। সে-কথাই তোমাকে এখন বলব।

বেতার ট্রান্সমিটারসহ রবারের ডিঙি করে পাঁচজন ক্রমশ এগিয়ে চললেন উপকূলভাগের দিকে।

চোখে দিগন্ত-সীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। আমরা স্বাধীনতার সৈনিক। এগিয়ে চলাই আমাদের সহজাত ধর্ম। এগিয়ে আমরা যাবই। কেউ পারবে না আমাদের গতিরোধ করতে। কেউ না।

ততক্ষণে সাবমেরিনটা আবার তলিয়ে গেছে জলের নিচে। শুধু সমুদ্রের বুকে খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কোন কিছুর চিহ্নও নজরে পড়ে না।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারপর রাত্রি।

উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আস্তে আস্তে রবারের ডিঙিটা এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে। আর বিশেষ বাকি নেই। মাইল খানেক মাত্র।

দেখতে দেখতে একসময়ে আকাশটা কালো হয়ে উঠল মেঘে মেঘে। শুরু হল ঠাণ্ডা হাওয়া।

শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল সত্যেন বর্ধনের মুখ। গতিক সুবিধের নয়। সমুদ্র আজ সারাদিন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় শীগগিরই বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্রের সে কি বিচিত্র রূপ! সে কি তার নাচের ঘটা!

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু বাহু আকাশে তুলে দুরন্ত আক্রোশে মুহুর্মুহুঃ সে আঘাত করতে লাগল রবারের পাতলা নৌকোটার গায়ে। যেন নিজ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশকারী এই তুচ্ছ প্রাণী ক'টাকে অতল সমাধিতে না-পাঠানো পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি নেই তার।

ঝড়ের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে এগিয়ে চলেছেন ওঁরা পাঁচজন।

কিন্তু কোথায় উপকূল! উপকূলের চিহ্নও নজরে পড়ে না কোথাও। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপ্‌টায় রবারের ডিঙিটা যে তখন আপন খেয়ালে কোথায়, কোন্ অনির্দেশের পথে ছুটে চলেছে, কে জানে!

এমনি করে সারারাত। কথা ছিল রাত্রির প্রথম ভাগেই তীরে অবতরণ করবেন, কিন্তু সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেল ঝড়ের জন্য। ফলে, মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁদের সময় লেগে গেল দীর্ঘ একুশ ঘণ্টা।

ওদিকে ততক্ষণে অন্ধকার কেটে গিয়ে পুব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। রাস্তায় লোক-চলাচল শুরু হয়েছে একটি-দুটি করে। এ অবস্থায় কিছু একটা বিপদ ঘটে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

আশঙ্কা মিথ্যে হল না।

সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়াল স্থানীয় একজন গ্রাম্য লোক। চোখে-মুখে তার অধীর কৌতূহল। বাঃ! কি সুন্দর ডিঙিটা!

কিন্তু একি! এ তো কাঠের তৈরি ডিঙি নয়! এ যে রবারের! আমাদের দেশে তো এ জিনিসের কোন প্রচলন নেই!

তাহলে এ ডিঙি কোথা থেকে এল! ওরা কারা! এলই বা কোথা থেকে!

এক কান থেকে অন্য কান। তারপর গোটা গাঁ জুড়ে সেই একই আলোচনা। ওরা কারা! রবারের ডিঙি করে এলই বা কোথা থেকে!

শেষ পর্যন্ত স্থানীয় থানাতে। রবারের ডিঙি করে কারা এসেছে গো বাবু! ওরা কারা?

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ বাহিনী ছুটে এল ঝড়ের বেগে। কই? কোথায় ওরা?

অবশ্য এমনি একটা সতর্ক নির্দেশ ওপর থেকে আগেই এসে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানেই যে তাদের সাক্ষাৎ মিলবে, তা কে জানত!

সত্যেনের তখন একমাত্র চেষ্টা সবাইকে নিয়ে জনতার মধ্যে মিশে যাওয়া। কিন্তু সব বৃথা। যাদের মুক্তির জন্য তাঁদের এই মরণপণ সংগ্রাম, সেই গ্রামবাসীরাই তাঁদের শেষ পর্যন্ত ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে।

প্রথম দলে আগত এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম্ প্রমুখরাও রেহাই পেলেন না। তাঁরাও একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে।

আর ধরা পড়লেন ফৌজ সিং এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন। বিভিন্ন দলে তাঁরা এসেছিলেন চট্টগ্রাম এবং আসামের মধ্য দিয়ে হাঁটা-পথে।

সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল মাদ্রাজ ফোর্টে। এবার বিচার। অপরাধ—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা।

৮ই মার্চ, ১৯৪৩ সাল। বিচার শুরু হল সবার অগোচরে, অতি সন্তর্পণে।

সাবধান, ভারতবাসী যেন ঘুণাক্ষরেও এ খবর জানতে না পারে। আগস্ট-আন্দোলনের আগুন তখনো জ্বলছে এখানে-ওখানে। এ অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই কর্মতৎপরতার খবর একবার তাদের কানে গেলে আর রক্ষে নেই।

রায় দেওয়া হল ১লা এপ্রিল। সত্যেন বর্ধন, আবদুল কাদের, আনন্দম্ ও ফৌজ সিং—এই চারজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড।

আপীলে বাকি একজনকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বন্দীরা নির্বিকার। গানে গল্পে আনন্দে উচ্ছ্বাসে সর্বক্ষণই তাঁরা ভরপুর। যেন মৃত্যু তাঁদের কাছে একটা খেলামাত্র।

মাদ্রাজ ফোর্টের কনডেমণ্ড্ সেল থেকেই মৃত্যুপথযাত্রী সত্যেন একদিন চিঠি লিখে পাঠালেন তাঁর দাদাকে ঃ

'…স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়া বাঙালীর পক্ষে নতুন কিছু নয়। আমি গর্বিত যে, ভগবান আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন।'

সত্যেন আগে ছিলেন মালয়ের ডাক ও তার বিভাগের কর্মী। কিন্তু এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে!

সত্যেনের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই সব কিছু ত্যাগ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে। সেখান থেকে ট্রেনিংয়ের জন্য পেনাং-এ।

সেখানেই পরিচয় ঘটেছিল আবদুল কাদের, ফৌজ সিং প্রমুখ সহকর্মীদের সঙ্গে। এ অভিযানে সবাই তাঁরা অংশীদার।

ফাঁসির দিন ধার্য হল ১৯শে সেপ্টেম্বর। সবাইকে সে-কথা জানিয়ে দেওয়া হল যথাসময়ে।

বন্দীরা তেমনি নিবিকার। দিক না ওরা ফাঁসি! সময় হলেই দিব্যি চলে যাব। ব্যস, ফুরিয়ে গেল!

সন্ধ্যার পর থেকেই সেদিন শুরু হল জলসা।

শুধু গান—গান আর গান! কখনো আবৃত্তি। মাঝে মাঝে সুউচ্চ কণ্ঠে ভাষণ। সব কথা আজ শুনিয়ে যেতে হবে দেশবাসীকে। বলে যেতে হবে যে, সংগ্রাম আসন্ন। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। তোমরা সবাই প্রস্তুত হও।

দেখতে দেখতে একসময়ে ফর্সা হয়ে এল পুব আকাশটা। ভেসে এল দূরাগত মিলিটারী বুটের ভারী শব্দ—গট্ গট্—গট্ গট্—গট্ গট্…

ক্রমশ শব্দটা এগিয়ে এল আরো কাছে। প্রস্তুত হও। এবার যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সবার প্রাণোচ্ছল কণ্ঠ—হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত। আমরা আজাদী সৈনিক। মৃত্যুকে আমরা কোনদিনও ভয় পাই নে। চল কোথায় যেতে হবে! বল ভাই সব—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

গট্ গট্—গট্ গট্—গট্ গট্···আস্তে আস্তে আবার একসময়ে বুটের শব্দ মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। তখনও দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে শোনা যেতে লাগল সেই মাতৃবন্দনা—আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ।

তারপরই সব স্থির। সবই শান্ত। কোথাও আর কোন সাড়া-শব্দ নেই।

সব যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সব ঠিক থাকবে। সবই চলবে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে।

শুধু পাখির কলরব··শান্ত হয়ে গেছে। সে কলকণ্ঠ তখন একেবারে স্তব্ধ।

সত্যেন বর্ধন, আবদুল কাদের, আনন্দম্, ফৌজ সিং—সবাই চলে গেলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে।

আর মেজর এম. এস. ধীলন! সেই ঘৃণ্য দেশদ্রোহীর কি হল?

না, ইংরেজ সরকার বেইমান নয়। তাই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সভ্য'—এই খেতাব তারা তাকে দিয়েছিল যথাযথভাবেই। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজের ভাষায়:

'On arrival at the front, however, a very prominent member of the party and a close and a trusted

friend of Gen. Mohan Singh betrayed the rest of the party by communicating with the British Forces and going over to them.

On arrival in India, this officer is said to have concocted hair-raising stories about his heroic escape from Singapore. He also brought away with him some very secret I. N. A. documents and records, and he was rewarded for his treachery to his comrades and country by being awarded the much-coveted honour of being made a Member of the British Empire.' [My Memories of I. N. A. & its Netaji : Maj. Gen. Shahnawaz Khan : P.—49]

শুধু ব্রিটিশ সরকার নয়, পরবর্তী কালে আমাদের দেশের স্বাধীন সরকারও এই মানুষটিকে তার অপূর্ব প্রভুভক্তির জন্য যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে একটুকুও ভুল করেননি, মল্লিকা। কারণ, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ! এ দেশে শত্রু-মিত্র, ভণ্ড-বেইমান, সবার সমান অধিকার! সুতরাং, কোনদিক থেকেই আপত্তির কোন কারণ ঘটেনি।

আপত্তি শুধু আই. এন. এ.-কে স্বীকৃতি দেবার বেলায়।

কারণ? কারণ, তারা সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বুকের রক্তে ইম্ফলের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিল।

সেই সুভাষ বোস, যাকে গান্ধী-বিরোধিতার জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল কংগ্রেস থেকে। সুতরাং, তার আই. এন. এ.-কে স্বীকৃতি দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে মল্লিকা। স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা সবাই আমাদের সমান শ্রদ্ধার পাত্র, এই তো আমরা জেনে এসেছি বরাবর।

আশ্চর্য, তাই নিয়ে আজ পর্যন্ত দলবাজীর আর অন্ত নেই।

অমুক আমাদের শহীদ, সুতরাং সে কুলীন ব্রাহ্মণ। আর অমুক! উঁহুঁ, সে আমাদের পার্টির কেউ নয়। সুতরাং, শহীদ-কুলে সে পতিত।

ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের কথা। ঠিক হল, মজঃফরপুর-বাসীদের উদ্যোগে সেখানে শহীদ ক্ষুদিরামের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হবে।

কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে কে?

ক্ষুদিরাম ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী বাংলাদেশের প্রথম শহীদ। তেমন উপযুক্ত লোক না হলে সেখানে চলবে কেন?

ঠিক হল, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন—জওহরলাল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী—সংগ্রামী পুরুষ জওহরলাল।

আশ্চর্য, আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন জওহরলাল। কারণ, দেশের মুক্তির জন্য ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিলেও ক্ষুদিরাম কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং, ক্ষুদিরামের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

কি লজ্জা! কি লজ্জা! কিন্তু লজ্জাটা কার, বলতে পারো মল্লিকা? ক্ষুদিরামের, না আমাদের?

এরপরেও কি মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ক্ষুদিরামের নাম উচ্চারণ করার মতো কোন অধিকার আমাদের থাকা উচিত?

তবে জওহরলালকে এজন্য কোন দোষ দেওয়া চলে না, মল্লিকা। কারণ, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি আর বিপ্লববাদ এক নয়।

প্রথমটাতে হাততালি আর ফুলের মালা, দুই-ই জোটে। কিন্তু পরেরটাতে হয় ফাঁসি, নয়তো দ্বীপান্তর, এর মাঝামাঝি কোন কথা নেই।

জওহরলালকে কোনদিনই সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

সুতরাং, কতবড় প্রচণ্ড মনের জোর থাকলে যে মানুষ স্বেচ্ছায় হাসতে হাসতে নিজের হাতে ফাঁসির রজ্জু ধারণ করতে পারে, সে অনুভূতি তাঁর না থাকাটাই স্বাভাবিক।

দোষ স্মৃতি-রক্ষা কমিটির। কেন তাঁরা সেদিন আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন জওহরলালকে? বাংলাদেশে আজও হেমচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ যাদুগোপাল প্রমুখ মহাবিপ্লবিগণ বেঁচে রয়েছেন। তাঁরাই কি ক্ষুদিরামের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নন?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'মৃত্যুঞ্জয় যাঁহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার উর্ধ্বে, দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ;
তাঁদের মাঝে যেন হয়
তোমাদের নিত্য পরিচয়।
তাঁহাদের খর্ব করো যদি,
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।'

কবিগুরুর এই কথাগুলোকে সত্যিই কি আমরা মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি, মল্লিকা?

আজ যাঁরা সব তুচ্ছতার উর্ধ্বে চলে গেছেন, সত্যিই কি তাঁদের সম্বন্ধে এতটুকুও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন আমাদের রাষ্ট্র-নায়কগণ?

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী নায়ক শ্রদ্ধেয় প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বড় দুঃখের সঙ্গে কি বলেছেন, শোন:

'খাদি-কর্মীদের মধ্যে আমি প্রায় সকলেরই দেখেছি যে, অতীতের বিপ্লবী যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে একটা অহেতুক ঘৃণা ও বিদ্বেষ বা মানসিক তাচ্ছিল্যবোধ আছে। ভূতপূর্ব পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং আরো অনেক তথাকথিত গান্ধীবাদী নেতাদের মধ্যেই আমি এই মানসিক দৈন্যের ভাব লক্ষ্য করেছি।

তাঁরা প্রকাশ্য বক্তৃতায় ঐসব বিপ্লবী যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসায় মুখর হলেও ব্যক্তিগতভাবে যখন তাঁরা কথাবার্তা বলেন, তখন তাঁদের মনের আসল স্বরূপটি ফুটে বেরুতে আমি অনেকের মধ্যেই দেখেছি।

…সেইজন্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজও কংগ্রেসের ও বর্তমানের ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস নেতাদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে আছেন। কার্যকালে নেতাজীর জনপ্রিয়তাকে কংগ্রেস নেতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগানোর জন্য প্রকাশ্য জনসভায় তাঁরা নেতাজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় 'পঞ্চমুখ' হন এবং তাঁদের ভাষণ শেষ করেন 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে, কিন্তু সেই 'জয় হিন্দ' ধ্বনির উদ্গাতা নেতাজীকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য বোধ করেন।'
[পাক-ভারতের রূপরেখা: সাপ্তাহিক বসুমতী: ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৭ সাল]

যাক, দলবাজীর কচকচি ছেড়ে চল আমরা আগেকার সেই প্রসঙ্গে ফিরে যাই, মল্লিকা।

মোট চারজনকে সেদিন প্রাণ দিতে হল ফাঁসিমঞ্চে। সত্যেন বর্ধন, আনন্দম্, আবদুল কাদের আর ফৌজ সিং। কারণ, বিশ্বাসঘাতকতা!

কিন্তু একটা প্রশ্ন। লোক হিসেবে মহাবীর সিং ধীলন যে রীতিমত সন্দেহজনক, সে-খবর কি সেদিন তাঁদের অজানা ছিল?

এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জীর কি বক্তব্য শোনা যাক:

'Towards the end of the Conference in Bangkok, a big dinner was given in honour of the delegates attending the Indian Independence Conference.

I was sitting at one of the tables and overheard a confidential conversation between two high-ranking officers, both of whom tried to sabotage the Move-

ment, and one of whom has been actually reinstated in the British Indian Army.

This was Major Mahabir Sing Dhillon, who was then acting as the Quarter-master General of the Supreme Command of the I. N. A. I reported the matter later to Rash Behari Bose.' [India's Struggle for Freedom : P.—23]

দেখা যাচ্ছে, জুন মাসে অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকেই মেজর সাহেবের আসল চেহারাটা ধরা পড়েছিল শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জীর কাছে। সভাপতি রাসবিহারীর কাছে সে-কথা তিনি রিপোর্টও করেছিলেন যথাযথভাবে। তাহলে জেনে-শুনে সেই মানুষটিকেই আবার পাঠানো হল কেন এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে ?

তবে কি রাসবিহারী এ সম্বন্ধে কোনরকম সতর্ক করে দেননি মোহন সিংকে ?

দিয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু তাঁর সেই সতর্কবাণী কোন কাজেই আসেনি। 'The G. O. C. did not care to receive instruction from the President.' [Rash Behari Bose—His struggle for India's Independence : P.—564]

কিন্তু কেন ?

সে-কথা পরে আসছে। আগে এ প্রসঙ্গ শেষ করে নিই, তারপর সব কিছুই তোমাকে খুলে বলব এক এক করে।

মোট চারজন প্রাণ দিলেন ফাঁসিমঞ্চে। শুধু কি এই চারজনই ?

গত বিশ্বযুদ্ধে এমনি কতজনকে যে ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিতে হয়েছিল, কে তার হিসেব রাখে !

এসব খবর কেউ সেদিন জানতে পারেনি। জানানোও হয়নি কাউকে। সব কিছুই করা হয়েছিল গোপনে, সবার অগোচরে।

জানানো হয়েছিল অনেক পরে, যুদ্ধের শেষে।

তাও বিস্তৃতভাবে কিছু নয়। শুধু সংখ্যাটাই প্রকাশ করা হয়েছিল সরকারীভাবে।

যেমন, চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল-রক্ষীবাহিনীর বিদ্রোহের ঘটনা।

আশ্চর্য, কেউ সেদিন জানতে পারেনি যে, এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে ভেতরে ভেতরে।

জানা গিয়েছিল তিন বছর বাদে, ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে।

এক প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সমর বিভাগের সেক্রেটারী সেদিন কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বীকার করেছিলেন যে—হ্যাঁ, এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল বৈকি!

এবার সে কাহিনীই তোমাকে আমি বলব, মল্লিকা।

১৯৪৩ সাল। ভারতের দিকে দিকে সেদিন নতুন দিনের সঙ্কেত। সুদূর বার্লিন থেকে সুভাষ ডাক পাঠিয়েছেন সংগ্রামী জনগণের কাছে। সংগ্রাম আসন্ন। সবাই প্রস্তুত হও। দিন আগত ঐ।

উপকূল-রক্ষীবাহিনীর বাঙালী তরুণবৃন্দও সে আহ্বান শুনেছেন। শুনেছেন বিভিন্নভাবে। বিভিন্ন তারিখে।

'Countrymen, when the British Empire is disappearing, the day of India's deliverance approaches. I want to remind you that in the year 1857 began India's first war of Independence. In May, 1942 has begun her last war of Independence. Gird up your loins. The hour of India's salvation is at hand.'

শুনেছেন নিজের হাতে গড়া সেনা বাহিনীর উদ্দেশ্যে সুভাষের সেই উদাত্ত আহ্বান:

'Brave soldiers! Today you have taken an oath that you will give fight to the enemy till the last breath of your life under the National Tricolour. From today you are the soldiers of the Indian

National Army of Free India. You have volunteered to shoulder the responsibility of forty crores of Indians. From today your mind, might and money belong to the Indian Nation.

Oh Friends! You have the honour to be the pioneer soldiers of Azad Hind Fauj. Your names will be written in golden letters in the history of Free India.'

আর এক প্রান্ত থেকে শুনেছেন মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সংগ্রামের ডাক :

'Independence India must have. Because her independence is essential for the regeneration of the whole world. It is not the end in itself, but it is a means to an end and that end is the destruction of imperialism and militarism and the creation of a better world for all to live in.'

শুনে শুনে ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন উপকূল-বাহিনীর স্বাধীনতা-কামী তরুণবৃন্দ।

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। সামনে দূরন্ত সংগ্রামের দিন। কেউ আমরা পিছিয়ে থাকব না আসন্ন সেই সংগ্রামের দিনে। সবাই প্রস্তুত হও।

হঠাৎ সেদিন (১৮ই এপ্রিল) বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ নেমে এল আকস্মিকভাবে।

কি যে হল কিছুই বোঝা গেল না, কিছুই জানা গেল না। শুধু অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা ভাবে শোনা গেল, বেশ কিছু-সংখ্যক বাঙালী তরুণকে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মানকুমার বসু-ঠাকুর তাঁদের অন্যতম।

মানকুমার বসু-ঠাকুর!

রক্ষীবাহিনী অবাক। এ যে অবিশ্বাস্য কথা! কারণ, এমন মেধাবী তরুণ উপকূল-রক্ষীবাহিনীতে সত্যিই বিরল। মোট তেরো বার তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন সামরিক ব্যাপারে। আশ্চর্য, প্রতিবারই প্রথম।

তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হল এভাবে? কি তাঁর অপরাধ?

অপরাধ, মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা।

আসামী সংখ্যায় মোট বারো জন। মানকুমার বসু-ঠাকুর, দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, নন্দকুমার দে, চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন বড়ুয়া, সুনীল মুখার্জী, কালীপদ আইচ, নীরেন মুখার্জী, আবদুল রহমান, আর. এন. ঘোষ এবং এ. কে. দে।

৬ই জুলাই শুরু হল বিচার।

প্রকাশ্য আদালতে নয়, বাঙ্গালোরের সেন্ট এনড্রুজ চার্চে অনুষ্ঠিত সামরিক আদালতে। সবার অলক্ষ্যে। অতি সঙ্গোপনে।

পরবর্তী কালে পবিত্র রায়, অমর সিং গীল, হরিদাস মিত্র ও যতীশ বসুর বেলায়ও তাই হয়েছিল, মল্লিকা। তাঁদের জন্য আদালত বসানো হয়েছিল ক্যামাক স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। সে-কথা পরে আসবে।

রায় দেওয়া হল ৫ই আগস্ট। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তা-ই হল। প্রথমোক্ত ন'জনকে দেওয়া হলো মৃত্যুদণ্ড। আবদুল রহমান ও আর. এন. ঘোষকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এ. কে. দে-র সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ সাল।

ফাঁসিমঞ্চ প্রস্তুত। পরাধীন দেশে দেশপ্রেমের একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। সেই দেশপ্রেমের অপরাধে এবার তাঁদের হত্যা করা হবে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে।

বন্দীরা নির্বিকার। একে অন্যকে আলিঙ্গন করে একসঙ্গে সবাই

মিলে তাঁরা সুর তুললেন—বন্দেমাতরম্! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ!

চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল ন'টি বিপ্লবী তরুণের জীবন-নাট্য। কাউকে সে-খবর জানতে দেওয়া হল না। এমন কি সংবাদপত্রগুলিকে পর্যন্ত নয়।

জানানো হল পুরো তিন বছর বাদে, ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে।

সাময়িক পত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি :

'১৮ই মার্চ—অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার জন থর্ন জানান যে, গত যুদ্ধের সময় শত্রু-গুপ্তচর অর্ডিন্যান্সে মাদ্রাজ, দিল্লী ও কলকাতায় ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইহাদের মধ্যে ২৭ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ১ জনের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং বাকি ১৪ জন মুক্তি পায়। ২৭ জন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং বাকি ১৩ জনের ফাঁসি হয়।'

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ।

আশ্চর্য, সবার অলক্ষ্যে এতগুলো তরুণকে ফাঁসি দেওয়া হল, অথচ এতদিনের মধ্যেও সে-খবর কাউকেও জানতে দেওয়া হল না! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

এ প্রসঙ্গে সরকারের অবিমৃশ্যকারিতাকে ধিক্কার দিয়ে সেদিন বাংলা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে কি লেখা হয়েছিল, শোন :

'যুদ্ধের সময় মাদ্রাজের কেল্লায় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর নয় জন সৈনিক জমাদার মানকুমার বসু-ঠাকুর, এন. কে. দে, হাবিলদার ডি. ডি. রায়চৌধুরী, হাবিলদার এস. কে. মুখার্জী, হাবিলদার এন. বড়ুয়া, নায়েক পি. চক্রবর্তী, নায়েক সি. মুখার্জী, গানার কে. পি. আইচ ইহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

আর গানার আবদুল রহমান, গানার আর. এন. ঘোষ ইহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং গানার এ. কে. দে-কে সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে বলিয়া নয়াদিল্লী হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে।

ইঁহারা সকলেই তরুণ। ইহাদের বয়স ১৭ বৎসর হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে। প্রকাশিত নামের তালিকা হইতে ইহাও মনে হয়, ইঁহারা সকলেই বাঙালী।

শোনা যায়, সামরিক আদালতে সরাসরি বিচারের দ্বারাই ইঁহাদের প্রতি দণ্ডবিধান করা হয়।

বলা বাহুল্য, বাহির হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইঁহাদিগকে কোনরূপ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই।

এই মামলা সম্পর্কে ইঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও যে ইঁহাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার কোন সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না। সুতরাং লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাকক্ষের মধ্যেই সব কিছু সমাধা হইয়াছে।

ইঁহারা কি অপরাধ করিয়াছিলেন নিশ্চিতভাবে জানিবার উপায় নাই; তবে সংবাদ পাঠ করিয়া মনে হয়, পরাধীন দেশে যাহা সর্বাপেক্ষা দণ্ডনীয় অপরাধ, সম্ভবত সেই শ্রেণীরই ছিল। কারণ, সংবাদে দেখিতে পাই, ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিবার আগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যুবকেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে করিতে ফাঁসিমঞ্চে গিয়া দাঁড়ান।

এতগুলি বাঙালী যুবকের অকালমৃত্যুর এই সংবাদ এমন আকস্মিকভাবে পাইয়া বাঙালী সমাজ স্তম্ভিত এবং ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে; ভিতরের ব্যাপার গোপন থাকাতে এই বেদনা সমধিক প্রগাঢ় আকার ধারণ করিয়াছে।

কারা-প্রাকারের অন্তরালে এই যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, এগুলি গোপন রাখিবার জন্য সরকারের আগ্রহের কারণ কি থাকিতে পারে,

আমরা বুঝি না ; অথচ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের এমন একটা আগ্রহের পরিচয় পাইতেছি।

...কারাগারের গোপন কক্ষে ভারতের স্বদেশ-প্রেমিক সন্তানদের বন্ধন, পীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে ভারতবাসীরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে ; আমলাতন্ত্র যদি এ সত্য এখনও উপলব্ধি না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা নিজেদের অনর্থ নিজেরাই ডাকিয়া আনিবেন। মানব ধর্মের অগ্নিময় বেদনাকে আর এদেশে কারচুপির দ্বারা প্রশমিত করা চলিবে না।' [সাপ্তাহিক দেশ : ৩০শে মার্চ : ১৯৪৬ সাল]

মল্লিকা, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। বাইরের লোকে বলে—ভিখারীর দেশ। কারণ, ভিক্ষাবৃত্তিই নাকি আজ আমাদের একমাত্র সম্বল।

সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থ থেকেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে আজ পৃথিবী জুড়ে ঢাক পেটানো হচ্ছে যে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, সম্পূর্ণ অহিংস পন্থায়ই নাকি আমরা এ 'স্বাধীনতা' অর্জন করেছি।

তাই যদি হয়, তবে বিপ্লববাদের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে এই যে শত শত শহীদদের কথা লেখা রয়েছে, এঁরা কারা ?

বিংশ শতাব্দীর দুঃসহ অভিশাপ থেকে দেশকে ভারমুক্ত করার জন্য ঐ যে ইম্ফলের রণাঙ্গনে ওঁদেরই উত্তর পুরুষ, হাজার হাজার স্বাধীনতা-কামী তরুণ প্রাণ চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছেন—ওঁরাই বা কারা ?

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ওঁরা কি বিগত, বিস্মৃত, মৃত কতগুলি ফসিল মাত্র ?

দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা থাকলে এক রাগিণীতে আলাপ করা চলে না।

প্রমাণ রাসবিহারী আর মোহন সিং।

রাসবিহারী দীর্ঘদিনব্যাপী জাপানবাসী। জাপানীদের সব কিছুই

তাঁর নখদর্পণে। সর্বোপরি নিজে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদ। কি করে যে কূটনীতির সাহায্যে কার্যোদ্ধার করতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি রীতিমত অভিজ্ঞ।

অন্য দিকে মোহন সিং একজন যোদ্ধা মাত্র। কূটনীতি সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই।

ফলে, যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হল। দেখতে দেখতেই একদিন বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

অথচ শুরু হয়েছিল চমৎকার।

ব্যাঙ্কক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুন মাসে। তারপর শুধু কাজ আর কাজ। স্বাধীনতার স্বপ্নে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি মানুষ তখন উন্মত্ত যেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী দেখতে দেখতেই লীগের শাখা গড়ে তোলা হল শহরে-বন্দরে সর্বত্র। সেই সঙ্গে শুরু হল একটানা প্রচারের কাজ।

প্রধান হাতিয়ার সিঙ্গাপুর এবং সাইগন রেডিও। সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে লীগের যাবতীয় কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তখন মেজর ইর্শাদ আলি সাহেবজাদার ওপর। কর্নেল ইশান কাদির, কর্নেল নাগর, কর্নেল হাসান প্রমুখ কয়েকজন নিয়েছেন সাইগন রেডিওর দায়িত্ব।

তাছাড়া সংবাদপত্র। সিঙ্গাপুর থেকে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত দৈনিক 'আজাদ হিন্দ' পত্রিকা তো তখন বলতে গেলে প্রতিটি ভারতবাসীর হাতে হাতে। সেই সঙ্গে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা।

সেনা বাহিনীর পরিকল্পনা আপাতত তিনটি। গান্ধী রেজিমেণ্ট, আজাদ রেজিমেণ্ট আর নেহরু রেজিমেণ্ট। সেই সঙ্গে স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ, ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ, রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ, রেজিমেণ্ট অফ ফিল্ড ফোর্স, আর্টিলারী ইউনিট, সাঁজোয়া গাড়ি ইউনিট,

এঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট, মেডিক্যাল এইড্ পার্টি, বেস্ হাসপাতাল ইত্যাদি।

গড়ে তোলা হল অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য আরো অফিসার দরকার হবে ভবিষ্যতে। এখন থেকেই তাঁদের তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন।

অসামরিক লোকদের ট্রেনিং-এর জন্য বিরাট শিক্ষা শিবির গড়ে তোলা হল কুয়ালালামপুরে। আর একটি পেনাং-এ।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হল আনুষ্ঠানিকভাবে।

ঠিক হল, বাহিনী পরিচালিত হবে একটি কাউন্সিল অফ অ্যাকশন বা সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে, যার মধ্যে রয়েছেন মোহন সিং, এন. রাঘবন, কে. পি. কে. মেনন, কিউ. গিলানী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ। সবার ওপরে সভাপতি রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

ব্রিটিশ র‍্যাঙ্ক পরিত্যাগ করে সবাইকে সেদিন ভূষিত করা হল নতুন মর্যাদায়। সভাপতির আদেশে মোহন সিংকে করা হল—'জেনারেল'। আজাদ হিন্দ ফৌজের জি. ও. সি.।

ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল! সত্যিই দুর্লভ নজীর। কারণ, জেনারেল হতে গেলে তার আগে অনেকগুলো র‍্যাঙ্ক পার হওয়া দরকার। কিন্তু মোহন সিংয়ের পক্ষে তাও সেদিন সম্ভব হয়েছিল সভাপতি রাসবিহারী বসুর দাক্ষিণ্যে।

যদিও মোহন সিংয়ের চাইতেও অনেক সিনিয়ার অফিসার সেদিন ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীতে, যেমন—কর্নেল গীল, কর্নেল ভোঁসলে, মেজর মেহতাব সিং, মেজর ভগৎ প্রমুখ প্রথম সারির অফিসারবৃন্দ, কিন্তু কেউ সেদিন আপত্তি করেননি এ নিয়ে। কারণ, সবারই সেদিন একমাত্র লক্ষ্য ছিল—স্বাধীনতা। সেখানে কে ছোট, কে বড়, সে প্রশ্ন অবান্তর।

কিন্তু সেই হল কাল।

মাত্র কয়েকদিন, তারপরই আস্তে আস্তে একদিন দেখা গেল যে, মোহন সিং আর আগেকার সেই মোহন সিং নেই। নিজের অজ্ঞাতেই কখন তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন অত্যধিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে।

বিরোধের প্রথম সূত্রপাত মোহন সিংয়ের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে।

হঠাৎ একদিন জানা গেল, তিনি নাকি জাপানী কর্নেল ইয়াকুরোর ইচ্ছানুসারে বর্মায় একদল সৈন্য পাঠিয়েছেন সংগ্রাম পরিষদকে না জানিয়ে।

খবর শুনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন সভাপতি রাসবিহারী বসু এবং সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

জি. ও. সি. হলেও সেনা বাহিনী সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মোহন সিংয়ের একার নয়, সংগ্রাম পরিষদের। সেখানে এন. রাঘবন, মেনন, গিলানী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ রয়েছেন। সর্বোপরি রয়েছেন পরিষদের সভাপতি রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

তাঁদের না জানিয়ে মোহন সিং নিজ দায়িত্বে বর্মায় সৈন্য পাঠাতে গেলেন কোন্ অধিকারে ?

রাসবিহারীর নিজের ভাষায় ঃ

'...In the latter part of November, it came to light that Mr. Mohan Singh as G. O. C. of the I. N. A. had arranged with the Iwakura Kikan for the transport of some I. N. A. troops to Burma for the purpose of training. An advance party was sent by the G. O. C. to Rangoon without the consent of the Council of Action. Naturally the Council of Action wished to know about the move in greater detail and was not prepared to sanction movement of troops without its knowledge.

...I regret to have to say that in matters

connected with the I. N. A., the G. O. C. arrived at important decisions without reference to the Council of Action. In fact, the Council was kept almost in darkness with regard to various important activities of the I. N. A.—a state of affairs which were tried to rectify.

I thought it was vitally important that the Council of Action should immediately take control of the policy regarding the army and all questions of major importance should be decided by the Council and not by the G. O. C. I had to write to Col. Iwakura to that effect so that no further mistakes would be committed'. [Rash Behari Bose—his struggle for India's Independence : P.—228.]

ভুল স্বীকার করলেন জি. ও. সি. মোহন সিং। কথা দিলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের আর কোন কাজ তিনি করবেন না সংগ্রাম পরিষদকে না জানিয়ে।

'Gen. Mohan Singh could give no satisfactory reply, and apologised for not informing the 'Council of Action' and promised in future to refer such matters to the Council.' [My memories of I. N. A. & its Netaji : Maj.-Gen. Shahnawaz Khan : P.—51]

তবু কোন সুরাহা হল না। আবার গোলমাল বাধল ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে।

ব্যাঙ্কক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুন মাসে। তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে, তবু কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি জাপ-সরকারের কাছ থেকে। যা পাওয়া গেছে, সবই অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা উত্তর।

কেন ওদের এই বেমানান নিঃশব্দতা? না, আর আমরা দেরি করতে রাজী নই। আমরা স্পষ্ট উত্তর চাই।

যথাসময়ে একটি চিঠি পাঠানো হল কর্নেল ইয়াকুরোর কাছে।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমাদের জাপ-সরকারের কি বক্তব্য তা আমরা জানতে চাই। আর আমরা দেরি করতে রাজী নই। হ্যাঁ, কিংবা না, যা হয় আমাদের ঝট্‌পট্ বলে দাও।

বোঝাতে চেষ্টা করলেন কর্নেল ইয়াকুরো। এ চিঠি টোকিও পাঠানোর অর্থই হল দু পক্ষের মধ্যে একটা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়া। তার চাইতে এটা তোমরা প্রত্যাহার করে নাও। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি যে কি ব্যাপার।

তাই মেনে নিলেন সংগ্রাম পরিষদ। বেশ তাই হোক। দেখা যাক আর কিছুদিন অপেক্ষা করে।

কিছুদিন চুপচাপ। তারপর আবার সেই একই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। আমরা স্পষ্ট জবাব চাই। নয়তো আমরা আমাদের পথ দেখতে বাধ্য হব।

না। বাধা দিলেন রাসবিহারী, অধৈর্য হয়ো না। অনেক কষ্টে আমরা একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। এ সময়ে মাথা গরম করে সব কিছু পণ্ড করে দিও না। অবস্থাটা ভেবে দেখ একবার।

কি আছে আমাদের?

কতটুকু আমাদের শক্তি?

উপযুক্ত সমর-সম্ভারই বা আমাদের কোথায়?

ইচ্ছা করলে বর্মা দখলের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে তারা ঢুকে যেতে পারত ভারতের অভ্যন্তরে। সে শক্তিও তাদের ছিল। তবু তারা তা করেনি। করেনি আমাদের মুখ চেয়েই।

'They can even smash Britain's inadequate defences in India without as much as crossing the borders. But they are holding their hand in the

hope that Indians themselves will rise and drive the alien forces out of the country and establish a free India without their intervention.' [Rash Behari Bose —his struggle for India's Independence : P.—188]

সুতরাং নিশ্চিন্ত থাক যে, জাপান আমাদের সাহায্য করবেই। আমাদের মুখ চেয়ে করবে না, নিজের গরজেই করবে। করতে বাধ্য। না করে যাবে কোথায়? কারণ, শত্রু আমাদের এক। সে শত্রুকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারই বা নিশ্চিন্ত হবার পথ কোথায়?

সুতরাং ধৈর্য ধরো। এ সময়ে চাই শুধু একটু বুদ্ধি। একটু কূটনীতি। দেখবে যে, কোন কিছুরই অভাব হবে না। তাছাড়া জাপান এখন বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। এ সময়ে এত বড় একটা ব্যাপার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে তাদের তো একটু দেরি হবেই। সবাই শান্ত হও। দরক র হলে জাপ-মন্ত্রিসভার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে আমি নিজে টোকিওতে যাব রাঘবনকে নিয়ে। কথা দিলাম।

২৯শে তারিখে আবার চিঠি দেওয়া হল কর্নেল ইয়াকুরোকে।

আমাদের কথা শেষ। এবার তোমাদের কিছু বক্তব্য থাকলে জানাও। নয়তো এই শেষ।

৪ঠা ডিসেম্বর জেনারেল মোহন সিং, কর্নেল গিলানী, রাঘবন, মেনন, কর্নেল এন. এস. গীল প্রমুখ সবাই গিয়ে সিঙ্গাপুরের সী-ভিউ হোটেলে মিলিত হলেন রাসবিহারীর আহ্বানে।

বক্তব্য সেখানে একটাই। জাপানকে পয়লা জানুয়ারির মধ্যে জবাব দিতে হবে। অন্যথায় আমরা সবাই পদত্যাগ করব আই. এন. এ. থেকে।

না। এবারও বাধা দিলেন রাসবিহারী, মনে রেখো, ভাঙা সহজ, কিন্তু গড়া সহজ নয়। আই. এন. এ. ভেঙে দিলে ওদের কিছু এসে-যাবে না, তাতে ক্ষতি হবে আমাদেরই। সুতরাং তোমরা আমাকে জানুয়ারি মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময় দাও। কথা দিচ্ছি, তার

মধ্যে যাহোক একটা বোঝাপড়া আমি করবই। শুধু এই ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাকো।

সবাই সেকথা মেনে নিলেন একবাক্যে। ঠিক আছে, তাই হবে। জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব আপনার কথামত।

কিন্তু পরদিনই শোনা গেল অন্য কথা।

না, আমরা অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। যা করার ঐ পয়লা জানুয়ারির মধ্যেই করতে হবে। নয়তো আই. এন. এ.-র কোন ব্যাপারে আমরা নেই।

রাসবিহারীর নিজের কথায়ঃ

'On the 4th December, at my request the members of the Council agreed to give me time till the end of January, 1943, to enable me to obtain full and satisfactory assurance from the Japanese Government. I was glad that I was given further time to attempt at a solution of those difficult questions before my colleagues resigned.

The next morning, that is on 5th December, I was surprised, therefore, to hear from Mr. Mohan Singh, Col. Gillani and Sri K. P. K. Menon that notwithstanding the previous day's decision they were not prepared to carry on the movement unless an assurance was immediately given that a reply to Bangkok resolutions in detail would be obtained on or before 1st January, 1943.

As far as I know there was no one in Malay capable of giving such an assurance. Moreover it was ultimatum to the Japanese Government which

would have offended them. I then realized that an attempt was being made to obstruct the solving of the questions in issue in order to wreck the movement. This I was not prepared to agree to.' [Ibid : P.—229]

৮ই ডিসেম্বর সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল আকস্মিকভাবে।

হঠাৎ সেদিন কর্নেল গীল-এর কাছে জাপানী মিলিটারী পুলিশ এসে হাজির। গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল। চলো এবার বন্দী-নিবাসে।

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ, মল্লিকা ?

এর মূলে রয়েছেন সেই বিশ্বাসঘাতক মেজর মহাবীর সিং ধীলন, যে নাকি সামরিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতে এসে শুধু নিজেই আত্মসমর্পণ করেনি, সেই সঙ্গে সহকর্মীদেরও ধরিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশের হাতে।

কে সেদিন ভারতে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করেছিলেন সেই মহাবীর সিং ধীলনকে ?

করেছিলেন বন্দী-শিবিরসমূহের ডিরেক্টার এই কর্নেল গীল। সুতরাং আজ তাঁরও নিস্তার নেই।

ফল হল মারাত্মক। সঙ্গে সঙ্গেই মোহন সিং এবং সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন সভাপতি রাসবিহারীর কাছে। গীলের গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা আমাদের কাছে মস্ত বড় একটা আঘাত স্বরূপ। সুতরাং আই. এন. এ.-র কোন ব্যাপারে আমরা আর নেই।

তারপরই স্থানীয় জাপানী কর্তৃপক্ষ মেজর ফুজিয়ারার কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করলেন মোহন সিং।

কেন তোমরা গীলকে গ্রেপ্তার করেছ বলো ? আমি জানি, গীল একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। সে যে ব্রিটিশের গুপ্তচর, তার কোন প্রমাণ আছে তোমাদের কাছে ?

আছে। অত্যন্ত বিনয় সহকারে জবাব দিলেন মেজর ফুজিয়ারা, আমি দুঃখিত যে, আমাকেই এই অপ্রিয় কাজটা করতে হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর যে, এ ব্যাপারে আমি নিরুপায়।

মেজর ফুজিয়ারা প্রদত্ত প্রমাণগুলোর মধ্যে কোন্‌টা যে সত্য, আর কোন্‌টা যে মিথ্যে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মল্লিকা। তবে একথা ঠিক যে, কতগুলি অভিযোগ সত্যিই গুরুতর।

অনেক অভিযোগ। একটার পর একটা। অসংখ্য।

আরো আশ্চর্য যে, এ সম্বন্ধে নির্দেশ এসেছে খোদ টোকিও থেকে। একবার নয়, বার বার। বক্তব্য সেই একই। গীলের ওপর কড়া নজর রাখো।

সেই সঙ্গে রয়েছে টোকিও, সাইগন, ব্যাঙ্কক, পেনাং, বর্মা ইত্যাদি স্থানে থাকাকালীন সময়ে তার সন্দেহজনক কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ।

এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি বিস্তৃতভাবে বলব আরো পরে। এখন শুধু একটি মাত্র ঘটনার কথাই তুলে ধরছি তোমার সামনে।

পরবর্তী কালে মালয় থেকে প্রকাশিত 'Chalo Delhi' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে শোন ঃ

'On the 18th Nov. 6 British officers landed by parachutes on Pegu and they were arrested. From investigation made after deciphering the British code, the Japanese authorities had come to the conclusion that Col. Gill was a British agent. Those six parachutists confessed that they had three objects : (1) to contact Col. Gill and Major Dhillon ; (2) to spread confusion and distrust between the Japanese and the I. N. A. ; (3) to find the movements of the Japanese forces.

Under these charges Col. Gill was taken for investigation'. [Chalo Delhi : S. A. Das & K. B. Subbaiah : P.—82.]

অর্থাৎ—১৮ই নভেম্বর তারিখে ছ'জন প্যারাস্যুটবাহী ব্রিটিশ অফিসার ধরা পড়ে জাপানীদের হাতে। সঙ্গে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত কিছু গোপনীয় কাগজপত্র। বিশ্বাসঘাতক মহাবীর সিং ধীলন এবং কর্নেল গীল—এই দুজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিল সে-সব কাগজপত্রে। বন্দীরা সবাই অপরাধ স্বীকার করেছেন। বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মোট তিনটি : (১) কর্নেল গীল এবং মেজর ধীলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা ; (২) আই. এন. এ. এবং জাপানীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং (৩) জাপানী সৈন্য চলাচল এবং সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা।

শুরু হল নানাবিধ অপপ্রচার। শুধু জাপানের বিরুদ্ধে নয়, রাসবিহারীর বিরুদ্ধেও। রাসবিহারী জাপানীদের puppet, অর্থাৎ হাতের পুতুল। দীর্ঘ দিন জাপানে বসবাস করার দরুন নিজেও তিনি একজন জাপানী হয়ে গেছেন। সুতরাং ভারত সম্বন্ধে তাঁর আনুগত্য সন্দেহের অতীত নয়।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সবার উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী আবেদন করলেন রাসবিহারী। ওরা বলছে, আমি জাপানীদের হাতের পুতুল।

বেশ, তা-ই বলতে দাও।

আমি বৃদ্ধ। অসুস্থ। বহুকাল আমি জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত। বিশ্বাস কর, স্বাধীনতা অর্জনের পর মাতৃভূমির এক কোণে নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কোন সাধই আমার নেই। একান্ত অনুরোধ, অহেতুক ভুল বুঝে স্বাধীনতা অর্জনের এই পবিত্র প্রয়াসকে তোমরা ব্যর্থ করে দিও না।

'...If my opponents call me a puppet, let them do so. But let me assure them that they are sinning

against a man whose only end, and aim in life is to see his country free, absolutely free and independent, who is as proud of his birth-right as any Indian alive, and who has staked his all and who will stake the last drop of his blood in upholding the honour and integrity of Hindustan.

I seek nothing from life except the success of our mission. If once it is accomplished I shall retire into seclusion in some nook or corner of our beautiful Homeland.

The full and complete independence of Hindustan is our objective and let no differences, personal or otherwise, colour or creed, obstruct the issue.'

[Chalo Delhi : P.—12]

এখানেই থামলেন না রাসবিহারী। ১২ই ডিসেম্বর আবার তিনি এক চিঠি লিখে পাঠালেন মোহন সিংয়ের কাছে।

সমস্ত পদস্থ অফিসারসহ তোমরা সবাই একবার এসো আমার কাছে। আমি সব কিছু বুঝিয়ে বলতে চাই তোমাদের।

উত্তর পেলেন পরদিন, ১৩ই ডিসেম্বর। কিন্তু কি সে উত্তর?

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য মল্লিকা। রাসবিহারী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি। মোহন সিং তারই অন্যতম সদস্য। একজন সদস্য হয়ে প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে তিনি এ চিঠি লিখলেন কি করে?

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন:

'He wrote a letter to Gen. Mohan Singh and asked him to send some senior officers to meet him at his residence in Singapur so that he could explain the situation to them.

Gen. Mohan Singh, however, sent a very curt reply stating that no officer liked to see him, and Gen. Mohan Singh would allow no one to go and see him.' [P.—55]

অর্থাৎ—চিঠির উত্তরে মোহন সিং রূঢ়ভাবে জানান যে, কোন অফিসারই তাঁর (রাসবিহারী) সঙ্গে দেখা করতে চান না। চাইলেও মোহন সিং কাউকেই তাঁর ওখানে যেতে দেবেন না।

শুধু কি এইটুকুই লিখেছিলেন মোহন সিং ?

এই কথাগুলো তাহলে কার ?

...'It is apparent from your correspondence that you are not only totally ignorant of anything pertaining to an army but have some foolish and misguided notions about it....

...It is merely written as a courtesy and to avoid future unnecessary instructions by you to the army. Needless to say that, if you still persist in writing anything, it will not be answered.'

[Chalo Delhi : P.—90-91]

সোজা কথায়—সেনা বাহিনী সম্বন্ধে তুমি একেবারেই অজ্ঞ এবং তোমার এই ধারণাকে একটা নির্বোধ ধারণা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এবার ভদ্রতা করে চিঠির জবাব দিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোন চিঠি দিলে তার জবাব দেওয়া হবে না।

হ্যাঁ, এই উত্তরই সেদিন দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুকে। দিয়েছিলেন তিনি, যিনি মাত্র তিনমাস আগে তাঁরই অনুগ্রহে সামান্য ক্যাপ্টেন থেকে ভূষিত হয়েছিলেন জেনারেলের মর্যাদায়।

কেটে গেল দু সপ্তাহ, তবু অচল অবস্থা অবসানের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

সভাপতি রাসবিহারীর অভিমত—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী জনগণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'।

শুধু এখন নয়, ১৯২৪ সাল থেকেই এই লীগ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র। লীগই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী জনগণের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী নবগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ এই অস্থায়ী স্বাধীন সরকারেরই একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ বাহু। একে পরিচালনা করবেন কাউন্সিল অফ অ্যাকশান বা সংগ্রাম পরিষদ। ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির সেখানে কোন স্থান নেই। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'In accordance with the resolutions of the Bangkok Conference Indian National Army is a part of the Indian Independence League and every officer and man of the I. N. A. is a member of the Indian Independence League and owes allegiance to the League.

It must be understood that an army is an army of a country and not of an individual ; so it was wrong of I. N. A. personnel to give allegiance to an individual, without raising an objection.' [Rash Behari Bose—his struggle for India's Independence : P.—226]

মোহন সিং তা মানতে রাজী নন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের জি. ও. সি.। স্বভাবতই সেনা বাহিনীর বেশ কিছু অংশ তাঁর অনুগত। সুতরাং তাঁর অভিমত, তিনিই প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। তাঁর সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিতে বাধ্য সেখানে সংগ্রাম পরিষদ বা তার সভাপতির মতামতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তার জন্য যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দিতে হয় তো তাতেও কোন ক্ষতি নেই, তবু এ ব্যাপারে অন্য কারো অধিকার তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন।

রাসবিহারীর ভাষায় :

'He wanted to have a free hand in his undertakings, and as such, he would not bear the idea of being interfered with by others in his work, but constitutionally he had to work under the Council of Action.

In order to sweep away this restriction, he intensified his exercise of dictatorial influence over the I. N. A. and infused wrong ideas into the minds of his officers and men that the army belonged to him, and that he was its master'. [Ibid : P.—231]

এই হল ব্যাপার। এবার দেখা যাক যে, কোনটা সত্য! কোনটা বাস্তব! কোনটা যুক্তিসঙ্গত!

এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম টোকিও সম্মেলনে কি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল শোন :

'The Council of Action shall be responsible for the working out of the general policy and in such working out they shall appoint departmental officers for the purpose of administration.'

[Chalo Delhi : S. A. Das & K. B. Subbaiah : P.—16]

তারপর ব্যাঙ্কক সম্মেলন। মোট পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব সেখানে গৃহীত হয়েছিল সেকথা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। কাউন্সিল অফ অ্যাকশান সম্বন্ধে সেখানে কি বলা হয়েছিল শোন :

'The Council of Action shall have general superintendence and control over all branches of the Indian Independence League in all territories mentioned in article (vi) and over the Indian National Army.' [Rash Behari Bose—his struggle for India's Independence : P.—88]

আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অন্য এক জায়গায় ঃ

'Resolved that the Indian National Army shall be under the direct control of the Council of Action and that the said Army shall be organised and commanded by the General Officer Commanding, Indian National Army in accordance with the directions of the Council of Action.' [Ibid : P.—89]

দেখা যাচ্ছে যে, কাউন্সিল অফ অ্যাকশান বা সংগ্রাম পরিষদই সর্বেসর্বা। জি. ও. সি. সেনা বাহিনী পরিচালনা করবেন একথা সত্যি, কিন্তু সেখানেও কাউন্সিল অফ অ্যাকশানের নির্দেশ ছাড়া স্বাধীনভাবে তাঁর কোন কিছু করবার অধিকার নেই।

তাহলে কেন এই অবাঞ্ছিত পরিবেশের সৃষ্টি, মল্লিকা ? এর সদুত্তর কোথায় বলো ?

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, কাজেও তাই হল। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে মোহন সিং সেই মারাত্মক নির্দেশ পাঠালেন সেনা বাহিনীর কাছে। দরকার হলে আমি আই. এন. এ. ভেঙে দেব। তোমরা সবাই প্রস্তুত থেকো।

'...A confirmatory order will be sent out as soon as arrangements with the Nipponese are complete. In the event of my being deported from you before such on order is issued, the dissolution will take place automatically and immediately.

Also at the same time the resignation of all the members of the I. N. A. and their release from obligations and undertakings to me and the I. N. A. will be taken for granted...' [Chalo Delhi : P.—92]

কি করবেন এখন সভাপতি রাসবিহারী ?

আই. এন. এ. ভেঙে যাবে, তাই কি তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন নির্বাক দর্শকের মতো ?

অসম্ভব ! আই. এন. এ. যে তাঁর বুকের রক্তে গড়া। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় তিল তিল করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার এতটুকু ক্ষতি তিনি সইবেন কি করে !

তাছাড়া আই. এন. এ. কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জাতীয় সম্পত্তি। তাকে ভেঙে দেবার অধিকার কারোরই নেই। তাঁর নিজেরও না। সুতরাং, তেমন কোন প্রচেষ্টা দেখলে বাধা তাঁকে দিতেই হবে।

মোহন সিং দেশপ্রেমিক, একথা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আই. এন. এ. গড়ার ব্যাপারে গোড়ার দিকে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

তা বলে তাঁর বর্তমান মনোভাবকে আর কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সবার ঊর্ধ্বে স্বাধীনতা। কোন কিছুর মুখ চেয়েই সেই স্বাধীনতার প্রশ্নে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

হয়তো কেউ কেউ ভুল বুঝবে। হয়তো কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হবে। কারো কারো কাছে কাজটা হয়তো রূঢ় বলেও মনে হতে পারে।

তবু এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায়। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মিলিটারী ডিসিপ্লিন তাঁকে মানতেই হবে। সেখানে কারোরই ক্ষমা নেই।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ২৯শে ডিসেম্বর ভোরবেলায়।*

সেক্রেটারী বি. কে. দাস সহ রাসবিহারী প্রমুখ সবাই

---

* মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের মতে এ ঘটনা ঘটেছিল ২০শে ডিসেম্বর। 'Chalo Delhi' গ্রন্থে বলা হয়েছে ২৯শে ডিসেম্বর। শেষোক্ত গ্রন্থের অভিমতই এখানে অনুসরণ করা হয়েছে।

সেদিন উপস্থিত জাপ-ভারত সংযোগ-রক্ষাকারী 'ইয়াকুরো কিকান' অফিসে।

মোহন সিং তখনো আসেননি, তবে আসবেন শীগ্গিরই। কর্নেল ইয়াকুরো তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন টেলিফোন-যোগে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহন সিং এসে হাজির হলেন লেঃ ইকবালকে সঙ্গে নিয়ে। কি ব্যাপার! হঠাৎ এই জরুরী তলব কেন?

নিঃশব্দে তাঁর হাতে একটি চিঠি তুলে দিলেন কর্নেল ইয়াকুরো। সেনা বাহিনীর জি. ও. সি. হিসেবে এই নিয়মগুলো এখন থেকে তোমাকে সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। বলো, তুমি রাজী কিনা?

না। মোহন সিংয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

তাহলে এই নাও। এবার আর একটি চিঠি তুলে দিলেন কর্নেল ইয়াকুরো। সভাপতি রাসবিহারীর আদেশে তোমাকে জি. ও. সি. পদ থেকে বরখাস্ত করা হল। আর আজ থেকে তুমি বন্দী। জি. ও. সি. না হলেও যথাযোগ্য মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হবে বন্দী-জীবনে। সভাপতির নির্দেশ তা-ই।

কাজেও তাই করা হল। নিজস্ব স্টাফ হিসেবে মোট সাতজন অফিসার, তুজন দেহরক্ষী এবং বেশ কিছু-সংখ্যক পাচক এবং আরদালিসহ তাঁকে রাখা হল সমুদ্রতীরবর্তী একটি বাংলো-বাড়িতে। তু মাস বাদে সেন্ট জন দ্বীপে। প্রায় বছরখানেক সেখানে কাটিয়ে অবশেষে সুমাত্রায়। সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের হাতে।

ওদিকে ততক্ষণে বিপদ যা হবার, তা হয়ে গেছে। কোন একটা কিছুর আশঙ্কা করে আগেই মুখ বন্ধ-করা একটা খামে মোহন সিং তাঁর শেষ নির্দেশ রেখে এসেছিলেন সহকর্মীদের কাছে।

আমার কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা আই. এন. এ. ভেঙে দিও। ভুলেও যেন আর কোনদিন তোমরা এই আই. এন. এ.-তে যোগ দিও না। আর সমস্ত পরিচয়-পত্র নষ্ট করে ফেলো। জি. ও. সি. হিসেবে এই হল আমার শেষ নির্দেশ।

কাজেও তাই হল। খবর শুনে বেশির ভাগ সদস্যই সরে দাঁড়াল প্রতিষ্ঠান থেকে। এই রইল তোমাদের ব্যাজ আর ইউনিফর্ম। আই. এন. এ.-র কোন ব্যাপারে আমরা আর নেই।

তবে সবাই নয়। যেমন, মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, মেজর জেনারেল ভোঁসলে, মেজর জেনারেল কিয়ানি প্রমুখ প্রথম সারির সামরিক অফিসারবৃন্দ।

কোনদিনই তাঁরা সমর্থন করেননি মোহন সিংয়ের সেই অভাবনীয় সিদ্ধান্তকে।

এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী কি বলেছেন শোন :

'General Mohan Singh wrote a most unfortunate letter to the President of the Council of Action, and issued an order to the Army which he left in a sealed cover. In this order he wrote that if he was arrested, the officers should dissolve the Army and destroy all documents.

He also enjoined on the officers and men to take an oath not to join any Indian National Army if it were formed again. This action was beyond his powers, and was against the discipline of the Army.'

[India's Struggle for Freedom : P.—49]

রাসবিহারীরও সেই একই অভিমত। নীতিগত দিক থেকে অমিল হলে পদত্যাগ করার অধিকার সবারই আছে। মোহন সিং বা আমি, - কেউ তার ব্যতিক্রম নই।

কিন্তু আই. এন. এ. জাতীয় সম্পত্তি। তাকে ভেঙে দেবার অধিকার কারোরই নেই। সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

তবু ভেঙে গেল। সেনা বাহিনীর বৃহত্তর অংশই সাময়িকভাবে হাত গুটিয়ে নিল মোহন সিংয়ের সেই নির্দেশের ফলে।

ফল হল সুদূরপ্রসারী।

আহত ব্রিটিশ সিংহের তখন অন্তিম অবস্থ শুধু শক্ত একটি আঘাতের অপেক্ষা মাত্র।

দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই মুহূর্তে সে আঘাত আর এল না বাইরে থেকে। এল অনেক পরে। অনেক দেরিতে। তখন ব্রিটিশ সিংহ মোটামুটি সামলে উঠেছে মার্কিন সাহায্য পেয়ে।

জাপানের অভিমতও তাই। শুধু শুধু এই ভুল বোঝাবুঝির জন্য একটা বছর দেরি হয়ে গেল। নইলে ইম্ফল জয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ছিল না।

এ প্রসঙ্গে জাপানী লেখক Tatsuo Hayashida রচিত 'Netaji Subhas Chandra Bose' গ্রন্থে মেজর ফুজিয়ারা কি বলেছেন শোন ঃ

'I am certain that the incident retarded the growth of the I. N. A. and, to a great extent, the independence movement. That resulted in delaying by over one year the advance of the I. N. A. into Burma, which was planned as a preliminary to its operations for the liberation of India.

If its advance to Imphal had materialized a year earlier, it could have succeeded in liberating India, which was then in a defenceless and unprepared state, as admitted by the Allied Powers, and the British-India authorities in particular, after the war.'

[Netaji Subhas Chandra Bose : Tatsuo Hayashida : P.—155]

দোষ কার ?

কার ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে ভারতবাসী বঞ্চিত হল ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় থেকে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম, মল্লিকা। পারো তো ভাবীকালের বংশধরদের তুমিই এ প্রশ্নের উত্তর দিও।

বিপ্লবী জীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়লে তার চলে না। তাই অসুস্থতা ভুলে গিয়ে আবার রাসবিহারী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন শেষবারের মতো।

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। তা বলে হার মানলে চলবে না। সুতরাং আবার চেষ্টা করতে হবে। আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে সব কিছু।

ফল হল অত্যন্ত শোচনীয়। একে অসুস্থ, তদুপরি এই অমানুষিক পরিশ্রম। তাই দেখতে দেখতেই তাঁর দেহের ভাঙন এগিয়ে চলল অবিশ্বাস্য গতিতে। কিছুদিন আগেও দেহের ওজন ছিল একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড। এবার এসে দাঁড়াল পুরো একশো পাউণ্ডে।

তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই রাসবিহারীর। তবু নিজের পানে তাকাবার কোন অবকাশ নেই। শুধু একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে সেই একইভাবে তিনি উল্কার মতো ছুটে বেড়াতে লাগলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শিবিরে।

মুখে সেই একই ডাক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গৌরবময় ইতিহাসকে তোমরা এভাবে কলঙ্কিত হতে দিও না ভাই। আমি বৃদ্ধ। আজ আছি তো কাল নেই। কিন্তু তোমরা বেঁচে থাকবে। তুচ্ছ কারণে এভাবে পিছিয়ে গেলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তোমরা মুখ দেখাবে কি করে?

'I may die tomorrow but one of you should be ready to take my place and when he dies there should be another to take over the responsibilities. It is the most sacred duty of every Indian to sacrifice his all for the complete independence of India and

the Hindusthan of tomorrow will be proud of you. If you survive in this struggle, you shall be called heroes and if you die in the attempt, you shall be martyrs.

I therefore appeal to you in the name of our motherland to set aside all petty differences, make one unit and brotherhood and move forward as one team and the freedom of our country is assured.

Remember you are born only once and will die only once, whether it is on sick-bed or whether it is on the battlefield. Come forward as men, live as men and die as men, so that the India of tomorrow can be proud of you.' [Rash Behari Bose—His struggle for India's Independence : P.—236]

আবেদন ব্যর্থ হল না, মল্লিকা। এগিয়ে এলেন মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী।

তারপর একে একে এলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে, এম. জেড. কিয়ানি, শাহনওয়াজ খান, লোগনাথন, আলাগাপ্পান, সেইগল, ঈশান কাদির প্রমুখ বীর সেনানায়কবৃন্দ।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের দিক থেকে এলেন দেবনাথ দাস, জন এ. থিবি, রঘুনাথ শর্মা, এন. রাঘবন প্রমুখ বিশিষ্ট সদস্যগণ।

একটা বড় কাজ করতে গেলে বাধা-বিপত্তি আসবেই, তার জন্য হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমরা এখনো মরিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পবিত্র প্রয়াসকে কিছুতেই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। আবার আমরা সেনা বাহিনী গড়ে তুলব নতুন করে।

হাজার বাধা। হাজার প্রতিকূলতা। সেই হাজার বাধা অতিক্রম করে যেভাবে সেদিন তাঁরা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তা

সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। আই. এন. এ. পুনর্গঠনের কাজে তাঁদের অবদান সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

তা বলে কাজটা কিন্তু খুব সহজে সম্ভব হয়নি, মল্লিকা। এজন্য তাঁদের বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল অসংখ্য বার। সুখের কথা, এসব সত্ত্বেও কোনদিন তাঁরা পিছিয়ে পড়েননি সেই দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে।

যেমন, একবার ঘটেছিল সেনা বাহিনীর একটা সভাতে। হঠাৎ সেখানে রাসবিহারীকে প্রশ্ন করা হল :

ভারতীয় হয়েও তোমার ছেলে জাপানী সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে কেন, বলো ?

তাহলে কোথায় যোগ দেবে, বলো ? চটপট জবাব দিলেন রাসবিহারী, সে জাপানের নাগরিক। জাপানেই তার জন্ম। সে হিসেবে আইনত সে জাপানী সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য। আমাদের নিজস্ব সরকার গঠিত হোক, তখন দেখো যে, তার পিতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সে লড়াই করে কিনা !

আর একবার পরবর্তী এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সিঙ্গাপুর অধিবেশনে। সেখানে প্রশ্ন করা হল :

সভাপতি যদি তাঁর কর্তব্য পালনে অক্ষম হন, তাহলে কি হবে ?

তৎক্ষণাৎ তোমরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করবে।

জবাব শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন উপস্থিত সেনানীবৃন্দ। এমন স্পষ্ট উত্তর কোনদিনই বুঝি তাঁরা আশা করতে পারেননি সভাপতির কাছ থেকে। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জীর ভাষায় :

'Rash Behari Bose's reply was characteristic and at once showed his frank honesty, sincerity of purpose and typical revolutionary spirit. This frank and bold assertion of the president had a very satisfactory effect on the whole gathering.' [India's Struggle for Freedom : P.—74]

আবার একদিন আই. এন. এ. গড়ে উঠল নতুন করে।

একটি মাত্র লোকের ওপর অত্যধিক ক্ষমতা অর্পণ করাই যে সমস্ত বিপর্যয়ের কারণ, এ সম্বন্ধে রাসবিহারী এবারে পুরোপুরি সচেতন। তাই এবার দায়িত্ব দেওয়া হল দু ভাগে ভাগ করে।

প্রথমেই 'মিলিটারী ব্যুরো' নাম দিয়ে গড়ে তোলা হল একটি নতুন বিভাগ। এ বিভাগের কাজ হল প্রধানত আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ নীতি এবং অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার দেখা-শোনা করা।

ব্যুরোর ডিরেক্টর হলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে। লেঃ মির্জা এনায়েৎ আলি বেগ—এ. ডি. সি.। আর চীফ অফ দি স্টাফ—মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান।

অন্যটি—'আর্মি কমাণ্ডার' বিভাগ। এ বিভাগের প্রধান কাজ শাসন, সামরিক শিক্ষাদান, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করা। এর সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হলেন মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানি। এ. ডি. সি.—আবদুল মজিদ।

লেঃ কর্নেল ঈশান কাদেরের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি বিরাট কেন্দ্র স্থাপন করা হল সিঙ্গাপুরে। সদর দপ্তরও ব্যাঙ্কক থেকে সরিয়ে আনা হল সিঙ্গাপুরে।

গড়ে উঠল শক্তিশালী প্রচার-বিভাগ। রাসবিহারীর নির্দেশে প্রচার-অধিকর্তা এস. এন. আয়ারের নেতৃত্বে এবং শ্রীশিবরামের সম্পাদনায় সব কিছু আবার নতুন করে গড়ে তোলা হল সিঙ্গাপুরে।

প্রকাশিত হল ইংরেজী পত্রিকা 'ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া' এবং 'আজাদ হিন্দ'। হিন্দীতে—'আওয়াজে হিন্দ' এবং 'আজাদ হিন্দ'। আর তামিল ভাষায় 'স্বতন্ত্র ভারত'।

আরো দুটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হল কুয়ালালামপুর এবং পেনাং থেকে। বক্তব্য সবারই এক। আর দেরি নয়—মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য সবাই প্রস্তুত হও।

রাসবিহারীর মাথায় তখন অন্য ভাবনা। দেহ তাঁর মোটেই সুস্থ

নয়। মরণ তো বৈশাখী ঝড়। কখন যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে প্রাণটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে পারে না।

কিন্তু তারপর! তারপর কি হবে?

কি হবে নিজের বুকের রক্তে গড়া এই আজাদ হিন্দ ফৌজের?

কি হবে তিল তিল করে গড়ে ওঠা এই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের?

সবই কি শেষ হয়ে যাবে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে?

ওরা সৈনিক। ওদের কর্মক্ষম রাখতে হলে নিত্য-নতুন কাজ চাই। নতুন আবেগ চাই। চাই নতুন তরঙ্গ।

কে শোনাবে ওদের সেই নতুন জোয়ারের আহ্বান?

কার আদেশে ওরা সব কিছু তুচ্ছ করে দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রু বাহিনীর ওপর?

কে সেই অসম্ভবের নায়ক?

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য সুভাষ! সুভাষই একমাত্র নায়ক, যিনি এই গুরুদায়িত্ব বইতে সক্ষম।

অবশ্য আগেই সুভাষকে আহ্বান জানানো হয়েছে সরকারীভাবে। এবার আহ্বান করতে হবে নিজের পক্ষ থেকে। বলতে হবে—তুমি এসো সুভাষ। আমি অসুস্থ। এখানে এসে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তুমি আমাকে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দাও।

একই ভাবনা তখন ডানা মেলেছে জাপানী সেনানায়কদের মনে। রাসবিহারী অসুস্থ। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা যন্ত্রণাময় দিন।

কিন্তু তারপর?

কি হবে তখন এই নবজাগ্রত আজাদ হিন্দ বাহিনীর?

কে নেবে তার দায়িত্বভার?

কে হবে তখন এই বিরাট মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা?

পরের কাহিনী জাপানী গ্রাউণ্ড সেলফ্ ডিফেন্স ফোর্সের লেঃ জেনারেল Seizo Arisue-র মুখ থেকেই শোন:

'...Regarding this matter, Mr. Rash Behari called me to a special room and while pertaking Indian rice-curry, requested me to make a speedy arrangement to bring Mr. Subhas Chandra Bose.

Myself and my colleagues had no objection to comply with it, but we were much worried as to the seniority positions between the two Boses after the arrival of Mr. Chandra Bose. So I asked his frank opinion in the matter. In reply he assured me that we should have no worry on this point, and that he would subordinate himself to Mr. Chandra Bose.

This impressed me very much and I felt great respect towards him since I saw very plainly that he felt no hesitation to work under the other Bose ignoring himself, for the success of the Indian freedom movement. Further, I could clearly understand how much he was devoted to the independence of India.' [Rash Behari Bose—His struggle for India's Independence : P.—50·51]

সংক্ষেপে ঃ সেদিন ভারতীয় প্রথায় ভাত খেতে খেতে রাসবিহারী আমাকে সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থা করতে বললেন। আমাদের কোন আপত্তি ছিল না, তবে দ্বিধা যথেষ্টই ছিল। দুজনেই বড়। পরে এই নিয়ে আবার একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না তো?

জবাব দিলেন রাসবিহারী—না, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি তাঁর অধীনে কাজ করতে সবসময়ে প্রস্তুত।

শুনে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে মুছে ফেলতেও তাঁর কোন আপত্তি নেই।

আর একজন জাপানী কর্নেল Hideo Jwakure এ প্রসঙ্গে কি বলেছেন শোন :

'...I had consulted with Mr. Bose regarding the above matter and whether to appoint Netaji Bose as new Chairman of executive committee of the league to which Mr. Rash Behari Bose agreed at once and told me to welcome him from the bottom of his heart, making additional remarks that Netaji was a remarkable man of merits of the Indian Independence movement with noble character and extensive knowledge....

Not only myself but also all staff of Iwakura Special Detachment were deeply moved by Mr. Rash Behari Bose's noble character.' [Ibid : P.—57-58]

সংক্ষিপ্তসার : আমিও একদিন রাসবিহারীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম এই নিয়ে। জানতে চেয়েছিলাম—নেতাজী এখানে এলে পরে তিনিই কি তখন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের চেয়ারম্যান হবেন ?

সমস্ত অন্তর থেকে স্বাগত জানিয়ে তৎক্ষণাৎ রাসবিহারী সম্মতি জানালেন। বললেন—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষ একটি মহত্তম চরিত্র। জ্ঞানের পরিধিও তাঁর বহুদূর বিস্তৃত। সুভাষ অসম্ভব প্রতিভাদীপ্ত নায়ক সন্দেহ নেই।

শুধু আমি নই, আমরা সবাই সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম রাসবিহারীর এই মহত্ত্ব দেখে।

সুভাষের প্রতি রাসবিহারীর এই আকর্ষণ কি আজকের ?

আশ্চর্য, চোখেও দেখেননি কোনদিন। পরিচয়ও নেই। অথচ সুদূর টোকিও থেকে সেই সুভাষের কাছেই তিনি ডাক পাঠিয়েছেন বার বার। আর কারো কাছে নয়, শুধু সুভাষের কাছেই।

কখনো সহকর্মী দেবনাথ দাসের হাত দিয়ে। কখনো বা যতীন্দ্র-লোচন মিত্র এবং জে. সি. দাসের সাহায্যে।

নির্বাসিত জীবনেও প্রথম যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের সঙ্গে রাসবিহারী যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন বরাবর। সেখানেও অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্রীশ ঘোষকে লিখিত চিঠিতে তিনি জানতে চেয়েছিলেন সুভাষের কথা। সুভাষ কি একবার আসতে পারে না এখানে?

সব শেষে বীর সাভারকরকে লিখিত চিঠিতে। সেখানেও সেই একই কথা। সুভাষকে একবার আসতে বলো এখানে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হলে শুধু একদিক থেকে লড়াই করলেই চলবে না, আঘাত করতে হবে ঘরে-বাইরে দুদিক থেকেই। তারই জন্যে সুভাষের একবার এখানে আসা প্রয়োজন।

তারিখটা ছিল ১৯৪০ সালের ২২শে জুন।

সব কথাই সাভারকরজী সেদিন খুলে বলেছিলেন সুভাষকে। চিঠিও দেখিয়েছিলেন রাসবিহারীর। সেই সঙ্গে নিজের অভিমতও ব্যক্ত করেছিলেন বেশ খোলাখুলিভাবেই।

আমাদের এখানে নানা মুনির নানা মত। নিজেরা তো কিছু করবেই না, অধিকন্তু আর কেউ করতে চাইলেও তারা তাকে বাধা দেবে প্রাণপণে। সুতরাং যুদ্ধের সুযোগে সত্যিই যদি কিছু করতে চাও তো আর দেরি নয়। কখন যে সরকারী অতিথিশালায় ডাক পড়বে, কে বলতে পারে?

'To impress this point Savarkarji showed to Subhas Basu a letter from Sri Bose to Savarkarji written just on the eve of Japanese declaration of war.' [Two Great Indian revolutionaries : Uma Mukherjee : P.—159]

মল্লিকা, এই হল রাসবিহারী। এ রাসবিহারীকে চিনতে সময় লাগে কি ?

জীবনে একটাই মাত্র সাধ ছিল—জন্মভূমিতে ফিরে এসে মৃত্যুবরণ করা। দুর্ভাগ্য, সে সাধও তাঁর পূর্ণ হয়নি। তার আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন মহাকালের আহ্বান শুনে।

আর তাঁর ছেলে ! না, বেশি দিন নয়। মাত্র কয়েক মাস বাদেই বীর পিতার বীর সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিলেন টর্পেডোর ঘায়ে বিধ্বস্ত এক জাহাজ-ডুবির ফলে।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কার কতখানি অবদান, তা নিয়ে মস্ত বড় ইতিহাসও রচিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে।

কোথায় সেখানে রাসবিহারীর স্থান ? দেশের ক'টি ছেলেমেয়ে জানে জীবনভোর তাঁর এই অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কাহিনী ? জানে কি কেউ ?

দোষ কাদের ? ছেলেমেয়েদের, না কি আমাদের ?

এই দীর্ঘ দিন ধরে আমরা কি দেশের ছেলেমেয়েদের জানতে দিয়েছি কোন কিছু, না কি দলীয় স্বার্থের খাতিরে সব কিছু লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি প্রাণপণে ?

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটো ইতিহাস আছে।

একটা মার খাবার ইতিহাস, অন্যটা মার দেবার ইতিহাস। একটা লিখিত, অন্যটার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বোধহয় হবেও না কোনদিন।

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিখিত ইতিহাসে দেশের ছেলেমেয়েদের একথাই বোঝানো হয়েছে যে, যুগ যুগ ধরে আমরা শুধু মারই খেয়েছি বিদেশীর হাতে, কিন্তু কাউকেই মারিনি।

তোমরাও তাই করো। পিঠ পেতে শুধু মারই খেও, তারপর দরকার হলে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গিয়ে নালিশ করো, তবু কাউকেই যেন

পালটা মার দিতে যেও না। ওটাই নাকি সম্মানের। তার বাইরে কোন কিছু করতে গেলে আমরা নাকি আদর্শ-ভ্রষ্ট হব পৃথিবীর চোখে।

রাসবিহারী সে দলের নন। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে সেদিন যাঁরা হাসিমুখে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন, রাসবিহারী সেই সীমিত-সংখ্যক ঘর-ছাড়া পথিকদেরই একজন।

আপত্তি সেইখানেই। নইলে জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য কতগুলি মার খাবার কাহিনী না শুনিয়ে ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন, বাঘা যতীন, রাসবিহারী ও সুভাষ প্রমুখের এই বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলিই কি আমাদের তুলে ধরা উচিত ছিল না দেশের ছেলেমেয়েদের সামনে ?

ওদিকে একই চিন্তা তখন সুভাষের মাথায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! ওখানে আমাকে যেতে হবে। যেতেই হবে।

ডাক পাঠিয়েছেন জাপান সরকার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমাকে তাঁরা জানিয়েছেন :

'কারে ওয়া তাইসেত্‌সু না নিংগেন দে আরু নোদে কারে নো আনজেন ও মাসি সোকুংগা কানজেননি হাকারু কোতো গা দেকিন্নু নারেবা অকুত্তেমো ইয়োই।'

অর্থাৎ—মহামান্য চন্দ্র বোস অত্যন্ত দায়িত্বশীল লোক। তোমরা যদি তাঁর নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে পারো, তাহলে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

সেই সঙ্গে ডাক পাঠিয়েছেন মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

সুভাষ তুমি এসো। শুধু আমি নই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় আজ তোমার পথ চেয়ে আছে। আমি অসুস্থ, বৃদ্ধ।

তুমি এসে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে এই দুঃসহ বোঝা থেকে মুক্তি দাও।

সুতরাং আর দেরি নয়। যে করে হোক, যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে হোক, ওখানে আমাকে যেতেই হবে।

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। বরং খুবই বিপদজনক। অসম্ভবও বলা চলে। পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্র এখন শুধু মৃত্যুর পদধ্বনি।

এ অবস্থায় এখান থেকে রওনা দিলেই যে শেষ পর্যন্ত ওখানে গিয়ে পৌঁছানো যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং মৃত্যুটাই সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

জাপ-সরকারও এ আশঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বার বার। আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র। বাদ বাকি সবটাই অনিশ্চিত।

তবু যেতে হবে। যত বাধা-বিপত্তিই মাথা উঁচিয়ে আসুক না কেন, সব কিছু মেনে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে।

মৃত্যু যদি আসে তো আসুক। তবু মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের এই অপূর্ব সুযোগটাকে কোনরকমেই হেলায় হারালে চলবে না।

৫ই ডিসেম্বর জার্মান সরকারের কাছে আবার এক নোট পাঠালেন সুভাষ :

'…আমি বিশ্বাস করি, সাবমেরিন, বিমান বা জাহাজে আমার দূরপ্রাচ্যে যাবার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব। এ-কাজে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, তা আমি জানি। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে সেই ঝুঁকি আমি মেনে নেব। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। আমি জানি যে, আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবেই।

যত রকম বিপদ, যত রকম ঝুঁকি, বা যত কিছু অসুবিধাই থাকুক না কেন, এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ

থাকব। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারব, ততই ভারতের এবং আমাদের সবার মঙ্গল।' [Indian Struggle : Subhas Ch. Bose]

কেটে গেল আরো কিছুদিন।

নিজের সঙ্কল্পে সুভাষ তখন স্থির। যেতেই হবে আমাকে এখান থেকে। যুদ্ধের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

রাশিয়ার অভ্যন্তরে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী একটানা এগিয়েই চলেছে। হিটলার বলেছেন, শীতের আগেই যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে হবে। সুতরাং এগিয়ে চল।

এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। রণনীতির প্রধান কথাই হল, সরবরাহ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু রাখা এবং সেনা বাহিনীর পার্শ্বদেশ রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জার্মান বাহিনী যেভাবে একটানা এগিয়ে চলেছে, তাতে বিপদ অনিবার্য। আজ হোক বা কাল হোক, এ ভুলের মাশুল জার্মানীকে দিতেই হবে।

অতিরিক্ত জয়ের আনন্দে হিটলার এখন দিশেহারা। এ অবস্থায় কে আজ তাঁকে বোঝাবে এসব কথা!

না, এ ব্যাপারে সেনানায়কদের মধ্যে কাউকে তিনি মানতে রাজী নন। কারো কথা শুনতে প্রস্তুত নন। তাঁর এক গোঁ— এগিয়ে চল। পেছনের পানে তাকানোর প্রয়োজন নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসত নেই। শুধু এগিয়ে যাও।

কথাটা একদিন খুলেই বলেছিলেন সুভাষ। বলেছিলেন জার্মান অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে।

১৯৪২ সাল। জার্মানীর তখন তুঙ্গে বৃহস্পতি চলেছে। শুধু জয়, জয় আর জয়! সর্বত্র একটানা জয়।

হিটলার আত্মহারা। আত্মহারা গোয়েরিং, গোয়েবল্‌স্‌, রিবেনট্রপ, কাইটেল প্রমুখ সবাই। আর বেশি দেরি নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে এল বলে!

একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষ। আশ্চর্য, এত জয়ের মধ্যেও জার্মানদের আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটিগুলি তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়তে দেরি হয়নি। তাই খোলাখুলিভাবেই সেদিন তিনি বলেছিলেন জার্মান অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে ঃ

আমার মতো তুমিও নিশ্চয় জানো যে, যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। তবে ব্রিটিশকে এবার ভারতবর্ষ হারাতেই হবে।

'You know as well as I do that Germany cannot win this war. But this time victorious Britain will lose India'. [An extract from Nachrichtemlieust i. e. The German Military Intelligence Service for Far East in the charge of Paul Leverkuehn : Netaji in Germany : N. G. Ganpuley : P.—182]

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। প্রমাণ, আফ্রিকা রণাঙ্গন।

দুর্ধর্ষ জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রোমেলের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। মিশর সংলগ্ন এল-আলামিনে দাঁড়িয়ে বার বার তাঁর সে কি আবেদন হিটলারের কাছে!

বেশি নয়, মাত্র তিনশো বিমান আমাকে দিন। ওটা পেলেই আমি গোটা ব্রিটিশ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব মিশরের বুক থেকে।

কথা দিয়েছিলেন হিটলার। একবার নয়, বার বার তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রোমেলকে।

কিন্তু কোথায় বিমান! কোথায় কি! বিমান তো দূরের কথা, যান্ত্রিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় তেল পর্যন্ত তিনি সরবরাহ করে উঠতে পারেননি আফ্রিকার রণাঙ্গনে।

কারণ, তাঁর কাছে সব চাইতে বড় প্রশ্ন তখন রাশিয়া—আফ্রিকা নয়। রাশিয়ায় তখন মরণ-বাঁচন সংগ্রাম চলছে দুপক্ষের মধ্যে। সেখানে একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দিকে তাকানোর মতো অবসর তাঁর নেই। সাধ্যও নেই।

এদিকে জেনারেল রিচির পরিবর্তে ব্রিটিশ পক্ষে সেনাপতি হয়ে এসেছেন জেনারেল আলেকজান্দার।

সুযোগ বুঝে ২৩শে অক্টোবর তারিখে তিনি জেনারেল মণ্টগোমারীসহ পাল্টা-আক্রমণ চালালেন রোমেলের বিরুদ্ধে। সরবরাহ বন্ধ। এবার তুমি কোথায় যাবে ডেজার্ট-ফক্স রোমেল?

রোমেল তখন হাসপাতালে। খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি রণাঙ্গনে ছুটে এলেন অসুস্থতা ভুলে গিয়ে।

কিন্তু সব বৃথা। যান্ত্রিক যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ বিমান এবং তেল— দু'য়েরই তখন অভাব। ফলে, বাধ্য হয়েই তাঁকে পিছু হটতে হল মিশরের সেই এল-আলামিন থেকে।

এখানেই শেষ নয়। তার চাইতেও বড় ঘটনা, ৮ই নভেম্বর মার্কিন সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে পাঁচশো সৈন্যবাহী জাহাজ এবং সাড়ে তিনশো যুদ্ধ-জাহাজ সহযোগে বিরাট এক সম্মিলিত বাহিনীর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আলজিরিয়ার উপকূলে অবতরণ।

আফ্রিকা আফ্রিকাবাসীদের জন্য নয়। সুতরাং লুঠের মালের বখরা ছাড়তে কেউ এত সহজে রাজী নয়।

শেষ আত্মরক্ষা-ঘাঁটি ম্যারেথ লাইনে দাঁড়িয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন রোমেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

একদিকে বিরাট সম্মিলিত বাহিনীসহ জেনারেল আইসেনহাওয়ার, অন্যদিকে অষ্টম আর্মিসহ জেনারেল আলেকজান্দার ও জেনারেল মণ্টগোমারী।

উপযুক্ত সমর-সম্ভার ছাড়া মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিরাট এই সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর সাধ্য তাঁর কোথায়?

ফলে, যে রোমেল একদিন জেনারেল ওয়াভেলকে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়েছিলেন, জেনারেল অকিনলেকের সাঁজোয়া-বাহিনীকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন, জেনারেল রিচিসহ গোটা ব্রিটিশ বাহিনীকে

ঠেলে মিশরের নীল নদে ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করেছিলেন, তাঁকেই এবার বার্লিনে ফিরে যেতে হল পরাজয়ের কালিমা মাথায় নিয়ে।

এবার শোন রাশিয়া রণাঙ্গনের কথা।

জয়ের আনন্দে জার্মান বাহিনী তখন এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। বুঝি এগিয়ে চলার সহজিয়া আনন্দেই তারা বিভোর।

রোস্টভ দখল করা হল ২৭শে জুলাই। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জার্মান বাহিনী আবার এগিয়ে চলল ককেসাস্-এর দিকে। উদ্দেশ্য—বাকুর বিখ্যাত তৈলখনি এবং কৃষ্ণসাগর তীরস্থ রাশিয়ার দুটি উল্লেখযোগ্য বন্দর নভোরোসিস্ক ও তুয়াপ্‌সে দখল করা। যদিও রোস্টভ থেকে বাকুর দূরত্ব রেলপথেই ন'শো মাইল।

১লা আগস্ট দখল করা হল কুশচেভকা। ৫ই টিখোরটস্ক। ৯ই তারিখে আরমাভির পেরিয়ে মৈকোপের তৈলখনির দিকে।

বিপদ দেখে মৈকোপের তৈলখনি এবং ক্রাসনোডারের তৈল শোধন-কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি নিজে থেকেই ধ্বংস করে দিলেন রুশরা।

মার্শাল স্ট্যালিনের নির্দেশ—এমন কিছুই পেছনে ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না, যার ফলে শত্রুপক্ষ এতটুকুও লাভবান হতে পারে। কল-কারখানা যতটা পার পেছনে সরিয়ে নাও। বাদ বাকি সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একাকার করে দাও। এককণা খাদ্যশস্যও যেন ওরা না পায় আমাদের দেশে।

২১শে আগস্ট কিউবান নদী পেরিয়ে ক্রিমস্কায়া। নভোরোসিস্ক বন্দর দখল করা হল ৬ই সেপ্টেম্বর।

আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করা হল ২৮শে অক্টোবর। এবার এক ধাক্কায় একেবারে বাটুমের কাছাকাছি।

গতি মন্থর হয়ে এল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। কারণ, শীত।

একটু একটু করে সেই ভয়ঙ্কর শীত তখন নামতে শুরু করেছে রাশিয়ার প্রান্তরে।

অন্যদিকে কিন্তু মার্শাল ভন বোকের তখন একমাত্র লক্ষ্য হল—ডন নদী। যে করে হোক, ডন নদী পার হতে হবে।

রুখে দাঁড়িয়েছে লাল ফৌজ। ডন নদী পার হওয়া মানেই শিল্প-নগরী স্ট্যালিনগ্রাড বিপন্ন হওয়া। কিছুতেই তারা ভন বোককে সে সুযোগ দিতে রাজী নয়।

দিনের পর দিন কেটে গেল, তবু কিছুতেই কিছু হল না।

এপারে ভন বোক স্থির, দৃঢ়সঙ্কল্প। ওপারে লাল ফৌজ তেমনি অটল, অনড়। কেউ কারো কাছে হার মানতে রাজী নয়।

প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে অবশেষে ওপারে যাওয়া সম্ভব হল দীর্ঘ সতেরো দিন পরে।

ফলে, যা হবার তাই হল। চলো এবার শিল্প-নগরী স্ট্যালিনগ্রাড।

স্ট্যালিনগ্রাড অভিযানের ভার ছিল জেনারেল ভন হথ্-এর ওপর। চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য এবার তাঁকে পরিবর্তন করে আনা হল জেনারেল ভন পাউলাসকে।

২৬শে আগস্ট উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে জেনারেল ভন পাউলাসের বাহিনী পৌঁছে গেল স্ট্যালিনগ্রাডের শহরতলীতে।

২রা সেপ্টেম্বর ভল্গা নদীর তীরে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর শহরের উপকণ্ঠে। ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল প্রচণ্ড আক্রমণ। শুধু স্থলপথে নয়, আকাশপথেও।

বিরাট আয়োজন। ব্যাপক প্রস্তুতি। মোট দশ লক্ষ সৈন্য, তিন হাজার বিমান এবং তিন হাজার ট্যাঙ্ক নিয়োগ করা হল স্ট্যালিন-গ্রাড দখলের জন্য। ফুয়েরারের আদেশ—যে-কোন মূল্যে হোক, স্ট্যালিনগ্রাড তাঁর চাই-ই!

আসল আক্রমণ শুরু হল ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে।

স্ট্যালিনগ্রাড তখন তিন দিক থেকে অবরুদ্ধ। পিছিয়ে

যাবারও কোন পথ নেই। ঠিক তার পেছনেই বিপদজনক ভল্গা নদী।

দেখতে দেখতে তিন-চতুর্থাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল স্ট্যালিনগ্রাডের।

নীচে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী। সবরকম মারাত্মক সমরাস্ত্র নিয়ে তারা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল স্ট্যালিনগ্রাডের দৃঢ় বেষ্টনীর গায়ে।

ওপরে অগুন্তি বোমারু-বিমান। আসছে তো আসছেই। ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে। এক দল ফিরে যাচ্ছে। আবার নতুন এক দল আসছে। যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের।

সেই সঙ্গে দূরপাল্লার কামানশ্রেণীর অবিরাম গর্জন। দরকার হলে প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ফ্যাক্টরী, প্রতিটি কারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে হবে, তবু স্ট্যালিনগ্রাড চাই-ই! ফুয়েরারের আদেশ—স্ট্যালিনগ্রাড চাই-ই!

হ্যাঁ, তাই। নাৎসী পার্টির এক অধিবেশনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই হিটলার সে-কথা ব্যক্ত করলেন তাঁর মাতৃভাষায়ঃ

'Wir werden Stalingrad nehmen, sie Köennen dessen versichert sein.'

অর্থাৎ—নিশ্চিন্ত থাকো, স্ট্যালিনগ্রাড আমরা জয় করবই।

আর হ্যাঁ, যে-সব অফিসার এবং সৈন্য সর্বপ্রথম স্ট্যালিনগ্রাডে ঢুকবে, তাদের বেতনসহ পুরো ষাট দিনের ছুটি দেওয়া হবে। কথা দিলাম!

জেনারেল চুইকোভ ও জেনারেল জেরেমেস্কোর নেতৃত্বে অবরুদ্ধ লাল ফৌজ তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

সঙ্গে এসে যোগ দিল শ্রমিক ও মজুরের দল। যোগ দিল প্রতিটি সাধারণ মানুষ।

এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত বাইরে এসে পা দিল হাতিয়ার নিয়ে।

সবার কণ্ঠে একই শপথ। পবিত্র এই পিতৃভূমিকে কিছুতেই আমরা তুলে দেব না শত্রুর হাতে।

প্রতিটি বাড়ি, অলি-গলি, প্রতিটি কারখানা যেন এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। বাড়ির একতলায় জার্মান বাহিনী, দোতলায় লাল ফৌজ। তবু কিছুতেই তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়।

হঠাৎ একসময়ে গোটা বাড়িটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। জীবনে মৃত্যু একবারই আসে। তা বলে ভীরুর মতো কোনমতেই নয়। পিতৃভূমি রক্ষার জন্য দরকার হলে এমনি করেই প্রাণ দিতে হবে, নিতেও হবে।

চূড়ান্ত আঘাত এল ২১শে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

রাস্তায়, ঘরে, সিঁড়িতে, করিডোরে, ছাদে, সর্বত্র শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ! প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত এমনভাবে তারা মিলে-মিশে গেল যে, কে শত্রু, আর কে মিত্র, বোঝাই গেল না।

মস্কো থেকে বেতারযোগে এক মর্মস্পর্শী আবেদন প্রচার করা হল স্ট্যালিনগ্রাডের রক্ষীবাহিনীর উদ্দেশ্যে:

'The whole world is watching ; Russia will never acknowledge the defenders as her sons and daughters if for one instant they should flinch and show themselves not worthy of what they really are !'

অর্থাৎ—সারা পৃথিবী আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। রাশিয়া কোনদিনই তোমাদের নিজের পুত্র-কন্যা বলে স্বীকার করবে না, যদি তোমরা একটি ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড় বা নিজেদের উপযুক্ত বলে প্রমাণ না কর।

নতুন করে শপথ নিল রক্ষীবাহিনী। না, আমরা হার মানব না। দরকার হলে প্রাণ দিয়েও আমরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেব।

পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। আরো হয়তো হবে। কিন্তু সেদিন পিতৃভূমি রক্ষার জন্য স্ট্যালিনগ্রাডের সামরিক এবং অসামরিক

জনসাধারণ যে অভূতপূর্ব বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের নজীর রেখেছিলেন, কোথাও বুঝি তার তুলনা মেলে না, মল্লিকা।

গোটা স্ট্যালিনগ্রাড ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। টেলিফোন ব্যবস্থা বলতেও কিছু অবশিষ্ট নেই। এমন কি সাইরেন বাজানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টিধারার মতো বোমা বর্ষণ চলছে তো চলছেই। কি হবে আর এ অবস্থায় শুধু শুধু সাইরেন বাজিয়ে!

আশ্চর্য! এত বড় বিপর্যয়ের মুখেও রক্ষীবাহিনী স্থির এবং দৃঢ়-সঙ্কল্প। সেনাধ্যক্ষের কোন নির্দেশ নেই। দেবার উপায়ও নেই। সব কিছুই তখন বিধ্বস্ত।

তবু কোন ভ্রুক্ষেপ নেই রক্ষীবাহিনীর। তারা নিজেরাই তখন সেনাপতি। নিজেরাই সৈনিক। নিজেরাই সব কিছু। লক্ষ্য শুধু একটাই। যে করে হোক পিতৃভূমি আমরা রক্ষা করবই।

কাজেও তাই হল। পিছু হটতে হটতে একসময়ে রক্ষীবাহিনী ভল্গা নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়াল পিঠ দিয়ে, তবু কিছুতেই মাথা নোয়াল না জার্মানদের কাছে।

হ্যাঁ—একেই বলে 'জনযুদ্ধ'। আমাদের দেশ আক্রান্ত। সুতরাং এ যুদ্ধ এখন তোমার, আমার, দেশের প্রতিটি আবালবৃদ্ধবনিতার। পরের ভাবনা পরে হবে। এখন আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করা।

কাজেও তারা তাই করেছিল, মল্লিকা। যে উজ্জ্বল নজীর সেদিন তারা স্ট্যালিনগ্রাডে দেখিয়েছিল, যুদ্ধের ইতিহাসে সত্যিই তা দুর্লভ।

উল্লেখযোগ্য যে, মিত্রপক্ষের অন্যতম সরিক হওয়া সত্ত্বেও তখনো পর্যন্ত রাশিয়া প্রায় কোন কিছুই সাহায্য পায়নি ইঙ্গ-মার্কিনদের কাছ থেকে।

এ নিয়ে সেদিন কম সমালোচনা হয়নি দেশে-বিদেশে। এমন কি খাস ইংল্যাণ্ডও তার ব্যতিক্রম নয়। খুব তো সেদিন তোমরা

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে রাশিয়াকে। কোথায় গেল তোমাদের সেই সেকেণ্ড ফ্রণ্ট ? ডানকার্কের সেই ঘা কি এখনো শুকোয়নি তোমাদের পিঠ থেকে ?

হরেক রকম টালবাহনা আর কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া তাতে লাভ হয়নি কিছুই। চার্চিলের ভাষায় ঃ

'What can we do to help Russia ? There is nothing that we should not do.'

অর্থাৎ—রাশিয়াকে সাহায্য করার জন্য আমরা কি করতে পারি ? করণীয় এমন কিছু নেই যা আমরা করব না।

ফলে, গোটা ইয়োরোপ ভূখণ্ডে এ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে হয়েছে রাশিয়াকে একা। সম্পূর্ণ একা।

শেষ চেষ্টা করা হল ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে। মরিয়া হয়ে জার্মানরা সেদিন দলে দলে গিয়ে আছড়ে পড়তে লাগল ভল্গা নদীর তীরে।

কিন্তু সব বৃথা। স্ট্যালিনগ্রাড অজেয়, অমর। তাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই সে রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

পরের কাহিনী যেমনি অবিশ্বাস্য, তেমনি অকল্পনীয়।

স্ট্যালিনগ্রাড তিন দিক থেকে অবরুদ্ধ। তা বলে বাইরের লাল ফৌজের অন্যান্য শাখাগুলি কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তলে তলে তখন অন্য দুটি দল নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে বিরাট একটি পরিকল্পনা নিয়ে।

জার্মানরা তখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। লক্ষ্য তাদের স্ট্যালিনগ্রাড। তাদের পার্শ্বদেশ রক্ষা করে চলেছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয় সৈন্যদল।

ওদের শক্তি আর কতটুকু ! দুদিক থেকে আচমকা আঘাত হেনে গোটা জার্মান বাহিনীটাকে ঘিরে ফেলা যায় না ! দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে !

১৯শে নভেম্বর, ১৯৪২ সাল। ভোররাত্রি।

হঠাৎ সেদিন লাল ফৌজের দুটি বাহু দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবার অগোচরে।

ওদিক থেকে আক্রমণ চালালেন জেনারেল রকোসাভস্কি, এদিক থেকে জেনারেল ভাতুতিন। লক্ষ্য—সমস্ত বাধা-বিপত্তি ছিন্ন-ভিন্ন করে পরস্পর হাত মিলিয়ে অবরুদ্ধ জার্মান বাহিনীকে পিষে মারা।

কাজেও তাই হল। ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয় সৈন্যদল আর যাই হোক, সুশিক্ষিত জার্মান বাহিনী নয়। তাই দেখতে দেখতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় তারা উড়ে গেল ঝড়ের মতো। কারো পক্ষেই টিঁকে থাকা সম্ভব হল না লাল ফৌজের সেই প্রচণ্ড দাপটের কাছে।

বিপদের আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দাঁড়াল জার্মান বাহিনী। কিন্তু সব বৃথা। লাল ফৌজ তখন দুর্বার, মরিয়া। কার সাধ্য তখন তাদের গতি রোধ করে!

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ভন পাউলাস বার্তা পাঠালেন জার্মান হাই-কম্যাণ্ডের কাছে।

বিপদ আসন্ন। যে-কোন মুহূর্তে আমরা ঘেরাও হয়ে পড়তে পারি। তবে এখনো সময় আছে। ইচ্ছে করলে এখনো পাশ কাটিয়ে পিছিয়ে আসতে পারি। এ সম্বন্ধে নির্দেশ চাই।

রাজী হলেন না হিটলার। না, কোনরকমেই পিছিয়ে আসা চলবে না। তাহলে ককেসাস অঞ্চলের সমস্ত জার্মান সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সুতরাং ধৈর্য ধর। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। সব ব্যবস্থা করছি।

পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল ২০শে নভেম্বর তারিখে। বেলা তখন প্রায় একটা। হঠাৎ রাশিয়ার সবগুলি রেডিও সেদিন ফেটে পড়ল গভীর উল্লাসে।

ঘেরাও! ঘেরাও! ঘেরাও! জার্মানীর বিখ্যাত ষষ্ঠ আর্মি ঘেরাও! লাল ফৌজের দুটি বাহু পরস্পর হাত মিলিয়েছে লাটোসাঙ্কা গাঁয়ে। সাবাশ লাল ফৌজ!

আবার ভন পাউলাস বার্তা পাঠালেন হাই-কম্যাণ্ডের কাছে। আমরা ঘেরাও হয়ে পড়েছি। আত্মসমর্পণ করব কিনা সে সম্বন্ধে নির্দেশ চাই।

না, কোনমতেই না। সেই একই নির্দেশ এল জার্মান ফুয়েরার হিটলারের কাছ থেকে, প্রতিরোধ ব্যবস্থা চালিয়ে যাও। আমি শীগগিরই ওদের এই অবরোধের প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। ইতিপূর্বে ভন বুশও স্টারারুশাতে একবার ঘেরাও হয়েছিল লাল ফৌজের হাতে। ধরে রাখতে পেরেছিল কি তাকে? সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকো। সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

কিন্তু খাদ্য! সমর-সম্ভার! ঘেরাও হয়েছে মোট তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার সৈন্য। সোজা কথা তো নয়!

ভাবনার কিছু নেই। সব আকাশপথে বিমানযোগে পাঠানো হবে।

তাই পাঠানো হল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতটুকু? তাছাড়া লাল ফৌজ তাদের সে সুযোগ দেবেই বা কেন?

ডাকা হল ফিল্ড মার্শাল ভন ম্যানস্টাইনকে। যে করে হোক, লাল ফৌজের বেষ্টনী ভেঙে ষষ্ঠ আর্মিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করো। অবিলম্বে।

১২ই ডিসেম্বর ম্যানস্টাইন প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন লাল ফৌজের বিরুদ্ধে। বেষ্টনী ভেঙে এগিয়েও গেলেন অনেকটা দূর।

আর মাত্র ত্রিশ মাইল বাকি। তারপরেই ভন পাউলাসের সেই ষষ্ঠ আর্মি।

কিছুতেই কিছু হল না। ১৬ই তারিখে আবার তাঁকে পিছু হটতে হল লাল ফৌজের হাতে পাল্টা-মার খেয়ে। ষষ্ঠ আর্মিকে উদ্ধারের আশা সেখানেই শেষ।

৮ই জানুয়ারি দুজন রুশ সামরিক অফিসার সাদা নিশান তুলে এগিয়ে গেলেন জার্মান লাইনের কাছে।

এই নাও আমাদের কম্যাণ্ডারের চিঠি। তাঁর নির্দেশ—অবিলম্বে তোমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। কাল সকাল দশটার মধ্যে জবাব চাই। দাবী অগ্রাহ্য হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিরুপায়!

ষষ্ঠ আর্মির অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার থেকে নিঃশেষ হতে হতে তখন আশি হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু ভন পাউলাস সেই চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করলেন অত্যন্ত ঘৃণাভরে। ফুয়েরারের আদেশ—শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তার ওপরে কোন কথাই থাকতে পারে না।

বাধ্য হয়ে ১০ই জানুয়ারি জেনারেল রকোসাভস্কি আক্রমণ শুরু করলেন অবরুদ্ধ ষষ্ঠ আর্মির ওপর।

হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মৃত্যু—দুটোর একটা তোমাদের বেছে নিতে হবেই। এখনো বলো, কোন্‌টা তোমার চাও?

দেখতে দেখতে শেষ বিমান-ঘাঁটিটিও চলে গেল ষষ্ঠ বাহিনীর হাত থেকে। ফলে, সবরকম সরবরাহ বন্ধ। খাদ্য, সমর-সম্ভার—সব কিছু।

২৫শে ডিসেম্বর ষষ্ঠ আর্মির সংখ্যা এসে দাঁড়াল মাত্র পনেরো থেকে বিশ হাজারে।

বোঝা গেল যে, প্রদীপ নিভতে আর বেশি বাকি নেই।

৩১শে ডিসেম্বর থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ষষ্ঠ আর্মির দিক থেকে। সামান্য প্রতিরোধও না।

নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হল ২রা ফেব্রুয়ারি, বিকেল ঠিক চারটেয়। মোট চব্বিশজন জেনারেল এবং আড়াই হাজার অফিসার-সহ ফিল্ড মার্শাল ভন পাউলাসকে সেদিন বন্দী হতে হল লাল ফৌজের হাতে।

আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন কমরেড স্ট্যালিন। সাবাশ লাল ফৌজ! তোমরা যা করেছ, ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

আর হিটলার! ষষ্ঠ আর্মির চরম আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা

নিবেদনের জন্য তিনি তিন দিন শোক প্রকাশের নির্দেশ দিলেন সমগ্র জার্মানীতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত আর কোনদিনও জার্মানীকে এতবড় পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি, মল্লিকা। সেদিক থেকে স্ট্যালিনগ্রাডের এই বিপর্যয় খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সন্দেহ নেই।

বিশেষ করে হিটলারের পক্ষে। স্ট্যালিনগ্রাড তাঁর অহঙ্কারে আঘাত করেছে, আহত করেছে। বিশ্বাসের ভিত ভেঙে দিয়েছে। কোথায় এর শেষ কে জানে!

দেখে দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন সুভাষ।

নিজের হাতে গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজকে কেন্দ্র করে এতদিন তিল তিল করে যে স্বপ্নসৌধ গড়ে উঠেছিল, তা সবই আজ মিথ্যে হয়ে যেতে বসেছে। কি আফ্রিকা, কি রাশিয়া, সর্বত্র আজ জার্মানীকে পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়াতে হয়েছে হিটলারের অবিমৃশ্য-কারিতার ফলে।

এ অবস্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে আফগানিস্থান ডিঙিয়ে ভারতভূমিতে পা দেবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা করতে হলে সর্বাগ্রে এখন যেতে হবে দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ায়।

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। তবু তা মেনে নিতে হয়।

তাই নিরুৎসাহ না হয়ে সুভাষ এবার নানাভাবে চাপ দিতে শুরু করলেন জার্মান সরকারকে। আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে চাই। তোমরা ব্যবস্থা করো। অবিলম্বে।

বাধা দিলেন হিটলার। তা হয় না। জাপান তো বলেই দিয়েছে যে, আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচভাগ মাত্র। তাছাড়া যুদ্ধ-পরিস্থিতি এখন অন্য দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় বাইরে যাওয়া অসম্ভব।

অসম্ভব! মনে মনে হাসলেন সুভাষ।

দেশের জন্য নিজের গলা বন্ধক রেখে আমি একদিন জার্মানীতে এসেছিলাম। দরকার হলে তেমনিভাবেই আবার একদিন চলে যাব। ব্রিটিশের সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী হাজার চেষ্টা করেও সেদিন আমাকে বাধা দিতে পারেনি। তোমাদের গেস্টাপো বাহিনীও পারবে না।

'For the sake of my country, I have risked my neck to come to Germany. For the same reason I am prepared to risk my neck to return to India. The British C. I. D. is very efficient and just as I escaped inspite of it, I shall escape your Gestapo also.'

[Ganpuley : P.—19]

চিঠি গেল পররাষ্ট্র-সচিব রিবেনট্রপের কাছে।

আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাব। শতকরা পাঁচভাগ নয়, একভাগ আশা থাকলেও যাব। অবিলম্বে ব্যবস্থা করো।

এবারও এগিয়ে এলেন পরম শুভার্থী সেই ভন ট্রট।

সোজা লোক নন এই হিজ একসেলেন্সী নেতাজী সুভাষ বোস। এই তো সেদিন ফুয়েরারকে মুখের ওপর বলে দিলেন যে—'আমাকে উপদেশ দিতে হবে না'।

এবার আরো কত কি বলে বসবেন, কে জানে! তার চাইতে দেখা যাক, দুপক্ষকেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থায় আসা যায় কিনা!

কাজেও তাই করলেন ভন ট্রট। নানাভাবে তিনি বোঝালেন হিটলারকে। নানা যুক্তি দিয়ে।

জাপান আমাদের বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, তাদের সঙ্গে আমরা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু কতটুকু আমরা তাদের সাহায্য করতে পেরেছি এবারের যুদ্ধে?

তারা যখন এত করে বলছে, তখন আমাদের উচিত অবিলম্বে হিজ একসেলেন্সী নেতাজী বোসকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা। নইলে তারা আমাদের ভুল বুঝতে পারে।

যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারলেন না হিটলার। সত্যিই তো! জাপান আমাদের বন্ধু। তাদের দিকটাও দেখতে হবে তো!

কিন্তু কি করে নেতাজী বোসকে এখন ওখানে পাঠানো সম্ভব? কাজটা যে খুবই বিপদজনক!

অথচ ভন ট্রটের যুক্তিটাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। দেখা যাক, কতদূর কি হয়!

ভন ট্রট কিন্তু আর বেশি দিন বাঁচেননি, মল্লিকা। বছর দেড়েক বাদেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল হিটলারকে হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে। শুধু ভন ট্রট্‌কে নয়, আরো অনেককেই। সে কাহিনী বলব তোমাকে যথাসময়ে।

চুপ করে বসে থাকার মতো লোক সুভাষ নন। ইতিমধ্যে দু-দুবার তিনি ঘুরে এলেন ইতালী থেকে। ওদের একটা দূর-পাল্লার বিমান নাকি কিছুদিন আগে কোথাও না থেমে একটানা সিঙ্গাপুর পর্যন্ত উড়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। দেখা যাক, মুসোলিনীকে বলে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা!

ইয়োরোপের সংগ্রামী জীবনে সুভাষ হিটলারের কাছ থেকে যতটা না সহযোগিতা পেয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তার চাইতে অনেক বেশি সহযোগিতা পেয়েছিলেন মুসোলিনীর কাছ থেকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষের প্রতিটি কাজের প্রতি মুসোলিনীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ ছিল অপরিসীম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এককালে গান্ধীজীও অত্যন্ত শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন মুসোলিনী সম্বন্ধে।

তা বলে এবার কিন্তু মুসোলিনী রাজী হতে পারলেন না সুভাষের এই প্রস্তাবে। পরীক্ষামূলকভাবে একটা বিমান সিঙ্গাপুর পর্যন্ত উড়ে

গিয়েছিল, একথা ঠিক। কিন্তু পরের বারেও যে সে প্রচেষ্টা সার্থক হবে, তার নিশ্চয়তা কি ?

তাছাড়া সবচাইতে বড় প্রশ্ন, মহামান্য পোপের ভ্যাটিকান শহর। ভ্যাটিকান খোলা নগরী। স্বভাবতই বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচরদের কাছে ভ্যাটিকান এখন স্বর্গপুরী। কোন রকমে খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ অনিবার্য। ভাল-মন্দ কিছু হলে তখন পৃথিবীর কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কি করে ?

অসম্ভব ! জেনে-শুনে কিছুতেই তিনি সুভাষকে এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিতে পারবেন না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, মুসোলিনী সেদিন কোন রকম ঝুঁকি নিতে রাজী হননি। নিলে বোধহয় সুভাষকে আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুখ দেখতে হত না, মল্লিকা।

এ প্রসঙ্গে এন. জি. গনপুলে কি বলেছেন শোন ঃ

'The Vatican City in Rome was an open centre for diplomats of all countries. Rome itself was a honeycomb of spies where it was not possible to keep anything secret for very long.

Netaji was required therefore to give up the attempt of flying from Italy and had to return sadder and downcast. In reality, it was good that he did not risk the flight, otherwise he would have been surely taken prisoner or his plane shot down.'

[Netaji in Germany : N. G. Ganpuley : P.—128]

রোম থেকে আবার বার্লিন। তারপরই সোজা জাপানী দূতাবাসে। কদ্দর হল ! কবে আমি যাব তোমাদের দেশে ? কবে ! কবে ! আর কত দেরি ?

ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠলেন সুভাষ। গনপুলের ভাষায় ঃ

'Netaji, however, was getting uneasy and bad-tempered because his mind was already working in the Far Eastern regions whereas his body was still in Germany.'

চলতি কথায়, মন পড়ে আছে দূর প্রাচ্যে, দেহ পড়ে আছে জার্মানীতে। ভাবনা-চিন্তা দেহ-মন সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে আছে সেই একটি বিন্দুতে। কবে আমি ওখানে যাব ? কবে ?

ওদিকে তখন ভেতরে ভেতরে কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো। কি করে এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানো যায় নেতাজী বোসকে ?

কাজটা খুবই বিপদজনক। বিশেষ করে জার্মানীর পক্ষে।

জার্মানীর এখন আর সেদিন নেই। মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট ব্রিটিশ বাহিনী ইতিমধ্যেই বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

এমন কি তাদের রাজকীয় বিমান-বহর এখন প্রকাশ্যেই এসে হানা দিতে শুরু করেছে জার্মানীর আকাশে।

নৌ-বহরের দিক থেকেও আগেকার তুলনায় ব্রিটিশ এখন অনেক শক্তিশালী।

ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, ভূমধ্য সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর—সব কিছুই এখন তাদের দখলে। এ অবস্থায় জাহাজ বা বিমানের সাহায্যে এতদূর পথ পাড়ি দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

একমাত্র উপায় সাবমেরিন। কিন্তু তাতেই বা ভরসা কোথায় ?

কখন যে টর্পেডো, মাইন, ডেপথ্-চার্জ বা ভারী কামানের পাল্লার মধ্যে পড়ে যেতে হবে, তা কে বলতে পারে ? বরং সেটাই তো স্বাভাবিক। গনপুলের ভাষায় :

'Germany had the most difficult task, as her submarine was required to pass through mine-infest-

ed and carefully guarded waters round the British isles. Passing through the English Channel was considered a very hazardous and dangerous assignment.'

দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মাসও বুঝি গড়িয়ে যায়। তবু আলোচনার আর শেষ নেই।

একবছর আগে হলে কথা ছিল না, কিন্তু এখন বলতে গেলে জার্মানীর চারিদিকেই বিপদ। সুতরাং সব দিক ভাল করে ভেবে-চিন্তে দেখা দরকার।

সবচাইতে বড় প্রশ্ন, অন্যতম শরিক জাপান। জাপান রয়েছে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে। স্বভাবতই যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সবই করতে হয় টেলিফোন বা রেডিওগ্রামের মাধ্যমে।

সেখানেও পদে পদে সংশয়। পদে পদে ভয়। শত্রুপক্ষ মাঝ থেকে ট্যাপ করে খবরটা ধরতে পেরেছে কিনা কে জানে! তাই সব কিছুই করতে হয় সাঙ্কেতিক ভাষায়।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরে অবশেষে একদিন স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ।

জাহাজ নয়, বিমানও নয়, যেতে হবে সাবমেরিনেই।

অবশ্য বিপদ সব দিকেই আছে, তবু সাবমেরিনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। মাত্র একজন তাঁর সঙ্গে যেতে পারবে সঙ্গী হিসেবে।

প্রথমার্ধের পথই সবচাইতে বিপদসঙ্কুল। সে দায়িত্ব বহন করবেন জার্মান সরকার। তাঁরা তাঁকে পৌঁছে দেবেন দক্ষিণ-আফ্রিকা সংলগ্ন মাদাগাস্কারের কাছাকাছি একটা স্থানে। বাকি অংশের দায়িত্ব জাপান সরকারের।

এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের আলেকজান্দার ওয়র্থ পরবর্তী কালে কি বলেছেন শোন :

'After long and complicated discussions with the

Italian and the Japanese Embassies in Berlin and Rome, the following was agreed upon between the Special India Division and the German military authorities ; Netaji accompanied by only one friend should be taken by a German submarine by way of the British Channel, Bay of Biscay, West Africa, South Africa to the south of Madagaskar where he should be transferred to a Japanese submarine which would take him to the nearest Japanese base in East Asia.

All these arrangements were successfully carried out through the joint efforts of Netaji and the Special India Division and thanks to the initiative of General Oshima, Ambassador of Japan in Berlin, his Military attache Mr. Yamamoto, and other members of the Japanese Embassy in Berlin and Rome, as well as the competent German military authorities.'

[Netaji in Germany : Alexander Werth : P.—38]

শুরুতেই বাধা এল জাপানী নৌ-বিভাগের পক্ষ থেকে। জাপানী আইনে অসামরিক লোকের পক্ষে সাবমেরিন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুভাষচন্দ্র বোস তাহলে যাবেন কি করে ?

উত্তর দিলেন সেই ভন ট্রট। সুভাষ বসু ইণ্ডিয়ান আর্মির কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্। তিনি অসামরিক লোক হলেন কি করে ?

ব্যস, সব চুপ। আর একটি কথাও শোনা গেল না জাপানী নৌ-বিভাগের পক্ষ থেকে।

'When Trott received this message by cable from the German Ambassador in Tokyo, Mr. Ott, he

immediately sent his reply. 'Subhas Chandra Bose by no means private person but 'Commander-in-chief' of Indian Liberation Army'.' [Ibid : P.—38]

পরিকল্পনা মতো প্রথমেই জাপানী দূতাবাসের কর্ণেল ইয়ামামোতো পাড়ি দিলেন টোকিওর উদ্দেশ্যে। সুভাষচন্দ্র বসুর অভ্যর্থনার জন্য আগে থেকেই ওখানে গিয়ে ব্যবস্থা করা দরকার।

তখনো রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের অনাক্রমণ চুক্তি বিদ্যমান। সুতরাং তাঁর পক্ষে তুরস্ক ও মস্কো হয়ে জাপান পাড়ি দিতে অসুবিধার কোন প্রশ্ন নেই।

কিন্তু ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষের বেলায় এবার আর সে-কথা খাটে না। স্বভাবতই সে-পথ এখন রুদ্ধ। তাই এই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ এবার তাঁকে পাড়ি দিতে হবে সাবমেরিনে।

কিন্তু কবে? কবে নতুন করে যাত্রা শুরু হবে সুভাষের?

না, সে-কথা একমাত্র নেতাজী আর দু-তিনজন ছাড়া কাউকেই বলা হবে না।

এ-যাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ-পথে জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি বাস।

নেতাজী বোস সাধারণ লোক নন। কোন রকমে একবার টের পেলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এখন নয়। বলা হবে আরো পরে। যথাসময়ে।

'অতঃপর নেতাজী জার্মানী হইতে সাবমেরিন যোগে জাপান চলিয়া আসিলেন।'

বলা সহজ, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়, মল্লিকা।

কোন গ্যারান্টি নেই। কোন নিশ্চয়তা নেই। কি যে হবে, কেউ তা বলতে পারে না। এমন কি হিটলার, মুসোলিনী, তোজো প্রমুখ

রাষ্ট্রনায়কগণও সেদিন পুরোপুরি আশা করতে পারেননি যে, সুভাষের এই যাত্রা সার্থক হবে।

আশা করা সম্ভবও ছিল না। কারণ, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। প্রায় সবটাই শত্রু-অধ্যুষিত অঞ্চল। তাদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এই দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সুভাষও তা জানতেন। শত্রুপক্ষের মাইন, টর্পেডো, ডেপথ্-চার্জ ইত্যাদি এড়িয়ে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যে সহজসাধ্য নয়, সে-সব কোন কিছুই তাঁর অজানা ছিল না।

তবু সেই বিপদসঙ্কুল পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সব কিছু তুচ্ছ করে। জীবনের একমাত্র স্বপ্ন—স্বাধীনতা। সেখানে নিজের কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ কোথায় ?

যেদিন সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে এক বস্ত্রে, প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, সেদিনই কি তিনি বারেকের জন্য চিন্তা করেছিলেন নিজের কথা ?

একবারও কি ভেবেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে ?

এই হল সুভাষ। স্বাধীনতা কে না চায়! কে না ভালবাসে! কিন্তু সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এমন করে মরিয়া হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ক'জন !

সুভাষ পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই তো আজও তিনি লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের মনে বেঁচে আছেন এক ও অদ্বিতীয় মহাক্ষত্রিয় 'নেতাজী' হয়ে, যা অহিংস ভারতবর্ষে সেদিন কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল। যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই।

বাইরে থেকে কোন কিছু বোঝার উপায় নেই। যেন কিছুই হয়নি। যেমন চলছিল, তেমনই যেন চলছে সব কিছু।

ভেতরে ভেতরে কিন্তু প্রস্তুতি-পর্ব তখন চলেছে সমান ভাবেই। সুভাষও প্রস্তুত। শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষা মাত্র।

প্রথমেই সুভাষের কয়েকটি বক্তৃতা রেকর্ড করে রাখা হল বেতারের জন্য। তাঁর অবর্তমানে মাঝে মাঝেই এগুলি প্রচার করা হবে আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে।

উদ্দেশ্য—ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে বিভ্রান্ত করা। অর্থাৎ—সুভাষ এখানেই রয়েছেন। কোথাও তিনি যাননি জার্মানী ছেড়ে।

সুভাষের কথাবার্তার মধ্যেও নতুন সুর। পরিচিত-অপরিচিত সর্বত্র একই কথা।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কিছুদিনের জন্য রাশিয়া ফ্রণ্টে যাচ্ছি। তোমরা সবাই ঠিকমত কাজ চালিয়ে যেও। মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসছি এখানে।

কিন্তু সঙ্গে কে যাবেন?

মাত্র একজনকে সঙ্গে নেওয়া চলবে।

কে সেই লোক?

কি তাঁর নাম?

আবিদ হাসান। হায়দরাবাদের তরুণ ছাত্র বার্লিনে অধ্যয়নরত আবিদ হাসান। সেই আবিদ হাসান, যিনি সর্বপ্রথম যোগ দিয়েছিলেন সুভাষের সেই পনের জনের বাহিনীতে। তিনিই সেদিন সুভাষের সঙ্গে পাড়ি দেবেন তাঁর একান্ত-সচিব রূপে।

সুভাষের ইচ্ছা তা-ই।

কিন্তু এন. জি. স্বামী! বেতার-বিজ্ঞান ও নানাবিধ সাঙ্কেতিক লিপিতে অভ্যস্ত স্বামীকে যে চাই-ই! ওঁর সহযোগিতা যে খুবই প্রয়োজন হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই রণাঙ্গনে! ওঁকে না পেলে কি করে চলবে?

তাই মেনে নিলেন জার্মান সরকার। ঠিক আছে, তাই হবে। স্বামীকে পাঠাবার দায়িত্ব আমরা নিলাম। তবে ঠিক এখনই নয়, ক'দিন বাদে।

তাই তাঁরা করেছিলেন, মল্লিকা। হাজার প্রতিকূলতা ঠেলেও

স্বামীকে তাঁরা যথাসময়েই পৌঁছে দিয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই রণাঙ্গনে।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪৩ সাল।

অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে সেদিন ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হল বার্লিনে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রায় ছ'শো কূটনৈতিক প্রতিনিধি সেদিন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সুভাষের আহ্বানে। পৃথিবীর সর্বত্র সেদিন সেই অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণী প্রচার করা হয়েছিল আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে।

আশ্চর্য, সুভাষ সেদিন ভাষণ দিলেন জার্মান ভাষায়ঃ

'Britischer Imperialismus und Indischer Nationalismus köennen niemals eine lebendige Einheit eingehen. Weil Indien und Gross Britannien kein gemeinsames ziel haben köennen. Ihre nationalen Interessen sind vollkommen unter schieden.'

পরে দেশীয় ভাষায়ঃ

২৬শে জানুয়ারি। পৃথিবীর সর্বত্র আজ ভারতীয়গণ সমবেত হয়ে থাকেন তাঁদের স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য। ১৯৩১ সালে আমি যখন কলকাতার মেয়র ছিলাম, তখন এই স্বাধীনতা দিবসেই আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম ব্রিটিশ অশ্বারোহী পুলিশের দ্বারা। সেদিনের সেই আঘাতের দাগ আজও আমার দেহে অক্ষয় হয়ে আছে।

...ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের জাতীয়তাবাদ কখনো একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ, ভারত ও ব্রিটেনের পরস্পরের স্বার্থ এক নয়, তাদের জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত।...আজ হোক, কিম্বা কাল হোক, এই সংগ্রামের চরম অধ্যায়ে আমাদের পৌঁছতেই হবে। এই সংগ্রাম—যা ভারতের কাছে জীবন-মৃত্যুর

সংগ্রাম হয়ে উঠেছে, যা ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হয়ে উঠেছে, তাতে একটি মাত্র লক্ষ্যই আমাদের থাকবে। সে লক্ষ্য হল—আমাদের জয়লাভ। আমাদের স্বাধীনতা। জয় হিন্দ!'

আর একটি অনুষ্ঠান হল জাপানী দূতাবাসে।

মাত্র কয়েকজন অতিথি। সব মিলিয়ে বারো জন। সুভাষ ও সহকারী নেতা নাম্বিয়ার তাঁদের অন্যতম। তবে অন্য দিক থেকে এ অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠান শেষ। অতিথিরা সবাই চলে গেছেন একে একে। সহকারী নেতা নাম্বিয়ারও চলে গেছেন একটু আগে। বাকি শুধু সুভাষ।

এবার শুরু হল আসল আলোচনা। কথা বলতে একটাই। রেডি ইওর একসেলেন্সী চন্দ্র বোস। জিরো আওয়ার আসন্ন। সময় নিকট হয়েছে, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে। কর্নেল ইয়ামামোতো আগেই জাপানে চলে গেছেন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন বলে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে নিমেষে মনের কোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে সুভাষের।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। অচিরেই তাঁকে পাড়ি দিতে হবে নতুন দেশে। নতুন পরিবেশে। নতুন করে।

জয় বীরেশ্বর বিবেকানন্দ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

'ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বলিপ্রদত্ত—'

জানি স্বামীজী, আমি জানি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। প্রয়োজন হলে আমি যেন নিজেকে বলি দিয়েও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারি।

আর যদি যাবার পথেই ভাল-মন্দ একটা কিছু ঘটে যায়?

তাহলে জীবনের সেই অন্তিম মুহূর্তেও আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রেখে যাব মহানায়ক রাসবিহারী বসুর উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন হোক।

'If I were lost on the way, please transfer my will to Mr. Behari Bose and my last wishes for his success.'

২৮শে জানুয়ারি।

সে কি বিশ্রী দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সেদিন গোটা জার্মানী জুড়ে! শুধু বরফ আর বরফ! সকাল থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরছে তো ঝরছেই। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে নানাদিক থেকে।

মে মাস থেকেই স্বাধীন বৈদেশিক মিশনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রকে। মূলত আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের মর্যাদা এখন যে-কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদার সমান।

আজাদ হিন্দ ফৌজ এখন আর আগেকার সেই Annaberg ক্যাম্পে নেই। দলবৃদ্ধির জন্য এখন তাদের স্থান হয়েছে Konigs-bruck ক্যাম্পে। মস্ত বড় ক্যাম্প। সুখ-সুবিধাও সেখানে যথেষ্ট।

সেদিন পায়ে পায়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেই ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলেন সুভাষ।

যাবার আগে শেষ দেখা। নিজের হাতে গড়া সন্তান-সম এই সেনা বাহিনীকে এখানে ফেলে রেখে যেতে মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। কিন্তু উপায় কি! বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে যেতে যে তাঁকে হবেই।

অবশ্য ফৌজ যেমন রয়েছে, তেমনিই থাকবে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছুই এখন থেকে দেখা-শোনা করবেন সহকারী নেতা নাম্বিয়ার। তাই ঠিক হয়েছে জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে।

জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী!

সুভাষকে দেখেই হাজার হাজার নওজোয়ান ব্যারাক থেকে

বেরিয়ে এসে ভীড় করে দাঁড়াল তাঁর চারপাশে। নেতাজী আয়া! আজাদ হিন্দ ফৌজকা নেতাজী! হিন্দুস্থানকা নেতাজী! সব-কোইকো নেতাজী!

সুভাষ তখন বেশ একটু অসুস্থ। তাই আগেই তিনি ফৌজী ভাইদের জানিয়ে দিলেন তাঁর অক্ষমতার কথা। আমি আজ বেশি কিছু বলতে পারব না ভাই। বড়জোর পনের-বিশ মিনিট।

একে বরফ-ঝরা দিন, তার ওপর খোলা জায়গা। সেই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সুভাষ শুরু করলেন তাঁর পনের-বিশ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণ। প্রথমে ক্লান্তি-জড়িত স্বরে—পরে দীপ্তকণ্ঠে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এমনি করেই।

কত কথা। কত ভাঙা-গড়ার কাহিনী। স্বাধীনতা সংগ্রামের কত ইতিহাস। যেন শেষ নেই এই উত্থান-পতন আর ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের।

এই শেষ দেখা। তাই যাবার আগে সব কথা আজ বলে যেতে হবে। উজাড় করে দিতে হবে নিজেকে। কিছুই ফেলে রাখলে চলবে না।

হাজার হাজার আজাদী সৈনিক বিস্মিত, নির্বাক।

ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ জমে গেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছু ভিজে গেছে বরফ-বৃষ্টিতে। তবু কোন খেয়াল নেই তাদের। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছুই বুঝি তারা ভুলে গেছে তাদের একান্ত প্রিয় নেতাজীকে কাছে পেয়ে।

কতক্ষণ সেদিন ভাষণ দিয়েছিলেন সুভাষ? বেশি নয়, মাত্র সোয়া দু ঘণ্টা।

'He wanted to speak only for about 15 to 20 minutes, but after he made the beginning and started opening his heart to those who had gathered there,

he forgot about his illness, and his cold and everything else, and spoke for exactly two hours and a quarter.'

সব শেষে সবার সঙ্গে বসে খাওয়া। এটা সুভাষের বরাবরের অভ্যাস। মাঝে মাঝে আজাদী সৈনিকদের মাঝে বসে খাওয়া তাঁর চাই-ই। তখন আর তিনি তাদের কাছে নেতাজী নন, ভাই, বন্ধু, গুরু সব কিছুই।

খাওয়া শেষ। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে। বিদায় দিতে হবে।

বরাবর যা হয়, এবারও তাই হল। হাজার কণ্ঠে সমস্বরে রব উঠল—নেতাজী জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ! আবার এসো নেতাজী। আমরা তোমার পথ চেয়ে থাকব। জয় হিন্দ!

'জয় হিন্দ!'

এক অকথিত ব্যথায় সুভাষ গম্ভীর, করুণ, স্বল্পবাক।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই তিনি সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন জোর করে।

এ দুঃখ তাঁর একার। এ বেদনার ভাগ দেওয়া চলবে না কাউকেই। বুকটা ব্যথায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও আজ তাঁকে মুখের হাসি জিইয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ! এ ছাড়া কোন উপায় নেই।

বিদায় ফৌজী ভাইগণ, বিদায়! যেতে যেতে অজ্ঞাতেই বুঝি কথাটা বেরিয়ে এল সুভাষের বুক চিরে, সব যেমন ছিল তেমনিই থাকবে। সবই চলবে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। আমিই শুধু থাকব না। তবু যেখানেই থাকিনে কেন, তোমাদের কথা আমি ভুলব না। কোনদিনও না।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সাল। তখনো অন্ধকার কাটেনি। আলো-আঁধারিতে পথ-ঘাট, গাছপালা, পাহাড়-নদী সব কিছুই রহস্যময়।

বার্লিনের লেহ্‌টার ব্যানহফ (Lehrter Bahnhof) রেল-স্টেশন। কিয়েল-গামী গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে। আর দেরি নেই।

সাধারণ দৃষ্টিতে কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, পরিস্থিতি আজ অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক নয়।

এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্ধর্ষ জার্মান গোয়েন্দার দল। চোখে-মুখে তাদের শাণিত তলোয়ারের দৃষ্টি।

হিজ একসেলেন্সী সুপ্রীম কম্যাণ্ডার আজাদ হিন্দ ফৌজ—নেতাজী সুভাষ বসু আজ যাবেন লেহ্‌টার ব্যানহফ স্টেশন হয়ে। এ সতর্কতা শুধু তারই প্রয়োজনে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনের মুখে। রেল-স্টেশন, বিমান-ঘাঁটি, বন্দর, পোতাশ্রয় কিছুই এখন আর নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বিভাগও এখন আগেকার তুলনায় অনেক বেশি তৎপর। কোথায় যে কে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে, কে জানে!

সুভাষ বোসের মতো লোককে পেলে যে তারা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সে তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং সাবধানতা প্রয়োজন।

সাবমেরিন কম্যাণ্ডারকেও এ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বার বার।

শত্রু-জাহাজের সাক্ষাৎ পেলেই যে তোমাদের হাত নিস্‌ পিস্‌ করে ওঠে, তা আমরা জানি। কিন্তু সাবধান! এক্ষেত্রে ওসব একেবারেই চলবে না।

মনে রেখো যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল এখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

উত্তর সাগর, আটলান্টিক, ভারত মহাসাগর—সর্বত্র এখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির দূরপাল্লার বোমারু-বিমান, মাইন ও যুদ্ধ-জাহাজের সমারোহ।

প্রতিটি গতিপথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্কিন এবং বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা বিভাগ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শত শত অভিজ্ঞ গোয়েন্দার দল।

যে-কোন মুহূর্তে টর্পেডো বা ডুবন্ত মাইনের বিস্ফোরণে অতল সমাধি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কারণ, যেতে হবে শত্রুর নাকের ডগার ওপর দিয়ে, যুদ্ধ-জাহাজের দৃষ্টি এড়িয়ে, রাডার যন্ত্রকে ফাঁকি দিয়ে, অতি সঙ্গোপনে।

সুতরাং খুব সাবধান! কোন রকম ঝুঁকি এক্ষেত্রে নেওয়া চলবে না। একটিবারের জন্যও না।

মনে রেখো যে—এমন একটি কঠিন দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে, যা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্তুও বটে। সুতরাং এগুতে হবে একেবারে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে।

ঠিক একইভাবে, একই সময়ে ওদিক থেকে জাপানী সাবমেরিনকে পাড়ি দিতে হবে সময়ের সঙ্গে চুলচেরা হিসেব করে।

একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ। হাজার চেষ্টা করলেও তখন কেউ কারো দেখা পাবে না মাদাগাস্কারের সেই নির্দিষ্ট স্থানে। সুতরাং আবার বলছি যে—সাবধান! খুব সাবধান!

লেহ্‌র্টার ব্যানহফ থেকে ট্রেনে জার্মানীর উত্তর সীমানায় অবস্থিত কিয়েল বন্দর।

ওখানেই তখন I/29 নম্বর সাবমেরিনটা অপেক্ষা করছিল সুভাষের জন্য। সেই চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও একজন ভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের প্রয়োজনে একটি সাবমেরিনের ব্যবস্থা করা—এটা সত্যিই অভাবনীয়। সেই অভাবনীয় সম্মানই সেদিন জার্মানী দিয়েছিল সুভাষকে।

লগ্ন আসন্ন। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে প্রতিটি দেশী ও বিদেশী বন্ধুর কাছ থেকে। বিদায় নিতে হবে দীর্ঘ দিনের কর্মক্ষেত্র জার্মানী থেকে।

সেই বিদায়-মুহূর্তে কে কে সেদিন উপস্থিত ছিলেন সুভাষের

পাশে ? মাত্র তিনটি লোক। আর কাউকে সেদিন খবরটা জানতে দেওয়া হয়নি সতর্কতা হিসেবে।

এ পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নেতা নাম্বিয়ার। নাম্বিয়ারই একমাত্র লোক, যিনি জানতেন সুভাষের এই পরিকল্পনার কথা।

জার্মানীর পক্ষ থেকে ছিলেন স্টেট সেক্রেটারী কেপ্‌লার আর বৈদেশিক দপ্তরের আলেকজান্দার ওয়র্থ।

প্রত্যক্ষদর্শী আলেকজাণ্ডার ওয়র্থ-এর মুখ থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন :

'Nambiar, State Secretary Keppler and I took Netaji and Hassan to Kiel during the night of the 7th to the 8th February, 1943. As I mentioned before, with the exception of Nambiar, Keppler and myself and the military people concerned, nobody else knew about Netaji's departure.'

[Netaji in Germany : P.—40]

আর সহযাত্রী আবিদ হাসান! তিনি কি সেদিন কিছু জানতেন নিজের গন্তব্য সম্বন্ধে ?

মোটেই না। সতর্কতা হিসেবে তাঁকেও সেদিন কিছু বলা হয়নি আগে থেকে। তাঁর ধারণা, তিনি গ্রীস পরিভ্রমণে চলেছেন নেতাজীর সঙ্গে। তাই সঙ্গে নিয়েছেন সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে গ্রীকভাষায় লিখিত একটি সহজপাঠ্য বই—সুবিধে হবে বলে।

কোনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে সাবমেরিন কম্যাণ্ডার তখন প্রস্তুত। আর দেরি নয়। সবগুলো ট্যাঙ্ক জলে ভর্তি হয়ে গেছে। সময় হয়ে এল বলে! এখন শুধু ডুব দেবার অপেক্ষা মাত্র।

'বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! তোমাদের কথা আমি কোনদিনও ভুলব না। আবার দেখা হবে!'

একটা রুদ্ধ আবেগকে চাপতে গিয়ে হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে নিচে নেমে গেলেন সুভাষ। আর ফিরেও তাকালেন না। বিপ্লবীকে পেছন পানে তাকাতে নেই। এগিয়ে চলাই তার সহজাত ধর্ম।

স্থির, অপলক দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন সহকারী নেতা নাম্বিয়ার।

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। সুভাষ চলে যাচ্ছেন। হিজ একসেলেন্সী সুপ্রীম কম্যাণ্ডার, আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী সুভাষ!

ঐ যে সাবমেরিনটা ডুবতে শুরু করেছে সুভাষকে নিয়ে! ঐ যে তার পেরিস্কোপটা এখনো জেগে রয়েছে জলের ওপরে!

না, আর নেই। খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কোন কিছুই এখন নজরে পড়ে না সমুদ্রের বুকে। সব শান্ত, সব স্থির।

একসঙ্গে কতদিন, কত মুহূর্ত, কত আনন্দ, বেদনা, কত সীমাহীন রাত্রিই না কেটে গেছে।

আজ সব কিছুর ইতি। সব বেদনার পরিসমাপ্তি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় শেষ করে আজ আবার সুভাষ এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে।

হে রুদ্র সন্ন্যাসী, এ সময়ে চোখের জল ফেলে তোমার চলার পথকে আমরা পিচ্ছিল করে তুলব না। তুমি যাও। তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক!

'মুক্তিপথের অগ্রদূত। পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!'

*** দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ***

আমি সুভাষ বলছি

শৈলেশ দে